পরলোক

পরলোক

পণ্ডিত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্নের ভূমিকা সমন্বিত

নবপত্র প্রকাশন ❑ কলিকাতা-৭৩

❑ প্রথম প্রকাশ ১৯২৭

❑ প্রকাশক . প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

❑ টাইপ সেটিং দি বেঙ্গল পি টি এস এন্ড কমপিউটার সেন্টার
৯এ বায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

❑ মুদ্রক ইম্প্রেশন প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
৩০/১ ঝাউতলা রোড, কলিকাতা-৭০০ ০১৭

❑ প্রচ্ছদ মদন সরকার

উৎসর্গ

আমি

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

মাদ্রাজ-হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ভকিল

উদার-হৃদয়, দেব-চরিত,

আমার

অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু

শ্রীযুত বনয়ারীলাল মিত্রের

পবিত্র

কর-কমলে

উৎসর্গ
করিলাম

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন

সাহিত্য-ক্ষেত্রে আমাব উপদেষ্টা, পরিচালক, উৎসাহদাতা, গুরু, অশেষগুণসম্পন্ন, সর্বশাস্ত্রবিশারদ, প্রথিতনামা মনীষী, আমাব অগ্রজকল্প, শ্রীযুত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশযের উপদেশে বিগত ১৩২৪ সালেব বৈশাখ মাসে আমি মহাত্মা লেড বিটাবেব On the other side of Death নামক পুস্তক অবলম্বন কবিযা, এই গ্রন্থ প্রণযনে প্রবৃত্ত হই। ১৩২৬ সালেব ১১ই চৈত্র বইখানি শেষ করি। ঐ সময কলিকাতায মেট্রোপলিট্যান্ ইন্স্টিটিউশনেব বহুবাজাব শাখা স্কুলে বাংলা ভাষার প্রধান শিক্ষকপদে নিযোজিত থাকায় পুস্তকখানিতে ইচ্ছামত সময দিতে পাবি নাই। একে ম্যালেবিযাব মক্কেল, তাহাতে বাত্রি জাগিয়া বইখানি লিখিযাছি, এ অবস্থায স্থানে স্থানে অসঙ্গতি থাকা অসম্ভব নহে। ভরসা করি, সহৃদয পাঠক সেরূপ স্থলে আমার ত্রুটি মার্জনা করিয়া লইবেন। আত্মা, পবকাল, ভূতযোনি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয বিষয লইয়া, একাল-সেকাল তর্ক-বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। ইহা লইযা সকল দেশেই তর্ক-যুদ্ধ। তাই জগতের প্রথিত নামা বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা দ্বাবা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছেন, এই পুস্তকে তাহাই সন্নিবেশিত হইল। অতি বড নাস্তিককেও এখন হেঁটমুণ্ড হইযা ভূত-প্রেত প্রভৃতি মানিযা লইতে হইবে। অনেকেব মনের ধাঁধা ইহাতে মিটিয়া যাইবে। ইহাতে দেশেব ও দশেব যদি কিছু কল্যাণ সাধিত হয, তবে তাহাব ষোল আনা গৌববই মহাত্মা হীবেন্দ্রবাবুব প্রাপ্ত কাবণ। এরূপ পুস্তকেব প্রণযনে প্রধান উৎসাহদাতাই তিনি।

ইহাতে যদি কিছু নিন্দাব বিষয থাকে তাব জন্য আমাব খেযালীপনাই দাযী , আমি অযোগ্য বলিয়া সকল ত্রুটিই আমারই প্রাপ্য।

এটি আমার খাঁটি খেয়াল! প্রথম দশ অধ্যাযেব ভাষাটা একটু "পণ্ডিতি" বকমেব হইযাছে। দ্বিতীয় সংস্কবণে উহাকে সরল করিয়া দিবার ইচ্ছা রহিল। পুস্তকেব কাহিনী পাঠকগণেব নিকটে তৃপ্তিদাযিনী হইলে, শ্রম সার্থক বলিয়া মনে কবিব। ইতি

গোস্বামী-দুর্গাপুর,
জেলা-নদীযা
২৮শে ভাদ্র,১৩৩৩

গ্রন্থকার।

ভূমিকা

মহাকবি শেক্সপীয়র পবলোক প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ও সেই অজানা দেশ যাব প্রান্ত থেকে কোন পান্থ কোন দিন ফেবে নাই—that undiscover country from whose bourne no traveller returns পরলোক সাধারণের অবিজ্ঞাত দেশ বটে, কিন্তু ঐ মুলুক থেকে কেহ কখনও ফেরে নাই, এ কথা কি ঠিক? শেক্সপীয়রের নিজেব নাটকেই—হ্যামলেট, জুলিয়াসসিজাব প্রভৃতিতে—দেখিতে পাই, প্রেত (Ghost) পবলোক হইতে ফিবিয়া ইহলোকে শুধু বিচরণ কবিতেছে না—এই পৃথিবীব মানুষের সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় কথাবার্তা কহিতেছে। শেক্সপীয়র রাণী এলিজাবেথেব সমসাময়িক—প্রায় ৩৫০ বৎসরেব পূর্ববর্তী লোক। এই ৩৫০ বৎসরে পরলোক সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান আলোচনা হইয়াছে—অনেক সমীক্ষা পবীক্ষা চলিয়াছে। অনেক প্রেতাত্মা মানুষেব অববাহনে—কখন কখন বা স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া স্বপ্রয়োজনে Medium বা মধ্যস্থের বাহনে অথবা নিজেব সূক্ষ্মশবীর অবলম্বনে ইহলোকে প্রত্যাগত হইয়া, নবনারীর ইন্দ্রিয় গোচব হইযাছে এবং স্বমুখে পরলোকেব সংবাদ প্রচাবিত করিয়াছে। যাঁহারা প্রেততত্ত্ববিদ্‌দিগেব(Spiritualists)অথবা Psychical Research Society-র প্রচারিত গ্রন্থাদি পাঠ কবিযাছেন, তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে বিস্তাব করিযা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহারা ঐ সাহিত্যেব সহিত অপবিচিত তাঁহাদিগকে ফ্রেডরিক মাযার্সেব Human Personality volumes), Sir William Crooks Spirit, Lodge এব Survival of Man পাঠ করিতে অনুবোধ কবি। যে পাঠক আয়াস স্বীকাব কবিবেন, তিনিই দেখিবেন যে পরলোক সম্বন্ধে এত সংবাদ বহন করিযা আমাদেব গোচব করিয়াছে যে, পবলোক আব অজ্ঞাত দেশ (undiscovered country) নাই—ঐ বেজানা মুলুক এখন আমাদেব সুজ্ঞাত হইবাব সুযোগ হইয়াছে।

তথাপি এ কথা স্বীকাব করিতে হয যে, ইহা অনেকটা পরের মুখে ঝাল খাওযা, যাহাকে আমরা Hearsay evidence বলি—জানা কথা নহে, শোনা কথা। প্রেত যে সঠিক সংবাদ দিতেছে, সে যে সত্যবাদী, অনেকটা ভ্রম প্রমাদশূন্য— এ কথার প্রমাণ কি? প্রেতকে পবলোক হইতে না নামাইযা, ইহলোকবাসী আমাদেব পক্ষে পরলোকে গিযা সেখানকার তথ্য সংগ্রহ কবিয়া এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা সম্ভবপর কি না? যেমন কবিয়া লিভিংস্টোন, স্ট্যান্‌লি, ন্যান্‌সেন প্রভৃতি সাহসিক পর্যটক আযাস ও অধ্যবসায দ্বাবা এই ভূমগুলের সঙ্কটসঙ্কুল অবিজ্ঞাত স্থানসমূহে পর্যটন কবিয়া তাহার সংবাদ সকলেব গোচর কবিযাছেন, পরলোকমণ্ডলের এমন অসমসাহস ভ্রমণকারী আছেন কি না? যদি থাকেন, তবে তাঁহাবা ঐ ভূমিকাব ন্যানসেন লিভিংস্টোন।

এ দেশে যাঁহাদেব যোগী বলে, যাঁহারা সাধনা দ্বাবা যোগমার্গে কতকটা অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা ঐরূপ পুরুষ। ইহলোক ছাডা যদি পরলোক থাকে, তবে সেই লোকে গতিবিধি তাঁহাদেব পক্ষে অনায়াসসাধ্য। আমার ধারণা—এইরূপ যোগী পূর্বেও ছিলেন, এখনও আছেন। পাশ্চাত্য দেশে ইহাদিগকে Occultist বলে। যাঁহারা য়ুরোপীয় mysticism এর ইতিহাস পাঠ কবিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যয় হইবে যে, এরূপ যোগী পুরুষ শুধু এ দেশে নয়, ইউরোপেও একেবারে বিরল নহেন। সেন্টপল, সোয়েডেন্‌বর্গ প্রভৃতি ইহার পাশ্চাত্য উহাহরণ। এ দেশেও অনেক যোগী পুরুষের কথা আমরা অনেকেই শুনিয়াছি। এইরূপ যোগী সাধুসন্ত 'করকবলিত-

কুবলয়বৎ' প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বিদেশে যে তত্ত্ববিদ্যামণ্ডলীর (The Theosophical Society প্রতিষ্ঠা হইয়াছে সম্প্রতি যাহার প্রধান কেন্দ্র মান্দ্রাজের উপকণ্ঠস্থ আদিয়ারে—এই থিওসফিক্যাল্ সোসাইটির উদ্দেশ্যত্রয়ের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য মানবের মধ্যে সুপ্ত শক্তির প্রবোধ ও বিকাশ। থিওসফিক্যাল সোসাইটির মধ্যে এমন সব সাধক আছেন, যাঁহারা যোগের পথে অগ্রসর হইয়া যোগারূঢ় হইয়াছেন। তাহার ফলে তাঁহাদের দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশ্রুতি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা যোগপথের অন্যতম বিভূতি। পাশ্চাত্য দেশে ইহাদিগকে Clairvoyance ও Clairaudience বলে। ঐ সম্বন্ধে অনেক প্রামাণিক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই ইহার যাথার্থ্য প্রমাণিত করিতে পারেন। থিওসফিক্যাল সোসাইটির মধ্যে যাঁহারা এই সকল যোগ বিভূতি লাভ করিয়া পরলোক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত সি, ডব্লিউ, লেড্ বিটার তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। ঐ সম্বন্ধে তিনি স্বীয় প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন,—যথা Astral Plane, Devachanic Plane, The Hidden Side of things, Clairvoyance, Science of the Sacraments এবং The other side of death। পরলোক সম্বন্ধে যত যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আমার বিশ্বাস, এই Other side of deathই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে Spiritualist এবং Psychic Research Society এবং অন্যান্য পূর্বতন লেখকদিগের আলোচনা ও গবেষণার সার সংগ্রহের সহিত লেড্ বিটার সাহেব নিজের প্রত্যক্ষ ও অনুভূত ঘটনাগুলির বৃত্তান্ত অতি সুন্দব শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত কবিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল ব্যাপাবের প্রকৃত তথ্য ও নিদান কি, তাহারও বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিযাছেন। তাহার ফলে পরলোক সম্বন্ধে একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ গ্রথিত হইয়াছে।

ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠকেব পক্ষে এই অমূল্য গ্রন্থ এত দিন অনদিগম্য ছিল। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিদাস বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রভূত যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই গ্রন্থেব বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন পরলোক গ্রন্থ সেই অনুবাদ। কিন্তু বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পবলোক গ্রন্থ এইরূপ নিপুণভাবে অনুবাদকার্য সম্পন্ন কবিয়াছেন যে, এই গ্রন্থ প্রায়ই মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থ যাহাতে বাঙালী পাঠকের নিকট আদরণীয় হয়—ইহা আমার বিশেষ আগ্রহ।

বিদ্যাবিনোদ মহাশয যোগ্য ব্যক্তি। সংস্কৃত ইংরেজী বাংলাতে তিনি বেশ পারদর্শী। অধ্যাত্ম সাহিত্যে তাঁহার বেশ প্রবেশ আছে এবং বাংলা রচনায় তাঁহাব বেশ সুযশ আছে। অতএব গ্রন্থ যে উপাদেয় হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। অধিকন্তু এ পরলোক গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের আলোচনা আছে, তাহার সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা উচিত। অবশ্য যাঁহারা চার্বাকের মন্ত্রশিষ্য— যাঁহারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, যাঁহারা বলেন চেতনা ও চিন্তা মস্তিষ্কেবই ব্যাপারমাত্র (Thought is a function of the brain), যাঁহাদের মতে যকৃৎ হইতে পিত্তনিঃসরণের ন্যায় মস্তিষ্ক হইতে চিন্তা নিসৃত হয়, সেই সকল মাস্তিষ্কিক জড়বাদীর (cerebralisctic materialists) এই পরলোক গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনই আগ্রহ হইবে না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারেন—"তেষাং প্রতি নৈষঃ যত্নঃ।" আমি নিজে সময়ে সমযে এই জড়বাদেব নিরাশ করিবার উদ্দেশে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইযাছি। প্রায় দশ বৎসব পূর্বে 'মনোবিজ্ঞানেব নূতন ধারা' এই না৷ দিযা ব্রহ্মবিদ্যা পত্রিকায কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে মনোবিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত তথ্য

সকলের উল্লেখ করিয়া আমি Myer (মায়ার) সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত কবি। সে উক্তিটি এই— ''Our method has revealed to us a hidden world within us and this hidden world has revealed to us an invisible world without'' অর্থাৎ "মনোবিজ্ঞানেব নূতন ধাবা জীবেব অভ্যন্তরে এই রাজ্য দিয়াছে এবং সেই রাজ্য আবাব বাহিবের এক অ-দৃষ্ট বাজ্য প্রকটিত করিয়াছে।" সেই বাহিরের অ-দৃষ্ট রাজ্য কি, তাহাব আভাস দিযা মায়াব (Myer) বলিয়াছেন— 'জীব এক নহে, তিন লোকের অধিবাসী—পৃথিবীলোক, সূক্ষ্ম ইথিরিয লোক এবং অতি সূক্ষ্মলোক (ধর্মগ্রন্থে যাহাকে স্বর্গলোক বলে)।' বলা বাহুল্য মায়ারেব এই তিন লোক আমাদিগের পরিচিত ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ অর্থাৎ Physical Plane,Astral Plane এবং Mental Plane এবং পাশ্চাত্য মনো-বিজ্ঞানেব নবাবিষ্কৃত brain, consciousness and deep sleep consciousness—আমাদেব শাস্ত্রোপদিষ্ট জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি।

সম্প্রতি প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানবিদ্ অধ্যাপক জেমস্‌এব Human Immortality নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ আমাব হস্তগত হয়। যাঁহাবা আত্মার অমরত্বে প্রত্যাখ্যান কবিতে চান, তাঁহাদিগেব ঐ পুস্তকখানি যত্ন কবিয়া পাঠ কবা উচিত। তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, চিন্তাকে মস্তিষ্কেব ব্যাপাব মানিযা লইলেও দেহাত্মবাদ বজায় হয না। কারণ, অধ্যাপক জেমস্ প্রতিপন্ন কবিযাছেন যে, চিন্তা মস্তিষ্কেব জন্য-জনক ব্যাপাব নহে, কিন্তু বিমোচক বা সঞ্চারক ব্যাপার (Transmissive function)। তিনি দেখাইযাছেন যে, হঠকাবী বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা চেতনাকে যে মস্তিষ্কেব জন্য-জনক ব্যাপাব (Productive function) বলিযাছেন, তাহা প্রমাণসিদ্ধ নহে। ববং ইহা বলাই সঙ্গত যে, অখণ্ড চৈতন্যেব অপ্রকৃত আত্ম জ্যোতিঃ সাধাবণতঃ এই স্থূল জড়, প্রাকৃত বিশ্বেব আচ্ছাদনে অবরুদ্ধ হইয়া আত্মপ্রকাশ কবিতে পাবে না, কদাচিৎ ক্বচিৎ কোন মস্তিষ্কের সাহায্যে সেই জ্যোতিঃ প্রাকৃত জগতে প্রকাশিত হয় , অর্থাৎ আমাদের মস্তিষ্ক চৈতন্যেব বহিঃপ্রকাশের উপাধি মাত্র। উপাধিব তারতম্যে সূক্ষ্মতা ও স্থূলতার ভেদে, স্বচ্ছতা ও আবিলতার অনুপাতে চৈতন্যের প্রকাশও ভিন্ন হয় , কিন্তু চৈতন্য যে এক ও অখণ্ড বস্তু, তাহার পরিচ্ছেদ হয় না—"উপাধিভিচ্ছদ্যতেন তদ্‌বান্।"

অতএব দেহের নাশে চিন্তার বিলোপ হয়, দেহাতিবিক্ত আত্মা নাই—এরূপ ভাবিবার কোনই সমর্থক যুক্তি নাই। বরং জার্মান দার্শনিক কান্টের সহিত সুর মিলাইয়া বলিতে হয় যে, মস্তিষ্ক আমাদেব চিন্তার জনক নহে, নিরোধক উপাধি মাত্র। ভৌতিক অনুভূতির পক্ষে মস্তিষ্ক অবশ্যম্ভাবী যন্ত্র বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভূতির পক্ষে ইহা আবরক যবনিকা মাত্র। কারণ, যখন এই আবরক তিরস্করণী তিরোহিত হয় এবং আত্মা বিদেহ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বরূপ লাভ করে, তখন তাহার যে মহিমা ও ঐশ্বর্য প্রকটিত হয়, কে তাহাব ইযত্তা কবিতে পারে? সে অবস্থা বচনেব—লক্ষণের—মননের অতীত।

৩১ শে ভাদ্র,১৩৩৩ — **শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত**

কলিকাতা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

উনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

চতুর্বিংশ অধ্যায়

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ষড়বিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ অধ্যায়

অষ্টবিংশ অধ্যায়

উনত্রিংশ অধ্যায়

ত্রিংশ অধ্যায়

একত্রিংশ অধ্যায়

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ত্রয়াস্ত্রিংশ অধ্যায়

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

ষটত্রিংশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

মৃত্যু-বিষয়িণী কতিপয় ভ্রান্তি

মৃত্যু-বিষয়িণী আলোচনা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকটেই হৃদয়গ্রাহিণী। প্রত্যেকের ভাবী জীবনেতিহাসে মৃত্যু-ব্যাপারটি একটি সুনিশ্চিত ঘটনা। জগতে এমন ব্যক্তি কেহই নাই, যিনি একটি না একটি আত্মীয়কে না হাবাইয়েছেন। যাহাবা অতীব শিশু, তাহারা ইহাব আস্বাদ না পাইতে পাবে , কিন্তু বযস্ক ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অবগত আছেন। ইহা সার্বজনীন ব্যাপার, অথচ, সর্বসাধারণে ইহার সম্বন্ধে গুরুতর ভ্রম পোষণ করিতেছেন। ইহা একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। সাধারণে ইহার তথ্য জানেন না। সেই কারণে পৃথিবীতে যে কত নিবর্থক দুঃখ, যাতনা ও ভয় মানুষকে নিপীড়িত কবিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কবা সুকঠিন। মৃত্যু সম্বন্ধে সকলেরই একটা কুসংস্কার বিদ্যমান রহিযাছে। এতদ্বিষযে আমাদিগের মধ্যে রাশি বাশি অলীক ও অজ্ঞজনোচিত বিশ্বাস বর্তমান আছে। তন্নিমিত্ত মানুষকে অতীত যুগে অপবিমিত ক্লেশ ভোগ কবিতে হইয়াছে ; বর্তমানেও অনির্বচনীয় যাতনা পাইতে হইতেছে। ভাবিকালে মানুষ যে সকল উপাদেয় কল্যাণ সম্ভোগ কবিবে বলিযা আশা কবা যায, উপবি-উক্ত অলীক বিশ্বাসেব মূলোচ্ছেদ তাহাদিগেব মধ্যে অন্যতম।

তত্ত্ববিদ্যা-বিষয়িণী শিক্ষায অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা অতীত জীবনাবলীব তথ্য আলোচনা কবিযাছেন, তাঁহাদিগেব ঐ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে—ভ্রম অপসৃত হইয়াছে। তাঁহাবা এক্ষণে তত্ত্ববিদ্যাব বিঘোষিত তথ্য গ্রহণ কবিতে প্রস্তুত। ইহাব প্রভাবে মৃত্যুকে লোকে আর দারুণ বিভীষিকার চক্ষে দেখিতেছে না। মৃত্যুজনিত শোকাবেগও অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে। এই তথ্য পবিজ্ঞাত হইযা আমবা মৃত্যুব প্রকৃত মূর্তি অবলোকন কবিতে ও ক্রমোন্নতিব্যাপারে উহাব স্থান জানিতে সমর্থ হইতেছি।

আমবা একটি একটি করিযা মৃত্যু-বিষযক প্রধান ভ্রমগুলিব অসাবতা প্রতিপাদন কবিব। কতকগুলিকে ধর্মজ ভ্রম বলা যাইতে পারে। প্রাচীন ধর্মমত কলুষিত হইযাই এবম্প্রকাব ভ্রমের সৃষ্টি কবিযাছে। এ বিষয়ে আমরা পবে আলোচনা কবিব। মৃত্যু-বিযয়ে সাধারণেব মধ্যে যে সকল ভ্রম অতীব প্রচলিত, তাহাই এক্ষণে আমাদিগেব আলোচ্য।

কখন কখন লোকে মনে করে যে, মৃত্যুব্যাপারটা সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান না থাকিলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি হয না। তাহাদিগের ধারণা এই যে, যে ব্যক্তি মরিবে, সে মরণান্তে নিজেই হাতে-কলমে মৃত্যু-বিষযক জ্ঞান লাভ কবিবে ; জীবিতকালে যদি তাহার ভ্রমই থাকে, তাহাতে কি আসে যায়? এ কথায দুইটি আপত্তি হইতে পারে। মৃত্যু-রহস্যটি অপরিজ্ঞাত থাকায় সর্বসাধারণেই মৃত্যুর নামে একটি অদ্ভুত ভয়ে ভীত হইযা পড়ে। উপবি-উক্ত কথায় ঐ ভয় কিছুমাত্র বিদূবিত হয় না। মানুষ মবিযা গেলে তাহার জীবিত আত্মীয়-স্বজনেবা তাহাব জন্য দারুণ শোকে অভিভূত হইযা পড়েন। তাহাব দশা পরলোকে কিরূপ হইতেছে ভাবিযা তাঁহাবা সাতিশয় উদ্বেগভোগ কবিতে থাকেন। উপরি-উক্ত কথায সেই শোক বা উদ্বেগও কিছুমাত্র উপশমিত হয় না। এই গেল একটি আপত্তি। অপব আপত্তিটি এই যে, ঐ কথায় একটি গুরুতর

তথ্য উপেক্ষিত হইয়াছে। মানুষ মরিবামাত্রই বুঝিতে পারে না যে, সে মরিয়াছে। কাজে-কাজেই মৃত্যুবিষয়ক ভ্রমগুলিও খুব শীঘ্র শীঘ্র বিনষ্ট হয় না। সত্যের আলোকে তাহার হৃদয় তখন-তখনই আলোকিত হয় না। তাই, তাহার পূর্ব-ভ্রমগুলি আপাততঃ থাকিয়া যায়। অনিমিত্ত মৃত ব্যক্তিকে সাধারণতঃ অনেকটা ক্লেশ ভোগ কবিয়ে হয।

মৃত্যুই কি পরিণাম?

মৃত্যু-বিষয়ক যাবতীয় অন্যায় সংস্কাবের মধ্যে প্রথম ও অতীব মর্মান্তিক ভ্রমটি এই যে, উহা সমুদয বস্তুর অবসান। মানুষ মরিযা গেলে সব ফুরাইযা যায, আব কিছুই থাকে না। এইটিই সাংঘাতিক ভুল ধারণা। অনেকের ধারণা আছে যে, এই লজ্জাজনক দেহাত্মবাদ আমাদিগেব মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, উহা গত শতাব্দীর প্রাবম্ভে মানসিক পীড়াৰূপে প্রকট হইযাছিল বটে, কিন্তু এখন আব নাই। ব্যাপার যদি এইৰূপই হইত, তবে খুব মঙ্গলেব কথা। সেইটুকুই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমার মনে হয়, যিনি সমসাময়িক চিন্তার আলোচনা করিয়াছেন, তিনি উপবি-উক্ত ধাবণা অনুমোদন করিবেন না। সুখেব বিষয়, ঐ কথাটি সত্য যে, এই দেহাত্মবাদৰূপ অপকাবক আগাছা আব উচ্ছেদ মস্তক উত্তোলন কবিতে পারিতেছে না। পূর্বে উহার উপব লোকেব যেৰূপ আস্থা ছিল, এখন আর সেৰূপটি নাই। কেন না, যাঁহাদেব মতামত শ্রদ্ধার্হ; তাঁহাব দেহাত্মবাদ অপেক্ষা উচ্চতব জ্ঞান লাভ কবিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীতে এখনও দারুণ অজ্ঞতাব বিপুল স্তূপ বিদ্যমান বহিযাছে। শুধু তাহাই নহে, আবও দুঃখের বিষয়, এক এক জন ঘোব মুর্খ ব্যক্তি দুই চাবিটিমাত্র বিজ্ঞান-বহুল শব্দ সংগ্রহ কবিযা আত্মশ্লাঘায় স্ফীত হইয়া মনে করে যে, সে প্রবীণ ব্যক্তিবর্গেব ন্যায় জ্ঞানরাশি আযত্ত কবিযাছে। একপ্রকার মুর্খের সংখ্যা অল্প নহে। একৰূপ মূর্খতা অতীব দোযাবহ। যে সকল হতভাগ্য বক্তি ঐ প্রকাব মানসিক দাসত্বেব অধীন, তাহাদেব মধ্যে এখনও বহুল পরিমাণে অতি ভযানক দেহাত্মবাদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

তথাচ আমবা নিঃসন্দিগ্ধৰূপে আশা কবিতে পাবি যে, ঐ প্রকার বিশ্বাস নিস্তেজ হইযা আসিতেছে। আব এক শ্রেণীব দেহাত্মবাদী আছেন, তাঁহারা এতটা উচ্চবাবী নহেন, কিন্তু অধিকতর কুটিল তাঁহাদের সংখ্যা কমিতেছে বলিযা আমাব মনে হয় না। বিস্তর স্ত্রী-পুরুষ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইঁহাবা নামতঃ কোন একটি ধর্ম মানিয়া চলেন, ইঁহাদিগকে কেহ জড়বাদী বলিলে, ইহাবা রোষ-প্রকাশপূর্বক সে কথা অস্বীকার করেন। তাহা হইলেও ইঁহারা কার্যতঃ এরূপভাবে জীবন যাপন করিযা থাকেন, যেন এই সংসাবই ইহাদের একমাত্র ধ্যেয়। কখন কখন ইঁহাদের মুখে ঈশ্বব, পবকাল প্রভৃতিব অস্তিত্বসূচক শব্দ ও বাক্যাংশ শুনা যায় বটে, কিন্তু ইঁহাদের চরিত্রমূলে তাদৃশ বিশ্বাস আদৌ দৃষ্ট হয় না। এই ব্যবহাবিক জড়বাদে মূঢ়তার ভাবটি একটু প্রচ্ছন্ন থাকে মাত্র। ইহাতে জডবাদীর প্রতিবেশীবাও বড একটা অসন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু মৃত্যুৰূপ তোরণদ্বাব অতিক্রম করিলে ইঁহাদেবও যে দশা, উচ্চবাবী দেহাত্মবাদীরও সেই দশা।

মৃত্যু সম্বন্ধে আব একটি অন্যায় সংস্কার আছে। সেটি আবও প্রশস্তৰূপে বিস্তৃত হইয়াছে দেখা যায়। সংস্কাবটি এই ঃ— একটা মহা অবিদিত অন্ধকারে অবগাহনেব নামই মৃত্যু ; মানুষ এই ভুর্লোক পরিত্যাগ করিয়া গেলে তাহার দশা যে কি হয়, তাহা নিশ্চিতরূপে এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। বাস্তবিক অনেক সম্প্রদাযেব মধ্যে এতদ্দশা সম্বন্ধে অনেক সত্য সংবাদ প্রচারিত

আছে, অথচ ঐ সকল সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই উহাতে বিশ্বাসবান্ নহেন। উঁহারা ঐ সকল সংবাদকে সম্পূর্ণরূপে অলীক বলিয়া মনে করেন। অন্ততঃ উহাদের কার্য্যকলাপে বা বাক্যালাপে তাদৃশ বিশ্বাসের আদৌ পরিচয় পাওয়া যায় না। বাস্তবিকই অধিকাংশ ধর্মসম্প্রদায়ের মতগুলির আলোচনা করিলে মনে হয় যে, তদনুসরণে শুভ অপেক্ষা অশুভ ফল ঘটিবারই অধিক সম্ভাবনা। কেন না, ঐ মতগুলি বড়ই বিসদৃশ ।

ক্যাথলিক (নৈষ্ঠিক) সম্প্রদায়ের মত

পাশ্চাত্য জগতে যতগুলি ধর্মমত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ক্যাথলিক সম্প্রদায় অন্যতম। মাত্র এই সম্প্রদায়ই পরলোকস্থ অবস্থাদির বর্ণনা করিয়াছেন। এই মতে পরলোক-ব্যাপার রূপকে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণে মর্ম পরিগ্রহ করিতে না পারিয়া উহাকে জড়-ধর্মান্বিত মনে করেন। কিন্তু উহাতে প্রকৃত ব্যাপার সুন্দররূপেই পরিব্যক্ত হইতেছে। যাঁহারা ইহা মানিয়া চলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে নিজেদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা অনেকটা জানিতে সমর্থ হয়েন। কিন্তু এ সম্প্রদায়েরও সত্যের একটা দিক্ পাষণ্ডতাপূর্ণ ধর্মমতের অলীক ছায়ায় তিমিরাবৃত দেখা যায়। পার্থিব পাপের ফলে অনন্ত যাতনা ঘটে—এইটিই সেই ভ্রান্ত মত। সত্যের অপর দিক্টাও অনেকটা মর্য্যাদাহীন হইয়া পড়িয়াছে। পরলোকে একটা তথাকথিত সুখ-উপভোগের উপহাস্য ব্যবস্থা এই মতে প্রবিষ্ট হওয়ায় সত্যমর্যাদা বিনিষ্ট হইয়াছে। ক্যাথলিক-মতই মোটামুটি এই—যে ব্যক্তি মহাপাপী, সে নরকে পতিত হয় . যিনি মহাপুণ্যাত্মা, তিনি পুণ্যশ্লোক ভার্জিনের ন্যায় স্বর্গে গমন করেন। সাধারণ শ্রেণীর সৎ ব্যক্তিগণ একেবারে নির্দোষ নহেন , মৃত্যুকালে তাঁহাদের কিছু ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া যায়। এই কারণে তাঁহারা ঈশ্বর-সমীপে একেবারে গমন করিতে অসমর্থ। কাজে কাজেই তাঁহাদিগকে একটি মধ্যবর্তী অবস্থায় অল্পাধিককাল অতিবাহিত করিতে হয়। এই মধ্যবর্তী অবস্থায় স্থানটিকে প্রেতলোক বলে। এখানে যাবতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। এখানে তাঁহাদিগকে বড় অধিক দিন থাকিতে হয় না, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত-প্রণালীটি কষ্টদায়ক। এইরূপ যাতনার নিষ্পেষণে নির্দোষ হইয়া তাঁহারা স্বর্গে সুখভোগের নিমিত্ত প্রস্তুত হয়েন।

যাঁহারা পরাবিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে ক্যাথলিক-মতের উপরি-উক্ত কথাগুলি বাস্তব ব্যাপারের সহিত অতীব ঘনিষ্টরূপে সমঞ্জস। মানবীয় ক্রমোন্নতিব্যাপারে কখন কখন এমন একটি সময় আসে, যখন মানুষ আর উন্নতির দিকে প্রধাবিত হয় না। তখন সে সত্য সত্যই পতিত হয়, স্খলিত হয়। সেই পতন অনন্ত নরকে নহে (কারণ, ইহা কতিপয় ক্রূরকর্মা নৃশংস রাক্ষসের বিকৃত মস্তিষ্কের কিম্ভূত কল্পনা)। কিন্তু চৈতন্য-শক্তির অপেক্ষাকৃত একটি ভগ্নাবস্থা এই পতনে পর্যবসিত হইয়া থাকে। এই পতনকাল কোটি কোটি বৎসরব্যাপী না হইলেও মানবের বিবর্ত-ব্যাপারে ইহা সময় সময় দেখা যায়। তখন মানুষ ক্রমোন্নতি ধারার পরবর্তী যুগের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এই নবীন কল্পের প্রারম্ভেই যে স্বীয় ক্ষীণশক্তির আয়ত্তের মধ্যে উন্নতির একটি প্রকৃষ্ট সুযোগ দেখিতে পায়।

তদবস্থায় তাহাকে একটি ছাত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ছাত্র যেন সহাধ্যায়ীদিগের সহিত পাঠে সমানভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। পাঠ্য-পুস্তকে সমপাঠীরা অনেকটা পড়িয়া

ফেলিয়াছে, সে যেন পারিয়া উঠিতেছে না। কাজে-কাজেই, পর-বৎসরের প্রারম্ভে নূতন ছাত্রেরা আসিয়া যত দিন না তাহার অনধিগত পাঠ আরম্ভ করে, ততদিন তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। নূতন ছাত্রেব সহিত যোগ দিয়া পঠিত বিষয় তাহাকে পুনরায় পড়িতে হয়। তাহা হইলে সে গন্তব্য পথে চলিতে সমর্থ হয়। পথের কঠিনতা নিবন্ধন যেখানে তাহাকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল, এই নবীন ব্যবস্থাব সুযোগে সে এখন ঐ স্থল অতিক্রম করিয়া যাইতে সমর্থ হয়। অতএব "অনন্ত নরক" রূপ ভয়ঙ্কর মিথ্যার পরিবর্তে আমবা এখন "সাময়িক স্থান" রূপ করুণাসিক্ত সত্যের সন্ধান পাইলাম। পক্ষান্তরে, যাঁহার পার্থিব জীবনে সম্পূর্ণভাবে নিকৃষ্টবৃত্তি, ইন্দ্রিয় ও বাসনা দমন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অত্যুন্নত জীবাত্মা ঐ সংযমবলে অতি শীঘ্র প্রেতলোক ত্যাগ কবিয়া যান। স্বর্গলোকে জাগবণ ঘটিলেই ইঁহার সমক্ষে স্বর্গলোকেব অনির্বচনীয় মহিমা ও পরমানন্দ উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে।

কিন্তু একজন সাধাবণ ব্যক্তি মৃত্যুব পূর্বে কোনরূপেই সম্পূর্ণভাবে পার্থিব বাসনা ও ইন্দ্রিয়-দর্শনে সমর্থ হয না। তাই ভুবর্লোকেও (Astral plane) তাহার একটি বলিষ্ঠ বাসনাদেহ থাকিয়া যায়। ভূর্লোকে স্থূলশরীরে অবস্থানকালে সে নিজের ঐ বাসনা-দেহটি গঠন করিয়াছিল। যত দিন না ঐ বাসনা-দেহ কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ততদিন তাহাকে দেহধাবী হইয়াই বাস করিতে হয়। বাসনাই বাসনা-দেহেব জীবন। এই বাসনা লোপ পাইলেই বাসনা-দেহের ক্ষয় হয়। এই প্রকাব লোপ ও ক্ষয়ের সংঘটনে সর্বদাই যাতনা ঘটে। ঐ যাতনাব সঙ্কেতস্বরূপই প্রেতলোকেব নরকাগ্নি কল্পিত হইয়াছে। এ কল্পনাও সুসঙ্গত।

প্রেতলোক-তথ্য

প্রেতলোকে নরকভোগব্যাপার বুঝাইতে হইলে সাধাবণতঃ মদ্যপায়ীব উদাহবণ দেওয়া হয়। অবশ্য একটা উৎকট মাতালেব কথাই বুঝিতে হইবে। সকলেই অনুমান কবিতে পারেন যে, পানাসক্তি কতই ভীষণরূপে বলবতী। যাহাব মনে এই পানেচ্ছা উদিত হয, তাহার যাবতীয ভদ্রতার ভাব অভিভূত হইয়া পড়ে। যাহাবা তাহাব সহিত অতি নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত, অতি সুমিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ, তাহাবাও তাহাব স্বাভাবিক স্নেহে বঞ্চিত হয। তখন সেই বাসনা-পীড়িত ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার অনশনেও ভ্রূক্ষেপ করে না। সে তখন স্বীয় ঘৃণিত বাসনা চরিতার্থ করবার নিমিত্ত তাহাদিগেব পরিহিত বস্ত্র পর্যন্তও উন্মোচন করিযা বিক্রয় করত অর্থ সংগ্রহ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। এই ব্যক্তি মবিযা গেলে, মৃত্যু প্রভাবে ইহার স্বভাব কিছুমাত্র পরিবর্তিত হয না। সেই ভয়ঙ্করী পানেচ্ছা তখনও তাহার নিকট সেইরূপ বলবতী থাকে। শুধু তাহাই নহে, তখন সেই ইচ্ছা পূর্বাপেক্ষা ও বলশালিনী হইয়া দাঁড়ায ; কেন না, তখন আর বাসনা-স্পন্দনকে দুর্বহ স্থূল জডেব নোদন কবিতে হয না , মাত্র সূক্ষ্ম দেহেই বাসনাব উপভোগ ঘটিয়া থাকে। তাই ঐ ব্যক্তিব তখন স্থূল দেহ বিদ্যমান না থাকায ঐ পানেচ্ছা চিবদিনের জন্য অতৃপ্তই থাকিয়া যায়। এতবদ্ব্যাপাবে আমবা প্রকৃত প্রেতলোকেব বেশ একটি চিত্র দেখিতে পাই। অতএব পাপক্ষালনকারী নবকাগ্নিব কল্পনা অসঙ্গত নহে।

সুখেব বিষয, উহা পাপের ক্ষালন-ভূমি—প্রাযশ্চিত্ত স্থল। উহা সেই নবক নহে, সেই অর্থ-শূন্য অনন্ত নবকের নিরর্থক কল্পনা নহে। দাযিত্ববিহীন দুর্ধর্ষ ব্যক্তিব কঠোব বৈব-চরিতার্থতাব নিমিত্তই তাদৃশী কল্পনার সৃষ্টি। নৈষ্টিক ধর্ম-তত্ত্ব আমাদিগকে ঐ প্রকাব নবকেব অস্তিত্বে বিশ্বাস

করিতে আদেশ করে। পরন্তু উহা কু-বাসনা পরিবর্জনের প্রয়োজনীয় একমাত্র ফলোৎপাদক, সুতরাং অতীব কল্যাণকর পন্থা। এখানে ভয়ঙ্কর যাতনা হইলেও বাসনা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যায়। এইরূপে, বাসনাক্ষয় হইলেই মানুষ স্বর্গলোকের উচ্চতর জীবনে আরোহণ করিতে পারে। অন্যথায় পারে না। বাসনা যখন এইরপে ক্ষয় হইয়া যায়, মানুষ যখন পূর্ণরূপে বাসনামুক্ত হইয়া থাকে, তকন পুনর্জ্জন্ম হইলে তাহার আর ইচ্ছা করিয়া পুনরায় বাসনার বোঝা স্কন্ধে করা কর্তব্য নহে।

বাসনা এইরূপে বিলুপ্ত হইয়া গেলেও চরিত্রে একটা দুর্বলতা থাকিয়া যায়। যে দুর্বলতা প্রযুক্ত পূর্বে বাসনা আসিয়া চাপিয়া ধরিযাছিল, এ দুর্বলতাও তদ্রূপ। ঐ বাসনামুক্ত ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম হইলে তাহার যেমন একটি স্থূলদেহ হইবে, সেইরূপ একটি সূক্ষ্মদেহও থাকিবে। এই সূক্ষ্মদেহটির উপাদানপুঞ্জের মধ্যে বাসনাস্পুরণোযোগী সামগ্রী বিদ্যমান থাকে। যেন পূর্ব জন্মের পূর্ব পূর্ব বাসনার সাজ-সরঞ্জাম সবই ঐ সূক্ষ্মদেহে বর্তমান থাকে। এই সকল সরঞ্জামের সাহায্যে ঐ ব্যক্তি তাহার পূর্বজন্মের পুনরভিনয় করিতে সমর্থ। ঐ ব্যক্তি সূক্ষ্মদেহস্থ ঐ সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, কারণ, পূবজন্মে ঐ ব্যক্তি ঐ বস্তুর অন্বেষণে ও উহার ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু এই নবীন জন্মে যদিও ঐ সকল বস্তু উহার সূক্ষ্ম শরীরে সঞ্চিত থাকে, তথাপি উহার ব্যবহার করা ঐ ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। পূর্বজন্মের সুকৃতিফলে যদি ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যক্রমে সুযোগ্য ও সতর্ক পিতামাতার নিকটে প্রতিপালিত হইতে পায়, যদি মন্দ বাসনাগুলিকে বুঝিতে ও সম্পূর্ণভাবে দমন করিতে শিক্ষা পায়, তাহা হইলে উপরি-উক্ত সামগ্রী অর্থাৎ পূর্বজন্মের বাসনা-বীজগুলি অঙ্কুরিত না হইয়া বন্ধ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। পরে অব্যবহৃত থাকা প্রযুক্ত আমাদিগের অব্যবহৃত দৈহিক পেশীর ন্যায় ক্রমান্বয়ে বিশুষ্ক হইয়া যাইবে।

স্থূল-দেহের ন্যায় সূক্ষ্মদেহের সামগ্রীও মৃদুমন্দভাবে, কিন্তু অনুক্ষণই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। আবাব নিরন্তরই নবীন সামগ্রীর সমাবেশ ঘটিতেছে। বিশুষ্ক উপাদান ক্ষয় পাইলেই তাহার স্থানে উৎকৃষ্টতর উপাদান সংগৃহীত হইবে। এই নবীন উপাদান সেই স্থূল ইন্দ্রিয়-ঘটিত বাসনার তীব্র, রুক্ষ পরিস্পন্দে সাড়া দিতে অসমর্থ। কাজেই ঐ নিকৃষ্ট ব্যাপারটি তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। বস্তুতঃ ঐ ব্যক্তি যখন উহাকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে; উঠিয়া, পরিশেষে উহাকে জয় করিয়া ফেলিয়াছে। এতদবস্থায় ঐ কুপ্রবৃত্তি উহার শত শত ভাবী জীবনেও আর পুনরাবির্ভূত হইবে না। কেন না, উহার জীবাত্মায় কুপ্রবৃত্তির স্থানে এখন সম্পূর্ণ আত্মসংযমরূপ একটি বিপরীত ধর্ম সংগঠিত হইয়াছে। বাসনার বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম করিয়া জীবনাতিবাহিত করিতে হইবে। তাহা হইলে অবশ্যই উহাকে পরাভূত করা যাইবে। এইরূপে কু-বাসনার পরাভব ঘটিলে আর সংগ্রামের আবশ্যকতা হইবে না ; কেন না, তখন বাসনা-বিজয়ী ব্যক্তি পাপবাসনার উলঙ্গ মূর্তি—প্রকৃত ছবি দেখিতে পাইবে। তখন আর ঐ ব্যক্তি উহার প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হইবে না। অতএব দেখা গেল, ভুবর্লোকের যাতনাকে পূর্বে বড়ই ভয়ানক বলিয়া বোধ হইত, আর বাস্তবিক ভয়ানকও বটে ; কিন্তু বস্তুতঃ উহা ছদ্মবেশী অনুগ্রহমাত্র। কেন না, উহার সাহায্যেই মানুষকে উপরি উক্ত প্রকার বিপুল নৈতিক জয়লাভ করিতে হয়। উহার সাহায্যেই সে ক্রমোন্নতির পথে দৃঢ়পাদবিক্ষেপে সমর্থ। আমাদের মনে হয় যে, তাদৃশ যাতনা ব্যতীত মানুষের পক্ষে ঐরূপ সুন্দর ফললাভ করিবার উপায়ান্তর নাই।

অতএব আমরা দেখিলাম যে, প্রেতলোক-তথ্যের অন্তরালে একটি অতীব আর্য সত্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আরও দেখিলাম যে, যখন পাশ্চাত্যদেশে ধর্মসংস্কার ব্যাপার অনুষ্ঠিত

হইয়াছিল, তখন বিস্তর এবং সুন্দর সত্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসও সেই সঙ্গে পরিবর্জন হইয়াছিল। প্রচলিত রীতিঅনুসারে ঐ পরিবর্জন-ব্যাপারকে "ধর্মসমস্কাব" আখ্যা দেওয়া হয়। এই ধর্মসংস্কারটা একটা অসাধারণ বিকৃত ধর্মোপপ্লব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রার্থনা

ঐ ধর্মসংস্কার-কালে আমাদিগের বিস্তর ক্ষতি হয়। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে ভগবৎসমীপে মঙ্গলকামনা একটি প্রচলিত রীতি ছিল। ঐ সময়ে এই রীতিটি পরিবর্জিত হয়। ইহাতে একটি গুরুতর ক্ষতি হইল। ঐরূপ মঙ্গলকামনা-প্রভাবে মৃত ব্যক্তি ভূবর্লোকে যথেষ্ট উপকাব প্রাপ্ত হয়। ঐ রীতির পরিবর্জনে মৃত ব্যক্তিকে নিঃসহায অবস্থায় প্রতিকূল ব্যাপাবের সহিত সংগ্রাম কবিয়া চলিতে হয়। যাহারা অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া প্রার্থনাবীতিটি পরিত্যাগ কবে, তাহাবা নির্বুদ্ধিতার ফল পাইয়া থাকে ; কেন না, তাহাদেব মৃত আত্মীয-স্বজন দুঃসহ যাতনা পায। বড়ই আশ্চর্যেব বিষয় যে, মানুষ ইচ্ছা কবিযা মৃত আত্মীয়ের সাহায্যে পরাঙ্মুখ হইযা থাকে। ঐরূপ সাহায্য করা কার্যটিকে ক্রূব কর্ম ভাবিয়া থাকে। বাস্তবিকই দেবতারাও নির্বোধ ব্যক্তিদিগকে বুঝাইয়া উঠিতে অসমর্থ।

প্রার্থনা বস্তুটি কি? যাহাবা আমাদিগেব সাক্ষাতে দেহত্যাগ করিযাছে, তাহাদিগেব অনুকূলে তীব্র ইচ্ছা ও প্রীতিপূর্ণ চিন্তা প্রকাশ কবিবাব নামই প্রার্থনা। যাঁহারা পবাবিদ্যাব আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা উত্তমরূপে অবগত আছেন যে, ঈদৃশী ইচ্ছা ও চিন্তা সূক্ষ্ম জগতেব খুব বাস্তব ব্যাপাব। এগুলি যেন আধ্যাত্মিক শক্তিব ভাণ্ডাব, যেন তাড়িতাধার। এই ইচ্ছা বা চিন্তা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রেরিত হইলে উহাব শক্তি তাডিতশক্তিব ন্যায় বিচ্ছুবিত হইতে থাকে। যে ব্যক্তি স্থূলদেহী, তাহার উপরেই ইচ্ছা ও চিন্তাব প্রভাব যখন এতটা, তখন মৃত ব্যক্তির উপর তাদৃশ প্রভাব পতিত না হইবে কেন? কোন একজন মৃত ব্যক্তির জন্য উপাসনা কি না প্রীতিপূর্ণ চিন্তা করিলে, উহা তাঁহাব নিকটে পৌছায় ও তাঁহার উপকাব-সাধন করে। যখন বিশ্বসৃষ্টি কার্যকারণবিধিসংশ্লিষ্ট তখন উপরি-উক্ত ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী। যাবতীয় মৃত ব্যক্তিদিগের মঙ্গলার্থ সাধারণভাবে ব্যগ্র প্রার্থনা ও সদ্ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাব শক্তি ততটা ফলপ্রসবিনী না হইলেও ফল নিতান্ত কমও হয় না। মোটের উপর এই সাধারণ প্রার্থনায় শুভফলও এত বেশী যে, ইহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন। ইউরোপের বিস্তব ধর্মসম্প্রদায় দিবারাত্র ধর্মনিষ্ঠ মৃত ব্যক্তিবর্গেব নিমিত্ত অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতেছেন। ইউরোপবাসীরা এই মহামহিম সম্প্রদায়গুলির নিকটে চিরঋণী।

যিনি মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরলোকে কি দশা ঘটিয়াছে, তাহা আমরা অবগত নহি, কতকটা অবগত হইলেও অধিকাংশ স্থলে সম্যক্ অবগত নহি। প্রশ্ন হইতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার জন্য কীদৃশী প্রার্থনা করিতে হইবে? তাঁহার কোন্ বস্তুব অভাব জানিতে না পারিযা আমরা এমন প্রার্থনা করিয়া বসিলাম, যাহার প্রভাবে হয় ত তাঁহার অনিষ্টই ফলিল? এরূপ কার্য কি কর্তব্য? এরূপ সংশয় হইলে ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের একটি উপদেশের আশ্রয় লইতে হইবে। উপদেশটি সুন্দর সুরলহরীতে গ্রথিত। উহা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে সতত ব্যবহৃত হইযা থাকে। উপদেশটি এই— "হে ভগবান, চির-বিশ্রাম দাও তাহারে, রেখো হে চির আলোকপাথারে।" মৃত ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ যদি আমরা জানিতে পারি, তবে সে ত ভাল কথা। সে ক্ষেত্রে

তদনুরূপ প্রার্থনা করাই কর্তব্য। কিন্তু যদি তাঁহার অভাবাদি আমরা অবগত হইতে না পারি, তবে সেরূপ স্থলে উপরি-উক্ত উপদেশ-অনুযায়ী প্রার্থনা ব্যতীত উৎকৃষ্টতব কামনা আর হইতে পারে না। বহুকাল পূর্বে ঐ প্রার্থনা রচিত হইয়াছে। বহু শতাব্দী যাবৎ ঐ প্রার্থনা-পবিখার মধ্য দিযা আবেগময় স্নেহেব পবিত্র অভিব্যক্তি-ধাবা প্রবাহিত হইয়াছে। তাহাতে কত আকুল প্রাণের যাতনা গিয়াছে' কতই উপকাব সাধিত হইয়াছে।

যদি আমবা একটু লক্ষ্য করি যে, উহাতে মৃত ব্যক্তির যাবতীয় অভাবেরই সম্যক মোচন হইতেছে, তাহা হইলে প্রতীতি হইবে যে, যিনিই ঐ প্রার্থনা-গীতিটি বচনা করুন না কেন, তিনি বিশেষ জানিযা শুনিযাই উহা বচনা কবিযাছিলেন, কিংবা হয় ত ঐশজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বীয় জ্ঞানেব অতিবিক্ত বিষযেব অবতাবণা কবিযা গিযাছেন। মৃত ব্যক্তিব যাহা আবশ্যক, তাহা উহাব দুইটি কথায় অতীব যথার্থভাবে পবিব্যক্ত হইযাছে। প্রথমতঃ, সমুদয় পার্থিব-চিন্তা ও উদ্বেগ হইতে "সম্পূর্ণ বিশ্রাম" বাঞ্ছনীয , কেন না তদ্দারা মৃত ব্যক্তির স্বর্গারোহণ বিষযশূণ্য হইবে। দ্বিতীযতঃ, ভগবৎস্নেহেব "চিব আলোক" তাহাব প্রয়োজন , কারণ, তাহার স্বকীয় প্রকৃতিব উচ্চতব ও অধিকতব আধ্যাত্মিক অংশ হইতে উহা তাহাব উপরে সুস্পষ্টরূপে বর্ষিত হইলে ঐ ব্যক্তি ক্রমে উর্ধ্বদিক উঠিতে থাকে, তাহাতে উহার অগ্রগতি শীঘ্র শীঘ্র হয। মৃত ব্যক্তিব নিমিত্ত ঈদৃশী প্রার্থনা নিবন্তব অনুষ্ঠিত হইলে তাহার আব কোন পার্থিব সাহায্যের প্রয়োজন হয না।

অতএব আমবা দেখিতে পাইলাম যে, এখানে ধর্ম (ধর্ম বলিতে খৃস্টানধর্মেব "প্রোটেস্ট্যান্ট" সম্প্রদাবেব কথা মনে স্থান দিতে হইবে না ; কেন না, ইহারা সর্ববাদিসম্মত সত্যও গ্রহণ কবিতে পবাঙ্মুখ) মৃত ব্যক্তিব উপকাবার্থ অনেকটা কাজ কবিয়াছে। অন্ধভাবে নহে, লোকে যদি ধর্ম জিনিসটি বুঝিয়া বিশ্বাস কবিত, তাহা হইলে মৃত্যু-বিষযে যে সকল ভ্রান্ত ধারণা পৃথিবীতে প্রচলিত বহিয়াছে, উহা যে সকলেব সংশোধনপক্ষে অনেকটা কার্যকর হইত। তাহা হইলেও উহা স্বকীয কযেকটি অন্যায সংস্কাবের জন্য দাযী। পবে সেগুলির আলোচনা করা যাইবে।

একটি অদ্ভুত মত

বিস্তর ধর্মনিষ্ঠ ও ভক্তিমান ব্যক্তিব একটি অদ্ভুত ধারণা এই যে, মৃত্যুর পববর্তী অবস্থার বিষয় কিছুই নিশ্চিতরূপে জানা যায় না, মানুষ পবলোক সংক্রান্ত ব্যাপার অবগত হয়, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, পরলোকেব গুহ্য ব্যাপাব দৈব বহস্য, ঈশ্বর ইচ্ছাপূর্বক মানব-চক্ষু হইতে ইহাকে লুক্কাবিত বাখিয়াছেন, ইহা অবগত হইতে চেষ্টা করা ধর্ম-বিরুদ্ধ। ইহাপেক্ষা মূঢ়তাব্যঞ্জক বিবৃতি আর সম্ভবপর নহে। কেন না, পরলোকজ্ঞানোপযোগী বৃত্তিনিচয় যদি আমাদিগের আয়ত্তাধীন থাকে, তাহা হইলে কি এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, তত্রত্য ব্যাপারগুলির সমক্ষে আমাদিগকে ইচ্ছাপূর্বক চক্ষু নিমীলিত করাই ভগবানের অভিপ্রেত? প্রতিপদেই আমরা পবলোকেব অস্তিত্ব অনুভুত কবিতেছি, পবলোকবাসী বন্ধু-বান্ধবেব মবণাতিরিক্ত জীবনের পরিচয় অনুক্ষণই পাইতেছি। আমাদিগকে কি এতদ্ব্যাপারগুলি উপেক্ষা করিয়া অস্ট্রীপেক্ষীর ন্যায় বালুকার মধ্যে মুখ লুকাইতে হইবে? আমরা যে সকল শ্রেষ্ঠ সাধু মহাত্মদের বিষয় জানি, তাঁহার সকলেই এই অদৃষ্ট জগতের কথা বলিযাছেন ; তাঁহারা ইহাকে যেরূপটি দেখিয়াছেন,

সেইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ও এতবিষয়ে স্বস্ব অভিজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে কি আমাদিগকে মনে করিতে হইবে যে, যখন তাঁহারা পরলোকব্যাপারের পরীক্ষার প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন পাষণ্ডতাপূর্ণ কৌতূহল তাঁহাদিগের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল? যখন তাঁহারা এই উচ্চতর জীবনের সত্যনিচয় বর্ণনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের চিত্ত নাস্তিকতা ও প্রতারণায় কলুষিত হইযাছিল? কিন্তু এবম্প্রকার স্পষ্টতঃ ঘৃণার্হ ধারণায় নিরসনার্থ তর্ক উপস্থাপিত করা নিশ্চয়ই নিরর্থক বাক্যব্যয়মাত্র।

যদি আমরা লক্ষ্য করি যে, আমাদিগের মধ্যে অনেকেই এই সূক্ষ্মজগৎ দেখিতে সমর্থ (কোন একটি বিশেষ প্রকার উৎকর্ষ প্রযুক্তই সূক্ষ্মজগৎ দেখিবার ক্ষমতা জন্মে বটে), তাহা হইলে আমবা জানিতে পারি যে, এই শক্তি আমাদের সমুদয় মানব ভ্রাতার সাধাবণ সম্পত্তি। তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে, যেমন এক্ষণে কেহ কেহ সূক্ষ্মজগৎ দেখিতে পাইতেছেন, সেইরূপ সমুদয় মানবজাতি এক দিন উহা দেখিতে পাইবে। কাজে-কাজেই এরূপ দৃষ্টিশক্তিলাভ মানবীয় ক্রমোন্নতির ঘটনা ও মহতী জাগতিক ব্যবস্থাব সুনির্দিষ্ট ব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। এবংবিধ উৎকর্ষই বাঞ্ছনীয় ও ব্যবহার্য। ইহা অস্বাভাবিক ও ধর্মবিরুদ্ধ নহে। এই শক্তি লাভ করিযা যখন আমরা ফল পাইতে থাকি, যখন আমরা দেখি যে, এই শক্তিব প্রভাবে মানুষ সত্যদর্শী হইলে তাহার নিজের মৃত্যু-ভয় থাকে না. পরলোকগত বন্ধু-বান্ধবের অবস্থা কি হইতেছে ভাবিয়া তাহার কোনরূপ উদ্বেগচাঞ্চল্যই দেখা যায় না, যখন আমরা বুঝিতে পাবি যে. যিনি এই সূক্ষ্ম জগতের বিষয় অবগত আছেন, তিনি অজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অপেক্ষা অত্যধিক পবিমাণে মৃত ব্যক্তির উপকাবসাধন কবিতে পাবেন, যখন আমবা এইগুলি লক্ষ্য কবি, কেবল তখনই পবলোক সম্বন্ধে সংশয়শূন্য হইযা থাকি। দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে আমাদিগের জ্ঞানের অধিকতর পরিপুষ্টি ঘটে, আমাদিগেব আশা-ক্ষেত্রও অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাদৃশ জ্ঞান ও আশা নিবন্ধন আমাদিগের প্রভূত উপকারই সংখাধিক হয়, কদাচ কোন ক্ষতি উহার নিমিত্ত আমাদিগকে ভোগ করিতে হয় না. এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের অন্তরালে শাশ্বত সত্য বিরাজ করিতেছেন। যাহা আমাদিগকে ঐ সত্যের সমীপবর্তী কবে, আমরা জানি, তাহা কদাচ অনর্থকব হইতে পারে না।

মৃত্যু-ভয়

পরলোক সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না, ইহা একটি অন্যায় সংস্কার। যে মৃত্যু-ভয় বহু লোকের জীবনে অতীব দেদীপ্যমান, তাহা ঐ সংস্কারসংশ্লিষ্ট ও বহু পবিমাণে উহারাই প্রসূত ফল। সাধারণ্যে এতদ্বিষযেব আলোচনা হয় না বটে, কিন্তু ধর্মযাজকের ন্যায় যাহারা বহুলোকের হৃদয়ের সংবাদ রাখেন, তাঁহার অবগত আছেন যে, বাস্তবিকই অনেকে এই দারুণ ভয়ে সতত ভীত। ভূতযোনির মত এই বিভীষিকা অনুক্ষণই ইহাদিগের অনুসরণ করিতেছে, আহাব-বিহাব কোন সময়েই ইহারা মুহূর্তের জন্য শান্তি বা স্বাধীনতা পায় না।

যে ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যুর জন্য এতদূর ভীত, সে তদীয় বন্ধু-বান্ধবের মরণের জন্য শঙ্কিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? ঐ ব্যক্তির আত্মীয়স্বজন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে উহার শোকের অবধি থাকে না। তাহা ছাড়া মৃত আত্মীয়ের শোচনীয় দশা মনে করিয়া উহাব হৃদয় উদ্বেগ ও যাতনায় পূর্ণ হইয়া পড়ে। মৃত্যুবিষয়ক প্রকৃত ব্যাপাব অবগত হইলে কাহারও আর ভয় ও

উদ্বেগ থকে না। উহা তখন অচিবাৎ বিলুপ্ত বইযা যায়। যিনি এতদ্বিধয়িণী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি মৃত্যুকে জীবনের একটি ঘটনামাত্র মনে করেন। তিনি ভাবিযা থাকেন যে, ইহজীবন যাপন যেরূপ ভযের বিষয় নহে, পাবলৌকিক জীবনও তদ্রূপ আশঙ্কার বিষয় হইতে পারে না। একটা অস্পষ্ট অনিশ্চয়তার ও একটা অপূর্ণ নিয়মের অনুভূতিই তাদৃশী ভীতির প্রসূতি। মৃত্যুর পব নিশ্চযই একটা ভযাবহ কাণ্ড ঘটিবে, এরূপ নিশ্চিত ধারণা উপরি-উক্ত ভয়ের ততটা কাবণ নহে। সূক্ষ্ম-জগৎ সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ যখন নির্ভর হয়, তখন তাহার প্রত্যয় দেখা দেয়, তখন সে সৌম্যভাবে স্বীয় অদৃষ্টের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হয়। যদি আমরা ধাবণা করি যে, সূক্ষ্ম-জগৎগুলি ঠিক আমাদিগের এই পৃথিবীসুলভ পরিজ্ঞাত নিয়মে নিয়মিত হইতেছে, তাহা হইলে উহাদিগের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইলে উহাদের আলোচনা আমাদিগকে অনেকটা স্বস্তি শান্তি প্রদান করিবে। বস্তুতঃ, ইহলোক ও পরলোক সর্বত্র আমরা ঐশী শক্তিব তত্ত্বাবধানে অবস্থান কবি। সুতরাং সকল লোকেই আমাদের আত্মীয়-স্বজনেবা ও আমবা তুল্যরূপে নিরাপদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারাবাহিক জীবনের প্রমাণ

একটি প্রবাদ আছে যে—"সেই অনাবিষ্কৃত দেশেব প্রান্ত হইতে কোন পথিকই ফিরিয়া আসে না।" এই ভ্রমসঙ্কুল ধারণাটি কেন যে আমাদিগের মধ্যে এরূপ প্রশস্তভাবে বিস্তৃত ও দৃঢ়মূল হইয়া পড়িল, তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয। যখন আমবা মনে বাখি যে, পৃথিবীব যাবতীয় দেশেই আমাদিগেব পবিজ্ঞাত প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগেই, সেই দেশেব "প্রান্ত" হইতে পথিকবৃন্দ নিবন্তবই প্রত্যাবর্তন কবিতেছে, তখন ঐ আশ্চর্য সার্বজনীন ভ্রমটিব কারণানুসন্ধান কবা আবও সুকঠিন হইযা পড়ে।

ইহা সম্পূর্ণ সত্য যে, এই প্রসিদ্ধ, অযথা সংস্কারগুলি বহুপরিমাণে আমাদিগেবই বৈশিষ্ট্যসূচক। আমবা যে সভ্যতা-গর্বে, ঐগুলি তাহাবই একটি প্রসূত ফল। যে সকল সঙ্কবজাতি সামবিক-শক্তি, বাণিজ্য-বৈভব, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাব ও যান্ত্রিক উদ্ভাবনে ভূমণ্ডলে আধিপত্য করিতেছে, ইউবোপখণ্ডই তাহাদের জন্মভূমি। কাজে কাজেই এই ইউবোপখণ্ড নিজেকেই একটা সমগ্র পৃথিবী মনে করিযা ভাবিতে থাকে যে—ইহাব স্বকীয় মতামত ও শিক্ষাই একমাত্র প্রণিধানযোগ্য। সম্ভবতঃ এরূপ চিন্তা কবা উহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। তাহা হইলেও এ কথাটি সত্য যে, উহা পৃথিবীব একটি অতীব ক্ষুদ্র কোণ মাত্র। ইউবোপবাসীগণ এখনও অতীব নবীন জাতি। উহাদেব যৌনসুলভ সামর্থ থাকিলেও ঐ কালোচিত প্রগল্‌ভতা ও অপবিপক্কতা প্রচুর পরিপ্রমাণেই উহাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। উহারা কোন বিষয়-বিশেষে আপনাদিগেব দারুণ অজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন বাখিবাব নিমিত্ত দৃঢতাব সহিত একটা মত প্রচাব করিযা থাকে যে, ঐ বিষয়টিব সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কিছুই যথার্থরূপে জানা যায নাই বা জানিবাব উপায়ও নাই। এরূপ আচরণ উহাদের নিত্যনৈমিত্তক ব্যাপাব। ইহা উহাদেব রতি। পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে উহারা যে মতামত প্রকাশ কবিযাছে, তাহাতেই উহাদের ঐ জঘন্য বদভ্যাসের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায।

অতীব দুর্ভাগ্যক্রমে মানবেব একটি প্রধান ব্যাপার—জন্মান্তর—যদি প্রচলিত ধর্ম-মতের বিরোধী না হইত, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ মৃত্যু-বিষয়ে সাধারণের ধারণা স্বভাবতঃ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র আকার ধারণ কবিত। যিনি প্রণিধান করেন যে, ইতঃপূর্বে তিনি অনেকবাব মরিযাছেন, এতদ্ব্যাপারে তিনি অধিকতব প্রশান্তভাব পাবণ করিতে সমর্থ। যাঁহার ধাবণা এই যে, ইহা একটি সম্পূর্ণরূপে নবীন ব্যাপাব, যাবতীয অনিশ্চিত ও অদ্ভুত সম্ভাবনা-সঙ্কুল, মৃত্যু-ব্যাপাব স্মরণ হইলে তাঁহাব ততটা প্রশান্তভাব থাকে না। এই জন্মান্তর-ব্যাপাবের দিক্ দিযা দেখিলে কথাটি সত্য হইযা দাঁড়ায যে, সকল পথিকই সেই অজানা দেশেব পথ হইতে ফিবিয়া আইসে। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে যাঁহাবা অধিকতব উন্নত, তাঁহাবা সচবাচর দেড হাজাব বৎসরের পরে জন্মগ্রহণ করেন। পথিকগণ আবাব অন্য প্রকারেও প্রত্যাবর্তন করে। এরূপ ক্ষেত্রে উহারা অতি অল্পদিন পরেই নানা কাবণে নিরন্তবই ফিরিয়া আইসে। তখন তাহাদিগকে ভূতযোনি বলা হয়।

ভূতযোনি

যাহাবা সূক্ষ্ম-জগতের অধিবাসীকে দেখিতে পায, তাহাদিগকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ কবা কয়েক বৎসব পূর্বেও একটি বীতি ছিল। কিন্তু উহাদিগেব সাক্ষাৎকাব লাভ কবা সৌভাগ্যের বিষয। সেকালে যেমন উহারা দৃষ্টিগোচর হইত, এখনও তদ্রূপ হইযা থাকে। কিন্তু সেকালে অর্থাৎ সেই ঠাট্টা-বিদ্রূপেব সময়ে যাহাবা উহাদিগকে দেখিযা ফেলিত, তাহারা সে কথা কাহাকেও বলিত না, কথাটা খুব গোপনে রাখিত . কেন না, ঐরূপ ঘটনা প্রকাশ করিলে তাহাদিগেব প্রত্যক্ষবাদ-সভার বিজ্ঞ সভ্য বলিযা যে খ্যাতি, তাহা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে বিগত কয়েক বৎসবেব মধ্যে সাধারণেব হৃদযে একটা কল্যাণকব পবিবর্তন আসিযা দেখা দিয়াছে। অধুনা যদি কেহ অতীন্দ্রিয ঘটনাবালী সম্বন্ধে উপহাস কবে, তবে লোকেব নিকটে সে নির্বোধ, অজ্ঞ ও অহঙ্কাবী বলিযা বিবেচিত হয। এখন আধ্যাত্মিক-অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। স্যাব উইলিয়য়ম ক্রুক্‌স্ ও স্যব অলিভার লজেব ন্যায় প্রথিতনামা বৈজ্ঞানিক এবং মিঃ আর্থর ব্যাল্‌ফোবেব ন্যায় বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ঐ সমিতির সদস্য। ঐ সমিতি সূক্ষ্ম-জগতেব ঘটনাবলী সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ গবেষণার বিপুল গ্রন্থ প্রকাশ কবিতেছে। সদস্যেবা ভাবিতেছেন যে, ঘটনাবলী সতর্ক ও ধাবাবাহিক অনুসন্ধানের যোগ্য। ব্যাপার যখন এইরূপ, তখন যদি কেহ প্রচলিত বীত্যানুসাবে উহাদিগকে "কুসংস্কাব" এই চিবাভ্যস্ত, মূঢতাব্যঞ্জক "কাকাতুযা"-বুলি বলিয়া উঠে, তবে তাদৃশ আচবণ এখন আব তাহাব পক্ষে কল্যাণকব নহে।

ভূতযোনি-বিষযে পক্ষপাতশূন্য অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইযাছে যে, পৃথিবীব যাবতীয দেশেই মৃতব্যক্তিব সময সময় পুনবাগমন সম্বন্ধে সুপবীক্ষিত বিববণ বিদ্যমান আছে। ঐ প্রেতযোনিরা যে লোকে বাস করিযা থাকে, তৎসম্বন্ধে প্রচুর সংবাদ উহাদিগের নিকট হইতে আমবা পাই না। কিন্তু বিবিধ বিববণগুলিব তুলনা ও ঐক্যকবণ দ্বারা আমবা সূক্ষ্ম-জগতেব বিস্তব ব্যাপাব অনুমান কবিযা লইতে পাবি। ঐ সকল বিববণ দ্বাবা আর কিছু না হউক, অন্ততঃ উহাতে নিবপেক্ষ অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পাবেন যে, মৃত্যুব পব মানুষ সত্য সত্যই বাঁচিয়া থাকে।

মিঃ ডাব্‌লিউ টি স্টেড্ তদীয় "প্রকৃত ভূতেব কাহিনী" নামক গ্রন্থেব উপক্রমণিকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের একটি ইতর কুসংস্কাব এই যে, ভূত বলিযা কোন কিছু নাই। উহাদিগেব এই সংস্কারটি কিছুতেই যাইতে চাহে না। ধর্ম, কাব্য, বিজ্ঞান এ সকলের বিশেষজ্ঞগণ, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও যাঁহাবা এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দিযাছেন, তাঁহাবা সকলেই অবগত হইয়াছেন যে, বাস্তাবিকই ভূতযোনি বিদ্যমান আছে। ভূতযোনি কিরূপ, এ সম্বন্ধে অসংখ্য প্রকার মত প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু উহাবা যে প্রকারই হউক, উহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধানকারীদিগের মধ্যে গুরুতর বাগ-বিতণ্ডা আব নাই। এ বিষয়ে যদি কাহারও সন্দেহ জন্মে, সে নিজে অনুসন্ধান করিয়া দেখুক। ছয় মাসে, সম্ভবতঃ ছয় সপ্তাহ অথবা ছয় দিনেই সে বুঝিতে পারিবে যে, ভৌতিক ব্যাপারের অস্তিত্ব সত্য, উহা অস্বীকার করা অসম্ভব। ঐ ব্যক্তি ভূতযোনির উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শত শত সুপ্রয়োগসম্পন্ন ব্যাখ্যার অবতাবণা করিতে পারে, কিন্তু উহার বিদ্যমানতা সম্বন্ধে তাহার আব সংশয় থাকিতেই পাবে না।

প্রেত তত্ত্ব

অনাবিষ্কৃত দেশের প্রান্ত হইতে বহু পথিক আর একভাবেও ফিরিয়া আইসে। আধুনিক প্রেততত্ত্ব তাহাদিগের ফিরিযা আসিবার একটি পন্থা প্রকাশ করিয়াছে। এই পন্থার বিস্তর প্রতারণা ও চাতুরী আছে। তত্রাচ ধৈর্যশালী অক্লান্ত সাধক এ পথের সত্যের সাক্ষাৎ পাইযা থাকেন। কিন্তু কোন অন্বেষক যদি উচ্চতর দিব্যদৃষ্টি-স্ফুরণে বিশেষরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয়েন, তবে তিনি নানাবিধ ছদ্মবেশী প্রেতের সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাধীন হইয়া পড়েন। অপরঞ্চ, এই গবেষণা পথটিতে বিস্তর আবর্ত-গর্ত বিদ্যমান আছে। অনবহিত ব্যক্তিগণ নিমেষমধ্যেই উহাতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পতিত হয়েন। পবে আমরা প্রেত-বিযয়ক কয়েকটি ঘটনার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু এখানে আপাততঃ এইটুকু বলিতে চাই যে, যাঁহারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে কৌতুহলী, তাঁহারা এবম্প্রকার ব্যাপার হইতেও বিস্তব সংবাদ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

কথিত হইতে পাবে যে, প্রেতদর্শকবৃন্দ যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত করেন, তাহার মূল্য অতীব অল্প ; কেন না, সেগুলি সর্বদা সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হয় না। তা ছাড়া, প্রেতগণের প্রমুখ্যাৎ যে সুদয় বিবরণ বিবিধ সময়ে ও বিবিধ স্থানে পাওয়া গিযাছে, সেগুলিব মধ্যেও ঘোর অনৈক্য। সত্য-সত্যই এই অনৈক্য দেখা গিয়াছে। অতএব প্রেত-প্রদত্ত প্রমাণ যে সকলগুলিই গ্রাহ্য, তাহা কদাচ সম্ভবপব নহে। কিন্তু এ কথাটি দৃঢতাব সহিত বলা যাইতে পারে যে, যে প্রেতটি সংবাদ দিতে বসে, সে নিজে যতটুকু জানে, ততটুকু সত্যই বলে। দুইটি প্রেতেব প্রদত্ত বিবরণে পার্থক্য ঘটিবার সাধারণ কারণ এই যে, তাহাবা উভযেই সম্যক্ অবগত নহে। তাহারা যে ইচ্ছাপূর্বক প্রতারণা কবে, তাহা নহে।

একটা উদাহরণ দেখা যাউক। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে সকল প্রেত ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির মুখে কথা-বার্তা বলিযা থাকে, তাহাবা মৃত্যুর পবপারস্থ অবতার বর্ণনা করিতে বসিয়া বলে যে— পরবর্তী জীবনটা ঠিক যেন একটা গ্রীষ্মকালীন আবাম-ভূমির উন্নতিশীল জীবন। বস্তুতঃ ঈদৃশী বর্ণনা মহিমামণ্ডিত একটি পার্থিত-ভাবেবই পুনরুক্তিমাত্র। ইহারা ধর্মবিষয়ে যাহা কিছু বলিয়া থাকে, সে সবই খৃস্টধর্মবিষয়ক। কিন্তু উহাদের প্রদত্ত মতগুলি প্রাচীন মত অপেক্ষা অধিকতর উদার ও ততটা কঠোব নহে। সচরাচর মতগুলি লক্ষ্যহীন, কিন্তু স্পষ্টত খৃস্টধর্মাত্মক। পার্থিব জীবনের ধম্মভাবে তাহারা এইরূপই ভাবিত। সিংহলের প্রেততত্ত্ববাদীদিগের একটি বৈঠকে লেড্‌বিটার সাহেব উপস্থিত ছিলেন। এবম্প্রকার সমিতিতে ইহা তাঁহাব প্রথম উপস্থিতি। তিনি দেখিলেন যে, যতগুলি প্রেত ঐ বৈঠকে আহূত হইয়া সূক্ষ্ম-জগতের বিবরণ প্রদান করিতে লাগিল, তাহারা সকলেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তিনি আবও লক্ষ্য করিলেন যে, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বিবিধ খৃস্টান-সম্প্রদায়ের সদস্যদিগের ন্যায় পার্থিব ধর্ম-বিশ্বাসটি উহাদিগেরও পরলোক পর্যন্ত দেদীপ্যমান। তখনও পূর্বেব বিশ্বাস অটল—দৃঢ়মূল। এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া উক্ত মহাত্মা অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন। কোন প্রেত খৃস্টানমত, কেহ বা বৌদ্ধ-মত প্রচার করে, এবম্প্রকার বৈষম্যের হেতু সহজেই অনুমেয়। যে যেরূপ, সে সেইরূপ চায়। মৃত্যুর পূর্বের হউক আর পরেই হউক— সর্বকালেই এই রীতি। এটুকু আমাদিগকে মনে রাখতে হইবে। তাহা হইলে আর উপরি-উক্ত বৈষম্যের কারণ নির্দেশ করিতে ক্লেশ পাইতে হইবে না। জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায় অনুসারে পরলোকেও প্রেতগণ দল বাঁধিযা বাস করে। ইহজীবনেও যেরূপ দলাদলি, পরলোকেও তদ্রূপ।

আর একটি নিঃসংশয় পদ্ধতি

বিবিধ প্রেত-প্রদত্ত প্রমাণগুলির ঐক্যকরণ দ্বারা আর ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিবর্গেব মুখে যে সকল তথ্য নির্গত হইয়া থাকে, তৎসমুদয় হইতে আমরা পরলোকেব অবস্থা-সংক্রান্ত বিস্তব সংবাদ প্রাপ্ত হইলেও তাদৃশী প্রাপ্তিব পত্রে তদপেক্ষাও সুনিশ্চিত ও সন্তোষজনক উপায় বিদ্যমান আছে। এই উপায়টিব সাহায্যে আমরা পারলৌকিক জীবনেব যাবতীয় বিষযে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ প্রাপ্ত হই। স্থূল-জগতে থাকিয়া সূক্ষ্ম-জগতের সংবাদ গ্রহণ করা আমাদিগের পক্ষে যতটা সম্ভবপব, তাহা ঐ উপায়টি দ্বারা হইতে পারে। স্থূলদেহী হইযাও মানুয অবসরক্রমে সূক্ষ্ম-জগতে প্রবেশ কবিয়া তথাকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে ও তত্রত্য অধিবাসীদিগের সহিত কথাবার্তা করিবার পর বর্তমান দেহে প্রত্যাবর্তন কবিয়া যাহা যাহা সেখানে দেখিযা আসিল, সে সমুদয়ের বর্ণনা করিতে পারে। এ ব্যাপাব মানুযেব সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। কিরূপে সম্ভব, তাহা এখনই বলিতেছি।

আমাদিগেব এই স্থূলদেহটিব সহিত আমরা খুবই পবিচিত। শুধু এই দেহটিতেই যে মানবাত্মার প্রকাশ হইযা থাকে, তাহা নহে , বহির্জগতেব সংবাদ গ্রহণেব পক্ষে যে ইহাব ইন্দ্রিযগুলিই একমাত্র দ্বাব, তাহাও নহে। বহু দিন পূর্বে মহাত্মা সেন্ট্‌পল বলিয়া গিয়াছেন—"দেহ দুইটি-একটি প্রাকৃতিক ও অপবটি আধ্যাত্মিক।" তাঁহাব ঐ কথায বুঝা যাইতেছে যে, তিনি মনুষ্যদেহ-গণনায় যে আধ্যাত্মিক দেহটিব কথা বলিযাছেন, পবাবিদ্যানুশীলনকাবিগণ অবগত আছেন যে, সেটি ভূবর্লোক-সুলভ দেহ অপেক্ষাও সূক্ষ্মতব ও উচ্চতব। তাঁহার কথাটি বড়ই সুন্দব , কেন না, উহাতে নিম্নতব অর্থাৎ স্থূলতর অবস্থাবও বর্ণনা আছে। বাস্তবিকই প্রত্যেক ব্যক্তিবই স্থূলদেহ ছাড়া ভিতবদিকে সূক্ষ্মদেহ আছে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হইযাছে যে, জীবাত্মাব কয়েকটি কোষ (দেহ) আছে। এই কোষগুলি একটি অপরটি অন্তর্গত, এইরূপে বিন্যস্ত। কোষগুলির প্রত্যেকটি স্ব স্ব ইন্দ্রিয় ও অনুভূতি-প্রণালী আছে। উহাবা নিসর্গের বিশেষ বিশেষ স্তবেব পক্ষে বিশেষ বিশেষরূপে উপযোগী।

নিসর্গেব স্তর আছে—এই মতটির ব্যাখ্যা পরাবিদ্যানুশীলনকারী ব্যক্তিব পক্ষে অনাবশ্যক। কিন্তু যিনি তত্ত্ববিদ্যায প্রথমে দীক্ষিত হইতে যাইতেছেন, তাঁহাকে সর্বাগ্রেই বুঝিবাব চেষ্টা কবিতে হইবে যে, আমাদিগের ব্রহ্মাণ্ডেব মধ্যে অতীব সুস্পষ্ট, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর স্তব বা লোকশ্রেণী বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাব জড় উপাদান। এই উপাদানেব নিবিড়ত্ব পরিমাণও পৃথক্ পৃথক্ প্রকাব। আমাদিগকে সতত-অনুভূত এই সমগ্র পৃথিবীটা উপবি-উক্ত লোকগুলিব অন্যতম। এইটিই সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তব? মানুষের দেহাভ্যন্তরে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতব, সূক্ষ্মতম এইরূপ নানা প্রকারের জড় উপাদান বিদ্যমান আছে। পূর্বে যে সকল স্তব বা লোকেব কথা বলা হইয়াছে, সেই সকল লোকেব বিশেষ বিশেষ, জড়াংশ মানুষের স্থূলদেহেব ভিতবে আসিয়া পুঞ্জীকৃত হয়। স্থূলদেহে অবস্থান-কালেই ঐ সকল লোকশ্রেণীব অভিমুখে মানুষের বিবর্তন-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। স্থূল ইন্দ্রিযনিকরের স্বাভাবিক তৎপবতা নিবন্ধন মানুষ স্থূল-জগতেব স্পন্দন গ্রহণে সমর্থ , তদ্রূপ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিযগুলিব ক্রিয়াশীলতাপ্রযুক্ত চতুর্দিকস্থ সূক্ষ্মজড়োদ্ভূত লোকগুলি হইতেও সে স্পন্দন পরিগ্রহে সমর্থ হইয়া থাকে। অবশ্য, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিকে ক্রিয়াশীল কবিতে হইলে উহাদিগকে জাগরিত কবিবাব প্রয়োজন।

মৃত্যু হওয়ায় মানবাত্মা যখন এই স্থূলদেহের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধহীন হইয়া পড়ে, তখন সে অভিনব অবস্থাব উপযোগী হইযা চলিবার প্রযাস পায। তখন সে একটা সূক্ষ্ম-দেহে বিবাজ কবে। সেই দেহকে আতিবাহিক দেহ বলা যাইতে পাবে। এই দেহধাবী হইয়া জীবাত্মা এই দেহের সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহাব কবিতে শিক্ষা করে। আমাদিগের এই স্থূল পৃথিবীর অর্থাৎ এই ভূর্লোকেব অব্যবহিত পরেই (ঊর্ধ্বদিকেই হউক আব ভিতরেব দিকেই হউক) ভুবর্লোক। আতিবাহিক দেহযুক্ত জীবগণ ভুবর্লোকে অবস্থান করে। তাই মৃত্যুর পব আতিবাহিক দেহপ্রাপ্ত জীবাত্মা ভুবর্লোক অনুভূত কবিতে সমর্থ হয। তখন উহাব দৈহিক জড উপাদানের ঘনত্বও ভুবর্লোকের অনুরূপই হইযা থাকে। মৃত্যুব পবপারস্থ এই ভুবর্লোকেব প্রাথমিক অবস্থাটা যদি আমাদিগের এই পার্থিব জীবনেই জানিবার বাসনা হয, তবে আতিবাহিক-দেহসুলভ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিযগুলিব ব্যবহাব শিক্ষা কবা আমাদিগেব একান্ত প্রযোজন।

ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি যাবতীয লোকেব পদার্থনুভূতি-শক্তি নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রত্যেকেব ভিতবেই নিহিত আছে। কিন্তু আমাদিগেব অধিকাংশেব পক্ষেই ঐ সকল সূক্ষ্মজগতেব অভিজ্ঞতা দীর্ঘকালব্যাপী ও ধীবগতি ক্রমাভিব্যক্তি-সাপেক্ষ। ভুবর্লোক-সম্ভব আতিবাহিক দেহের জড-উপাদান একটু স্বতন্ত্র প্রকাব , কেন না, পৃথিবীব উন্নত জাতিসমূহেব মধ্যে যে সমুদয ব্যক্তি সুশিক্ষিত, তাহাবা ভুবর্লোক-সুলভ সূক্ষ্ম জড উপাদানবাহী যাবতীয পবিস্পন্দে সাডা দিতে সমর্থ—একরূপ জ্ঞানে পূর্ব হইতেই জ্ঞানবান্। শুধু তাহাই নহে, উহাবা তাদৃশ জ্ঞান-প্রভাবে স্ব স্ব সূক্ষ্মদেহকে নির্দিষ্টভাবে যন্ত্র ও সাধনস্বরূপ ব্যবহাব কবিতে সমর্থ।

নিদ্রাকালে আমাদিগের অবস্থা

মানুষ যে কেবল মৃত্যু হইলেই স্থূলশবীব ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মশবীবে বিচবণ করিয়া থাকে, তাহা নহে। নিদ্রিত হইযা পডিলেও এবম্প্রকাব ব্যাপার ঘটে। নিদ্রাবস্থায় সূক্ষ্মদেহে অবস্থান-কালে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুইটি দেহেব মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন সংযোগ থাকে। তাই, নিমেষের মধ্যেই সূক্ষ্মদেহ হইতে স্থূলদেহে প্রত্যাগমন কবা তাহার পক্ষে সম্ভবপব হইযা উঠে। বস্তুত, সাধারণ স্থলে সূক্ষ্মদেহেব এই প্রয়াণ-ব্যাপাবটিকেই স্থূলদেহের নিদ্রা বলা হয। কেন না, স্বভাবতঃ মানুষ নিদ্রা যায় না, তাহাব স্থূলদেহটিই নিদ্রিত হইযা পডে। পূর্বে আমরা যে সমুদয সুশিক্ষিত ব্যক্তির উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাব তাঁহাদিগের সূক্ষ্মদেহোপযোগী ইন্দ্রিযগুলির যথেষ্ট উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন। সুতরাং নিদ্রাকালে আমবা যে সমুদয বাস্তব ঘটনাবলীর দ্বারা পরিবৃত হই, তাঁহারা যদি সেগুলির পরীক্ষা করিতে সচেষ্ট হয়েন, তবে সেগুলির গবেষণা ও তাহা হইতে বিস্তর তথ্য সংগ্রহ কবিতে তাঁহারা সমর্থ। কিন্তু খুব বেশী সময়ই উঁহারা সচেষ্ট হয়েন না, একরূপ অন্যমনস্কভাবেই বাত্রি অতিবাহিত করেন। যে চিন্তা মনে প্রবলা, কেবল সেইটিই গভীরভাবে পুনঃ পুনঃ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাবা ঘুমাইয়া পড়েন। উঁহাদের সূক্ষ্মদেহোপযোগী বৃত্তি আছে, কিন্তু কচিৎ সেগুলিব ব্যবহার কবেন। ইঁহাবা নিশ্চয়ই সূক্ষ্মজগতে জাগরূপ থাকেন, কিন্তু জাগরূপ হইয়া উহাতে প্রবেশ করেন না। কাজে কাজেই সূক্ষ্মজগতের পারিপার্শ্বিকগুলির কথা উঁহাদের বড় একটা মনে থাকে না।

উঁহাদের পূর্বে বহু জন্ম হইযা গিযাছে। একটা আবহমানকালের রীত্যানুসারে উঁহারা ঐ ঐ জন্মে সূক্ষ্মদেহেস্থ সুলভবৃত্তিগুলির ব্যবহাব কবেন নাই। কেন না, তখন ঐ বৃত্তিগুলি ক্রমে ক্রমে

ও ধীরে ধীরে একটি 'খোলার' মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। ডিম্বের মধ্যে কুক্কুট-শাবক যেমন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ঠিক তদ্রূপ। ঐ খোলাটি স্বার্থাভিমুখী চিন্তাবাশিতে গঠিত। সাধারণ মানব ঈদৃশী চিন্তায় একরূপভাবে নিমগ্ন থাকে যে, অহার আব উদ্ধারেব উপায় দেখা যায় না। এই স্বার্থচিন্তা তাহার স্ব-নিন্মিত প্রাচীরস্বরূপ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে। ইহা এত স্থূল যে, ইহার অপর পার্শ্বে যে কি ঘটনা, ঘটিতেছে, তাহা ঐ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কিছুই অবগত হইতে পাবে না। কখন কখন, (সেটা বড়ই কদাচিৎ), বাহিবের কোন প্রচণ্ড সংক্রমিতবল কিংবা নিজেবই কোন আভ্যন্তবীণ উদ্দাম বাসনা ক্ষণকালেব নিমিত্ত এই কুজ্ঝটিকাব যবনিকা অপসৃত কবিয়া থাকে। তখন ঐ ব্যক্তি কিছু প্রকৃত জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। কিন্তু আবাব মুহূর্তের মধ্যে গাঢ় কুয়াশা তাহাব চতুর্দিকে ঘনীভূত হইয়া উঠে। তখন ঐ ব্যক্তি পূর্বের ন্যায় বে-হুঁসভাবে স্বপ্ন দেখিতে থাকে। সুদূব ভবিষ্যতে মানবের সুধীব কিন্তু সুনিশ্চিত ক্রমাভিব্যক্তি ক্রমান্বযে এই কুযাসা-তিমিব বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। তখন সে ক্রমে ক্রমে নিজের চতুর্দিকস্থ অতীত কর্মজীবনে পূর্ণ একটি বিশাল জগৎ অনুভূত করিতে সমর্থ হইবে। অথবা সে নিজেই প্রকৃত ব্যাপাব অবগত হইয়া, স্বীয় আভ্যন্তবীণ দৃঢ় ও অবিচলিত উদ্যম-প্রভাবে উপরি-উক্ত কুয়াসা জাল অপসারিত কবিযা ক্রমশঃ নিশ্চেষ্টতার যুগ-সম্ভূত অবসাদ দূব কবিতে সমর্থ হইবে, প্রাকৃতিক কার্য একটু দ্রুতভাবে চালাইতে হইলেই একরূপ ব্যাপাবের প্রয়োজন হয়। একরূপ উদ্যম-প্রকাশে যদি অন্যদিকেব তুল্যরূপ উৎকর্য সাধিত হয়, তাহাতে ক্ষতি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভেব পূর্বে মানসিক বল, জ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষ লাভ কবিবার প্রয়োজন। যদি কোন ব্যক্তি মানসিক বল প্রভৃতি লাভ কবিতে পাবিল না, অথচ তাহার পূর্ব-জীবনেব স্মৃতি জাগবিত হইয়া উঠিল, তবে সেরূপ স্থলে তাহাব দ্বিগুণ বিপদ্ ঘটিবাব সম্ভাবনা। প্রথমতঃ সে ব্যক্তি দিব্যজ্ঞানসম্ভূত শক্তি-নিচযেব অপব্যহাব কবিয়া বসিবে ; দ্বিতীয়তঃ ঐরূপ বিবিধ শক্তি নিবীক্ষণ কবিযা, তাহাদেব প্রকৃতি অনুধাবন বা তাহাদিগকে দমন করিতে অসমর্থ হইযা ভয়ে অভিভূত হইযা পডিবে।

পর্যবেক্ষণ-শিক্ষা

যিনি নিযমিতরূপে গুহ্য-তত্ত্ববিষযিণী শিক্ষায প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাকে সাধারণতঃ প্রথমেই তাঁহার অভ্যস্ত চিন্তা-প্রণালীটি পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাঁহার চতুর্দিকে যে নবীন ও সুন্দর জগৎ বিদ্যমান আছে, সেইটি তাঁহাকে দেখিতে হইবে , দেখিবার শিক্ষা কবিতে হইবে। কেন না, তাহা হইলে তিনি ঐ নবীন জগতে প্রতিভান্বিতভাবে কার্য করিতে সমর্থ হইবেন। এতটুকু শিক্ষাপ্রাপ্ত হইলেই যে তিনি জাগরিত অবস্থায় সূক্ষ্মদেহসুলভ জ্ঞানের কোন স্মৃতি আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন, তাহা নহে। তিনি ঐরূপভাবে সমর্থ হইলেও হইতে পাবেন, কিন্তু নিশ্চয়ই যে হইবেন, তাহাব কোন স্থিবতা নাই। সূক্ষ্ম-জগতেব বাপাব স্মরণ করিযা বলা একটি গুরুতর ক্ষমতা। যিনি সূক্ষ্ম-জগতেব জ্ঞানটিকে স্থূল-জগতে অবিচ্ছিন্নভাবে ববাবর বহন কবিয়া আনিতে পাবেন, তিনিই ঐ ক্ষমতা লাভ কবেন। জ্ঞানটিকে বহন কবিয়া আনিবার শক্তিব উপরেই ঐ ক্ষমতা নির্ভর কবিয়া থাকে। সূক্ষ্ম-জগতে স্বাধীনভাবে কার্য কবিবাব শক্তির সহিত এই ক্ষমতার কোনই সংস্রব নাই। ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইতে শক্তিও ক্রমে আসিয়া পড়ে। তখন মানুষ স্থূল-দেহী হইয়াই সূক্ষ্মদেহ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান প্রকাশে সমর্থ হয়। সুতরাং মানুষ তখন জাগ্রত ও

নিদ্রিত উভয় অবস্থাতেই সূক্ষ্ম-দেহেব ইন্দ্রিয়নিচয় ও শক্তিরাজির ব্যবহারজনিত উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে সে চতুর্দিকে নিরন্তরই মৃতব্যক্তিবর্গকে দেখিতে পায়। সুতরাং তখন সে তাহাদিগকে তত্রত্য অবস্থাদি পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়। এতদবস্থায় ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে আমবা পাবলৌকিক জীবন-সংক্রান্ত প্রচুব সত্য ও বিশদ সংবাদ পাইতে পাবি। এতদৃশ দর্শকবৃন্দেব নিকট হইতেই আমবা সূক্ষ্মজগতেব সন্তোষজনক জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হই।

এ কথাটি সত্য যে, ঐ সকল ব্যাপাব ঐ প্রকার ব্যক্তিব নিকটেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অন্যেব নিকটে নহে। কিন্তু উহার উক্তিনিয অন্যেও প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। অন্ততঃ উক্তিগুলিব মূল্য আছে , কেন না, স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর উহাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ঐগুলি সোজাসুজিভাবে উৎপাদকেব নিকট প্রাপ্ত, এ জন্যও উহাদিগকে মূল্যবান্ বলিযা মনে কবা যাইতে পারে। যখন এরূপ ব্যাপাব ঘটে যে, অনেকগুলি তত্ত্ব-অন্বেষক পৃথক্ পৃথকভাবে ধারাবাহিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইযা দেখিল যে, তাহাদেব গবেষণাব ফলগুলির মধ্যে মূলতঃ খুব সৌসাদৃশ্য বিদ্যমান বহিয়াছে, তখন তাহাদিগেব প্রদত্ত সেই সাক্ষ্য দেন যথেষ্ট পবিমাণে দৃঢীভূত বলিয়া বোধ হয়। আবাব যখন দেখা যায় যে, তাহাদিগেব গবেষণা এতদ্‌ব্যাপার সম্বন্ধে পৃথিবীব প্রাচীন ধর্ম্মমতগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন বা কোন কোন স্থলে উহাদিগেব ব্যাখ্যা কবিতেছে, তখন স্পষ্টই বুঝা যায যে, তাহাদিগের কথা স্পষ্টই সত্য। সেরূপ ক্ষেত্রে পবলোক সম্বন্ধে আলোচনায় তাহাদিগেব কথায সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন না কবা নির্বোধেব কার্য। আমাদিগের চতুর্দিকে নিবন্তবই সূক্ষ্মজগতেব ঘটনাবলীব সংঘটন হইতেছে। এ সকল ঘটনা আমাদেব আলোচ্য। উপবি-উক্ত প্রত্যক্ষদর্শীবা যে অনুমান কবিয়া থাকে, আমাদেব মনে হয, কেবল তাহাই ঐ আলোচ্য ঘটনাব একমাত্র সন্তোষজনক হেতু-নির্দেশক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, খৃস্টধর্মেব প্রাচীন ও সত্য উপদেশগুলিব মধ্যে ঐ অনুমানেব পবিপন্থী কোন কিছুই নাই।

যে সকল ব্যক্তি নিবন্তব পবাবিদ্যাব আলোচনা কবিয়া থাকেন, যাঁহাবা সর্বদাই সূক্ষ্ম-জগতের কার্যে ব্যাপৃত, তাঁহাদিগেব নিকটে সূক্ষ্মজগতের অস্তিত্ব একটা খাঁটি সত্য, একটি দৈনন্দিন ব্যাপার, স্থুল দেহেব মত একটা বাস্তব পদার্থ। তাই পবাবিদ্যা সমিতিব কোন ব্যক্তির নিকটেই ঐ সকল ব্যাপাব আর কল্পনাব সামগ্রী নহে, উহা জ্ঞানেব বিযযীভূত। দিন দিন এখন ঐ সমিতির সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সূক্ষ্ম জগতের আলোচনায় উহাবা বিস্তব তথ্য জানিতে পাবিযাছেন। আমবা পরে সেগুলিব আলোচনা করিব। তখন আমরা বুঝিতে পাবিব যে, আবিষ্কৃত তথ্যগুলি আমাদিগেব প্রাণে অনেকটা উৎসাহেব সঞ্চাব করে। কেন না, উহাদেব সাহায্যে আমরা বুঝিতে পাবি যে, মৃত্যু-ব্যাপাবটি অমর-জীবনপথে একটি ঘটনামাত্র---এই ঘটনার জন্য কিছু মাত্র বিলাপ বা ভয কবিবার প্রয়োজন নাই। পবন্তু উহাকে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতব অবস্থায় উপনীত হইবাব একটি সোপান বলিয়া বিবেচনা কবা কর্তব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

ধর্ম-সম্বন্ধীয় অন্যায় সংস্কার

আমরা এক্ষণে যে সকল অন্যায় সংস্কারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব, বেশ যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যাইতে পারে যে, প্রচলিত ধর্ম হইতে সেগুলির উদ্ভব হইয়াছে। প্রকৃতখৃস্ট-ধর্ম হইতে আদৌ তাহারা উদ্ভূত নহে। অধুনা আমরা ঐ ধর্মে যে সকল নিরর্থক জড়-বাদ আনিযা ফেলিয়াছি, তাহাই ঐ কুসংস্কারের প্রসূতি। পূর্বেই বলিযাছি, ঐ ধর্মে একটা যুক্তিবিরুদ্ধ মত প্রচলিত আছে। সেটি এই—মৃত্যু হইবামাত্র মানুষ হয় অনন্ত স্বর্গে, নয় অনন্ত নরকে গমন করিয়া থাকে। খস্টধর্মের কতিপয় সম্প্রদায় এ মতের পৃষ্ঠপোষক। উহাদিগকে বড় একটা কেহ চিনে না। এই মতটি নানা প্রকারে বিস্তর অনিষ্টসাধন করিয়াছে। তা ছাড়া, উহাতে সুস্পষ্ট অসঙ্গত কথা থাকা প্রযুক্ত উহাব উপব লোকেব কার্যতঃ একটা ঘোর অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। যাহাবা এই মতাবলম্বী সম্প্রাদায়ভুক্ত হইবে, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া ঐ দুইটি দসাব একটি গ্রহণ কবিতে হইবে, অর্থাৎ হয় স্বর্গে, নর নরকে যাইতেই হইবে, তাহাব আর গত্যন্তব নাই। এবম্প্রকাব ব্যবস্থা যদি হয, তবে সেটি নিতান্তই গর্হিত। এরূপ হওযা ঘোব অসম্ভব। যাঁহারা এই মতটির প্রবর্তক, হয় ত তাঁহাবা পারলৌকিক ব্যাপাবটা কিছুই বুঝিতেন না। সমগ্র ব্যাপারটিই তাঁহাদের নিকটে বহস্য-জড়িত ও অর্থশূন্য বলিযা অনুভূত হইয়াছিল। তাই অশান্তিকর সংশয়ে তাঁহারা অনাশ্বাসিতপূর্ব দৈবানুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ভগবান্ দয়া-পরবশ হইয়া অবশ্যই অনুগ্রহ করিবেন, এইরূপ একটা ক্ষীণ আশা তাঁহাদের হৃদয়ে আসিয়া জাগিত। অথবা ঐ মত-প্রবর্ত্তকগণ একটা অদার্শনিক সিদ্ধান্ত করিয়া বসিলেন যে, মৃত্যু হইলে একটি আকস্মিক ও ষোলকল্যাণপূর্ণ পবিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ভাবিলেন, এই পরিবর্তন-নিবন্ধন মৃতব্যক্তিব যাবতীয় বদভ্যাসগুলি নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হয়, আর তকনই ঐ ব্যক্তি এক জন দেবদূত হইয়া উঠে , কাজে কাজেই তখন সে স্বর্গবাসের উপযোগী হইয়া থাকে। কিম্বা ঐ মহাপ্রচারকগণ ভাবিয়াছিলেন যে, মৃত্যুকালে সঞ্চিত পুণ্য স্খলিত হইযা পড়ায় মৃত ব্যক্তি একটা বিকট দানব হইয়া উঠে। মৃত্যুকালে যে পুণ্য স্খলিত হইয়া যায়, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ঐটি তাঁহাদের অনুমান। এই শেষোক্ত ধারণাটি সম্বন্ধে সচরাচর বড় একটি হৈ-চৈ শুনা যায় না।

এই মতটি যে মূঢ়জনোচিত ও ভ্রমসঙ্কুল, তাহা প্রতিপন্ন করা অনাবশ্যক বলিয়া মনে হয়। প্রকৃত কদাচ ঐন্দ্রজালিক চাতুবী প্রকাশ করেন না। তাঁহার কাছে সকল প্রকার উন্নতিই ক্রমানুবর্তিনী। কোন অনভিপ্রেত ব্যাপার পরিবর্তন করিতে হইলে কিংবা দুর্বলকে সবল করিতে হইলে, সে কার্য ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিযা হইতে থাকে। সে কার্যটি স্বাভাবিকভাবে (এই কথাটিই খুব সুসঙ্গত), ধীরগতিতে সংঘটিত হয়। উহা যে আশ্চর্যরূপে বা অতীন্দ্রিয় সংস্রব নিবন্ধন ঘটিয়া থাকে, তাহা নহে। বস্তুতঃ আমরা দেখিয়া থাকি যে, মৃত্যু হওযায় মৃত ব্যক্তির প্রকৃতির আদৌ কোন পরিবর্তনই ঘটে না। মৃত্যুব পূর্বদিন ঐ ব্যক্তি যেরূপটি ছিল, মৃত্যুর

পরবর্তী দিনেও সে ঠিক সেইরূপটিই থাকে। একটুও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। জীবিত কালে যদি ঐ ব্যক্তি ধর্মপরায়ণ, ভক্তিমান্ বা অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন থাকেন, তবে মৃত্যুর পরেও উঁহারা ঐ সকল গুণরাশি বিদ্যমান থাকিবে। অপরঞ্চ, যদি উনি পার্থিব জীবনে নীচ ও সঙ্কীর্ণ-হৃদয়, কুচিন্তারত ও ইন্দ্রিয়সেবাসংক্রান্ত বাসনায় বিব্রত থাকেন, তবে মৃত্যুর তোরণ অতিক্রম করিয়া গেলেও ঐ সকল অসদ্গুণ তাঁহাকে পরিত্যাগ কবে না। প্রকৃত কথা এই যে, মৃত্যু হওয়ায় প্রকৃত মানুষটির কোনরূপ পরিবর্তনই ঘটে না। পবিচ্ছদাবৃত ব্যক্তির বহিরাবরণটি উন্মোচনের ন্যায় স্থূলদেহপরিত্যাগে দেহীর প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তনই হয় না। যখনই মানুষ এই ব্যাপারটি অনুভব করিতে পারে, অমনই যে বুঝিতে পারে যে, মৃতুও আমাদিগের পরিজ্ঞাত অন্যান্য নৈসর্গিক পরিবর্তনেব ন্যায় একটা পরিবর্তনমাত্র। তখন সে মনে কবে যে, অলৌকিক রূপায়নের প্রতীক্ষায় সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। যে বুঝিতে পারে যে, যাহা তাহার হইবার ইচ্ছা, নিজেকে সেইরূপটি গড়িয়া তুলিতে হইবে, ধীরে ধীরে অথচ অটলভাবে এই গঠন-ক্রিয়া পরিচালনের প্রয়োজন। কেন না, তাহার কার্যকলাপ একটি শাশ্বত ও অপবিবর্তনীয় বিধির অন্তর্গত। এই বিধির প্রভাবে কোন ব্যক্তি বিনা পরিশ্রমে কিছুই প্রাপ্ত হয না ; কিন্তু পবিশ্রম করিলে তাহার পুরস্কার কড়া-ক্রান্তি হিসাবে পাওয়া যায় ; তাহার কদাচ অন্যথা হয় না। যে সূক্ষ্ম-জগৎ তাহার নিকটে একটি অস্থিরচিত্তেব কল্পিত রাজ্যের সামগ্রী বলিয়া মনে হইত, এখন তাহা জাগতিব বিধি-নিযমিত সু-পবিজ্ঞাত সাম্রাজ্যের বিষয়ীভূত হইযা উঠিল। এরূপ অবস্থায ঐ ব্যক্তি যথাযথভাবে স্বীয কর্তব্য অবধারণে সমর্থ।

মৃত্যুর নিমিত্ত আয়োজন

মৃত্যুর নিমিত্ত একটা বিশেষ প্রকার আয়োজনের প্রয়োজন আছে, এই কথাটি পুনঃ পুনঃ খৃস্টধর্মী মানবেব আর একটি অহিতসাধন কবিযাছে। মূলধর্মটি চিরকালই সাম্প্রদায়িক মতাপেক্ষা অধিকরত পরিণামদর্শী ও উহার মূলধর্মে নানাবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানের সুস্পষ্ট বিধিব্যবস্থা আছে। যিনি সমর্থ, তাঁহাকেই ক্রিয়াদি করিতে হইবে—ব্যবস্থা এইরূপ। কিন্তু যিনি অধম, যিনি ঐ অনুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়া ঘটনাচক্রে অন্যত্র জীবলীলা সাঙ্গ করেন, তাঁহার উপর মূলধর্ম কোন প্রকার প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করে নাই। পরন্ত অনেকগুলি সম্প্রদায়ের মত এই যে, মানুষের মৃত্যুকালীন মানসিক অবস্থার উপর তাহার শাশ্বত কল্যাণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর কবে। যদি তিনি মৃত্যুসময়ে "করুণা" বা "ভগবদনুগ্রহ" প্রাপ্ত হইলেন, তবে আর ভাবনা নাই ; মনে করিতে হইবে, তিনি অতি সহজে আনন্দধামে যাইবার টিকিট পাইয়া বসিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি যদি ঐরূপ ত্রাণ প্রাপ্ত না হইলেন, তবেই মুস্কিল। সেরূপক্ষেত্রে, তাঁহার পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা যত না করা হয়, ততই ভাল। এবংবিধ বায়ুরোগাত্মক অদ্ভুত মুক্তি-ব্যাপারটি (মৃত্যু-কালে পাপী মনে কবিল, আমি "ত্রাণ" প্রাপ্ত হইলাম আর অমনি ত্রাণ হইয়া গেল, এই অদ্ভুত মতটি) সম্ভবতঃ মানববুদ্ধির অতীব বিস্ময়জনক একটা বিকৃতিমাত্র। ঐ কুসংস্কারটির মধ্যে আদৌ কোন বুদ্ধির পরিচয় নাই, যদিই কিছু থাকে, তবে তাহা ঐরূপ বিকৃত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই অদ্ভুত প্রতারণার ফল বিশেষরূপ নির্মম। কেন না, যদি কোন ব্যক্তি সংগ্রামরত সৈনিকের ন্যায় বিদেশে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুকালীন

মানসিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা অবগত হওয়া তাহার আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। কাজে কাজেই তাহার নিমিত্ত একটা অনাবশ্যক ভয় ও উদ্বেগ আসিয়া উপস্থিত হয়। যেমন সকল প্রকার লৌকিক কুসংস্কারের মধ্যেই অতি সামান্য একটু সত্য নিহিত থাকে, সেইরূপ এই অদ্ভুত ধারণাটির তলদেশেও অতি ক্ষুদ্র একটি সত্যের কণিকা বিদ্যমান আছে। এই সত্যটুকুর উপর একটি সুবিপুল গৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র ভিত্তি ঐ প্রকাণ্ড গৃহের ভার ধারণ করিতে অসমর্থ।

ধর্ম-পথে থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে, এইটুকুই মৃত্যু উদ্দেশ একমাত্র আয়োজন। এই আয়োজনই একমাত্র ফলোৎপাদক ও প্রয়োজনীয়। মানুষ যদি সারাটি জীবন ধর্মপথে কাটাইয়া থাকে, তবে বন্দুকের গুলি বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুকালে তাহার মানসিক অবস্থা কি হইয়াছিল, তাহা দেখিবার আদৌ প্রয়োজন নাই। আর জীবিতকালের ধর্মাচরণ যদি তাহার পারলৌকিক জীবনের ভিত্তি স্বরূপ হইয়া না থাকে, তবে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত থাকিয়া একটি ক্ষণিক প্রবলীভূত অনুতাপ দ্বারা সে ব্যক্তি কখনই স্বীয় ভবিষ্যতের পরিবর্তন ঘটাইবার আশা করিতে পারে না। কুপথগামী ব্যক্তিরও মতি-পরিবর্তন ঘটে। কোন না কোন সময়ে সে সৎপথে প্রত্যাবর্তন করে। আসন্ন মৃত্যুর আবেগে যদি তাহার ঐরূপ পবিবর্তন দেখা দেয়, তবে সেটা খুবই ভাল। এরূপ স্থলে তাহার কর্মের পরিবর্তন ঘটিবে না। ভোগ দ্বারা তাহাকে কর্মক্ষয় করিতে হইবে। কিন্তু পরবর্তী জগতেও যদি তাহার ঐরূপই সদিচ্ছা থাকিয়া যায়, তবে নিশ্চয়ই তাহার সঞ্চিত কর্মের প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, ঐ সদিচ্ছাপ্রভাবে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের নূতন কর্মও সদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া উঠে।

মৃত্যুর পূর্বে মনে যে চিন্তার উদয় হয়, সেটি একেবারেই নিষ্ফল, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। পক্ষান্তরে, ঈদৃশী চিন্তা অনুন্নত ব্যক্তিবর্গের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পূর্বেই বলিয়াছি যে, পরবিদ্যার মতে মানুষ নিদ্রিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে তাহার মনে যে চিন্তাটি থাকে, সেটি কিরূপ, তাহা বিশেষরূপে দেখা আবশ্যক। কারণ, আমরা এখন ক্রমোন্নতির যে ক্রমে অবস্থিত, তাহাতে ঐরূপ চিন্তাটি লইয়াই—উহারই আলোড়ন-বিলোড়ন করিয়াই প্রায় সারারাত্রিটা অতিবাহিত করিয়া থাকি। যিনি সূক্ষ্মজগৎ দেখিতে পান, নিদ্রায় পূর্বকালীন চিন্তায় তাঁহার তত প্রয়োজন নাই ; কেন না, চিন্তা হইতে চিন্তান্তরে যাইবার ক্ষমতা তাঁহার করায়ত্ত। তাই তিনি ইচ্ছামাত্রই নিদ্রার পূর্ববর্তী পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহার চিন্তার সাধারণ উন্মুখতা কোন্ দিকে, কেবল সেইটুকুই লক্ষ্য করিতে হইবে ; কেন না, এরূপ দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির মন অভ্যস্ত প্রণালীতে দিবারাত্র সমভাবে প্রধাবিত হইয়া থাকে।

সাধারণ উন্নত মানবের ঐ প্রকার দশা। তাঁহাদেরও পার্থিব জীবনে মনের যে সাধারণ প্রবণতা থাকে, সূক্ষ্মজগতেও সেইটি তাঁহাদের কার্যের মূলসূত্র হয়। অতএব ইঁহাদেরও মৃত্যুকালীন বিশেষ কোন একটি চিন্তা তত প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু যাহারা একেবারে অনুন্নত, সূক্ষ্মজগৎ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যাহাদের এখনও অতীব অস্পষ্ট ও অভিনব তাহাদের নিকটে মৃত্যুকালীন চিন্তাটির মূল্য খুব বেশী। কেন না, এই চিন্তাটি তাহার মনে অনেকটা সময় থাকিবার সম্ভবনা। ইহার পরিবর্তন ঘটিলেও তাহা অতি ধীরে ধীরে ঘটে। অতএব এই চিন্তাটিকেই প্রধান সুর মনে করিয়া তাহার সূক্ষ্ম-জীবনের অন্যান্য সুরগুলি ইহার সহিত মিশাইয়া বাঁধা যায়। যাহাতে এই চরমকালীন চিন্তাটি অসৎচিন্তা না হইয়া একটি সৎচিন্তা হয়, সে বিষয়ে একটু যত্ন পইলে সে যত্ন নিশ্চয়ই নিষ্ফল হয় না।

সৈনিকের মৃত্যু

যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে, কর্তব্যের আহ্বানে প্রাণ বিসর্জন করেন, তাঁহার অদৃষ্ট সম্বন্ধে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা সংশয় থাকা উচিত নহে। অপব ব্যক্তিবর্গেব ন্যায় তাঁহার জীবনের উপরই নির্ভর কবে, মৃত্যুর উপর নহে। কিন্তু তাঁহার ঐ মৃত্যুটিও তাঁহার ক্রমাভিব্যক্তির একটি মূল সাধন। কর্তব্য জিনিসটি তাঁহার নিকটে একটি মনঃকল্পিত ব্যাপার। মাত্র ইহার নিমিত্তই তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ। ততদূর সাহস—ততদূব বীরত্ব পর্য্যন্ত তাঁহার স্ফুরিত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, তিনি পূর্ব অবস্থা হইতে অনেকটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। তিনি ন্যায়তঃ যত্ন করিলেন কি অন্যায়েব পক্ষ অবলম্বন করিলেন, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। তিনি মনে করেন যে, তিনি ন্যায়ের পক্ষেই আছেন। তাঁহার ঐ বদ্ধ কর্তব্যের আহ্বান, তাঁহার জন্মভূমির আদেশ। তাই তিনি যাবতীয় স্বার্থচিন্তা দূরে নিক্ষেপ কবিয়া, মৃত্যুকে ধ্রুব সত্য জানিয়াও ঐ আদেশপ্রতিপালনে কৃতসঙ্কল্প। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যে শ্রেণীর মনুষ্য হইতে সাধারণ সৈনিক বাছিয়া লওয়া হয়, তাহাদের গার্হস্থ্য জীবনের সাধারণতঃ ঐরূপ বিস্ময়কর সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার উৎকর্ষসাধন পক্ষে কোন রূপ সুযোগ উপস্থিত হওযা নিতান্ত অসম্ভব। অথচ ঐ উৎকর্ষ সমবাঙ্গনে সাধিত হইয়া থাকে। ঐরূপ লক্ষ্য করিতে ইহাও দৃষ্টি-গোচব হইবে যে, বুদ্ধব্যাপাবটি ভযাবহ হইলেও উহাতে নির্দিষ্ট ক্রমে একটা সুস্পষ্ট ক্রমোন্নতি ঘটিয়া থাকে। ধর্মোন্মত্ত মুসলমানগণেব ধাবণা এই যে, যে ব্যক্তি ধর্মের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে রণভূমিতে শযন কবে, যে পববর্তী জগতে অচিবাৎ সুখ-সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইযা থাকে। তাই দেখা গেল, এই ধাবণাটিব মূলেও একটি সত্য কণা বিদ্যমান বহিযাছে।

দীর্ঘজীবনে মানুষেব যতটুকু ক্রমোন্নতি ঘটে, যুদ্ধে মরিলে কতিপয় স্থলে তাহা অপেক্ষা অধিক ঘটিয়া থাকে। তথাচ, মূল ধর্মে একটা কথা আছে যে—"হে প্রভু! আমাদিগকে আকস্মিক মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করুণ।" এই প্রার্থনাটিব মধ্যে সাধাবণতঃ একটি যুক্তি দেখা যায়। মানুষ বার্দ্ধক্য পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে, ইহজীবনেব তাহাব অধিকাংশ ইতর বাসনা স্বভাবতঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তখন তাহার চরিত্রে ইতববৃত্তি আর থাকে না। সুতরাং পরিশুদ্ধির নিমিত্ত ভূবর্লোকে আর তাহাকে ততটা খাটিতে হয না। দীর্ঘকাল পীড়ায় ভুগিলেও অনেকটা ঐরূপ ফল ফলিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি পূর্ণ যৌবনচ্ছটার মধ্যেই অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার অবস্থা একেবাবে স্বতন্ত্র প্রকাব হইয়া থাকে। ইহাব বাসনানিচব তীব্র ও উদ্যম থাকা প্রযুক্ত ইহাকে সূক্ষ্মজগতে দীর্ঘকাল অবস্থিতি কবিতে হয। কিন্তু তথায যদি এই ব্যক্তি বেশ সদ্ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে শিক্ষা করে, তবে তাহাতে এত অধিক সুন্দর কর্মফল প্রসৃত হইবে যে, জীবিত থাকিলেও সে ঐ সময়ের মধ্যে অতটা সুফল অর্জন কবিতে পাবিত না। অতএব আকস্মিক মৃত্যু-ব্যাপারটিরও আমরা দুইটা দিক্ দেখিতে পাই।

মানুষ যদি অকস্মাৎ স্থূলদেহ পবিত্যাগ করিয়া ভূবর্লোকে যাইয়া উঠে, তবে সেরূপ স্থলে কখন কখন তাহাকে সুখস্বপ্ন-পুলকিত নিদ্রার দীর্ঘকাল অভিভূত থাকিতে হয়। জ্ঞান-চৈতন্য থাকে না। খৃষ্ট-ধর্মের একটি প্রাচীন উপদেশে ঐ কথাটি ব্যক্ত হইযাছে। আবাব কখন কখন তাহার জ্ঞানে বিপর্যয় ঘটে না। স্থূলদেহের জ্ঞান-সূত্রটি আদৌ বিচ্ছিন্ন হয না। এইরূপ বৈষম্য ঘটে কেন, তাহা অবধারণ করা সকল সময় সহজ নহে। মোটামুটি এই বলা যাইতে পাবে যে, মানুষ জীবিতকালে যেরূপ কার্যাদি করিয়া থাকে, মৃত্যুব পবে সে তদনুরূপ দশা প্রাপ্ত হয়। পারলৌকিক অবস্থাটা

খুব বেশী পরিমাণে পার্থিব জীবনের কার্যকলাপের উপরই নির্ভর করে। একটা উদাহরণ দেখা যাউক। অধিকাংশ যুবক প্রেত-দেহেও নিকৃষ্ট জড়াংশে দেহ রচনা করিতে সমুৎসুক। কিন্তু উহারা যদি যথাসময়ে নানাবিধ ইন্দ্রিয়বাসনা সংযত করিবার শিক্ষা-করিত, তাহা হইলে উহাদিগের জ্ঞান ঐ সকল নিকৃষ্ট জড়াংশের ভিতর দিয়া স্ফুরিত হইতে চাহিত না। মৃত্যুর পরে নূতন উপাদান বিন্যাসে একটি সূক্ষ্ম দেহ রচিত হয়। ঐ সকল যুবক পার্থিব জীবনে যদি সংযমী হইত, তাহা হইলে উহাদের অভিনব সূক্ষ্ম দেহে ঐ নিকৃষ্ট জড়াংশ বিদ্যমান থাকিত না। উহা কেবল বাহ্য প্রভাবেরই বিষয়ীভূত হইয়া থাকিত। সে ক্ষেত্রে ঐ সকল সূক্ষ্ম-দেহী যুবক বাহ্য জগতের পরিস্পন্দে সাড়া দিতে অনভ্যস্ত থাকা প্রযুক্ত তাহাদের ইতর ইন্দ্রিয়-বৃত্তি পরিস্ফুট হইতে পারিত না। কাজে কাজেই স্থূল-জগতের ব্যাপারে তাহাদিগকে অশান্তি ভোগ করিতে হইত না। সূক্ষ্ম-জগতে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দেই থাকিতে পারিত।

যাহারা আকস্মিক মৃত্যুর কবলে কবলিত হয়, তাহাদিগের আর একটি বিশেষ সুবিধা ঘটে। যুদ্ধেই হউক বা কোন দৈব ঘটনাতেই হউক, আকস্মিক হইলেই সে সুবিধাটি আইসে। সেটি এই—এক দল অদৃশ্য সহায়ক আসিয়া উহাদিগের সেবায় প্রবৃত্ত হয়। শুনা যায়, প্রাচীনকালে উচ্চ শ্রেণীর দেব-যোনিরাই ঐ সেবা-কার্য করিতেন। কিন্তু বিগত অল্পদিন হইতে যে সকল মানুষ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় জ্ঞানতঃ ভূবর্লোকে কার্য করিতে সমর্থ ; কেবল তাঁহারাই এই প্রেম-ব্যঞ্জক সেবা ধর্মে যোগ দিতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহারা অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা ঐ প্রকার সেবা-কার্যে বিশেষরূপে উপকৃত হইয়া থাকে, তাহাদিগের ঐ প্রকার সহায়কের নিতান্ত প্রয়োজন। কেন না, তাহাদের প্রেত-দেহটি অতীব দুর্দমনীয় হইয়া থাকে, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে উহাকে দমন করা অসম্ভব। শুধু তাহাই নহে, আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় তাহারা স্বভাবতঃই দারুণ বিচলিত হইয়া থাকে, এমন কি, অনেক স্থলে অতিশয় ভীতও হইয়া পড়ে। সুতরাং তখনও সহায়ক আবশ্যক। তাই ঐরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল সাহায্যকারীরা আসিয়া উহাদিগকে আশ্বস্ত ও শান্ত করেন, যতদূর সম্ভব উহাদিগকে উহাদের বর্তমান অবস্থা বুঝাইয়া উহাদের শ্রেয়ঃ নির্ধারণ করিয়া দেন। সেইটুকুই উঁহাদের কার্য। ভূবঃ, স্বঃ প্রভৃতি যাবতীয় সূক্ষ্ম-জগতের অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সকল প্রকার সঙ্গত স্থলেই প্রকৃতির ব্যবস্থা আমাদিগের অনুকূল, সকল ঘটনায়ই প্রকৃতি পূর্ণমাত্রায় আমাদের সাহায্যকারিণী। তাই যে সকল বিঘ্ন আমাদিগের উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া অনুমিত হয়—যে সকল বাধা নিরন্তরই আমাদিগের সমক্ষে আসিয়া দাঁড়ায়, সে সমুদয় সত্ত্বেও আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, প্রত্যেক ব্যবস্থাটিই আমাদিগের আনুকূল্য-অনুসারিণী, প্রাতিকূল্য-বিধায়িনী নহে। আর একটু বুঝিতে হইবে যে, মহীয়সী জাগতিক বিধির বিধানে আমাদিগের অগ্রগতি সুখসাধ্যই হইয়া আসিতেছে। আমাদের উন্নতি-পথে একটা বাধা ঘটে, তাহা ঐ বিধির অভিপ্রেত নহে। উন্নতির একটা প্রতিবন্ধক ঘটিলেই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ক্ষেত্রে মানুষ হয় ভগবদিচ্ছার বিপরীত কার্য করিয়াছে, কিংবা ভগবদভিপ্রায়টি ঠিক বুঝিতে পারে নাই। এই দুইটির একটি নিশ্চয়ই ঘটে। একটি প্রাচীন বাক্য আছে যে—"যাঁহারা ভগবান্‌কে ভালবাসেন, যাবতীয় ব্যাপার তাঁহাদের মঙ্গলসাধান করিয়া থাকে।" স্থূলজগতের অস্থায়ী একবার অতিক্রম করিয়া গেলেই আমরা উপরি-উক্ত প্রাচীন বাক্যটির যাথার্থ অনুভূত করিতে সমর্থ হইয়া থাকি।

চতুর্থ অধ্যায়

মৃত্যু-বিষয়ে আমাদিগের ভাব

মৃত্যু-বিষয়ে বিবিধ লৌকিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় অন্যায় সংস্কারের আলোচনাকালে তত্ত্ব-বিদ্যাপন্থিগণ মৃত্যু ব্যাপাবটিকে কি ভাবে দেখিয়া থাকেন, তাহা আমি স্বভাবতঃই বহুল পরিমাণে নির্দেশ করিয়াছি। যাঁহারা পরা-বিদ্যার আলোচনায় নিরত, তাঁহারা সাধারণের ন্যায় মৃত্যুকে তত গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে করে না। পাশ্চাত্য দেশের সাধাবণ ব্যক্তিমাত্রই মনে করে যে, পার্থিব জীবনটি যেন একটি সরলরেখা, হঠাৎই জন্ম-সময়ে উহার উৎপত্তি হয় ও মৃত্যুদিনে উহার আকস্মিক তিরোভাব ঘটে। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যবিদ্‌গণ ভাবেন যে, যদি পুনর্জন্ম না-ও ঘটে, তত্রাচ পার্থিব জীবনটা যেন একটা বিপুল বৃত্তের রেখাচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রাংশ, আর জন্ম ও মৃত্যু যেন ঐ বৃত্ত-পরিধির দুইটি বিন্দু। একটি সরল রেখা যেন ঐ বিন্দুদ্বয়কে ভেদ করিয়া গিয়াছে। ঐ বেখাটির এক পার্শ্বে ভূর্লোক, অপর পার্শ্বে ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সূক্ষ্মজগৎ।

স্থূলজগতে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে সূক্ষ্মজগতের অনেকটা পথ আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হয়। সে সম্বন্ধে আমাদের প্রচুর জ্ঞান না থাকায় আমরা একটা ক্রমযুক্ত চিত্র অঙ্কিত করিতে অসমর্থ। সূক্ষ্মজগতের তাদৃশ জ্ঞান থাকিলে আমরা জীবাত্মার অন্ততঃ একটা মোটামুটি গতিবিধির নির্দেশক চিত্র প্রদান করিতে পারিতাম। চিত্র দ্বারা যদি জীবাত্মার গতিবিধি বুঝিতে হয়, তবে মনে করিতে হইবে যে, জীবাত্মা যেন একটি বৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে। বৃত্তটির ৩০ ভাগের এক ভাগ যেন স্থূলজগতে আর ২৯ ভাগ দেন সূক্ষ্মজগতে। যেন একটি রেখা বৃত্তটিকে স্থূল ও সূক্ষ্মজগতের মধ্য দিয়া ভেদ করিয়া গিয়াছে। ঐ রেখাটির উপরের অংশ সূক্ষ্মজগৎ, নিম্নের অংশ স্থূলজগৎ। এই বৃত্তের কেন্দ্র স্থির করিয়া উহার ভিতর দিয়া একটি সরল রেখা অঙ্কিত কর। ঐ রেখা ঊর্ধ্বদিকে পরিধির যে স্থলে সংযুক্ত হইবে, সেইটি যেন জীবাত্মার বিশ্রাম-স্থান। নিম্নদিকে পরিধির যে স্থানে ঐ রেখা আসিয়া মিলিবে, সেইটি যেন পার্থিব জীবনের মধ্যবয়স। ঐ বিশ্রামস্থল হইতে জীবাত্মা ক্রমেই নিম্নগামী হইয়া স্থূল হইতে ক্রমেই স্থূলতর হইতে হইতে পরিশেষে উপরি-উক্ত রেখা-চিহ্নিত পার্থিব জীবনে প্রকটিত হয়, অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করে। আবার ক্রমেই উহার ঊর্ধ্বগতি হইতে থাকে। পরে রেখা-চিহ্নিত পরিধির অপর স্থলটি, অর্থাৎ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্মজগতের ভিন্ন ভিন্ন স্তর অতিক্রম করিতে করিতে, যেন সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্মতর হইতে হইতে পরিশেষে সেই বিশ্রামস্থলে যাইয়া পুনর্মিলিত হইয়া থাকে। এই মহাভ্রমণের পূর্বে জীবাত্মা এই বিশ্রামস্থলে অর্থাৎ কারণশরীরে বিদ্যমান থাকে। তাহার কিয়দংশমাত্র এইরূপ গতাগতি করিয়া শেষে সেই কারণশরীরী মূল আত্মার সহিত সংমিলিত হয়। বৃত্তের দ্বারা বুঝাইবে ব্যাপারটা ঠিক বুঝান হয় না ; কেন না, আরোহণ অপেক্ষা অবতোরণ-গতিটি দ্রুত হইয়া থাকে। বৃত্ত কল্পনা করিয়া সমান সমান ভাগ বুঝিয়া লইলে ঐ আরোহণ-অবতোরণ সময়ের তারতম্য ধরা পড়ে না। ঠিক বৃত্তাকার না হইলেও জীবাত্মা যে ভ্রমণে বহির্গত হইয়া বক্রভাবে ঘুরিয়া পুনরায় আবার সেই স্থানে যাইয়া মিলিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর এই বক্রগতিতে কোন প্রকার কোণ নাই। সে গতিটি

একটি সুশৃঙ্খল শ্রেণী কি না progression স্বরূপ। আকস্মিকভাবে এ গতির একটা দিক্-পরিবর্তন ঘটে না।

আচ্ছা, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, জীবাত্মার ঐ ভ্রমণ-কক্ষটি বৃত্তেরই অনুরূপ, তাহা হইলে ঐ বৃত্তের কতটুকু অংশ সূক্ষ্মজগতে আর কতটুকু অংশই বা স্থূলজগতে অবস্থিত? সামান্য একটু হিসাব করিলেই দৃষ্ট হইবে যে, জীবাত্মার ইহলৌকিক জীবনপথেব ৩০ ভাগের এক ভাগমাত্র। অনেক স্থলে তার অপেক্ষাও অল্প। যখন আমরা এই তথ্যটুকু পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি, কেবল তখনই স্থূজগতের সহিত সূক্ষ্মজগতের কতটুকু অনুপাত, তাহা আমরা অল্প অল্প হৃদয়ঙ্গম কবিতে আরম্ভ করি। বর্তমান যুগ পৃথিবীর ইতিহাসে একটা উন্নতির অব্দ-প্রবর্তক কাল। তত্রাচ উপবি-উক্ত ধাবণা ব্যতীত সূক্ষ্মজগতেব ব্যাপার বুঝিবাব যো নাই।

জীবাত্মার ভ্রমণ বৃত্তে একটি প্রয়োজনীয় বিন্দু

সূক্ষ্ম-জগৎ ও স্থূল-জগতের মাঝামাঝি যেন একটি সবল রেখা টানা আছে। ভ্রমণবৃত্তের ২৯ ভাগ যেন রেখাটির উর্ধ্বদিকে সূক্ষ্মজগতে অবস্থিত। অপর এক ভাগ যেন উহার নিম্নদিকে স্থূলজগতে বিন্যস্ত। ঐ সরল রেখাটি বৃত্তটিকে যেন দুইটি স্থানে ছেদ করিয়া গিয়াছে। একটি স্থানে যেন জীবাত্মার জন্ম, অপব স্থানে যেন উহার মৃত্যু সূচিত হইতেছে। বৃত্তের ঐ ছেদ-বিন্দু দুইটিই যে খুব প্রয়োজনীয়, তাহা নহে। বহং যে বিন্দুটি ঐ ছেদবিন্দুদ্বয় হইতে সমদূরবর্তী ও বেখাচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রতর পরিধির মধ্যে অবস্থিত, সেইটিই সমধিক প্রয়োজনীয়। এই বিন্দুটি হইতে সমগ্র কক্ষটির কেন্দ্রেব ভিতর দিয়া সরল রেখা অঙ্কিত করিলে কক্ষটি কি না বৃত্তটি দ্বিভাগে বিভক্ত হয়। এই সরল রেখা উর্ধ্বদিকে পরিধিকে যে বিন্দুতে ছেদ করে, সেখানে জীবাত্মার আদি স্থান কল্পনা কবিতে হইবে। তাহা হইলে দৃষ্ট হইবে যে, পূর্বকথিত সমাধিক প্রয়োজনীয় বিন্দুটি ঐ উর্ধ্বস্থ বিন্দু কি না জীবাত্মা হইতে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী বিন্দু অতিক্রম করিলেই ভ্রমণ-কক্ষের বক্রগতি নিম্নাভিমুখী না হইয়া উর্ধ্বমুখী হইতে থাকে। চিত্রস্থ ঐ সমধিক প্রয়োজনীয়—ঐ সর্বাপেক্ষা দূববর্তী বিন্দুটি মানব-জীবনের একটি গুরুতর সমস্যা-নির্দেশক স্থল। জীবাত্মা ঐহিক জীবনের ঐ বিন্দুতে আসিলে তাহার বৈরাগ্যের ভাব দেখা দেয়, পার্থিব ব্যাপারে তখন সে আর জড়িত থাকিতে চাহে না, তখন তাহার চিন্তা উচ্চতর বিষয়াভিমুখে প্রধাবিত হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টতইঃ বুঝা যাইতেছে যে, ঐ বিন্দুটি তাহার জীবন-বৃত্তের পার্থিব জন্ম-মরণ-বিন্দু অপেক্ষাও গুরুতর ; কেন না, ঐ স্থলেই জীবাত্মার বহির্বাশক্তির পরাকাষ্ঠা ঘটে—ঐ স্থলেই চিত্তবৃত্তি বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগত প্রত্যাবর্তন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অতএব স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, যদি উপরি-উক্ত (জীবাত্মার) ভ্রাণকক্ষটির পরিক্রমা বেশ সমানভাবে ব্যবস্থাপিত হয়, তবে প্রোক্ত পরিবর্তন অর্থাৎ জীবাত্মার বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতের প্রতি আসক্তি পার্থিব জীবনের ঠিক মধ্যভাগেই ঘটিযা থাকে। একটি গ্রহ স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে কক্ষের সর্বোচ্চ স্থানে অর্থাৎ সূর্য হইতে চরম দূরে যাইয়া পড়ে। গ্রহের ঐ গতিটি বেশ ক্রমান্বয়ে হইতে থাকে। তদ্রূপ মানুষও ক্রমে ক্রমে বিষয়াসক্তির চরম স্থানে আসিতে থাকে। সে নিজেও ততটা বুঝিতে পারে না যে, তাহার তাদৃশী অবস্থা ঘটিয়াছে। কিন্তু এতদাসক্তির চরম স্থলটি জন্ম-মৃত্যু-বিন্দুদ্বয় হইতে সমদূরবর্তী হওয়া আবশ্যক। প্রাচ্যদেশীয় মনীষিগণ প্রজ্ঞাবলে পার্থিব জীবনের যাদৃশ বিভাগ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, উপর্যুক্ত ব্যাপার

তাহার সহিত সম্পূর্ণরূপে সমঞ্জস। উহাদের ব্যবস্থা এই যে, মনুষ্যকে প্রথম ২১ বৎসর শিক্ষায় ও দ্বিতীয় ২১ বৎসব গার্হস্থ্য কর্তব্য সম্পাদনে অতিবাহিত করিতে হইবে। তাহার পবে অর্থাৎ ৪২ বৎসর বযসে তাহাব জীবন মধ্যভাগে উপস্থিত হইবে। তখন যাবতীয সংসার-চিন্তা ত্যাগ কবিযা, পুত্রেব হস্তে গৃহ ও সম্পত্তি ন্যস্ত করিয়া তাহাকে সহধর্মিণী সমভিব্যাহারে নিকটবর্তী কোন স্থানে যাইয়া একটি ছোট কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে হইবে। তথায ২১ বৎসবকাল তাহাকে ধর্মালাপ ও ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত করিয়া শান্তি ভোগ করিতে হইবে। ইহার পরে জীবনেব চতুর্থ ভাগের সূত্রপাত। এতদবস্থায় উপনীত হইলে মানুষ ইচ্ছা করিলে সংসাব-সংস্রব সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া ভগবচ্চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতে পাবে। কিন্তু জীবনেব মধ্যস্থলটিই প্রকৃত নিবৃত্তিস্থান। প্রাচীন পেরুবাসীরাও মনে কবিতেন যে, ৪৫ বৎসব বয়সে যাবতীয সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া মানুষ অভীপ্সিত বিষয়ে মনোনিবেশ কবিতে সমর্থ হয়।

পাশ্চাত্য জগতে জীবন-ধারণ ব্যাপাবটা এতই অস্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে যে, বার্ধক্যেও তত্রত্য মনুষ্যগণ সাংসাবিক কার্যনিচয়েব ঝঞ্ঝাট ও প্রতিযোগিতাব মহা আগ্রহের সহিত ব্যাপৃত থাকে। তাই তাহাদেব পার্থিব জীবনেব বিভাগ সুস্থতাহীন ;তাই তাহাদেব জীবন-যন্ত্রেব কলকতা অসংলগ্ন। চবিত্রের নির্মলতা সম্পাদন ও বৈরাগ্য-সাধন মধ্যজীবনেই অনুষ্ঠেয়। এতদ্ব্যাপাবে লিপ্ত না হইতেই পাশ্চাত্যগণকে মৃত্যু আসিযা আলিঙ্গন কবে। কাজে কাজেই তাঁহাদিগকে ঐ কার্য্য ভূ-লোকেব পবিবর্তে ভূবর্লোকে যাইয়া সম্পাদন কবিয়া লইতে হয। ইহাতে উন্নতিব পথে অনাবশ্যক বিলম্ব ঘটে। জীবন-ব্যাপাবেব যথার্থ তাৎপর্য্য অপবিজ্ঞাত থাকায় মানুষের উন্নতি এইরূপ মন্থবগতি হইয়া থাকে।

জ্ঞানের উপকারিতা

ঐ সকল তথ্য অবগত না থাকিলে মানুয পার্থিব জীবনে বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইযা থাকে। পাবলৌকিক জীবনে তাহার ক্ষতির পবিমাণ আরও অধিক। অতএব যিনি এই গুহ্য-তত্ত্ব-বিষয়িণী শিক্ষার অনুভূতি কিঞ্চিন্মাত্রও কবিতে পারিযাছেন, তাঁহাবও বিপুল লাভ। তখন তিনি পার্থিব জীবন ও পারলৌকিক জীবনেব পরিমাণ পবিজ্ঞাত হইতে পাবেন। তাই সমগ্র জীবন-বৃত্তের ত্রিশ ভাগের এই এক ভাগের নিমিত্ত কার্য করিযা সমুদয় সময তিনি নষ্ট করেন না। অপর ঊনত্রিশ ভাগ অপেক্ষা না করিয়া বিচক্ষণতাব সহিত জীবন যাপন কবেন। পারলৌকিক জীবনে উপনীত হইলে তিনি ভীত বা বিব্রত হয়েন না। কাবণ. তত্রত্য পাবিপার্শ্বিকনিচয তাঁহার পরিচিত। তিনি উহাদেব মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া উহাদের উপকার গ্রহণেও সমর্থ হয়েন। পারলৌকিক জ্ঞান লাভ করিলে মানুষেব প্রাণে সাহস ও প্রত্যয জন্মে ; ভয ও উদ্‌ভ্রান্ত-ভাব আর থাকে না। এই জ্ঞান তাহাকে পবলোকে ক্ষমতায় ও উপায়-উদ্‌ভাবন-পটুতাগুণে ভূষিত করিয়া তুলে। ইহাব বিহনে তথায সে অবিত্রবিহীন অর্ণবষানেব ন্যায় নিরুপায় হইয়া পড়িত।

ভূয়োদর্শনে জানা গিযাছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বক্তৃতা শুনিতে গিযা পাঁচ কথার মধ্যেও ঐ সত্যজ্ঞানের বিষয় শুনিয়া থাকেন, উহাবা সত্যতা তাঁহাব প্রাণে সুস্পষ্টরূপে মুদ্রিত হইযা যদি তাঁহাকে ঐ তথ্যানুসরণে উদ্‌বুদ্ধ না-ও কবে, তথাচ তাঁহার বিপুল লাভ ঘটিযা থাকে। এরূপ ব্যক্তি পার্থিব জীবনে পূর্ণ পারলৌকিক জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ পাইয়া উহা উপেক্ষা

করিলেও পারলৌকিক জীবনে যাইয়া তাঁহার মনে পড়ে যে, তিনি পার্থিবদেহে এক দিন এবম্প্রকার অবস্থাবিষয়ক জ্ঞানের আলোচনা শুনিযাছিলেন। তখন তিনি বুঝিতে পাবেন যে, সেই বক্তা প্রকৃত কথাই বলিয়াছিল। পারলৌকিক জীবনে কিরূপ আচরণ অনুষ্ঠেয় বলিযা সেই বক্তৃতায় উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তখন তিনি তাহাই স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত কবেন। কারণ, তিনি তখন উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সমর্থ। এইরূপে পৃথিবীর সহিত তাঁহাব একটি সম্বন্ধসূত্রও থাকে। যাঁহার পাবলৌকিক জ্ঞানে একেবারে বঞ্চিত, তাঁহাব মৃত্যুর পব যেন অকূল সমুদ্রে বাযু-বিতাড়িত হইয়া চলিতে থাকেন, তাঁহাব পরিচিত যাবতীয় ভূ-সীমাই যেন অন্তর্হিত হইযা যায়। তখন তাঁহাদেব মনে অব্যক্ত ও নিবাকাব ভযের সঞ্চার হওযার একটা ভযঙ্করী উৎকণ্ঠা আসিয়া দেখা যায। উপরি-উক্ত ব্যক্তিকে এই উৎকণ্ঠা ভোগ কবিতে হয় না।

পবলোক সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ কবিতে পাবিলে মৃত্যুব পব বিব্রত হইয়া পড়িব না বলিয়া অনেকটা ভবসা ও বিশ্বাস থাকে। এইটুকুই যে একমাত্র লাভ, তাহা নহে। যিনি ঐ তথ্য অবগত হয়েন, তিনি অপরেব প্রতিও সাহায্যেব হস্ত প্রসাবণ কবিতে সমর্থ হইযা থাকেন। যাহাবা সম্প্রতি ইহলোকেব সীমা অতিক্রম কবিযা অ-দৃষ্ট জগতে প্রবেশ কবিয়াছে এমন শত শত ব্যক্তিব পক্ষে তিনি সুখ ও শান্তির কেন্দ্রস্বরূপ হইযা উঠিতে পাবেন। এই পবোপকার ও সুখশান্তিব বিধান প্রভৃতি কার্যেব সম্পাদনে তাঁহাব নিজেবও বিপুল পুণ্যকর্মেব নবীন অনুষ্ঠান হইযা থাকে। ইহাতে তাঁহাব স্বীয ক্রমোন্নতি প্রভূত পবিমাণে বৃদ্ধি পায।

বিলাপ ও শোককরণ

মৃত্যু-সম্বন্ধীয এই প্রাথমিক ভ্রমগুলিব নিবসন ও উহাব প্রকৃত তথ্যের উদঘাটন হইলেই প্রতীতি জন্মে যে, মৃত্যুজনিত শোককবণপ্রথা সর্বতোভাবে ঘোব নিরর্থক। প্রথানুসাবী শোককরণের যাবতীয বিকট ও কিম্ভূত বসন-ভূষণ শুধু যে অসঙ্গত কালব্যতিক্রমের আনুষঙ্গিক ব্যাপাব, শুধু যে মধ্যযুগের কুসংস্কারে ইতব উর্ধ্বর্তন, তাহা নহে। কিন্তু ঐ সকল বসন-ভূষণেব ব্যবহারে যথেষ্ট শোক প্রকাশ করা হইল, এইরূপ একটা বালকবৎ ধাবণা জন্মে। এই অতিরঞ্জিত দুঃখ একটিসাংঘাতিক ভ্রম। অতি ঘোর অজ্ঞতা ও অবিশ্বাস ও অবিশ্বাস হইতেই এই ভ্রমের উদ্ভব হইযা থাকে। যে খৃস্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তি বিশ্বাস কবেন যে, তাঁহাব প্রিয়বন্ধু ভগবানের সমক্ষে আনন্দের মধ্যে প্রবেশ কবিয়াছে, তিনি সেই বন্ধুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থ কৃষ্ণপোশাক পরিধান বা কৃষ্ণরেখাঙ্কিত চিঠিব কাগজ ব্যবহার করিবেন কেন? একজন প্রকৃত তত্ত্ববিদ্যাবিৎ ঐরূপ কবেন না। তিনি জানেন যে, তাঁহাব আত্মীয মৃত্যুব পব উচ্চতর ও অধিকতর সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ভূবর্লোক ত্যাগ করত স্বর্লোকে আরও মহীয়ান্ জীবন যাপন করিতে অগ্রসব হইতেছেন।

শুধু ইহাই নহে। আমবা মৃত আত্মীয়েব জন্য যে প্রবল দুঃখ প্রকাশ কবিযা থাকি, একটি সম্পূর্ণ অপবোধই তাহার ভিত্তি। এতাদৃশ শোকে নিত্যন্ত অনাবশ্যক যাতনারাশিই ঘটিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, উহা অপেক্ষাও অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার ঘটে। শোকেব ঐ সকল উৎকট উচ্ছ্বাস, দীর্ঘকালব্যাপী ঐ অতৃপ্ত বিলাপ আমাদিগেব সেই প্রাণপ্রিয় গতাসুআত্মীয়ের ঘোর যাতনা উৎপাদন করিয়া থাকে। মৃত ব্যক্তি স্বভাবতঃ একটি শান্তিময়ী তন্দ্রায হইতেছেন। ইহার পরেই স্বর্গলোকেই ঐশ্বর্যের মধ্যে তাঁহার জাগিবার কথা। এমন সময়ে—এই সুখের তন্দ্রার

মধ্যে আমাদিগের শোক ও বিলাপের ফলে তাঁহাকে বারংবার জাগরিত হইতে হয়। তখন পার্থিব জীবনের সুস্পষ্ট স্মৃতি তাঁহার মনে উদয় থাকে। আমরা যতই শোক করি, সেই শোকের একটা ঐক্য-সম্পন্ন পরিস্পন্দ তাঁহার সূক্ষ্মশরীরে ততই অনুভব হইতে থাকে। ইহার ফলে তিনি একটি সুতীক্ষ্ণ অশান্তি ও সুদীর্ঘ অবসাদ অনুভব করেন। তাহা ছাড়া তাঁহাব অগ্রবর্তী প্রয়াণ পক্ষে ইহাতে দারুণ বিলম্ব ঘটে। যাঁহারা মৃত ব্যক্তির শুভ কামনা করেন, সংযমাভাব তাঁহাদিগের ঘোর পরিপন্থী। বহুক্ষণ ধীরভাবে চেষ্টা না করিলে তাঁহার প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন না। যাঁহারা পৃথিবীতে জীবিত থাকিয়া শোক করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য শুভ হইলেও তাঁহার অজ্ঞ। তাঁহাদের প্রবল শোকে মৃত আত্মীয়েরা যথেষ্ট বিব্রত হইয়া পড়ে। এ সম্বন্ধে পরে কয়েকটি গল্প বলা যাইবে। ইংলণ্ডের কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ গল্পগুলি প্রচলিত আছে।

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে যেন কেহ এরূপ অনুমান না করেন যে, স্নেহপরায়ণ বিয়োগ-বিধুর ব্যক্তিবর্গের উপর পরাবিদ্যাবিদ্‌গণের সহানুভূতি নাই, কিম্বা তাঁহার মৃত আত্মীয়গণকে ভূলিয়া যাইতে পরামর্শ দিতেছেন। তাঁহাদের পরামর্শের যথার্থ তাৎপর্য এই যে, মৃত আত্মীয়গণেৰ স্মৃতি প্রাণে এরূপভাবে জাগরিত রাখিতে হইবে, যেন তাহা অনিষ্টকর না হইয়া ইষ্টকর হয়। তাঁহাদের উপদেশেব তাৎপর্য এই যে, স্বার্থজৃম্ভিত অকার্যকর দুঃখের পরিবর্তে একাগ্র ও স্নেহসিক্ত শুভ বাসনাগুলিকে মৃত আত্মীয়ের উদ্দেশে হৃদয়ের পোষণ করাই আমাদিগের উচিৎ। উপদেশচ্ছলে তাঁহার শোকার্ত ব্যক্তিকে বলেন, তোমার চিন্তাকে উচ্চতর সমতলে উত্থিত কর—আপনাকে ভুলিয়া যাও, আত্মীয়বিয়োগজনিত তোমার বাহ্য ক্ষতির ভ্রম বিস্মৃত হও। তাহা হইলে তোমার মৃত আত্মীযের মহোপকারের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি পাইবে, সন্দেহ নাই।

মৃত্যু সম্বন্ধে আর একটি ধারণা আছে। সেটি বড়ই প্রশস্তভাবে বিস্তৃত। ধারণাটি এই যে, মৃত্যুব্যাপারটি নিতান্ত যাতনাপ্রদ। মৃত্যুকালীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আক্ষপ-বিক্ষেপ ও গলার ঘড়ঘড়ানি সম্বন্ধে অতি ভীষণ গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সমুদয় গল্প উপরি-উক্ত ধারণার পোষক। ঐ ধারণাটিকে কুসংস্কারমধ্য পরিগণিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে ; কারণ, দেহ হইতে চৈতন্য তিরোহিত হইলেই ঐ সকল ব্যাপার ঘটিতে তাকে। উহা জড় দেহেরই চরমকালীন আক্ষেপিত গতি। প্রায় সর্বত্রই প্রকৃত মৃত্যুব্যাপারটিকে সম্পূর্ণভাবে যাতনাশূন্য বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, যিনি বহুদিন ধরিয়া পীড়ার ভয়ঙ্কর কষ্ট পাইয়া আসিতেছেন, ঠিক মৃত্যুর সময়টিতে তাঁহারও কষ্ট থাকে না। মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তির মুখ-শ্রীতে দিব্য শান্তির ভাব প্রকাশ পায়। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, মৃতব্যাপারটি যাতনাদায়ক নহে। তাহা ছাড়া বিস্তর মৃত ব্যক্তিকে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই—মৃত্যুর স্মৃতি তাঁহাদের অন্তরে সম্পূর্ণরূপে জাগরূপ থাকিতে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গিয়াছে যে, উহা দঃখজনক নহে। তাঁহাদের কথাও এ সম্বন্ধে জ্বলন্ত প্রমাণ।

উচ্চতর বাস্তবিকতা

আমাদিগের প্রত্যেকের জীবন-বৃত্তের কত ক্ষুদ্র অংশ আমরা এই ভূলোকে যাপন করি, তাহা যদি আমরা সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেও পারি, তবুও সমগ্র জীবনের সহিত তুলনায় পার্থিব জীবনের ক্ষুদ্রত্বটুকু ধারণা করিতে আমরা যথার্থরূপে সমর্থ হই না। যথার্থরূপে ঐ ধারণাটি করিলে হইলে সূক্ষ্মজগতের জীবনের বাস্তবিকতা যে খুব উচ্চতর, তাহা আমাদিগকে বুঝিতে

হইবে ও সতত স্মরণ করিয়া চলিতে হইবে। এই কথাটি অতীব প্রয়োজনীয়। ইহার প্রয়োজনীয়তা শত মুখে বলিলেও বলা হয় না। কারণ, এখন ও অধিকাংশ ব্যক্তি স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রামের এমনই শাসনাধীন যে, তাঁহারা অপ্রকৃত ঘটনাবলীকে প্রকৃত ও প্রকৃত ব্যাপারকে একেবারে অলীক, দুর্বোধ্য বলিয়া মনে করেন।

সূক্ষ্মজগৎকে তাঁহারা কাল্পনিক জগৎ বলিয়া থাকেন। এরূপ বলিবার তাঁহাদের হেতু আছে। কাল্পনিক হইলেও উহা জড়জগৎ অপেক্ষা এক ধাপ উচ্চতর, সুতরাং বাস্তবিকতার একধাপ নিকটে। ভ্রমাত্মক বস্তু সূক্ষ্মজগতে বিস্তর থাকিলেও থাকিতে পারে ; কিন্তু ভূলোক-সম্ভব স্থূলতর অবগুণ্ঠনে আবৃত হইলে ঐ সকল বস্তুর মিথ্যাত্ব অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। মানবাত্মার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও সর্বগ্রাসিনী। সূক্ষ্মদেহযুক্ত জীবাত্মার দৃষ্টি ঐরূপটি না হইলেও উহা অন্ততঃ স্থূল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ও অধিকতর নির্ভরযোগ্য। জড়জগৎ অর্থাৎ ভূর্লোক অপেক্ষা ভুবর্লোক উচ্চতর ; ভুবর্লোক অপেক্ষা স্বর্লোক উচ্চতর। জীব ভূর্লোক অপেক্ষা ভুবর্লোকে ও স্বর্লোকে অধিক দিন অবস্থান করে। শুধু তাহাই নহে। ঐ সকল সূক্ষ্মজগতে অবস্থানকালে জীব এত বেশী কাজ করিতে সমর্থ হয় যে, পৃথিবীতে বাস করিবার সময় সেই সময়ের মধ্যে তাহা দ্বাবা তত বেশী কাজ হওযা অসম্ভব।

পার্থিব দেহের প্রয়োজনীয়তা

উপরি-উক্ত তথ্য এতই সত্য ও সুস্পষ্ট যে, উহাব গুরুত্বেব সহিত তুলনা করিতে গেলে পার্থিব জীবন তুচ্ছ ও উপেক্ষণীয় ব্যাপার বলিয়া অনুমতি হয়। কিন্ত পার্থিব জীবনেরও একটি উপযোগিতা আছে। পার্থিব দেহের জড়াংশ অধিকতর স্থূল ও গুরু। ইহার স্পন্দন-বেগ সুমন্থর। আমবা বিবর্তনের যে বর্তমান ক্রমে উন্নীত হইয়াছি, তাহাতে ঐ সুমন্থর পরিস্পন্দের সাহায্যে আমরা বিস্তর বিষয় শিক্ষা করিয়া লইতে পারি। এই হিসাবে পার্থিব জীবন আমাদিগের প্রয়োজনীয়।

এতদ্বিষয়ে আবও দুই একটি কথা এখানে বলা সঙ্গত মনে হয়। নচেৎ কুসংস্কার অপনোদনার্থ আমরা পরে কিছু বলিতে গেলে লোকে হয় ত আমাদিগের কথার যথার্থ তাৎপর্য পরিগ্রহ করিতে অসমর্থ হইবে। কোন কোন ব্যক্তি এরূপ ভাবেন যে, যখন মৃত্যু একটি উৎকৃষ্টতর জীবনের দ্বাবস্বরূপ, আর উহা যখন সুন্দর ও বাঞ্ছনীয ব্যাপার, তখন আমাদিগের উহা পরিহার করিতে চেষ্টা করিবার প্রয়োজন কি? আর পার্থিব জীবনটাকে রক্ষা করিবার জন্যই বা এত আয়াসস্বীকার কেন? বাস্তবিকই উপরি-বিবৃত ব্যাপারে মনে হয় যে, মানুষ যত সত্বর মরে, ততই মঙ্গল। উপরি-উক্ত স্থান যেন আত্মহত্যার প্রশ্রয়দাতা। যদি আমরা মাত্র আমাদিগের নিজের কথা, মাত্র আমাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা করিয়া থাকি, তবে ঐরূপ চিন্তা বাস্তবিকই আসিতে পারে। কিন্তু ভগবৎসমীপে ও অন্যান্য মানবগণের নিকটে আমরা যে কর্তব্যসূত্রে আবদ্ধ আছি, তাহা যদি চিন্তা করি তাহা হইলে আর ঐ সকল কূট তর্ক মনে স্থান পায় না।

যিনি এই পৃথিবীতে চরিত্রবান্ হইয়া নানা প্রকার শুভকার্য সম্পাদন করত জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার পারলৌকিক জীবন আরও সুখের, আরও পূর্ণাঙ্গ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগকে পার্থিব জীবনেরও একটি উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যের সিদ্ধি—মাত্র এই স্থূল পৃথিবীতেই সম্ভবপর। আত্মরক্ষা-প্রবৃত্তি অতীব

কল্যাণময়ী। ভগবান্ আমাদিগের হৃদয ঐ প্রবৃত্তি প্রদান কবিয়াছেন। ঘটনাপুঞ্জের ঘাত-প্রতিঘাতে যতদূর সম্ভব, পার্থিব জীবনটাকে বক্ষা করিয়া উহাব চরম উপভোগ কবা আমাদিগেব কর্তব্য। আমবা স্থূলজগতে এমন সকল শিক্ষালাভ কবিত পাবি, যাহা অন্যত্র শিখিবাব উপায নাই। যত শীঘ্র আমবা এই সকল বিষয অধিগত করিতে পাবি, ততই আমাদিগের মঙ্গল। কারণ, উহা অবগত হইলে এই সংকীর্ণ নিম্নস্থ জীবনে প্রত্যাবৃত্ত হইবাব আমাদিগের আব আবশ্যক হইবে না। বর্তমানে ভূলোকই আমাদিগেব বিবর্তেব প্রধান বঙ্গালয। এখানকার অবস্থানিচয স্থূল ও অনভিলষিত হইলেও মাত্র উহাদিগেব সাহচর্যে বিস্তব প্রযোজনীয় উন্নতি করিয়া লওযা যাইতে পারে। বহিবাগত সংঘাত সাড়া দিবাব নিমিত্ত যদি আমরা আমাদিগেব ভিতরে একটা স্পন্দন জাগাইতে শিক্ষা কবিতে পাবি, তবেই আমাদেব অন্তর্নিহিত গুণগ্রামেব বিবর্ত সংসাধিত হইবে। নিদ্রিত গুণেব বিকাশসাধন পক্ষে এইটি প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু জিবাত্মা যে সমতলে অবস্থিত, সেখানে স্পন্দননিচয অতীব সূক্ষ্ম ও দ্রুত। সে স্পন্দন উপবি-উক্ত বহিবাগত স্পন্দনেব সাড়া দিতে পাবে না। বর্তমানে ঐরূপ সাড়া দেওয়া অসম্ভব। ঐরূপ সাড়া দিবাব স্পন্দন প্রাণে জাগাইতে হইলে, যাহা স্থূলতর ও দৃঢতব, সেই সমুদায বস্তু লইযা আবম্ভ কবিতে হইবে। এইরূপ কবিতে কবিতে উহাদেব সাহায্যে নিদ্রিত বৃত্তিনিচয ক্রমে ক্রমে উদ্‌বুদ্ধ হওযায আমবা সহজ বিকার্য হইযা উঠিতেপাবি। এবম্প্রকার উপাযে আমবা যাবতীয ক্ষেত্রেব যাবতীয প্রকাব স্পন্দনে সাড়া দিতে সমর্থ হই। এতদবস্থায সকলের উপবেই আমাদর পূর্ণ সহানুভূতি ও অনুকম্পা নিঃসৃত হইযা থাকে। এই মহীযসী অবস্থায উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে ভূলোকেই সাধনা আরম্ভ কবিতে হইবে। প্রতি জন্মেই জীবাত্মাকে আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞানালাভার্থ প্রস্তুত হইতে বিশেষরূপে আয়াস স্বীকাব করিতে হয। বিশেষতঃ প্রতিজন্মেই বাল্যকালটি বড়ই কষ্টকব, কেন না, বহু কষ্ট স্বীকাব কবিযা ঐ সময নবীন স্থূলদেহেব উপব অধিকাব-বিস্তাব কবিতে হয। সুতবাং বহু পবিশ্রম কবিযা যখন আমবা স্থূলদেহ ও অন্যান্য কযেকটি দেহকে আয়ত্তেব মধ্যে আনযন কবি, তখন ঐগুলিকে যত্নপূর্বক বক্ষা কবিযা উহাদিগকে যথাযথ উপভোগ কবাই আমাদিগেব কর্তব্য। তাহাতে আমাদেব স্বার্থও আছে। ('মহতী বিধি') যত দিন না আমাদিগকে দেহত্যাগ বাধ্য কবে, তত দিন নিশ্চযই কাহাবও দেহ ত্যাগ কবা কর্তব্য নহে। তবে একটি কথা এই যে, যদি কোন উচ্চতব বাধ্যকাবী কর্তব্যেব আহ্বান আসিযা পড়ে, তবে সে ক্ষেত্রে দেহপাত বাঞ্ছনীয। স্বদেশবক্ষার্থে সৈনিকেবা এইরূপে বণশয্যায শাযিত হইযা থাকে।

অতএব নিরূপিত সময় না আসিলে কাহাবই মরিতে সাহসী হওযা উচিত নহে। কিন্তু মৃত্যুকাল আসিযা উপস্থিহ হইলে আমাদিগেব আনন্দিত হওযা কর্তব্য, কেন না, তখন আমবা শ্রমেব ক্ষেত্র হইতে বিশ্রামেব নিকেতন—তমিস্রা হইতে আলোক, সসীমত্ব হইতে অসীমত্বে উপনীত হইতে উদ্যত। তখন আমাদেব প্রাণে উল্লাসেব ফোযারা স্ফুবিত হওয়া উচিত। কবি তাই বলিযাছেন ঃ—

"প্রাণেব উল্লাস, আত্মাব প্রকাশ,
ত্যাজ যবে দেহ-কাবাগাবে ,
ভূ-চিহ্ন-নিচয়, ছাড়ি সমুদয,
যেন চলি যায পাবাবারে।"

যে সকল কথা বলা হইল, সে সমুদয পাবলৌকিক জীবনেব ঐশ্বর্যের পার্শ্বে হীনপ্রভ বলিয়া প্রতীত হয। স্বর্লোকের সুখৈশ্বর্য অতি চমৎকাব ভুবর্লোক প্রায়শ্চিত্তভূমি ; স্বর্লোক

অক্ষয়, আনন্দের নিকেতন। সাধু-সন্ন্যাসীরা এই আনন্দেরই সুখস্বপ্নে পুলকিত থাকেন। এই আনন্দই কবিদিগেব সঙ্গীত তরঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া উঠে। মোটের উপর এই আনন্দটি স্বপ্নের ন্যায় অলীক নহে। উহা সজীব ও মহীয়ান্ সত্য। পার্থিব জীবনের কর্মানুসারে পারলৌকিক জীবন কাহাব কাহাব ভাগ্যে সুখের ও কাহার কাহার পক্ষে দুঃখের হইযা থাকে। আমাদের সকলকেই পারলৌকিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। পারলৌকিক জীবন অর্থে এখানে ভূবর্লোকের কথা বুঝিতে হইবে। ভূবর্লোকের পরবর্তী স্থানে অনন্ত সুখ। সকলেই সেই সুখের অধিকারী সে সুখ সকলেবই হৃদয়গ্রাহী। পববর্তী অধ্যায়ে সে সুখেব কথা বলা হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, স্থূল ইন্দ্রিয়যুক্ত মানব সূক্ষ্মজগতে কার্য কবিবার মত উন্নত হইতে এখনও সমর্থ হয় নাই। অন্ততঃ খুব বেশী লোকই সে শক্তি লাভ কবিতে পারে নাই। স্থূল ইন্দ্রিয়যুক্ত হইয়া মানুষ মাত্র কযেকটা নির্দিষ্ট দিকে উন্নতি করিয়া থাকে। কিন্তু আত্মার সম্যক্ চৈতন্য-সম্পাদন ঘটাইতে পারিলে স্থূলদেহেই মানুয উচ্চতর জগতের কার্য-কলাপ করিতে পারে। পার্থিব জীবন ছাযা-চঞ্চল হইলেও ইহাকে এক অর্থে বপনকাল বলা চলে ; কেন না, এই পার্থিব জীবনেই আমবা এমন সকল শক্তিপুঞ্জের সূত্রপাত করিতে পারি, যাহার ফল উচ্চতর জগতের উৎকৃষ্টতব অনুকূল ও ফলপ্রসবিনী অবস্থাব অধীনে আমাদিগের ভোগে আইসে।

এই কথাটিতে উপবি-উক্ত কথাগুলি রূপান্তরিত হইল, ইহা যেন কেহ মনে না করেন। উপবে পূর্বে বলা হইযাছে যে, সত্য সত্যই ভুবর্লোক, স্বর্লোক প্রভৃতি সূক্ষ্মজগৎ বিদ্যমান আছে ও সেগুলি ভূলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। আব একটি মহান্ সত্যেব ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মৃত্যু সকলেব পক্ষেই বস্তুতঃ উৎকৃষ্টতব জীবনে প্রবেশ কবিবাব দ্বাবস্বরূপ। মৃত্যু আমাদিগকেযে স্থান লইয়া যায, সেখানকাব সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের তুলনায় আমাদিগের পরিজ্ঞাত বর্তমান সৌন্দার্যাদি অতীব অকিঞ্চিৎকব। এই সকল তথ্যের কোন প্রকাব রূপান্তর করা হইতেছে না। আমবা মৃত্যুর দ্বার দিযা যখন যাই, তখন আমাদিগের সম্মুখে অনেকগুলি আবরক পর্দা আসিয়া পড়ে ; অন্ততঃ খুব একটা নিবিড কৃষ্ণবর্ণের আবরণ সম্মুখে ঝুলিয়া পড়ে। যিনি সৌন্দর্য্য ও মহিমার প্রতিকৃতি, জীবন ও মৃত্যুব সেই সর্বব্যাপী নিয়ন্তা শ্রীভগবানের নিকট হইতেই ঐ আববণ আসিয়া দাঁড়ায়।

পাবলৌকিক জীবন সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। এই সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা বড়ই সাংঘাতিক। ভূবর্লোক, স্বর্লোক প্রভৃতি উচ্চতর জগৎগুলি বাস্তবিকই আছে। জডজগৎ অপেক্ষা উহাদের বাস্তবিকতা অধিকতর, এই মহান্ সত্য যিনি হৃদযঙ্গম কবিতে পাবিয়াছেন তাঁহার আর ঐ সাংঘাতিক সংশয় থাকে না। পাশ্চাত্য ভূ-ভাগেব অধিকাংশ ব্যক্তি এত দিন ধরিয়া ঐ নিরুপায সংশযে কিষ্ট ছিলেন। জীবনের ব্যবহার ও সার্থকতাব যথার্থ উপলব্ধি পক্ষে ঐ সংশয় অপেক্ষা ভীষণতর শত্রু আর নাই। দুর্বুদ্ধিদিগের হস্তে উহা অপেক্ষা দৃঢতব শাস্ত্র আর নাই। যিনি পরা-বিদ্যা আলোচনা করিয়া থাকেন, ঐ সকল তথ্য অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে আদৌ কঠিন নহে। পরাবিদ্যা সমিতির সভ্যমাত্রেই ঐ সকল তথ্যের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকৃত ঘটনাবলী

মানুষের অন্তরে কতকগুলি নিদ্রিত বৃত্তি আছে। উহাদের সাহায্যেই সূক্ষ্মজগতের সুস্পষ্ট অনুভূতি ঘটে। পূর্বে এতদ্বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে। এই পার্থিব জীবনের বস্তুনিচয় আমাদিগের যেমন স্পষ্ট জ্ঞানের বিষয়ীভূত, উপরি-উক্ত অপ্রবুদ্ধ বৃত্তিগুলিব সাহায্যে পারলৌকিক জীবনও তদ্রূপ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অবগত হইতে সমর্থ হইযা থাকে। পরা-বিদ্যা অনুশীলনকারী কতিপয় ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ঐ সকল আন্তর বৃত্তিব উন্মেষসাধন করিযাছেন। পরলোক সমন্ধে এই অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁহারা যথাযথ সংবাদ দিতে সমর্থ, বিবেচনা করা যায়। পরলোকের যথাযথ সংবাদ দিবার সামর্থ বড়া সহজ ব্যাপার নহে। পাশ্চাত্য ধর্মসম্প্রদায়েব কোন প্রাচীন আচার্যই তাদৃশ সামর্থেব গর্ব করিতে পাবেন না ; তাঁহারা পবলোক সম্বন্ধে এক একটা মত প্রকাশ করিতে পারেন মাত্র। স্ব স্ব উক্তিব সমর্থনের নিমিত্ত এই বলিতে পারেন যে, আমাদের ধর্মগ্রন্থে এই কথা আছে, বাইবেলে এইরূপ উপদিষ্ট হইযাছে, ইত্যাদি। কিন্তু কোন আচার্য্যই আমাদিগের সমক্ষে এইরূপ বলিত সমর্থ নহেন যে,—"আমি তোমাদিগেব নিকটে স্বর্গ বা নরকের বর্ণনা করিতেছি, আমি নিজে তথায় গমন করিয়াছিলাম। আমি উহা দেখিয়া আসিয়া বলিতেছি যে, উহা যথার্থ ব্যাপার।" কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌গণ বাস্তবিকই ঐরূপ বলিতে সমর্থ। কারণ, তাঁহারা যাহার বিবৃতি করেন, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই বিষয়েই আলোচনা করেন। সেই জন্যই তাঁহদিগের কথা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে ; তাঁহাদের কথাগুলি প্রত্যক্ষজ্ঞানসম্ভূত। তাঁহারা এতই নিঃসংশয় যে, পারলৌকিক ব্যাপারের বিবৃতিকালে তাঁহারা এরূপও বলিয়া থাকেন ঃ—"আমাদিগের কথা যদি তোমাদিগের নিকট সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত না হয়, তবে মাত্র আমাদের কথায় তোমবা সন্তুষ্ট থাকিও না ; ঐ সকল ব্যাপাব পরিজ্ঞাত হইবার পক্ষে তোমাদিগকের সমক্ষে বিস্তর পন্থা উন্মুক্ত রহিয়াছে ; তেমরা নিজে উহার সাহায্যে যথাসাধ্য উত্তমরূপে ব্যাপারগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। তাহা হইলে তোমরাও আমাদিগর ন্যায় অপরের নিকট এইরূপ দৃঢ়তাব সহিতই মন্তব্য প্রচার করিতে সমর্থ হইবে।"

মৃত্যুর পর জীবের কিরূপ অবস্থা দাঁড়ায়, সে সম্বন্ধে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে। কিন্তু অনুসন্ধানে যে অপরটিকে বাস্তবিক বলিয়া বুঝা গিয়াছে, তাহা ঐ সকল প্রচলিত মতের অধিকাংশ অপেক্ষাই সঙ্গত। এরূপ দেখা যায না যে, মরণের পর মানুষের একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটে, কিংবা মরিতে মরিতে সে হাওয়ার মত নক্ষত্রনিকরের পশ্চাতে কোন সুন্দর স্বর্গে চলিয়া যায়। বরং বিপরীতই দেখা যায। মৃত্যুর পূর্বে যেমনটি ছিল, মৃত্যুর পরেও ঠিক সেইরূপটিই থাকে। তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার গুণাবলী ও ক্ষমতা-নিচয় ঠিক একই প্রকার থাকে। পৃথিবীতে জীবিতকালে সে নিজের জন্য যেরূপ অবস্থা প্রস্তুত করিয়াছিল, মৃত্যুর পরে সে ঠিক তদ্রূপ অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। পার্থিব জীবনে সে যে সকল চিন্তা ও বাসনাগুলিকে হৃদয়ে প্রশ্রয়

দিত, সেইগুলি এখন সুস্পষ্ট সজীব প্রাণীর মত মূর্তিমতী হইয়া তাহার চতুর্দিকে অবস্থান করিয়া তাহাকে উত্তেজিত করিতে থাকে। সে পূর্বেই ঐ বাসনাগুলিকে যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা যত দিন না ক্ষয় হয়, তত দিন উহাবা ঐরূপে উহাকে জ্বালাতন করিতে থাকে। পৃথিবীতে অবস্থানকালে মানুষ যদি খুব উৎকট কু-চিন্তা ও কু-বাসনা করিয়া থাকে, তবে মৃত্যুর পরে সেগুলি তাহার অতি ভযঙ্করী সঙ্গিনী হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এইটুকু সুখের বিষয় যে, ভুবর্লোকবাসীদেব মধ্যে খুব অল্প লোকেরই এরূপ সঙ্গিনী দেখা যায়। সচবাচর মনুষ্যগণ মৃত্যুর পরে একটা ফাঁকা, নিরর্থক জীবনে অতিবাহিত কবে , এরূপ জীবন এতই বিরক্তিকর যে, বলিয়া বুঝান যায় না। ঈদৃশ জীবনে কোন প্রকার সঙ্গত সার্থকতা নাই। মৃত্যুর পর সাধারণ ব্যক্তিবর্গেব ইহা অপেক্ষা গুরুতর অসুবিধা আর ঘটে না। যাহাবা আত্মসুখে অকিঞ্চিৎকর কার্যে ও তুচ্ছ গল্পগুজবে পার্থিব জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে, মৃত্যুর পরে তাহাদেরই ঐরূপ কষ্টকর জীবন-ভোগ ঘটে।

মৃত্যুর পব মানুষের যে পুবস্কার বা শাস্তি ঘটে, তাহা বহিরাগত নহে। পার্থিব জীবনে সে যেরূপ কার্য করিযাছিল, যেরূপ চিন্তার প্রশ্রয় দিয়াছিল, যেরূপ কথাবার্তা কহিয়াছিল, তদনুরূপ ফলই এখন তাহার ভাগ্যে ফলিবে। বস্তুতঃ মানুষ পার্থিব জীবনে যে শয্যা রচনা করে, মৃত্যুর পবে তাহাকে সেই শয্যার শযন করিতে হয়।

তথাচ মৃত্যুব অব্যবহিত পবেই মানুষেব যে নবীন জীবনেব আরম্ভ হয়, তাহা যে শুধুই পার্থিব জীবনের ফলস্বরূপ, তাহা নহে। কাহাব কাহাব পক্ষে উহা আব একটু বেশী গুরুতর হইয়া পড়ে। কিন্তু সেটুকু সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নিজের দোষেই হইয়া থাকে। ভুলোক অপেক্ষা ভুবর্লোক এক ক্রম উচ্চতব। কাজেই তত্রত্য সুখভোগ ও উন্নতির সম্ভাবনা নিম্নতর জগতের সম্ভাবনা অপেক্ষা সর্বতোভাবে খুব বেশী। কিন্তু ঐ সকল সম্ভাবনানিচয় উচ্চতর প্রকৃতিসম্পন্ন। উহাদিকের সুবিধা গ্রহণ কবিতে হইলে নির্দিষ্ট-পরিমাণ বুদ্ধি জ্ঞান আবশ্যক হয়। যে ব্যক্তির বুদ্ধির বিকাশ ঘটে নাই, পার্থিব জীবনে যে ব্যক্তির সমগ্র চিন্তা ও শক্তিমাত্র ঐহিক বিষয়পুঞ্জেই নিযুক্ত ছিল, ভুবর্লোকের উচ্চতর অবস্থায় মধ্যে যাইয়া তাহার বিশেষ কিছু লাভ হয় না। পার্থিব জীবনেই আত্মোন্নতির সুযোগ ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঐ সুযোগ প্রত্যাখ্যান করে বা যে ব্যক্তি উহা দেখিতেই পায় না, তাহার অর্দ্ধকৃশাপ্রাপ্ত চিত্তের পক্ষে ঐ অধিকতর মহীয়ান্ জীবনের সুপ্রশস্ত সম্ভাবনানিচয় অনুভব করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার।

কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি পার্থিব জীবনে পারলৌকিকতত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত একটু যত্নবান্ হইয়া থাকে, স্থূল জড়ের অন্তরালে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার একটু শক্তিও যদি তাহার আয়ত্ত হইয়া থাকে, তবে ভুবর্লোকে গেলে তাহার সম্মুখে অতীব মর্মস্পৃক্ অনুরাগাত্মক নূতন নূতন গবেষণার ও আলোচনার পন্থাসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকিবে ; এই প্রাথমিক ক্রমে, অর্থাৎ এই পার্থিব জীবনে যদি ঐ ব্যক্তি নিঃস্বার্থ কার্যকলাপে প্রীতি অনুভব করিতেও পরোপকারার্থে কর্ম কবতি শিক্ষা কবিয়া থাকে, তবে ভুবর্লোকে সে প্রগাঢ় আনন্দের অধিকাবী হয়। তাহার তত্রত্য উন্নতিও দ্রুতগতিতে হইতে থাকে। যিনি বুদ্ধিমান্ ও পবোপকাবী, যিনি সূক্ষ্ম জগতের অবস্থানিচয় অনুধাবন করিয়া ঐ অবস্থানুযায়ী গঠিত হইবাব আয়াস স্বীকার করেন, যিনি কায়মনোবাক্যে ঐ সকল অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁহার সম্মুখে সুযোগপুঞ্জের সমৃদ্ধ বীথিকা উদঘাটিত হইয়া থাকে। উহার সাহায্যে তিনি নবীন জ্ঞানার্জন ও আবশ্যক কর্মসাধন করিতে সমর্থ হয়েন।

তিনি বুঝিতে পারেন যে, এই স্থূলদেহ হইতে মুক্ত হইলেই জীবাত্মার উজ্জ্বলতা ও আভা বৃদ্ধি পায়। সৌরকরের নিকটে চন্দ্ররশ্মি যেরূপ হীনপ্রভ, ঐ ঔজ্জ্বল্যের সমীপে যাবতীয় পার্থিব উপভোগও তদ্রূপ পরিম্লান। তখন অনাবিল জ্ঞান ও নিষ্কম্প বিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি তদীয় পারিপার্শ্বিকনিচয়ের উপর অ-নশ্বর জীবনের প্রভাব দেদীপ্যমান দেখিতে পান। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তখন তিনি শত শত ব্যক্তির নিকটে শান্তি ও অনির্বৃচনীয় আনন্দেব কেন্দ্রস্বরূপ হইতে পারেন। সুদীর্ঘ পার্থিব জীবনে যে শুভানুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত, এক্ষণে ভুবর্লোকের এই অল্পকালস্থায়ী অবস্থিতিব মধ্যেই তিনি তদপেক্ষা অধিকতর শুভকার্য-সম্পাদনে সমর্থ।

পারলৌকিক জীবন একটা একটা অভিনব ব্যাপার নহে

প্রথমেই একটা সুস্পষ্ট সত্য মনে বাখিতে হইবে যে, মৃত্যুব পববর্তী জীবন অদ্ভুত অভিনব ব্যাপার নহে। উহা বর্তমান জীবনেবই প্রসারণ। মৃত আত্মীযবর্গ হইতে আমবা বিশ্লিষ্ট নহি। তাহারা সততই আমাদিগের চতুর্দিকে অবস্থান করিতেছে। আমাদিগেব জ্ঞান সংরুদ্ধ হইয়াছে, তাই আমাদিগেব মনে হইতেছে যে, আমবা তাহাদিগকে হারাইয়াছি। আমরা আত্মীয়গুলিকে হাবাই নাই, হাবাইয়াছি কেবল তাহাদিগকে দেখিবার শক্তি। আমাদিগেব জ্ঞানের প্রসারণ কবিযা লইতে পারিলে, আমরা তাহাদিগকে দেখিতে, এমন কি, পূর্বেব মত তাহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে সমর্থ হই। জ্ঞানের তাদৃশ উন্নতিসাধনও আমাদিগেব পক্ষে সম্পূর্ণরূপ সম্ভবপর। আমরা সকলেই মৃত আত্মীযদিগের সহিত সর্বদাই দেখা-শুনা কবিতেছি ও কথাবার্তা কহিতেছি ; অথচ এই ব্যাপার ঘটিতেছে বলিযা আমাদিগেব সম্পূর্ণরূপে মনে পড়িতেছে না। জাগ্রত অবস্থার মধ্যেও মানুষ স্বীয় জ্ঞান অধিশ্রযণে সন্নিপাতিত কবিয়া উহাকে লিঙ্গশবীরে নিবদ্ধ করিতে পারে। শিক্ষা করিলেই মানুষ এরূপ কবিতে সমর্থ হয। কিন্তু ঈদৃশী শক্তি লাভ করিতে হইলে বিশেষ উৎকর্ষের প্রয়োজন। সাধাবণ শ্রেণীর মানবেব পক্ষে ঐরূপ শক্তিলাভ বহু সময়সাপেক্ষ। কিন্তু স্থূলদেহটি নিদ্রাভিভূত হইয়া পডিলে প্রত্যেক ব্যক্তিই ন্যূনাধিকভাবে তাহার সূক্ষ্মশরীরের ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐরূপভাবে আমরা প্রত্যহই আমাদিগেব গতাসু আত্মীয়স্বজনের সমীপবর্তী হই। তাহাদিগের সহিত দেখা-সাক্ষাতের কথা কখন কখন আমাদিগেব অংশতঃ মনে থাকে। সেরূপক্ষেত্রে আমবা বলিয়া থাকি যে, আমরা অমুক-অমুককে স্বপ্নে দেখিয়াছি। কিন্তু খুব সাধারণতঃ ঐ দেখাসাক্ষাতের কথা মনে থাকে না। তাই মনে হয় যে, আমরা তাহাদিগকে আদৌ দেখিতে পাই না। তথাচ ইহা একটি সুস্পষ্ট সত্য যে, আমাদিগেব সহিত মৃত আত্মীয়দের স্নেহবন্ধন পূর্ববৎ সুদৃঢই বিদ্যমান থাকে। তাই মানুষ এই ভৌতিক দেহ-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবামাত্র সে স্বভাবতঃ প্রিয়জনের নিকট যাইতে চেষ্টা করে। তাই বলিতেছি, বস্তুতঃ পরিবর্তন কিছুই ঘটে না। পবিবর্ত্তনেব মধ্যে মাত্র এইটুকু হয় যে, দিবসে তাহাদিগকে দেখিবার পরিবর্ত্তে আমবা তাহাদিগকে রাত্রে দেখিযা থাকি। আর একটু বিশেষত্ব এই ঘটে যে, আমরা স্থূলশরীরে তাহাদিগের মেলা-মেশা করিবার পবিবর্তে সূক্ষ্মশরীরে তাহাদের সহিত মিশিয়া থাকি।

মসার্ এল্ ম্যারিলার নামক একজন গ্রন্থকার তাঁহাব Le Braz's La Legonde de la Mort en Basse Bretagne নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকায় ব্রিট্যানি নামক স্থানের কৃষককুলেব পারলৌকিক অবস্থানসংক্রান্ত বিশ্বাস ও মনোভাবেব একটা বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। তিনি

বলেন ঃ—"ব্রিটেনদিগের ধারণা এই যে, জীবিত ও গতাসু সকল ব্যক্তিই তুল্যভাবে এই পৃথিবীতে বাস করিতেছে। উহারা পরস্পর দুশ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। তাহারা বলে, মৃত ব্যক্তিদিগের একটা বিপুল সঙ্ঘ আছে। সে সঙ্ঘের নাম "L' Anaon" ঝড় বা বাতাবর্তের ন্যায় এই সঙ্ঘকে ভয় করা যাইতে পারে। পথিপার্শ্বস্থ কণ্টকাকীর্ণ গুল্মনিচয় যদি সূক্ষ্মশরীরী প্রেতগণ কর্তৃক কথঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলই হইয়া পড়ে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই, কেন না, ঐ গুল্মগুলি বিহঙ্গমের ললিতকাকলী-লহরীতে নিয়ত মুখরিত হইয়া থাকে। ব্রিটনরা বলে, গুল্মগময় ক্ষেত্রবৃত্তি যেমন 'হনিসক্ল্' নামক সুরভি-পুষ্পে গ্রথিত, তদ্রূপ স্থূলজগতের সহিত সূক্ষজগৎও বিজড়িত। ব্রিটনরা মৃত ব্যক্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে। উপরি-উক্ত সঙ্ঘ L' Anaon তাহাদের খুব গভীব বিশ্বাসের বিষয়। ঐ সঙ্ঘের নামে তাহাদের হৃদয়ে যুগপৎ ভয় ও সুকোমল সমবেদনার উদ্রেক হইয়া থাকে।

"মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকে। প্রত্যহ, এমন কি, প্রত্যেক ঘণ্টায়ই উহারা আসিয়া মিশিতেছে। তাহারা রাত্রিতে রাজপথে ও নির্জন গলিপথে ভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহারা ক্ষেত্র ও ময়দানে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তাহাদের সংখ্যা কম নহে। তাহাবা মাঠের তৃণপত্রেব মত ও সমুদ্রকূলেব বালুকার ন্যায় অগণ্য, অসংখ্য। যে গৃহে তাহাবা স্থূল নশ্বর দেহধাবী হইযা বাস কবিত, পরলোকেব সংবাদ লইয়া তাহারা তথায় প্রত্যাগত হয়। নিশীথসময়ে তাহারা পবলোকের প্রাযশ্চিত্ত-যাতনার বা সুখভোগের সংবাদ লইয়া নীবব বাসভবনের মধ্যে ধীবপদসঞ্চাবে বিচবণ করে। কখন কখন তাহাদিগকে মশাবিযুক্ত পর্যঙ্কেব বহির্দেশে অস্পষ্ট ছাযামূর্তিতে দেখা যায়। কখন কখন উননের নির্বোণোন্মুখ অগ্নিব পার্শ্বে তাহাদিগকে নীববে অবস্থিতি কবিতেও দেখা যায়। পার্থিব আত্মীয়গণ যখন কোন বিপদে বা জীবন-সঙ্কটে পড়ে, তখন উহাবা বক্ষক হইয়া তাহাদিগের নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে পাহারা দেয। মৃত জননী আসিয়া নিদ্রিত অবস্থায় সন্তানকে আদর-সোহাগ কবেন, তাহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা কবেন, তাহদিগকে আদব কবিয়া দোলাইয়া থাকেন। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি সন্তানের অশ্রু মুছাইয়া থাকেন। মৃত ব্যক্তি পৃথিবীতে হয ত সুন্দর বৃতি-রক্ষিত গোলাবাড়ী রাখিয়া গিযাছেন। হয ত লোহিত-রাগ-বঞ্জিত উজ্জ্বল-গাত্র গো-মেষাদির পা ফেলিযা গিয়াছেন , হয় ত হেমোজ্জ্বল সৌরকবার্ণববৎ তবঙ্গায়িত শস্যক্ষেত্র পৃথিবীতে রাখিয়া তিনি গতাসু হইয়াছেন। পরলোক প্রাপ্তির পরও ঐ সকল বস্তুব স্মৃতি তাঁহার মনে ফুটিযা উঠে। তখন তিনি ঐ ঐ দ্রব্যেব নিকটে আসিযা উপস্থিত হযেন। এরূপ ব্যাপাব সর্বদা না হইলেও কখন কখন ঘটিযা থাকে। এরূপ ঘটনার স্থবেল বৃদ্ধ কৃষকের জীবাত্মা তদীয় লাঙ্গলের নিকটে প্রত্যাগমন করিয়া উর্দ্ধর সীতা-চিহ্নের মধ্যে দৃঢ়হস্তে উহা চালাইতে থাকে। ঐ পুরাতন অভ্যস্ত কার্য্যের বলবতী বাসনা তাহাকে সূক্ষ্মদেহীদিগেব নীবব রাজ্য হইতে আকর্ষণ করিয়া আনে।

"মনে রাখিতে হইবে যে, সকল প্রেতাত্মাই দযার্দ্র নহে। অনেক জীবিত মনুষ্যের উপর বরং নির্দয ব্যবহার কবিয়া থাকে। এরূপ প্রেতের নিকটে না যাওয়াই মঙ্গল। এই স্থূল জড় জগতেব কোলাহল ও সঞ্চালন বশতঃই অধিকাংশ ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিদিগের মৃদুস্বর শুনিতে পায় না। ব্রিটেনদিকেব ধারণা এই, যদি আমরা সাংসাবিক কার্যেও সুখান্বেষণে নিবিষ্টচিত্ত না হই, তাহা হইলে পবলোকের প্রায যাবতীয় কার্যই অবগত হইতে পাবি।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

অদৃষ্ট ব্যাপার মিথ্যা নহে, সত্য

পবলোকের স্মৃতি ভূলোকে আনযন করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। প্রেতাত্মারা এইরূপ করে বলিয়া তাহাদিগেব তত্রত্য চৈতন্যের কোন বিপর্যয় ঘটে না বা সেই সূক্ষ্মজগতে কার্য করিতেও কোনরূপ বাধা জন্মে না। সর্ববিষয়ে তাহাদের স্বাধীনতা ও সুবিধা পূর্ববৎ অক্ষুন্নই থাকে। আমরা জানিতে পাবি বা না পাবি, মৃত ব্যক্তিবা আমাদিগেব অতি নিকটেই বাস করিয়া থাকে। আমরা দেহ বলিতে যে জিনিসটাকে বুঝি, মাত্র সেইটিই তাহাদের নাই, তাহাদের সহিত মাত্র এইটুকুই আমাদেব প্রভেদ। আমাদিগেব গাত্র হইতে উপবেব জামাটি উন্মোচন করিলে আমাদের ব্যক্তিত্ব তাহাতে নষ্ট হয না . তদ্রূপ স্থূলদেশ পরিত্যক্ত হওযায তাহাদিগেরও কোনরূপ পবিবর্তন ঘটে না। ভারমুক্ত হইলে আমবা বাস্তবিকই যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করি , তদ্রূপ দেহ-মুক্ত হওয়ায় তাঁহারাও আনন্দ বোধ কবেন। মৃত্যু হওয়াব মানুষেব চিত্ত-বৃত্তি, স্নেহ, অনুরাগ, উদ্বেগ, আকাঙক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই পবিবর্তিত হয় না। কেন না, ঐগুলি পবিত্যক্ত পার্থিব দেহের সহিত সম্পৃক্ত নহে। মৃত ব্যক্তি এই দেহরূপ পবিচ্ছদটি পবিত্যাগ করিযা অন্য একটি পরিধান করেন। কিন্তু তাহা হইলেও তিনি পূর্ববৎ চিন্তা ও অনুভব কবিতে সমর্থ।

যে সকল ব্যাপার আমবা চর্মচক্ষুতেদেখিতে পাই না, সেগুলিকে সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অতীব দুরূহ। আমবা যে জগতে বাস করিতেছি, তাহা একটা প্রকাণ্ড জগতের অতি ক্ষুদ্রাংশ। আমাদের দৃষ্টিশক্তি অতীব নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এটুকু অনুধাবন কবা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তথাচ, বিজ্ঞান তারস্ববে এই সত্যেব ঘোষণা করিতেছে। বিজ্ঞান যে সকল আণুবীক্ষণিক জীব-জগতের পরিচয় দিতেছে, সেগুলি কিছুমাত্র আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেগুলিকে আমরা জ্ঞাত হইতে পারি না। ঐ জীবগুলি আণুবীক্ষণিক বলিয়া উহারা অনাবশ্যক নহে ; কারণ, উহাদিগেব অনেকগুলির অবস্থা ও স্বভাব-সংক্রান্ত জ্ঞানের উপর আমাদিগের স্বাস্থ্যসংরক্ষণ শক্তি, এমন কি, অনেক সময় আমাদিগের জীবন পর্যন্ত নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের ইন্দ্রিয়শক্তি সীমাবদ্ধ। আমরা যে বায়ুমণ্ডলে নিমজ্জিত, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। আমাদিগেব কোন ইন্দ্রিয়ই বাযুব বিদ্যমানতার পরিচয় দিতে পাবে না। যখন বায়ু গতিশীল হয, মাত্র তখন আমবা ত্বগিন্দ্রিয়ের সাহায্যে উহাব অস্তিত্ব অনুভব কবিতে পাবি। তথাচ, উহা এত শক্তিমান যে ঐ শক্তিতে আমাদিগের দৃঢ়তম অর্ণবযানও ধ্বংস হইতে পাবে। ঐ শক্তি আমাদিগেব দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হর্ম ভূপতিত করিযা থাকে। অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, আমাদিগেব চতুষ্পার্শ্বে মহতী শক্তি বিরাজ করিতেছে, অথত আমাদিগের নিস্তেজ ও ক্ষীণ ইন্দ্রিয উহা অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছে না। তাই বলি, যাহা আমবা দেখিতেছি, তাহা ছাড়া আর দেখিবার কিছু ই নাই—এ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। যাহাতে ঐ ভ্রান্ত ধারণায় আমরা পতিত না হই, সে বিষযে আমাদিগকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বার্মিংহাম্ নগরে "বিশ্বে আমাদিগের স্থান" নামক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্যর্ অলিভার লজ্ এইরূপ বলিয়াছেন ;—

"আকাশ যদি সতত মেঘাচ্ছন্নই থাকিত, তাহা হইলে সূর্য যে কোথায় অবস্থিত, তাহা আমরা জানিতে পারিতাম না। তদ্রূপ, বিশ্বে এমন বিস্তর জিনিস বিদ্যমান আছে, যাহা আমরা তীক্ষ্ণতর ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিতে পাইতাম। ইন্দ্রিয়গুলি আমাদিগের সেরূপ নয় বলিয়া ও আমাদিগের দৃষ্টিশক্তি আবরিত হওয়ায়, আমরা সেগুলি দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ নহি। বিশ্বে এতই দেখিবার ও জানিবার বিষয় আছে যে, উহার তুলনায় আমাদিগের পরিজ্ঞাত ও পরিদৃষ্ট ব্যাপার সমুদয় অতীব নগণ্য।"

আমরা যেন একটি দুর্গে আবদ্ধ আছি. আমাদিগের ইন্দ্রিয়গুলি যেন দুর্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতায়ন। দিগ্‌বিশেষে ঐগুলি যেন উন্মুক্ত আছে। অপব অপর অনেক দিকে আমাদেব বাতায়ন নাই। সে সকল দিক্ আমাদিগের পক্ষে বদ্ধ। দিব্যদৃষ্টি বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিপ্রভাবে আমাদিগের আব দুই একটি বাতায়ন খুলিতেপারে। উহাতে আমাদিগেব চক্ষুর্গ্রাহ্য স্থানের বিস্তৃতি ঘটে। উহার প্রভাবে আমরা একটি নবীন ও বৃহত্তর জগৎ দেখিতে পাই। ঐ জগৎ এই প্রাচীন জগতেরই অংশ, অথচ সে তথ্যটুকু আমরা পূর্বেপবিজ্ঞাত ছিলাম না।

মানুষ প্রেতলোকে যাইয়া কি দেখে?

মানুষ মবিযা প্রথমেই ভুবর্লোকে যাইয়া উঠে। আমরা মৃত্যুর পরে এখানে যাইয়া কি দেখি? মনে কব, আমাদের জীবাত্মা ইহ-শবীর ত্যাগ করিযা ভুবর্লোকে যাইযা উঠিল। উঠিলে, কোন্ নূতন পবিবর্তন-নিচযেব দিকে আমাদেব মন প্রথমেই আকৃষ্ট হইবে? যিনি মৃত্যুর পরে ভূবর্লোকে যাইযা উঠেন, সম্ভবতঃ প্রথমে তাঁহার নিকটে কোন প্রভেদই পরিলক্ষিত হইবে না। তিনি জীবিত অবস্থায এই পৃথিবীতে স্থূলনেত্রে যে সকল পদার্থ দেখিতে পাইতেন, সেখানেও সেই সেই পদার্থ সেই সেইরূপে দেখিতে পাইতেছি বলিয়া তাঁহার বোধ হইবে। এরূপ ব্যাপারটি কেন ঘটে, তাহা আমরা পরে বুঝাইয়া দিতেছি। বুঝাইয়া দিতেছি বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে পারিব না, কতকটা বুঝাইব ; কেন না, সম্পূর্ণরূপে বিশদভাবে বুঝাইতে হইলে ভূবর্লোক-সম্ভব প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি সর্বাঙ্গ-পরিস্ফুট প্রবন্ধের অবতারণা করা আবশ্যক হইয়া উঠে। পৃথিবীতে জড়ের কঠিন, তরল ও বায়বীয়—এই তিনটি অবস্থা দেখা যায়। তদ্রূপ, ভূবর্লোকেও তত্রত্য জড়ের নিবিড়ত্বের ক্রম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। তত্রত্য পদার্থগুলি ভূলোকের সম অবস্থাপন্ন দ্রব্যনিচয় দ্বাবা আকৃষ্ট বা উহাদের সহিত সমঞ্জস হইয়া থাকে। এই কাবণেই মৃত ব্যক্তি সেখানে যাইয়া পূর্বপরিচিত প্রাচীর ও গৃহ-আসবাবাদি দর্শন করিয়া থাকেন। সে স্থূল জড়াংশে পৃথিবীব প্রাচীরাদি গঠিত, তাহা সেখানে তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হইলেও ভূবর্লোকসুলভ জড়াংশের নিবিড় বিন্যাসই ঐ সকল আসবাব প্রভৃতির মূর্তি প্রকট করিয়া থাকে। ঐ মূর্তি তাঁহার নিকটে অতীব স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। সত্য বটে, একটু প্রণিধান কবিলেই তিনি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন যে, ঐ সকল মূর্ত পদার্থের পরমাণুপুঞ্জ চক্ষুগ্রাহ্যরূপে গতিশীল। ঐ গতিও খুব দ্রুত। কিন্তু পার্থিব পদার্থের পরমাণুর মধ্যে যে পরিবর্তন হইতেছে না, তাহা নহে। এ পরিবর্তন—এ গতি চক্ষুর্গ্রাহ্য নহে, এইটুকুই প্রভেদ। ভুবর্লোকপ্রবাসী অতি অল্পলোকই ঐরূপে প্রণিধান করিতে পায়। তাই মৃত্যুর পরে সাধারণ মানুষ প্রথমে কোন পরিবর্তনই অনুভব করিত সমর্থ হয় না।

মৃত ব্যক্তি ভুবর্লোকে যাইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে থাকেন। তখন তিনি স্বীয় পরিচিত গৃহাদি দেখিতে পান। যে-সকল প্রাণপ্রিয় আত্মীয়-স্বজনকে পৃথিবীতে রাখিয়া গিয়াছেন,

তাহাদিগকেও ঐ গৃহে দেখিতে পান। কেন না, পৃথিবীস্থ জীবিত আত্মীয়-স্বজনেরও সূক্ষ্মদেহ এক্ষণে তাঁহার এই নবীন দৃষ্টিশক্তির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। ক্রমান্বয়ে তাঁহার নিকটে একটু প্রভেদ অনুভূত হয়। তিনি শীঘ্রই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার সকল প্রকার যাতনা ও ক্লান্তি তিরোহিত হইয়াছে। এই যাতনা ও ক্লান্তির তিরোভাব অবস্থাটুকু যদি তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পার, তবেই যথার্থরূপে তোমরা উচ্চতর জীবনের ধারণা করিতে কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থ হইবে। একটু চিন্তা করিয়া কথাটি তোমার বুঝিতে চেষ্টা কর। এখানে, এই পৃথিবীতে তোমাদের এক মুহূর্তের জন্যও সুখ-শান্তি নাই ; কোন্ মুহূর্তে যে তোমাদের ক্লান্তির বিশ্রান্তি ঘটিয়াছিল, তাহা কর্মময় জীবনের অস্থির তাড়নায় তোমাদের মনেই পড়ে না; সেই বিশ্রান্তি যদি আবার ঘটে, সেই ক্লান্তিযাতনা যদি আবার স্থলিত হয়, বল দেখি, তবে সেই অবস্থাটি কতই সুখের হইয়া উঠে। পাশ্চাত্যদেশে আত্মার অবিনাশিতা ব্যাপারটি শৃঙ্খলার সহিত আলোচিত হয় নাই। সেই কারণে মৃত ব্যক্তি সাধারণতঃ বুঝিতেই পারেন না যে, তিনি মরিয়াছেন। তিন মৃত্যুর পরও দর্শন, শ্রবণ, চিন্তা অনুভব সবই পূর্ববৎ করিয়া থাকেন। তাই, "তিনি মরিয়াছেন"—এ কথাটি বুঝিয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। মৃত ব্যক্তি বলিয়া থাকেন,—"আমি মরি নাই। আমি পূর্ববৎ জীবিত আছি। এখন আমি পূর্বাপেক্ষাও আরামে রহিয়াছি।" বস্তুতই তিনি আরামে থাকেন। পার্থিব জীবনে যদি প্রকৃত শিক্ষা পাইতেন, তবে ঐরূপ কথাই তাঁহার মুখে আমরা আশা করিতে পারিতাম।

তিনি যে মারিয়াছেন, তাহা এইরূপ অবগত হইতে পারেন। তিনি নিকটে তাঁহার বন্ধুবর্গকে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝিতে পাবেন যে, তাঁহাদেব সহিত তাঁহার কথাবার্তা চলে না। কখন কখন তিনি তাঁহাদেব সহিত কথাবার্তা বলেন। তাঁহাবা এমনভাবে থাকেন, যেন তাঁহাব কথা শুনিতেই পাইতেছেন না। তিনি তাঁহাদিগকে স্পর্শ কবিবার চেষ্টা কবেন, কিন্তু তাহাতে বুঝিতে পাবেন যে, তাদৃশী চেষ্টা ফলবতী নহে। কখন কখন এতদূর ঘটিবার পরও মৃত ব্যক্তি স্বীয় মৃত্যু-বিষয় অনুধাবন করিতে পারিয়া উঠেন না। তিনি মনে কবেন যে, হয় ত তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। জাগবিত হইলেন এ সমুদায় অসুবিধা দূর হইবে। এরূপ মনে কবিবার একটা কারণও আছে। ঐ সকল বন্ধু-বান্ধবেব পার্থিব দেহ যখন নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন তাহারা তাঁহাব সহিত পূর্বের ন্যায় মিলিযা মিশিয়া গল্প-স্বল্প করে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি ধীরে ধীবে বেশ বুঝিতে পারেন যে, মোটেব উপব তাঁহাব মৃত্যুই হইয়াছে। তখন তাঁহার একটা চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়া থাকে। খুব সাধারণতঃই এইরূপটি ঘটে। এরূপ উদ্বেগের হেতু কি? পার্থিব জীবনে সুশিক্ষার অভাবই এই হেতু। চলিত মতাবলম্বী হওযায তিনি মৃত্যুব পবে যে অবস্থাটি হইবে বলিয়া আশা কবিযাছিলেন, এক্ষণে তাহা হইতে স্বতন্ত্র অবস্থা তাঁহাব সম্মুখে প্রকটিত হয়। তিনি কোথায় আছেন, কি ঘটিয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারেন না। এক জন ইংরাজ সৈনাধ্যক্ষ মৃত্যুর পরে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—"আমার যদি মৃত্যুই হইযা থাকে, তবে আমি কোথায় আছি? এতদবস্থার নাম যদি স্বর্গ হয, তবে ইহা খুব বঞ্ছনীয় নহে। ইহাব নাম যদি নবক হয, তবে যাহা ভাবিতাম , তদপেক্ষা ইহা অনেক ভাল।"

যাহারা যুক্তি ও সহজবুদ্ধি ব্যবহাব কবিবার পরিবর্তে আজও পৃথিবীতে অবিদ্যমান, কল্পিত পিশাচাদির ভয়ঙ্কবী-মূর্তি-সংক্রান্ত মূঢ়তাব্যঞ্জক অলীক গল্প শিখাইতেছে, তাহাদেব দোষেই প্রভূত পরিমাণে নিরর্থক উদ্বেগ ও সুতীব্র যাতনা উপবি-উক্তভাবে সংঘটিত হইতেছে। ভিত্তিহীন পাষণ্ডতাপূর্ণ নবকাগ্নি মতটিতে এত অনর্থ ঘটিযাছে যে, ঐ মতেব উৎসাহদাতৃগণও তাহা অবগত নহেন। কেন না, উহাতে ইহলৌকিক পারলৌকিক উভয প্রকাব অনিষ্টই সংসাধিত

হইয়াছে। প্রেতলোকপ্রবাসী ঐরূপ বিপন্ন ব্যক্তিব অপব অপর জীবাত্মার সহিত শীঘ্রই সাক্ষাৎ ঘটিয়া থাকে। তাহারা ভুবর্লোক-তথ্য অনেকটা সুপরিজ্ঞাত। তাহাদিগেব নিকটে ঐ বিপন্ন ব্যক্তি জানিতে পারেন যে, ভুবর্লোকে ভয়ের কোন কারণ নাই , পৃথিবীব ন্যায় সেখানেও নৈতিক জীবন যাপন কবা যাইতে পারে।

তিনি ক্রমশঃই বুঝিতে পারেন যে, ওখানে বিস্তর নূতন জিনিস বিদ্যমান আছে। যে সকল দ্রব্যের সহিত ভূমণ্ডলে তিনি পরিচিত ছিলেন, তাহাবও অসদ্ভাব নাই। কিন্তু সেগুলি পার্থিব পদার্থেব প্রতিরূপমাত্র। এখানে চিন্তা ও বাসনা-নিচয় চক্ষুর্গ্রাহ্য মূর্তিতে মূর্ত হইয়া উঠে। এই সকল মূর্তির অধিকাংশই তত্রত্য সূক্ষ্মতর জড়াংশ গঠিত, ভুবর্লোকে তাঁহার অবস্থিতি যতই অধিক হইতে অধিকতর হইতে থাকে, ততই ঐ সকল মূর্তি তাঁহাব সমক্ষে প্রকষ্টরূপে প্রকট হইয়া উঠে। কেন না, আমাদিগকে স্মবণ বাখিতে হইবে যে, ভুবর্লোকে অবস্থানকালে তিনি নিয়মিতভাবে সততই অন্তর্মুখীন হইতে থাকেন। জীবাত্মা দেহী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে উহাব সমগ্র পার্থিব জীবনটাই জড়েব মধ্যে আত্ম-বিনিয়োগ-কার্যে কাটাইয়া দেয় ; পরে উহা হইতে আত্মনিষ্কশন করিতে থাকে। শেষোক্ত কার্যের সময় বহু অভিজ্ঞতা উহার লাভ হইয়া থাকে।

আমরা পূর্বেও বলিয়াছি যে, পার্থিব জীবনেও মানুষেব চিত্তবৃত্তি ক্রমে ক্রমে ঊর্ধদিকে ফিবিতে থাকে। এইরূপ ভাবে উহা ফিরাইবার চেষ্টা কবা তাহার কর্তব্য। যত দিন না এই নশ্বর দেহটি স্খলিত হইয়া পডিবাব সময আসিয়া উপস্থিত হয, তত দিন যাবৎ স্থূল-জগতের আসক্তি ক্রমে ক্রমে ত্যাগ করিবার চেষ্টা কবা তাহার উচিত। স্থূল-দেহের বিনাশ ঘটিলেই সূক্ষ্ম-জগতে বাসের সূত্রপাত হয। কিন্তু এই সূক্ষ্মাবস্থায কেবলই আত্মনিষ্কাশন ব্যাপাব ঘটিয়া থাকে। ইহার ফল এই হয় যে, যে সমুদয় নিম্নশ্রেণীব জড়াংশে পার্থিব বস্তুব প্রতিরূপগুলি গঠিত হইয়া প্রকট হইয়া থাকে, ঐগুলির প্রতি তাহাব আসক্তি দিন দিনই হ্রাসপায়। যে সমুদয় উচ্চশ্রেণীর জড়াংশে চিন্তামূর্তিনিকর নির্মিত, তখন সে দিন দিন তাহাতেই সংশ্লিষ্ট হইযা উঠে। ভুবর্লোকের চিন্তামূর্তির উপাদান যত দূর তাহাব আয়ত্ত্ হইতে পাবে, তত দূব সংগ্রহ কবিয়া তাহাতেই সে নিবিষ্টচিত্ত থাকে। এইরূপ তাহার জীবনটি দিন দিন চিন্তা-বাজ্যেব সামগ্রীতে পরিণত হয। তখন তাহাব পরিত্যক্ত সংসাবের প্রতিরূপ স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এরূপ বিলোপেব কাবণ তাহাব অবস্থাব-পরিবর্তন নহে—অনুরক্তিব কেন্দ্রচ্যুতিই সেই বিলোপের হেতু। এতদবস্থায় উন্নীত হইলেও তাহার বাসনাপুঞ্জ বিদ্যমান থাকে। তখনও তাহার চতুর্দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ বাসনা-মূর্তি বিরাজ করে। বাসনা-রাশির শুভাশুভ প্রকৃতিঅনুসাবে তাহার তৎকালীন জীবন সুখের বা অশান্তিব প্রস্রবণ বা হেতু হইযা ওঠে।

এই ভুবর্লোকেব ব্যাপার আলোচনা করিলেই আমরা বহু নীতি-উপদেশের হেতু বুঝিতে পবি। বিস্তর ব্যক্তিই জানেন যে, অপবের অনিষ্ট করা পাপ। উহা ঘোর অন্যায়। কিন্তু তাঁহারা ভাবিযা আশ্চর্যান্বিত হযেন যে, ঈর্শ্যা, বিদ্বেষ, উচ্চাভিলাষ যখন বাক্যে বা কার্যে ব্যক্ত হয় না, তখন উহা অন্যায় বলিয়া ঘোষিত হয় কেন? পরলোকের দিকে সামান্য একটু দৃষ্টিপাত করিলে আমবা দেখিতে পাই যে, যে ব্যক্তি ঈর্ষা প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে হৃদয়ে পোষণ করে, সে ঐগুলির দ্বারা বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পরে ঐগুলির তাহাকে তীব্র যাতনা প্রদান করে। আদর্শস্বরূপ, ভুবর্লোক-প্রবাসী কয়েকটা জীবাত্মার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলেই আমরা উপরি-উক্ত কথাটি আরও সুন্দররূপে বুঝিতে সমর্থ হইব। উহাদিগের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদিগের প্রণিধান করিয়া দেখিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

কয়েকটি প্রেতাত্মার বিবরণ

এক জন সাধাবণ মানুষেব ধারণা করুন। মনে করুন, লোকটির ভাল বা মন্দ কোন প্রকাব বৈশিষ্ট্য নাই। মৃত্যুব পরে এই বৈশিষ্ট্যহীনতাই উহাব প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইবে। মৃত্যুর পবে উহাব কোন বিশেষ প্রকাব সুখ বা দুঃখ ঘটিবে না। খুব সম্ভবতঃ উহার অতিবাহিক জীবনটি নির্জীব প্রকাবেব হইয়া উঠিবে। কেন না, পার্থিব জীবনে ঐ ব্যক্তি কোন প্রকাব সঙ্গত বিষয়েব উৎকর্ষসাধন কবে নাই। পার্থিব জীবনে ঐ ব্যক্তি যদি শুধু গল্প-স্বল্প করিয়া, শুধু ক্রীড়া-কৌতুক করিযা, শুধু নিজের কাজটুকু কবিযা বা নিজের পোষাক-পরিচ্ছদের ভাবানা ভাবিয়াই সময় অতিবাহিত কবিয়া থাকে, তবে মৃত্যুব পব সম্ভবতঃ উহাব নিকটে সময় বড়ই দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইবে। তখন সময় কাটান বড়ই কষ্টকব হইয়া উঠিবে , কেন না, তখন আব ঐ ঐ পার্থিব বিষযেব উপভোগ সেখানে সম্ভবপব থাকিবে না।

এ সম্বন্ধে আমি এখানে একটি গল্প উদ্‌ধৃত কবিব। উহা পড়িয়া পাঠকগণ উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যবিহীন মানবেব নির্জীব পাবলৌকিক জীবনের বেশ একটা ধাবণা কবিতে পারিবেন। এক জন খৃস্টান বহু বৎসব পূর্বে একখানি পুস্তকে গল্পটি লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। পুস্তকখানি তত বিখ্যাত নহে। যে সময়ে পুস্তকখানি প্রণীত, সে সময "পবাবিদ্যা" বলিয়া কোন কথা প্রচলিত হয নাই। তিনি তখন প্রেততত্ত্ব বলিয়া কোন শব্দও শুনেন নাই। তথাচ এই স্থূল-দেহই তিনি দেহতিবিক্ত জীবাত্মাদিগকে দর্শন কবিতে ও তাহাদিগেব সহিত কথাবার্তা কহিতে সমর্থ ছিলেন। পার্থিব জীবনেই তিনি সাদৃশী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই লিপিবদ্ধ বিবরণটি এই ঃ- –

"গত বৎসব কোন একটি বাড়ীর নিকট দিযা যাতাযাত করিবার সময় প্রায প্রত্যহই উহাব গতাযু মালিকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। তিনি এক জন চিকিৎসক ছিলেন—পশার-প্রতিপত্তিও বেশ ছিল। লোকটি খুব সামাজিক ও সর্বসাধারণ্যে সুপরিচিত। অনেকে তাঁহাকে আদব করিযা নিযন্ত্রণ-আমন্ত্রণও কবিত। * * * * * * আমার সহিত দেখা হইলেই তিনি বলতেন, তাঁহাব বড়ই দুঃখ। তিনি সঙ্গীহীন! সঙ্গী থাকিলেও তাহাদের সহিত থাকিতে তিনি অনিচ্ছুক। তিনি বলিতেন, তাঁহার বাড়ীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেডাইতেই তিনি ভালবাসেন, পার্থিব জীবনেব সঙ্গীদিগেব কাছে থাকিতেই তাঁহার বেশী আনন্দ বোধ হয়। তাহার স্ত্রীর ধারণা যে, তিনি খুব দূববর্তী স্বর্গে বেশ সুখে আছেন অথচ তিনি স্ত্রীব কাছেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, স্ত্রী তাহা জানিতে পাবিতেছেন না, তিনিও জানাইতেছেন না, এই জন্য তাঁহাব দুঃখের অবধি নাই। আমি তাঁহাকে পার্থিব বায়ুমণ্ডল পরিত্যাগ কবিয়া উচ্চতর জীবনে আরূঢ় হইতে নির্বন্ধাতিশয় সহকাবে উপদেশ দিতাম , বলিতাম, পৃথিবীমণ্ডল অপেক্ষা সেখানে কার্য-প্রবৃত্তি অধিকতব বলবতী। উত্তরে তিনি বলিতেন, সেখানে তাঁহার ন্যায এক জন চিকিৎসকেব কোন কার্যই নাই , কেন না, সেখানে নশ্বর দেহও নাই, দেহের ক্ষয়ও নাই।

"এইরূপ নির্জীব প্রকারের একটা অসুখকর জীবন মৃত্যুর পরে তাঁহাকে যাপন করিতে হইবে, তাহা তিনি কখন চিন্তাও করেন নাই। এখন তিনি বড়ই নিরাশভাবে খৃস্টধর্মোক্ত বিচার-দিনেব প্রতীক্ষা করিতেছেন। সেই দিনের বিচারে তাঁহার ভাগ্যের পবিবর্তন হয কি না, তাহাই দেখিবার নিমিত্ত তিনি উৎসুখ হইয়াছেন। পার্থিব জীবনে তিনি নিযমমত ভজনালয়ে যাইতেন। উপাসনা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল, তা ছাড়া উহা কর্তব্য বলিয়াও তাঁহার মনে হইত। কিন্তু ধর্ম-বিষয়ে তিনি কখনও মনঃসংযোগ পূর্বক চিন্তা করেন নাই। সমাজ ও পৃথিবীর সুন্দব সুন্দর দ্রব্যেই তিনি অধিকতর আসক্ত ছিলেন। উপভোগ কবিবারও বিপুল সুযোগ ছিল। তথাচ মৃত্যুকাল পর্যন্ত ত্রাণকর্তার উপরে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। এক্ষণে তিনি দেখিতেছেন, ব্যাপাব বিপবীত! যাহাদিগকে তিনি পার্থিব জীবনে অধার্মিক বলিযা মনে করিতেন, তাহাবাই এখন দিব্যি জ্যোতিতে প্রোজ্জ্বল। সে জ্যোতি তিনি এখন সহ্য করিয়া উঠিতে পারেন না। আবার, যাঁহারা ভজনালযে ধার্মিক বলিয়া প্রখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদের ভাগ্য এখন সম্পূর্ণ বিপবীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। * * *

"সকল দিনই বিচার-দিন, এই কথাটি আমি তাঁহাকে বুঝাইবাব চেষ্টা কবিযাছিলাম। বলিয়াছিলাম যে, তাঁহাব নিজের কথাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তিনি পৃথিবীতে শুধু ঐহিক জীবনই অতিবাহিত কবিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মভাবের সঙ্কোচই বর্তামানে বিচারকফলস্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে। বলিযাছিলাম যে, প্রতিভূ-ঘটিত প্রায়শ্চিত্ত দ্বাবা আমাদিগের ত্রাণ হইতে পারে না , পবিত্র জীবন-যাপনই পরিত্রাণেব প্রকৃষ্ট পন্থা। আরও বলিয়াছিলাম যে, খৃষ্ট ও তাঁহাব মহিমাশালী শিষ্যবর্গ সকলেই ধর্মরাজ্যেব বিস্তাবসাধন কবিতেছেন। বলিয়াছিলাম, যদিও বোগ-চিকিৎসা কবিবাব তাঁহাব কোনরূপ সুবিধা নাই, তথাচ তাঁহাব দ্বাবা বিস্তব অশরীরী আত্মাব উপকাব সাধিত হইতে পাবে। কিন্তু এইরূপ বলায় তিনি বিবক্ত হইলেন। আত্মার ধর্মোপদেষ্টা হইবার পক্ষে তাঁহার ঘোব অমত। আত্মার সাহায্যকারী হিসাবে আমরা সকলেই উপদেষ্টা, এ কথাটুকু আমি কিছুতেই তাঁহাকে উপলব্ধি কারাইতে পারিযাছিলাম না।"—(Light on the Hidden Way, Boston, Ticknor and Co, 1886, P 71 দ্রষ্টব্য)।

এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি সূক্ষ্ম-জগতের একটা অতীব সাধাবণ ব্যাপার। এরূপ ব্যাপাব প্রায়ই ঘটিযা থাকে। ইহা চিত্তাকর্ষকও বটে। এরূপ ঘটনায় প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহাবা পৃথিবীতে কোন প্রকার উচ্চতর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত না থাকে, মৃত্যুব পর তাহাদিগের জীবন স্ফূর্তিহীন ও অসুখকব হইয়া উঠে। তা ছাড়া, মিথ্যা ও অসম্পূর্ণ ধর্মোপদেশ পালন করিয়া চলিলে মবণান্তে একটা কুফল ভোগ কবিতে হয়। উপরি-উক্ত চিকিৎসকেব বিবরণেব লেখক বলিয়াছেন যে তিনি অনেকক্ষণ ধরিযা কথাবার্তা কহিয়া, অনেক প্রকার ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া অবশেষে সেই চিকিৎসকের প্রেতাত্মার মনের অবস্থা একটু ভাল করিয়াছিলেন। এইরূপে উন্নতির পথে আনিতে ঐ প্রেতাত্মাকে বিস্তব বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, উপদেশ-প্রভাবে ঐ প্রেতাত্মা উচ্চতর স্তবে আরূঢ় হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যাহারা পৃথিবীতে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, স্বার্থান্ধ হইযা অসংযত ঐহিক জীবন অতিবাহিত করে, তাহারা মৃত্যুর পরে যখন দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া বিগত পার্ধিব জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত কবিতে সমর্থ হয়, তখন তাহাদের নিজের ত্রুটি তাহারা বুঝিতেপারে। তখন তাহারা নিজেদের প্রকৃত মূর্তি দর্শন করে। সে সময় তাহাদের অনুতাপেব পরিসীমা থাকে না।

এই প্রকারে দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় মৃত ব্যক্তিব মহোপকাবের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে: পার্থিব জীবনে তিনি কোন্ কোন্ সুযোগ হারাইয়াছেন, কোন্ কোন্ গুণে তিনি বঞ্চিত ছিলেন, কোন্ কোন্ শুভ কার্যের অনুষ্ঠান তিনি কবিতে পাবিতেন, তত্তাবৎ তিনি পশ্চাদবলোকনশক্তি প্রভাবে জানিতে পারেন। তখন তাঁহাব মনে হয, তিনি যেন ঘৃণিত, যেন সমাজচ্যুত। কিন্তু সৌভাগ্যেব বিষয়, সূক্ষ্ম-জগতে সহায়ক আছেন। তাঁহাবা নিবন্তর পবোপকাবকার্যে ব্যাপৃত। মৃত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা ঐরূপ ঘটিলে, এক জন সাহাযক তাঁহাব নিকটে উপস্থিত হইযা বলিতে থাকেন, হতাশ হইও না, এখনও উপায় আছে ; এখন হইতে প্রাণে সদ্‌বৃত্তিব উন্মেযসাধন করিতে থাক, তাহা হইলে পরবর্তীপার্থিব জীবনে তুমি নিশ্চয়ই ঐ সকল সদ্‌গুণবিভূষিত হইযা জন্মগ্রহণ করিবে। কখন কখন মৃত ব্যক্তি নিতান্ত নিরুৎসাহ ও নিরাশ হইযা পড়েন। তাঁহার চতুর্দিকে অবসাদেব গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ জমাট বাঁধিযা ঘিবিযা দাঁড়ায। উহা অপসাবিত কবা নিতান্ত কঠিন ব্যাপাব। পার্থিব জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তি আনাযত্ত বা উহাব সম্বন্ধ অনবগত থাকায় ঐ ব্যক্তি সূক্ষ্ম-জগতেব সুযোগ-সুবিধাব ধাবণা আদৌ কবিতে পাবেন না। সে সুযোগ-সুবিধাও অতীব চমৎকাব। কাজে কাজেই তিনি ঘোব নৈরাশ্যে নিমগ্ন হইযা পড়েন। ইহাব ফলে তাঁহাব সম্বন্ধে তাঁহাব বন্ধুবান্ধব ও সাহাযকদিগের শুভচেষ্টা বহুদিন যাবৎ ব্যর্থ হইতে থাকে। চিকিৎসকেব উপাখ্যানটি সাধাবণ স্বার্থান্ধ জীবনের শেষ পবিণামেব একটি সুন্দব দৃষ্টান্ত। সূক্ষ্ম-জগতে ঐরূপ দশাগ্রস্ত সহস্র সহস্র-জীবাত্ম বিদ্যমান আছে। আবাব সুখাবস্থাসম্পন্ন বিস্তব ব্যক্তিও আছেন। তাঁহাবা পার্থিব জীবনে ততটা স্বার্থপবাযণ ছিলেন না।

অসাধারণ ঘটনাবলী

আমবা এক্ষণে কযেকটি অসাধাবণ ঘটনাব আলোচনা কবিব। তাহাতে পাবলৌকিক জীবনেব সুযোগ-সুবিধাব সম্পূর্ণ ধাবণা কবিতে সমর্থ হইব। পার্থিব জীবনের ভিন্ন ভিন্ন চবিত্রেব প্রভাবে পাবলৌকিক জীবন কিরূপভাবে নিযন্ত্রিত হয়, তাহাও বুঝিতে পাবিব। নশ্বব-দেহ-পবিত্যাগেব পব মদ্যপাযীব কিরূপ দুর্দশা হয়, তাহা পূর্ববর্তী একটি অধ্যাযে বিবৃত কবিযাছি। মনে বাখিতে হইবে, মদ্যপায়ীব বিবরণটি নিকৃষ্ট জড় জগতের বলবতী বাসনাপুঞ্জের পবিণামেব উদাহবণমাত্র। ঐ বাসনা মাত্র জড়জগতেই মিটিতে পারে। মৃত্যুব পব ঐ বিহ্বলকাবিণী আকাঙ্ক্ষাব কিছুমাত্র হ্রাস হয না , ববং পূর্বাপেক্ষা উহা তীব্রতব হইয়া উঠে। কেন না, উহার স্পন্দন-বেগ মন্থব করিবাব জন্য তখন আব স্থূল জড়কণা বিদ্যমান থাকে না। ইন্দ্রিযপরাযণ ব্যক্তিব অবস্থা সম্ভবতঃ মদ্যপায়ীব দশা অপেক্ষাও শোচনীয। পুবাকালেও এতদ্ব্যাপাব পৃথিবীবাসীবা সুন্দবরূপে অবগত হইয়াছিলেন। ট্যান্ট্যালসেব (T.ntalus) উপাখ্যানে আমবা এই ব্যাপারেব একটা প্রকট-মূর্তি দেখিতে পাই। উৎকট পিপাসায পীড়িত হইয়া ঐ ব্যক্তি জলপান কবিতে যাইতেছে, অথচ জল মুখের কাছে আসিতে না আসিতেই অপসাবিত হইতেছে।

ভোগ-বিলাস-পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ কখন কখন দারুণ অনুশোচনা (=) যাতনা ভোগ কবিয়া থাকেন। মৃত্যুর পব নব জীবনে যদি তাঁহাবা অনুতপ্ত না হইযা কিয়ংপবিমাণে পূর্বরূপ ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির নিমিত্ত উন্মত্ত চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদের অবস্থা আবও ভযাবহ হইয়া দাঁড়ায়। আমবা পূর্বেই বলিয়াছি, এক এক অভিরুচির, এক এক বাসনার লোকগুলি যেমন এখানে একত্র হয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম-জগতেও হইয়া থাকে। তাই, মৃত্যুর পব ইন্দ্রিয়-পবতন্ত্র, দুষ্ক্রিয় ব্যক্তিবর্গ একত্র

হয়। নশ্বর দেহে যে যে স্থানে তাহারা চরিত্র-অংশে কলুষিত করিয়াছিল, এক্ষণে ঐ ঐ স্থলে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। কাম-সিক্ত চিন্তা ও বাসনার বিষাক্ত উদ্‌গমে তাহাদের দূষিত বায়ুমণ্ডল আরও সাংঘাতিক হইয়া উঠে। পারলৌকিক জীবনেও অতি নিকৃষ্ট অবস্থাপন্ন হওয়ায়, তাহারা স্থূল-জগতের অনেকটা নিকটেই অবস্থান করে। কোন কোন ঘ্রাণে আমাদের ঘোর আসক্তি দেখা যায়। ঐ ঘ্রাণে তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহাদের কুবাসনার বেগ প্রভূত পরিমাণে বর্ধিত হইয়া থাকে, অথচ বাসনা চরিতার্থ করিবার কোন উপায় হয় না। এইরূপে সেই হতভাগ্য জীবগণ যাতনাক্লিষ্ট হওয়ায় ঘোরতর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। তথাচ সেই লম্পট নরককুণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে না। না পারিবার কারণ, তাহারা পার্থিব জীবনে অনবহিতভাবে ঐ নরকের সর্বনাশ-সাধিনী মোহিনী মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

একরূপ অবস্থায় ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ করিবার পক্ষে কখন কখন তাহাদের নবীন সুযোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। অন্যের মারফতে তাহারা বাসনার উপভোগ করে। এই 'মারফতে' উপভোগ-ব্যাপার অতীব যাতনাপ্রদ। ইহাতে তাহাদের মহাপাতক ঘটে। উত্তরকালে তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে বিস্ময়কর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। পার্থিব দেহে যে ব্যক্তি নিজ দোষে শরীর ও চিত্তের বল হারাইয়া বসে, তদীয় দেহে জীবাত্মার অধিকার হ্রাস পাইয়া থাকে। এতদবস্থায় ঐ ব্যক্তির চিত্তে যখন কুবাসনার উদ্দাম লহরী খেলিতে থাকে, তখন তাহাতে গতাসু পাপ-নিরত জীবাত্মার আবেশ হয়। এইরূপ আবেশ হইলে, ঐ ব্যক্তি আরও ভয়ানক পাপে লিপ্ত হইতে থাকে। আবিষ্ট হইতে কোন কোন গতাসু প্রেতাত্মা ঐ ব্যক্তিকে আর ছাড়ে না। উহার স্থূল-দেহ আশ্রয় করিয়া মারফতীভাবে নিজের পূর্বে ঘৃণিত বাসনা চরিতার্থ করিতে থাকে। এই প্রকার আবেশ নিতান্ত অস্বাভাবিক। ইহাতে উভয়েরই ক্ষতি। যে সূক্ষ্মদেহধারী কামুক প্রেতাত্মা আবিষ্ট হয়, তাহারও ক্ষতি হয়, আবার যে দুর্বলচিত্ত স্থূলদেহধারী ব্যক্তির দেহে ঐরূপ আবেশ ঘটে, তাহারও মহা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহার কুফল অবগত হইতে পারে সে কদাচ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র জীবনযাপনে প্রবৃত্ত হয় না। সকল সময়ে না হইলেও, কখন কখন উপরি-উক্ত হতভাগ্য অশরীরী ব্যক্তিগণকে কুসঙ্গ হইতে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়া উঠে। কুসঙ্গের হাত হইতে মুক্ত হইলেই দেখা যায়, তাহাদের মর্মন্তুদ অনুশোচনা আসিয়া দাঁড়ায়। স্থূল-জগতের ন্যায় সূক্ষ্ম-জগতেও মনুষ্যেরা হতাশ হইয়াই কখন কখন কুসঙ্গে মিশিয়া থাকে। প্রচলিত ধর্মের শিক্ষা অতীব নির্মম, অসম্পূর্ণ ও পাষণ্ডতাপূর্ণ। ঈদৃশী শিক্ষার প্রভাবে তাহারা বুঝিয়া লয় যে, তাহারা যে পাপ করিয়াছে, তাহার মোচন নাই, ক্ষমা নাই। তখন তাহারা নিরাশ হইয়া পড়ে, অপর গত্যন্তর নাই ভাবিয়া কুসঙ্গে মিশিয়া যায়। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, ধীরভাবে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে তাহাদিগকে নৈরাশ্য-পল্বল হইতে নিষ্ক্রান্ত করা যাইতে পারে। যে পল্বলের মধ্যে তাহারা অনবহিতভাবে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন তাহারা ভীত-চকিত হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে থাকে।

ধনলিপ্সা ও ঈর্ষা

সুরাপান বা লাম্পট্যের ন্যায় অন্যান্য বিস্তর পাপের পরিণাম ঐরূপ ভীষণই হইয়া থাকে। তবে পরিণামগুলিতে একটু একটু বৈশিষ্ট্য আছে বটে। কৃপণ ব্যক্তি যখন আর অর্থসংগ্রহ করিতে পারিতেছে না বা যখন তাহার সঞ্চিত অর্থে কোন শত্রুপক্ষের হস্তক্ষেপ আসিয়া পড়ে তখন

তাহার মনে কতটা যাতনা জন্মে, তাহা আমরা কল্পনা করিতে অসমর্থ। মৃত্যুর পর ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিব ঈর্ষানল জ্বলিতেই থাকে ; কেন না, তখন আর স্থূল-জগতে হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি তাহাব আদৌ থাকে না , বরং ঈর্ষার বেগ তখন আরও প্রবল হইয়া উঠে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ বিশেষ বিশেষ পাপেব বিষময় মোহনিবন্ধন প্রচণ্ডভাবে পার্থিব জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। পার্থিব জীবনে যে ব্যক্তি অন্যেব ভাল দেখিয়া অসূযাপীড়িত হয়, মরণান্তে তাহাব কিছুমাত্র জ্ঞানান্বেষ হয় না। অন্যের শ্রীবৃদ্ধিতে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা তাহাব আদৌ থাকে না, পার্থিব শ্রীতে শ্রীমান্ হইবার সম্ভাবনাও তখন তাহার নাই। অথচ উন্মাদেব মত পবশ্রীকাতবতাব বিষদংশন ভোগ কবিতে থাকে,—অসূয়া সর্বক্ষণই ঘোর স্বার্থের জৃম্ভণ। উহা চিরকালই অসঙ্গ ত। কিন্তু মৃত্যুব পব সচবাচব উহাব তরঙ্গ-স্ফীতি বডই ভীতিপ্রদ ও প্রচণ্ড হইযা উঠে। যে হতভাগ্য মানব এই অসূযা-বাক্ষসীব কবাল কবলে কবলিত, তখন আব তাহার বিন্দুমাত্রও বিবেক-বুদ্ধি থাকে না। যাহারা অর্থসঞ্চয় কবিযা যায়, সচবাচব ন্যূনাধিক পবিমাণে তাহাদিগকে উহাব জন্য উদ্বেগ পোহাইতে হয। এই উদ্বেগ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রকাশ পাইযা থাকে। কোন কোন প্রেতাত্মা ঐ সঞ্চিত অর্থবাশিকে সম্পত্তি মনে করিযা উহার প্রতি ঘোব আকৃষ্ট থাকে। প্রেত-দেহে যদিও সে উহার ব্যবহাব কবিতে পাবে না, তথাচ তাহার আসক্তি কমে না। পাছে কেহ ঐ অর্থ দেখিয়া ফেলে, পাছে কেহ উহাব অন্যায খরচ করে, এই ভয়ে সে সর্বদা সশঙ্ক থাকে। যেখানে ঐ অর্থ সংগোপনে সংগৃহীত থাকে, প্রেতাত্মা সেখানে চুপে চুপে গমন কবে অপহবণকাবীদিগকে ভয-প্রদর্শন কবিযা বিদূবিত কবাই তাহার উদ্দেশ্য। আবাব কোন কোন প্রেতাত্মা মনে কবে যে, তাহাব সন্তান-সন্ততিবা বা বন্ধু-বান্ধবেবা অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছে, অতএব তাহাব সঞ্চিত অর্থ তাহাবা গ্রহণ কবিযা ব্যবহাব কবিতে পাবিলে ভাল হইত। যতক্ষণ না ঐ অর্থ সন্তান-সন্ততিবা পায, ততক্ষণ তাহাব উদ্বেগেব সীমা থাকে না।

প্রতিহিংসা

মৃত্যুব পরেও মানুষ বৈরসাধন কবিযা থাকে। এরূপ কযেকটি ঘটনা বিগত ২০ বৎসরের মধ্যে লেড বিটাব সহেব জানিতে পারিয়াছেন। একটি অত্যদ্ভুত ঘটনার বিবৃতি Theosophical Review. vol xxii ৮১ পৃষ্ঠায সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত মহোদয এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

"আমাব জনৈক বন্ধুর একখানি ছোবা ছিল। কিংবদন্তী এই যে, যে ব্যক্তি ঐ ছোরাখানি হস্তে করিবে, ছোবাখানিব এমনি গুণ যে, তাহাবই মনে হইবে যে, কোন এক জন স্ত্রীলোককে উহা দ্বারা হত্যা কবি। আমাব বন্ধুটি একটু সন্দিগ্ধচিত্তেব লোক, কিন্তু তথাচ একটু সন্দিগ্ধভাবেই উহাব প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিতেন। আমাব বন্ধু এক দিন ঐ ছোরাখানি হস্তে লইযাছিলেন। যাই লওযা অমনি 'অসুস্থ' বোধ কবিলেন। তখন তাডাতাডি উহা ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন অনুসন্ধানে জানা গিযাছিল যে, কোন সময়ে উহাতে দুইটি স্ত্রীলোক নিহত হয়। পবীক্ষা করিযা দেখিবার নিমিত্ত আমি ঐ ছোবাখানি হস্তে ধবিযা স্থিব হইয়া বসিায বহিলাম। আমাব দেহেব মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রকারেব বেগ অনুভূত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল. যেন কোন ব্যক্তি আমাকে সরাইযা লইয়া যাইবাব নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে। আমি কিছুতেই নড়িব না সঙ্কল্প করিযা রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম, দেখা যাউক, ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়ায়। তখন দেখিলাম. আমার সম্মুখে একটা অসভ্য চেহারার লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। আকৃতি দেখিযা তাহাকে

পাঠান বলিয়া মনে করিলাম। লোকটিকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, আমি তাহার চেষ্টায় নড়ি চড়ি নাই বলিয়া সে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছে। সে আমাকে যে প্রবৃত্তি দিবার চেষ্টা পাইতেছিল, আমি তাহা সংবরণ করিতেছিলাম। এজন্যও তাহার ক্রোধ হইয়াছিল। আমি তাহাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমার কথা কিছুই বুঝিতেপারিল না। পরে জানিতে পারিলাম যে, ঐ ব্যক্তির স্ত্রী অপর পুরুষের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া উহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। পরে তাহাদিগকে কোন স্থানে একত্র দেখিতে পাইয়া এই ছোরা দ্বারাই উভয়কে হত্যা করে। ছোরাখানি ঐ ব্যক্তির নিজস্ব। ঐখানি এখন আমি ধরিয়া বসিয়া আছি। তারপরে ঐ ব্যক্তি স্ত্রীজাতির উপর প্রতিশোধ লইতে সঙ্কল্প করিল। এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া নিজের শালী ও অপর এক জন স্ত্রীলোককে নিহত করে। তার পরে নিজেই নিহত হয়। ইহার পরে ঐ ব্যক্তির প্রেতাত্মা ছোরাখানিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। এই ঘটনার পরে ছোরাখানি যাহারই হস্তে স্থান পাইয়াছে, ঐ প্রেতও তাহাতে আবিষ্ট হইয়া তাহাকে রমণীনিধনে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। ঐ ভূতাবিষ্ট ছোরা দ্বারা অনেক রমণী নিহতও হইয়াছে। তখন ঐ প্রেতের বর্বরোচিত স্ফূর্তি দেখে কে। প্রেতের প্রদত্ত প্রবৃত্তির পরিপন্থী হওয়ায় আমার উপর তাহার মহা ক্রোধ। সে আশা করিয়াছিল যে, আমি ঐ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইব না। আমার কথা সে বুঝিতে পারিল না দেখিয়া, এক জন ভারতীয় বন্ধুর উপরে তাহাকে বুঝাইবার ভার ন্যস্ত করিলাম। আমার সেই বন্ধুটি তাহাকে বুঝাইয়া সৎপথে আনিল। তখন ঐ প্রেত বলিল যে, ছোরাখানি ভাঙ্গিয়া ফেলাই উচিত। আমি তখন উহা মাটিতে প্রোথিত করিলাম। * * *

ঐ পাঠানভূত না বলিলেও আমি উহা ভাঙ্গিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতাম। তথাচ তাহার সম্মতি লইয়া ঐরূপ করাই ভাল হইয়াছিল মনে হয়।"

আর একটি প্রেতেরও ঐরূপ প্রতিহিংসা-বৃত্তি দেখা গিয়াছিল। এ ব্যক্তি উপরি-উক্ত পাঠান অপেক্ষা অনেক সভ্য। সভ্য হইলেও প্রতিহিংসাবৃত্তি কম নহে। লোকটি কামাসক্ত এক জন বৃদ্ধ। দ্যূতক্রীড়ার সেবা করিয়াও অসংযতভাবে জীবন যাপন করিয়া লোকটি প্রভূত অর্থ অপব্যয় করে। অসংযমের মাত্রা খুব বর্ধিত হইলে তাহার বন্ধুবান্ধব তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিল। সে তখন আত্মহত্যা করিয়া বসিল। আত্মহত্যা করিবার সময় বলিয়া গেল, সংসারের লোকেরা অকৃতজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছে বলিয়াই আমি আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইলাম , আমি ইহার প্রতিশোধ লইব ; যত দূর পারি, আমিও অপর অপর ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিতে ছাড়িব না। এইরূপে প্রতিশোধে প্রবৃত্ত হইয়া সে প্রায় ৬০ বৎসরকাল নিজের মরণের স্থানটিতে বিচরণ করিয়াছিল। কোন দুর্বলচিত্ত ব্যক্তিকে পাইলেই তাহাতে আবিষ্ট হইয়া তাহাকে আত্মহত্যা করিতে প্রণোদিত করিত। তাহার উত্তেজনা বশতঃ কোন ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করিয়া বসিলে তাহাকে ঐ প্রেত ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া ফেলিত।

'লুসিফার' নামক সংবাদপত্রে কয়েক বৎসর পূর্বে আর একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। ব্যাপারটি আরও বিস্ময়কর। বিবরণটিতে জানা গিয়াছে যে, এক জন এঞ্জিন-চালকের প্রেতাত্মা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের হত্যা-কামনায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিল। গল্পটি খুব বড় বলিয়া উদ্‌ধৃত করিলাম না। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, প্রায়শঃ এইরূপ প্রেতাত্মাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, তাহার কার্য অতীব গর্হিত। তখন তাহার প্রকৃত তীব্র অনুতাপ আসিয়া দেখা দেয়।

গ্রীস্‌দেশীয় পুরাণোক্ত সিসিফসের ভাগ্যের বিষয় স্মরণ করুন। অনন্তকাল ধরিয়া একটি গুরুভার বিপুল শিলাখণ্ড গড়াইয়া গড়াইয়া উর্ধদিকে পর্বতশিখরে তাহাকে তুলিতে হইবে ;

আবার যাই শিখরের অতি নিকটে যাইবে, অমনি উহা ভূপতিত হইবে। অবস্প্রকার বিধিনির্দিষ্ট ব্যবস্থা। যাহারা ঐহিক বাসনাজালে জড়ীভূত, তাহাদের পারলৌকিক জীবন ঐ সিসিফসের ঠিক অনুরূপ। বাসনা-তাড়িত ব্যক্তি ঐহিক জীবনে শুধু স্বার্থপ্রণোদিত জল্পনা-কল্পনা করিয়া থাকে। মরণান্তেও তাহার ঐ প্রবৃত্তির বিরতি ঘটে না। বেশ সাবধানতা পূর্বক সে একটি মতলব স্থির করে, করিয়া বড়ই স্ফূর্তি অনুভব করে। যাই মতলব স্থির হইয়া গেল, অমনি মনে পড়িল যে, উহা সিদ্ধ করিতে স্থূল-দেহের প্রয়োজন ; কিন্তু এখন স্থূল-দেহ নাই! তখন সমস্ত আশা ঐ বিপুল শিলাখণ্ডের মত ভূপতিত হইয়া পড়ে। কিন্তু—প্রবৃত্তি এমনি প্রকৃতিগত যে, আশা বিনষ্ট হইলেও ঐ ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আশারূপ শিলাখণ্ডকে আকাঙ্ক্ষা শিলাখণ্ডকে আকাঙ্ক্ষা-শৈল-শিখরে তুলিবার চেষ্টা করে। এইরূপ করিতে করিতে তাহার পাপের ক্ষয় হইয়া যায়। পরিশেষে সে স্থির করে যে, ঐ শিলাখণ্ড আর টানিয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। তখন সে উহা পর্বতের পাদমূলে ফেলিয়া রাখে।

সূক্ষ্ম-জগতে চিন্তার মূর্তি

মানুষের যে সকল চিন্তা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট, যাহা স্বকীয় লাভ-বাসনায় সুরঞ্জিত, সেগুলি সূক্ষ্ম জগতের স্থূলতর বিভাগে মূর্তিমতী হইয়া তাহার চতুর্দিকে অবস্থিত থাকে। যে ব্যক্তি সতত স্বার্থ-জড়িত চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে, সে অত্যুৎকট চিন্তার মূর্তি গঠিত করিয়া বসে। চিন্তার পৌনঃপুন্যে ঐ মূর্তিও ক্রমে ক্রমে শক্তিশালিনী হইতে থাকে। পার্থিব দেহে ঐ মূর্তি মানুষ দেখিতে পায় না। দেখা না গেলেও উহার প্রভাব মানুষ বুঝিতে পারে। মূর্তির অনুরূপ চিন্তা পুনঃ পুঃন করিতে ইচ্ছা হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা হওয়া ব্যাপারটাই ঐ মূর্তির প্রভাব। কিন্তু মানুষ মরিয়া গেলে, ঐ চিন্তা-নিচয় মূর্ত হইয়া তাহার অনুসরণ করে। উহাদের হাত হইতে পালাইয়া নিস্তার পাইবার যো নাই। কেন না, উহার সহিত মূর্তিগুলি প্রকৃতিগতভাবে সংশ্লিষ্ট। উহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে মানুষকে মনে করিতে হইবে যে, ঐ চিন্তাগুলি বড়ই বিশ্রী, বড়ই ঘৃণিত। তার পরে ঐগুলি প্রশ্রয় না পায়, তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কখন কখন মানুষের চারিদিকে অপরিমিত চিন্তা মূর্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। সে চিন্তা তাহার নিজের নহে, মূর্তি তাহার গঠিত নহে। অপর কোন ব্যক্তি হয় তো তাহার সম্বন্ধে আকুল প্রাণে চিন্তা করিয়াছে। সেই চিন্তা অনুকূলই হউক আর প্রতিকূলই হউক, স্নেহ-ভালবাসা-নিঃসৃতই হউক আর বিদ্বেষব্যঞ্জকই হউক, উহা মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নিশ্চয়ই তাহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া দাঁড়াইবে। শুধু তাহাই নহে। উহার পরিস্পন্দ-বেগ ঐ ব্যক্তি অনুভব করিতে থাকিবে। মৃত ব্যক্তির অনুকূলে আমরা যদি স্নেহ-ভালবাসা-সিক্ত চিন্তা করি, যদি আকুল প্রাণে তাহার জন্য শুভ কামনা করি, তবে তাহার ফলে এইরূপ মৃত ব্যক্তির মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে। আমরা ইচ্ছা করিলে আমাদের মৃত আত্মীয়কে সুন্দর স্নিগ্ধ মূর্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত রাখিতে পারি। তাহার ফলে সে চতুর্দিকে মনোমুগ্ধকর আভা দেখিতে পাইবে। তখন কোন প্রকার অশুভকর প্রভাব তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারিবে না। সেই মনোহারিণী আলো, সেই অনুকূল আবরণ তাহার প্রাণের মধ্যে সাহানুভূতি ও স্নেহের ভাব জাগাইয়া তুলিবে। শুধু তাহাই নহে, তাহার প্রাণের যাবতীয় অশান্তি দূরীভূত করিয়া দিবে। "দৃশ্য ও অদৃশ্য মানব" নামক গ্রন্থের (Man Visible and Invisible) ৯ নম্বর ছবিতে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা চিন্তাকারীর সূক্ষ্ম-দেহের

স্নেহসিক্ত চিন্তাব প্রতিমূর্তি দেখিতে পাই। মিসেস বেশান্ত ১৮৯৬ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরের সংখ্যা 'লুসিফার' নামক সংবাদ-পত্রে "চিন্তামূর্তি" নামক যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ছবিগুলির মধ্যেও চিন্তার মূর্তি বিদ্যমান আছে। যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ঐ চিন্তা করা হইয়াছিল, মূর্তিগুলি তাহাব অভিমুখে খুব বেগে প্রধাবিত হইতেছে।

অন্যান্য প্রকার চিন্তামূর্তিও দেখা যায়। সেগুলি তত সুখদায়িনী নহে। মানুষ স্থূলদেহে যাহাদের সহিত দুর্ব্যবহার করে, মৃত্যুর পর সে তাহাদের চিন্তা-মূর্তি দ্বাবা পরিবেষ্টিত হয়। এই সকল মূর্তি দ্বারা এইরূপ ভাবে উত্তেজিত হওয়ায় তাহার পূর্বকৃত দুর্ব্যবহারের অনেকটা প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যায়। এই সকল মূর্তি হইতে স্পন্দন নিঃসৃত হইতে থাকে। তাহাকে ঐ স্পন্দন-বেগ সহ্য কবিতে হয়। আবার যাহাকে সকলেই ভালবাসে, তাহার প্রতি প্রীতিপূর্ণ চিন্তা নিঃসৃত হওয়ায় ঐ চিন্তা-স্রোতে তাহার উর্ধ্বগতি পরিবর্ধিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যাপারেব একটা জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরিযার উদ্দেশে কোটিকোটি ব্যক্তির প্রীতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা-ব্যঞ্জক চিন্তা-মূর্তি নিঃসৃত হওয়ায় তিনি অতি সত্বর স্বর্লোক উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন। তা ছাড়া তাঁহার স্বকীয় সদ্‌গুণও তাঁহাব সত্বব স্বর্গপ্রাপ্তিব সহায হইযাছিল।

দুর্ভাগ্যশতঃ কোন কোন ব্যক্তি অনেকেব অবিশ্বাস বা বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়ে। তাহাদেব উপব কাহাবও স্নেহ-ভালবাসা থাকে না। যাহাবা তেজারতি, মহাজনী প্রভৃতি দ্বাবা নির্মমভাবে শত শত লোকেব সর্বনাশসাধন কবিযাছে, মৃত্যুব পব তাহাদেব ভয়াবহ অবস্থা আসিযা উপস্থিত হয। তাহাদেব চতুর্দিকে পুঞ্জ পুঞ্জ চিন্তা-মূর্তি নিবন্তব জমাট বাঁধিয়া দাঁড়ায় ও ভযপ্রদর্শন কবিতে থাকে। তখন তাহাবা অতীব ভীত হইয়া পড়ে। অনুতাপেবও পরিসীমা থাকে না। চিন্তা-মূর্তিগুলি স্বতন্ত্র জীব হহে। তাহাদের অবস্থিতিও নির্দিষ্টকাল-সাপেক্ষ। চিন্তাকাবীব চিন্তাব বেগ অনুসাবেই মূর্তির স্থায়িত্ব নিযমিত হইয়া থাকে। তথাচ, যাহাকে এই চিন্তা-মূর্তি পরিবেষ্টিত কবিযা দাঁড়ায়, উহাব হাত হইতে তাহার পলাইযা নিস্তাবপাইবাব যো নাই। কেন না, তাহাব প্রতিআকর্ষণই এই মূর্তিব উদ্ভবের বা অস্তিত্বেব মূল কাবণ। এই পীডিত ব্যক্তি নিজেব চাবিদিকে একটি কবচ গঠন কবিয়া লইতে পারে। কিরূপভাবে উহা গঠন করিতে হয, অবশ্য তাহা জানা চাই। ঐ আববণে মূর্তি-নিঃসৃত পীডনকাবীর পরিস্পন্দ প্রতিহত হইযা যায়। জানা থাকিলে ঐ ব্যক্তি ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চিন্তা-মুক্তি-নিচয় চূর্ণ-বিচূর্ণ কবিযা ফেলিতে পাবে। কিন্তু যতক্ষণ উহা বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ উহাই গুগ্‌লি-শামুকেব ন্যায় দৃঢ়ভাবে মৃত ব্যক্তিতে সংলগ্ন দেখা যায়। মৃত ব্যক্তিব কাছে ঘুবিযা ঘুবিয়া বেডায়, কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চায না। সাধাবণতঃ ভিন্ন ভিন্ন লোকের নিকট হইতে নিঃসৃত হওয়ায় চিন্তা-মূর্তিগুলিও স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিতি কবে। প্রত্যেক মূর্তিই চিন্তাকাবী ব্যাক্তির মানসিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন কবে। কিন্তু কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, চিন্তামূর্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিব চিন্তা-নিঃসৃত হইলেও উহাবা সং-মিলিত হইয়া একটা বিকট অপদেবতাব মূর্তি পরিগ্রহ কবিয়া বসে। এই বিকট মূর্তিটি যদি আবাব প্রতিকূল প্রকৃতি-সম্পন্ন হয়, তবে তাহার ফল অতীব ভীষণ হইয়া থাকে।

অষ্টম অধ্যায়

ব্যভিচারিণীর পরিণাম

যাঁহারা পারলৌকিক ব্যাপাবেব অনুসন্ধ্যানে প্রবৃত্ত, তাঁহারা এক জন ব্যভিচাবিণীব পবিণাম অবগত হইতে পাবিযাছেন। আমরা সে বিষয়টি এখনই বলিতেছি। তাহাতে অনেক স্ত্রীলোক সাবধান হইতে পাবিবেন। ব্যাপাবটি অতি অল্পদিন ঘটিয়াছিল। একটি যুবতী রঙ্গালয়ে কোন কর্মে নিযুক্ত হয়। শাবীবিক সৌন্দর্য তাহার বেশ ভালরূপ ছিল। স্ত্রীলোকটি গর্বিতা ও হৃদয়হীনা। নির্বোধ ও লম্পট যুবকবৃন্দেব উপর প্রভাব বিস্তাব কবিয়া সে পৈশাচিক আনন্দে উৎফুল্ল থাকিত। সে গর্ব কবিয়া বলিত যে, তাহাবই জন্য দুইটি দ্বন্দ্বযুদ্ধ ও একটি আত্মহত্যা ঘটিযাছে। উহা ছাড়া শত শত ব্যক্তিব হৃদয ভাঙ্গিযাছে। যাহা হউক, হঠাৎ তাহার শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। সে যে সকল ব্যক্তিব সর্বনাশ কবিযাছিল, যাহাদিগকে প্রতাবিত কবিযাছিল, তাহাদিগেব ক্রোধ ও বিদ্বেষ ভূবর্লোকে তাহাব সমক্ষে আসিযা উপস্থিত হইল। বিস্তব ব্যক্তিব ঘনীভূত ক্রোধ ঘৃণা সংমিলিত হইয়া এ ক্ষেত্রে একটি বিকট মূর্তি ধাবণ কবিযাছিল। মূর্তিটি দেখিতে একটি বিপুলকায় কদাকাব গেবিলা জন্তুব মত। এই অপ্রীতিকব সঙ্গীর সর্বাঙ্গ যেন ক্রূরতায পূর্ণ। ইহাব সাহচর্যে স্ত্রীলোকটি যাব-পব-নাই ভীত হইযা পডিল ; ইহার নিকটা হইতে পবিত্রাণ পাইবাব প্রযাস পাইতে লাগিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কিছুতেই এই বিকট মূর্তি তাহাকে ছাডিল না। যে সকল পবাবিদ্যাবিদ্ মহাত্মা এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ কবিতেছিলেন, তাঁহাবা অচিরাৎ এই অনিষ্টপ্রবণ মূর্তিটিব ধ্বংসসাধন কবিলেন। কিন্তু তথাচ ঐ পাপনিরতা যুবতীর প্রেতাত্মার বিশেষ উপকার কিছুই হইল না ; কেন না, দুর্ভাগ্যবশতঃ পার্থিব জীবনে সে নিতান্ত অপদার্থ ছিল। স্থূল-জগতে একটি জীবন নষ্ট কবা যেরূপ গুরুতব ব্যাপাব সূক্ষ্মজগতেও তদ্রূপ। কিন্তু উপবি-উক্ত প্রকার চিন্তামূর্তি যতই সজীব ও ভযানক হউক, উহা একটি ক্রমোন্নতি-সম্ভূত জীব নহে। উহা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয-সঞ্জাত অস্থায়ী সৃষ্টিমাত্র। একটা মৃন্ময় পাত্র ধ্বংস কবিলে যেমন কোনরূপ প্রত্যবায় হয না, ঐ মূর্তির বিলোপসাধন কবিলেও তদ্রূপ কোন পাপ ঘটে না।

পাপের পরিণাম

এই পৃথিবীতে যে সকল পাপকার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সূক্ষ্মজগতে সেই সমুদয়ের ফল ভিন্ন ভিন্ন প্রকাবে ফলে। কিন্তু সে ফলগুলি অতীব ভযঙ্কর। পাপানুষ্ঠানের ফল কিরূপভাবে ফলে, তাহাব অনেকগুলি বিবরণ পরিবর্তী অধ্যাযে বিবৃত হইবে। একটি উদাহরণ দেখ : অনেক সময দেখা যায যে, হত্যাকাবী মরিয়া গেলে তাহাব পূর্বকৃত পাপের স্মৃতি পুনঃ পুনঃ তাহার মনে জাগিতে থাকে। নিবন্তবভাবে হিংসাপ্রবৃত্ত ভীতিজনক চিন্তা করিতে করিতে একটি মূর্তিব উদ্ভব হয়। মূর্তি সেই পূর্বকৃত ভযঙ্কব পাপের এই অনুষ্ঠানক্ষেত্রে নিঃশব্দে বিচরণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে পাপী যে সুতীক্ষ্ণ যাতনা অনুভব করে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তিকে চিন্তার প্রেত-মূর্তিগুলি নিরন্তর অনুসরণ করে, তাহার যাতনা আরও উৎকট। এইরূপ একটা ব্যাপার

জানা গিয়াছে। কি নিয়মে পুনর্জন্ম নিয়মিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে যাইয়াই কয়েক জন মহাত্মা ঐ ব্যাপারটা জানিতে পারিয়াছেন। আরবজাতীয় দুইটি লোক একত্র বাস করিত। দুই জনের মধ্যে বিশেষরূপ সৌহার্দ্য ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা উভয়েই একই যুবতীর আসক্ত হইয়া পড়ে। ব্যাপারটি পরিব্যক্ত হইলে উহাদের একজন অপরের প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠে। পাছে ঐ রমণী অপরের প্রতি প্রসন্ন হয়, এই ভয়ে সেই ক্রুদ্ধ ব্যক্তি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাহার পথ হইতে অপসারিত করিবার যোগাড় করিতে লাগিল। সে নিজের হাতে হত্যা করিল না বটে, কিন্তু মিথ্যা প্রমাণ দিয়া তাহাকে শত্রুপক্ষের হস্তে ধরাইয়া দিল। তাহার ফলে উহার প্রাণদণ্ড হইল। এই ঘটনার অতি অল্পদিন পরেই সেই যুবতী অন্য এক ব্যক্তির উপর কৃপা-কটাক্ষ করিল , কেন না, ষড়যন্ত্রকারী যুবকের প্রতি তাহার একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল না। তখন সেই প্রেমিক বিফলমনোরথ হইয়া স্বীয় পাপ-কর্ম স্মরণ করিয়া ভীত হইয়া পড়িল। তার পরেই আত্মহত্যা করিয়া বসিল। এইরূপে যুবকদ্বয় তরুণযৌবনেই ভূবর্লোকে যাইয়া উপনীত হইল। অতি অল্পদিন পরেই এক জন অপরের অনুসরণ করিয়াছিল! ভূবর্লোকে তাহাদিগের অবস্থিতি অতি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া হইয়াছিল। তাহা হইলেও তাহাদিগের অবস্থা একরূপ দাঁড়াইল না। নিহত ব্যক্তির অবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহার একটা উদাহরণ আমরা ইতিপূর্বেই বিবৃত করিয়াছি। জীবিতকালে মনোভাব ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে নিকৃষ্ট জড়াংশ নিয়োজিত না করায় ঐ নিহত ব্যক্তি এক্ষণে ভূবর্লোকে যাইয়া তাহার পারিপার্শ্বিকনিচয় সম্বন্ধে ঘোর অনভিজ্ঞ। সূক্ষ্মদেহের জড়াংশবিন্যাসে এক্ষণে সে ভুবর্লোকের অতীব নিম্নস্তরে আবদ্ধ। অপর পক্ষে হত্যাকারী যুবককে তত্রত্য অতীব অপ্রীতিকর অবস্থার অবনতি ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাহার সূক্ষ্মদেহও অপেক্ষাকৃত স্থূলতর হইয়াছিল। কেন না, জীবিতকালে তাহার নিকৃষ্ট জড়াংশের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

পার্থিব জীবনের ঘটনা-সংশ্লেষের ফলে এই শেষোক্ত যুবককে পাপের ফলভোগ করিতে হইল। পাপের ফল যতটুকু বর্ণনা করা হইল, তাহাতে মনে হয়, উহা যেন কিছুই নহে। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী ত্রিবিধ প্রকার বহুদর্শিতায় জানা গিয়াছে যে, ঐ ভোগ অতীব ভয়ঙ্কর ব্যাপার। মানুষ যেমন কাজ করিয়া যায়, মৃত্যুর পরে অবিকল তদ্রূপ ফল ফলিতে থাকে। ভয়ঙ্কর কাজের ফলেভোগ ভয়ঙ্করই হইয়া থাকে। যিনি সূক্ষ্ম জগতের তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি কোন ব্যক্তির পার্থিব জীবনের কাজ দেখিয়াই তাহার ভুবর্লোকের ভাবী জীবন-প্রবাহের বর্ণনা করিতে পারেন। বন্ধুর শঠতা পরিজ্ঞাত না হইয়াই নিহত ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাই বন্ধুর প্রতি তাহার স্নেহভালবাসা অক্ষুণ্ণই ছিল। এই নবীন জীবনে যদিও তাহার পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কোন প্রকার অনুভূতি ছিল না, তথাচ তাহার ঐ অন্তর্নিহিত স্নেহ-ভালবাসা হত্যাকারী বন্ধুর নিকটে আসিবার উদ্দেশ্যে তাহার প্রাণে একটা ইচ্ছা জাগাইয়া দিয়াছিল। হত্যাকারী ব্যক্তির জীবাত্মা অনির্বচনীয় ভয়ে ভীত হইয়া উহার সম্মুখ হইতে পালাইয়া পরিত্রাণ পাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। ভয়ানক স্থানে, ভয়ানক ভয়ানক লোকের মধ্যে, অতীব ঘৃণিত দৃশ্যের মধ্যে যাইয়া লুক্কায়িত হইল। এইরূপে লুক্কায়িত হইয়া যখনই আপনাকে নিরাপদে মনে করে, অমনই নিহত বন্ধুর জীবাত্মা সেখানে তাহার পশ্চাতে যাইয়া বিদ্যুদ্বেগে উপস্থিত হয়। অনুসৃত বন্ধুর ভয়াবহ পারিপার্শ্বিকের বিষয় বা তাহার উৎকট উৎকণ্ঠার বিষয় নিহত বন্ধু কিছুই অবগত ছিল না। মাত্র পূর্বকালীন স্নেহভালবাসার টানে অনুসরণ করিতেছে, অথচ যাহাকে অনুসরণ করিতেছে, তাহার দুর্দশার বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না, এইটুকুই আরও ভয়ানক ব্যাপার হইয়া উঠিল।

নিহত বন্ধু তাহার হত্যা-বিষয় কিছুই অবগত ছিল না ; তাহার প্রাণ সৌহার্দ্য, স্নেহ-ভালবাসায় পরিপূর্ণ। অথচ অনবগত থাকিয়াও স্বীয় হত্যাকাণ্ডের এরূপ ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ লইতে লাগিল, এইটুকুই একটা অদ্ভুত উৎকট তামাসা। এবম্প্রকার অনুসরণ ও পলায়ন বহু বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকে। দোষী ব্যক্তির নিকটে সেই সময়টা অতীব সুদীর্ঘ বলিযা বোধ হয় , তখন তাহার অনুতাপের পরিসীমা থাকে না। পরে অল্প অল্প করিয়া বাহিরাবরণ স্খলিত হইতে থাকে, তখন উভয়ের মধ্যে একটা মীমাংসা হইয়া যায়।

প্রতিভাশালী ব্যক্তি

যে সকল ব্যক্তির কোন প্রকাব বৈশিষ্ট্য নাই, যাহারা সাধারণ মানব অপেক্ষাও নিম্নস্তবের, আমরা তাহাদেব বিষয় আলোচনা কবিয়াছি। যাহাদেব অন্তরে বিশ্বরূপ উৎকট স্বার্থের জল্পনা খেলিতে থাকে অথবা যাহারা দুষ্কৃতি-জড়িত, তাহারই নিম্নস্তবের মানব।

যাহারা সাধারণ মানব অপেক্ষা অধম হইলেও কোন কোন বিষয়ে একটু সঙ্গতভাবে চলে, আমরা এক্ষণে তাহাদিগের আলোচনায প্রবৃত্ত হইব। এবংবিধ ব্যক্তিবর্গেব নিকটে পারলৌকিক জীবনটি কিরূপ হইযা দাঁড়ায, তাহা সম্যক্‌রূপে অনুধাবন কবিতে হইলে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অধিকাংশ ব্যক্তিকেই পার্থিব জীবনে অনিচ্ছাব সহিত, মাত্র জীবিকা-নির্বাহেব জন্য মাত্র পোষ্যবর্গেব প্রতিপালনের নিমিত্ত অনেক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া জীবন ও শক্তির বেশী অংশ ব্যয় করিযা ফেলিতে হয। আতিবাহিত দেহীর গ্রাসাচ্ছাদন বা বাসস্থানেব প্রায়োজন নাই , সুতবাং সূক্ষ্ম-জগতে যখন তাহাব জীবিকা অর্জনেব আবশ্যকতা থাকে না, যখন পোষণকাবীর পবিশ্রমেব যাবতীয় প্রয়োজন বিদূযিত হয, তখন তাহাব অবস্থাটি কিরূপ হইয়া উঠে, একবাব তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। পার্থিব জীবনেব বাল্যকাল হইতে আব এই সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহধাবণ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়েব মধ্যে স্বাধীনভাবে স্বীয অভীপ্সিত কার্য কবিবার এইটিই তাহার সুবর্ণ-সুযোগ। কার্য কবিবাব স্বাধীনতা সূক্ষ্ম-জগতেই খুব বেশী। স্থূল ভৌতিক জড়-দেহাতিরিক্ত হইয়া কার্য করা যতটা সম্ভব, সূক্ষ্ম-দেহে অবশ্য ততটুকুই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

মনে করুন, কোন ব্যক্তি পার্থিব দেহে খুব সঙ্গীতপ্রিয় ছিল। মরণান্তে সূক্ষ্ম-জগতে ঐ ব্যক্তি পৃথিবী-নিঃসৃত যাবতীয় উৎকৃষ্টতম সঙ্গীত শ্রবণেব সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। পার্থিব দেহে সে সঙ্গীতেব মিষ্টত্ব যতটুকু অনুভব কবিতে পাবিত, এক্ষণে এই নবীন অবস্থায় অবস্থিত হইযা তদপেক্ষা অনেক বেশী অনুভব কবিতে পাবিবে , কেন না স্থূল শ্রবেণেন্দ্রিয়ের অবিষযীভূত অপর অপর পূর্ণাঙ্গ স্বব-লহরী এই সূক্ষ্মদেহে তাহাব আযত্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পার্থিব জীবনে শিল্পের অনুবাগী, যে ব্যক্তি গঠন ও বর্ণের সৌন্দর্যে প্রীতি অনুভব কবে, মরণান্তে উচ্চতব জগতেব যাবতীয় সৌন্দর্যরাশি তাহার সমক্ষে উন্মুক্ত হইয়া থাকে। তখন ইচ্ছানুসাবে সে তাহা ভোগ কবিতে পাবে। সে ব্যক্তি নৈসর্গিক সৌন্দর্যানুরাগী, সূক্ষ্ম-জগতে এই সৌন্দর্য উপভোগ করিবার সম্ভাবনা তাহাব খুব বেশী ; কেন না, তখন সে ইচ্ছামাত্রই দ্রুতবেগে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পবিভ্রমণ করিযা বাশি বাশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে। স্থূলদেহীব পক্ষে তাদৃশ উপভোগ বহু-বৎসবসাপেক্ষ। পার্থিব দেহে যদি কোন ব্যক্তি বিজ্ঞান বা ইতিহাসে অনুরক্ত থাকে, মরণান্তে সে দেখিতে পায় যে, পৃথিবীব যাবতীয় পুস্তকাগাব ও

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার তাহার আয়ত্ত। এতদবস্থায় সে দেখিতে পায় যে, রসায়নবিদ্যা বা প্রাণিবিদ্যার নিগূঢ় তত্ত্বগুলি এখন তাহার কাছে অতীব পরিস্ফুট। পার্থিব দেহে যাহা ভাল করিয়া অনুধাবন করা যাইত না, এখন তাহা অতীব সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতেছে ; কেন না, এখন বাহ্য ও অন্তর উভয় দিক্ই তাহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত। এখন সে বিস্তর কার্য কারণ দেখিতে পায়। একটি আনন্দের বিষয় এই যে, এতদবস্থায় কাহাকেও একটা ক্লান্তি ভোগ করিতে হয় না। পার্থিব দেহে কোন একটা বিষয়ের আলোচনাকালে বা কোন একটা বিষয়ের পরীক্ষা-সময়ে আমরা কতকটা অগ্রসর হইযাই যেন আর পারিয়া উঠি না ; আমরা নিরন্তরই এইরূপ একটা ক্লান্তি অনুভব করিয়া থাকি। কেন না, আমাদের মস্তিষ্ক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপ সহ্য করিতে পারে, তার বেশী পারে না। স্থূল-জগতের বাহিরে ক্লান্তি বলিযা কোন কিছু নাই ; কারণ, মন কখন ক্লান্ত হয না, বাস্তবিক পক্ষে মস্তিষ্কই ক্লান্ত হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে, বিস্তর বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম-জগতে যাইযা বিপুল উৎসাহে অধ্যয়ন ও পরে গবেষণায় নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন। যখন তাঁহারা পার্থিব দেহে জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের একটা উৎসাহ ছিল না। পড়া-শুনা, আগ্রহ সূক্ষ্ম-জগতেই অধিক হয , কারণ, তখন প্রশস্ততর সুযোগ সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে, গবেষণার অনুকূল নূতন নূতন বৃত্তিও এই সময আয়ত্ত হইযা থাকে। মহামতি লেড্ বিটার বলিতেছেন যে, তাঁহার এক জন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন বন্ধুর সহিত এক জন প্রতিথনামা গতাসু গণিতজ্ঞের সাক্ষাৎ হইযাছিল। এই গণিতজ্ঞ অতি অল্পদিন হইল মারা গিযাছিলেন। সূক্ষ্ম-জগতে যাইযা ইনি কয়েকটা নূতন বিষয়ের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হওয়ায় ইঁহার আনন্দের সীমা নাই। গণিতবিজ্ঞানের উচ্চতর জটিল বিষযের সমাধান করিয়া সেইগুলি পৃথিবীতে অবিলম্বে প্রচার করিবার নিমিত্ত ইনি উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই বিস্ময়কর নবীন আবিষ্কারগুলি সেই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি তদীয় স্থূল মস্তিষ্কের সাহায্যে অনুধাবন বা প্রচার করিতে অসমর্থ হওযায় গণিতজ্ঞ জীবাত্মা উহার উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন। ঘন-ক্ষেত্রাতিরিক্ত স্থানের অনুভূতি করিতে পারিলেই ঐ আবিষ্কারনিচয় হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হইতে পারিত। এই ঘন-ক্ষেত্রাতিরিক্ত স্থানের বিষয় পরবর্তী একটি অধ্যাযেই বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করা যাইবে।

নিঃস্বার্থ শ্রমিক

এ পর্যন্ত শুধু স্বার্থজড়িত উপভোগের কথাই বলা হইযাছে। কথাগুলি যদিও সঙ্গত, যদিও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচাযক, তথাপি সকলের উহাতে তৃপ্তি জন্মিতে পারে না। এমন বিস্তর লোক আছেন, যাঁহারা এতদপেক্ষা বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত সন্তোষলাভ করিতে পারেন না। অপর ব্যক্তির সেবাতেই ইঁহারা সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ পাইযা থাকেন। অপরকে সেবা করিতেই পারিলেই ইঁহারা নিজের জীবন সার্থক মনে করেন। সূক্ষ্ম-জগতে এই সেবাধর্মী ব্যক্তিদিগের কিরূপ দশা হইযা থাকে? স্থূল-জগৎ অপেক্ষা সেখানে তাঁহারা অধিকতর আগ্রহের সহিত পরোপকার-ব্রতে ব্রতী হযেন। এই ব্রতসাধনের সুযোগও সেখানে সুন্দরতর। সূক্ষ্ম-জগতে সহস্র সহস্র সাহায্য প্রার্থী জীবাত্ম আছে। সেবাধর্মীরা তাহাদিগের বাস্তবিকই সাহায্য করিতে পারেন। সেরূপভাবে পরোপকার করা পার্থিব দেহে সম্ভবপর হয় না। সূক্ষ্ম-জগতের ঐ সকল সেবাধর্মীদিগের মধ্যে কেহ কেহ সর্বসাধারণের উপকারসাধনে ব্যাপৃত থাকেন। আপন আপন জীবিত বা মৃত পরিবারবর্গে বা বন্ধু-বান্ধবের উপকারে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করেন। "জীবিত বা

মৃত" শব্দ প্রয়োগে একটা অদ্ভুত সত্য-বিপর্যাস মনে আসিতে পারে। আমরা এই স্থূল, আবদ্ধকাবী, ভৌতিক দেহে নিবদ্ধ রহিয়াছি, অতএব আমরা নিশ্চয়ই মৃত। যাহারা আমাদিগেব মত আবদ্ধ নহে, আমাদিগের অপেক্ষা মুক্ত ও অধিকতর কর্মপটু, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে জীবিত। যে মাতা মরণান্তে ঐ উচ্চতর জীবনে উপনীত হইযাছেন, তিনি নিরন্তরই তাঁহার পার্থিব সন্তানের শুভাশুভেব প্রতি দৃষ্টি রাখেন ; তিনি সন্তানের ঠিক যেন রক্ষয়িত্রী দেবদূতী হইযা দাঁড়ান। 'মৃত' স্বামী শোকার্তা পত্নীর অতি নিকটেই সতত অবস্থান করেন। জীবিতকালে পার্থিব দেহে তিনি যেমন পত্নীর কাছে কাছে থাকিতেন, এখনও সেইরূপই থাকেন, এই সত্যটুকু যদি কোনরূপে স্ত্রীকে জানাইতে পারেন, যদি কোনরূপে বুঝাইতে পাবেন যে, তিনি পত্নীকে এখনও সেইরূপ ভালই বাসেন, তবে বড়ই প্রীত ও কৃতার্থ বোধ করেন।

শেযোক্ত ঘটনার অনুরূপ একটি ঘটনা কতিপয় বৎসর পূর্বে জানা গিযাছিল। এ স্থলে পত্নী দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন। তাই তিনি গতাসু স্বামীব সাহচর্য অনুভব করিতে পাইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি স্বতশ্চল লিখন-সাহায্যে স্বহস্তে পবলোকগত স্বামীর নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহও করিতেন। কযেক বৎসর যাবৎ তিনি এইরূপ কবিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন পরবিদ্যা-সমিতিব সংস্রবে আসিয়া এতদ্‌বিদ্যা-বিষযক পুস্তক পাঠ করিযা অবগত হইলেন যে, পরলোকগত জীবাত্মদিগকে ঐ প্রকারে আনয়ন করা যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহাতে তাঁহাদের অগ্রগতির পক্ষে বিলম্ব ঘটে, তখন সেই পত্নী কিয়ৎপবিমাণে উৎকণ্ঠিত হইলেন। তখন গতাসু স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাব নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করায় তাঁহার কোনরূপ অনিষ্ট হইয়াছে কিনা? স্বামী উত্তর করিলেন,—অনিষ্ট হয নাই। ইহাতেও স্ত্রী সম্যক্‌রূপে আশ্বস্ত না হওযায় ঐ গতাসু স্বামী তাঁহকে লেড্‌বিটাব সাহেবের সহিত পবলোকসম্বন্ধে আলোচনা কবিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন।

লেড্‌বিটার সাহেব বলিতেছেন—"আমি সেই গতাসু স্বামীব সহিত কিছু সময় কথাবার্তা কহিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি অতীব বুদ্ধিমান্ ও নিঃস্বার্থ। ভুবর্লোকের নিম্নতর জড়াংশেব সংস্রবে থাকিয়া তাঁহাকে পত্নীর সাহচর্য ভোগ করিতে হইতেছে। ইহাতে তাঁহাব ঔর্ধ্বদৈহিক উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটিতেছে—অগ্রগতির বিলম্ব ঘটিতেছে, তাহা তিনি সম্যক্ অবগত ছিলেন। কিন্তু বলিলেন যে, তাঁহাব সাহচর্যে তাঁহার পত্নীর একটু শান্তি হয়, পত্নী যত দিন এরূপ শান্তি চাহিবেন, নিজেব সামান্য ক্ষতি হইলেও তত দিন তিনি এরূপ শান্তি প্রদান করিবেন। তাই এরূপভাবে পত্নীর নিকটে যত দিন পারিবেন, তত দিন থাকিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। আমি তাঁহাকে নিন্দা করিতে পারিলাম না। তাঁহাব কার্য একটু স্বতন্ত্র প্রকার, উহা সাধারণ বিধিব বিপরীত। কিন্তু উহাতে স্বার্থের গন্ধ ছিল না। তাঁহার কার্যের ফল কিরূপ ফলিবে, তাহাও তিনি জানিতেন। তিনি যেমন স্বীয পত্নীর, তেমনই অপব অপর ব্যক্তিরও প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। এই শুভকার্যের ফলে তাঁহার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক অকার্যকর হইয়া উঠিয়াছিল।"

নবম অধ্যায়

সূক্ষ্ম-জগতের পারিপার্শ্বিক

ভূবর্লোকের দৃশ্য, সাধারণ অবস্থা ও অধিবাসিবৃন্দের বিষয় মহাত্মা লেড্‌বিটাব তদীয় 'ভূবর্লোক' (The Astral Plane) নামক গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণনা কবিয়াছেন। সূক্ষ্ম-জগতের বিষয় যথাযথ বর্ণনা করিবার পক্ষে মানবের ভাষা অসম্পূর্ণ। তথাচ যতদূব সম্ভব, তাহা করিয়াছেন। সে বর্ণনাব পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মরণান্তে মানুষের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর লোকে অপরিবর্ত্তনীয় প্রয়াণ ঘটতে থাকে। লেড্‌বিটার-প্রদত্ত ভূবর্লোকেব বর্ণনা পাঠ কবিলে এই প্রয়াণের ও সূক্ষ্ম জগতের একটা সুন্দর ধারণা জন্মে, ব্যক্তিবর্গের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য অনুসাবে কোন কোন বিষয় অন্যরূপ হইলেও সূক্ষ্ম-জগতের দশা সাধারণতঃ একই প্রকার। অতিবাহিক জীবনের শেষাংশ মানুষ যে জগতে অতিবাহিত করে, সেখানে যাইয়া আপন আপন ইচ্ছানুসারে মূর্তি বাছিয়া লইয়া তাহার পক্ষপাতী হয় ; অপর মূর্তিগুলিকে অনেকটা উপেক্ষা করিয়া থাকে। এই পৃথিবীতে যেমন একজাতীয় ও একধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা একত্র থাকিতে ভালবাসে, সেখানেও তদ্রূপ। পৃথিবীতে একধর্মাবলম্বীরা যেমন পরস্পর পরস্পরের মতের সমর্থন করে, সেখানেও সেইরূপ কবিয়া থাকে। মানুষ সেখানে যে আপন আপন চিন্তা-মূর্তিই দেখিয়া থাকে, তাহা নহে। সেরূপ মূর্তি ত থাকেই, তদ্ব্যতীত অপরের প্রসূত চিন্তার মূর্তিও সেখানে বিস্তর। একই বিষয়ে যতরূপ চিন্তা নিঃসৃত হইয়াছে, তাহাদের মূর্ত্তি সেখানে বিরাজ করিতেছে।

মনোহর সৃষ্টিপুঞ্জ

উপবি-উক্ত কথাটি একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝা যাউক। বাইবেল নামক ধর্মগ্রন্থের প্রাচীন ও অর্বাচীন অংশের কাহিনীগুলি সম্বন্ধে শত শত বৎসর যাবৎ সহস্র ব্যক্তিনিচয় চিন্তা কবিযাছেন; সুতরাং ঐ সকল গল্প-সম্বন্ধীয় বিস্তর সুস্পষ্ট চিন্তা-মুর্তি সূক্ষ্ম-জগতে প্রকট বহিযাছে। এই সকল চিন্তা কারীদিগের অধিকাংশই পরলোক সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ. তাই চিন্তা-মুর্তিগুলিও স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ সম্পূর্ণরূপে অসমঞ্জস। প্রত্যেক জাতির কৃষক-সম্প্রদায় কোন গল্পের চিন্তা করিতে গেলে সেই গল্পের নায়ককে আপন আপন পরিচিত পোশাক ও পাবিপার্শ্বিক-ভূষিত ও বেষ্টিত করিয়া থাকে। সকল দেশের কৃষকেরই এইরূপ ব্যাপার। তাই আমরা খৃষ্ট ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দের চিন্তা-মূর্তির পরিধানে নিয়তই জর্মণদেশীয় কৃষকের বা ইটালীদেশীয় "লাজেরণী" নামক দরিদ্রদিগের পোশাক দেখিতে পাই ; জোসেফ ও তাঁহার অনুচবদিগের চিন্তা-মূর্তিগুলি ইংলণ্ড ও আমেরিকার কৃষক-বালকদিগের পরিচ্ছদে ভূষিত। ঐ পবিচ্ছদ ফুটবল সম্প্রদায়ের পশমী কামিজের ন্যায় "বিচিত্র বর্ণযুক্ত" ও জমকালো। যিনি সহজ-বিকার্য-প্রকৃতি সম্পন্ন বা কথঞ্চিৎ দিব্যদৃষ্টিযুক্ত, তিনি স্থূলশরীরী হইয়াও কখন কখন উপরি উক্ত চিন্তা-মূর্তিনিচয় দৃষ্টিগোচর করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যাপার দর্শন করিয়া অ্যানি ক্যাথেরাইন্ ইমারিকের ন্যায় কেহ কেহ উহাকে বাস্তব ঘটনার অলৌকিক প্রত্যাদেশ বলিয়া মনে করেন।

শুধু বাইবেল-বর্ণিত ব্যক্তিবর্গেব প্রতিমূর্তিই যে আমরা দেখিযা থাকি, তাহা নহে। কবিবব সেক্ষপীয়ব প্রণীত নাটক-বর্ণিত বিস্তর ব্যক্তির মূর্তিও ঐরূপে দেখা যায়। তদ্ব্যতীত আধুনিক ঔপন্যাসিকদিগের পুস্তক বর্ণিত অনেক সুবিখ্যাত ব্যক্তির মূর্তিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, পাঠকবর্গ বহুদিবস যাবৎ ঐ সকল চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ চিন্তা করিয়াছেন, সূক্ষ্ম-জগতে চিন্তাব মূর্তিগুলিও তদনুরূপ হইযাছে; ন্যূনাধিভাবে সৌষ্ঠব-অসৌষ্ঠবযুক্ত হইযা দাঁড়াইযাছে। মহাত্মা লেড্‌বিটার বলিতেছেন—আমি নিজে বেকীসার্প ও চেরিবিল্ সহোদবগণের (Becky Sharp and of the Cheeryble brothers) অতীব সুন্দব মূর্তি নিরীক্ষণ করিয়াছি। রবিন্‌সন্ স্যান্টাক্লস, আলাদীন ও আলিবাবার অতীব সুস্পষ্ট জীবন্ত চিত্র আমাব দৃষ্টিপথে পতিত হইযাছিল। উপন্যাসপ্রিয় বালক-বালিকাগণের বহুবৎসারব্যাপী সুতীক্ষ্ণ কল্পনাব প্রভাবেই ঐ জীবন্ত চিত্রেব উদ্ভব হইযাছিল। কোন কোন দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন বালক ঐ প্রকার চিন্তা-মূর্তি দর্শন কবিয়া সেগুলিকে প্রকৃত ব্যক্তিই মনে কবিযাছিল। এই প্রকার ভ্রান্তি নিশ্চয়ই অনেক সময ঘটিয়াছে। শুধু বালক-বালিকারাই যে এইরূপ ভ্রমে পড়িয়াছে, তাহাও নহে।

বহু ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভূতেব মূর্তি দেখিবাব বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি ভূতেব মূর্তি নহে। ঐ দর্শন-ব্যাপার যদি বিকৃত-মস্তিষ্ক-সম্ভূত না হয়, তবে ঐগুলি চিন্তামূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। গির্জাব ব্যযনির্ব্বে জন্য যাহাতে অজ্ঞ কৃষকগণ বিপুল অথাসাহায্য করে, এই অভিপ্রায়ে মধ্যযুগেব ধর্মধ্বজী সন্ন্যাসীবা উহাদিগকে ভীত কবিবাব উদ্দেশ্যে ধম্মেব মধ্যে অতিবঞ্জিত বিকট ভযোৎপাদক ব্যাপাবের কল্পনা কবিতেন। তাঁহাদিগেব কল্পনা নিশ্চয়ই বিকৃত মস্তিষ্ক-সঞ্জাত। পাপ কবিলে কিছুকাল কষ্টভোগ কবিতে হয—কিছুদিন স্বর্গে যাওয়া যায না। এই টুকুই খৃস্টধর্মেব সবল সত্য। কিন্তু ঐ সন্ন্যাসীবা এই সত্যকে বিকৃতার্থ কবিয়া প্রচাব করিলেন যে—পাপেব ফল "অনন্ত নরক।" ঐ সময অর্থাৎ মধ্যযুগ হইতে নবকাগ্নিজ্ঞাপক ধর্মমতেব হতভাগ্য ও প্রতাবিত পৃষ্ঠপোষকগণ ক্রোধান্ধ ঈশ্বরের, মনুষ্যাকারবিশিষ্ট শযতানেব, অগ্নিহ্রদের ও অকথ্য যাতনাক্লিষ্ট পাপীব ভয়াবহ চিন্তা-মূর্তিব উদ্ভব কবিয়া আসিতেছে। ঐ সকল মূর্তিতে সূক্ষ্মজগৎ পরিপূর্ণ। কখন কখন এই সকল মূর্তি মানুষেব দৃষ্টি-পথেও পড়িয়াছে। ঐগুলি দেখিলে আজও দুর্দান্ত ভীতিজনক পুরোহিতযুগেব কথা মনে পড়ে। পার্থিব জীবনে যে হতভাগ্য এই ঘৃণিত মতের শিক্ষা পায, মবণান্তে যখন তাহার সমক্ষে সত্য সত্যই ঐ সকল অদ্ভুত চিন্তা মুর্তি আসিযা উপস্থিত হয, তখন তাহার মনের ভাব কিরূপ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। সন্ন্যাসীদিগেব ঐ নরকাগ্নিব কল্পনা-সংবলিত মত যাবতীয ধর্মমতেব মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর। উহাতে যে কত অনিষ্টসাধন কবিযাছে, তাহার ইয়ত্তা কবা কঠিন, কত শত সুন্দব প্রদেশে ঐ মত অভি সম্পাতের ন্যায় ছায়া-বিস্তার কবিয়া রহিযাছে। তাহার ফলে, তত্রত্য মানবমণ্ডলী জীবিত হউক, মৃত হউক, সকলেই সমানভাবে শোক, দুঃখ ও অবসাদ ভোগ কবিতেছে। ঐ মতটি ভয়োৎপাদক তো বটেই, তদ্ব্যতীত উহাতে মানুষেব ঈশ্বর-বিশ্বাস শিথিল হইযা যায, চবিত্র পাশবিকভাবে কলুষিত হইয়া উঠে।

কৃত্রিম দৃশ্য

যেরূপভাবে মূর্তি-নিচয সংগঠিত হয, একটা দৃশ্যও অবিকল তদ্রূপ প্রকাবে উৎপন্ন হইযা থাকে। দান্তে-বর্ণিত প্রেতলোক ও সুইডেনবর্গ-বর্ণিত স্বর্গ ও নরকেব উদ্ভবও এইরূপেই হইয়াছে। ঐ দুই মহাত্মাব দিব্যদৃষ্টিব সহিত মূর্তি-প্রণয়নবিদ্যাও সংমিলিত হইযাছিল বলিযা

বোধ হয়। যাঁহাবা প্রকৃতি ব্যাপাব দৃষ্টিগোচর করিয়াছেন, তাঁহাবা ঐ মহাত্ম-গণেব সত্যদর্শী তাব বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইযাছেন। স্মবণ বাখিতে হইবে যে, মৃত বাক্তিব জীবাত্মা বা কোন দেবযোনি উপরিউক্ত চিন্তামূর্তির কোন একটিব মধ্যে প্রবেশ কবিযা উহাকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পাবেন। সৎ বা অসৎ আত্মায় চিন্তা-মূর্তিতে এবম্প্রকাব আবেশ নিযতই হইয়া থাকে, এরূপ ঘটনা অনেকবাব জানাও গিযাছে। মানুষ ভ্রমনবশতঃ একটা সযতানের কল্পনা করিল। কল্পনা করিল যে, সযতানেব একটা লেজ আছে, সেই লেজেব আগাগুলি কাঁটাব মত ছুঁচাল, তাহাব চোখ দুটি রেকাবীর মত বড় ও গোল, তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। কল্পনাটি ভ্রমবশতঃ কবা হইল বটে, কিন্তু সত্য সত্যই তাদৃশী চিন্তামূর্তি সূক্ষ্ম-জগতে সংগঠিত হইযা পড়িল। এইরূপ বিকট মূর্তি সূক্ষ্ম-জগতে বিস্তর আছে। মবণান্তে কোন দুষ্ট ব্যক্তিব জীবাত্মা অথবা কোন অনিষ্টকাবী ব্যোমচব ঐরূপ একটি মূর্তিতে কু-অভিপ্রাযে আবিষ্ট হইয়া থাকে। অপব পক্ষে নির্দোষ সত্যপবাযণ বালক-বালিকাগণেব উদ্ভাবিত সাধু ও দেবদূতেব চিন্তা-মূর্তিতে সচবাচব ধার্মিক লোকেব জীবাত্মা, কখন কখন বা উচ্চশ্রেণীব দেবযোনিবা আবিষ্ট হইযা সূক্ষ্ম-জগৎ-প্রবাসী জীবাত্মা বৃন্দেব অশেষ সহাযতা কবিয়া থাকেন।

এই কাবণেই আমবা দেখিতে পাই যে, যে সকল অলীক কুসংস্কাব সর্বসাধারণে বিস্তৃতিলাভ কবিয়াছে, অথচ বাস্তবিক পক্ষে যাহাদেব কোনই ভিত্তি নাই এরূপ ব্যাপাবেব অনুরূপ বর্ণনা প্রকৃত সত্যবাদী আধ্যাত্মিকজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ দৃষ্টিগোচব কবিযাছেন বলিয়া ঘোষণা কবেন। এই কাবণে এখনও ডানাযুক্ত দেবদূত দৃষ্টিগোচব হয। কিন্তু পাখাসঞ্চালন কবিযা যদি গমনাগমন করিতে হয, তবে সেই ব্যাপাবটি বড সহজ-সাধ্য হয না। তাহাতে বিপুল পরিশ্রম আবশ্যক। এই পরিশ্রমেব কথা মনে হইলে সূক্ষ্ম-জগতে সুখ-স্বচ্ছন্দে চলাফেরা কবিবাব স্ফুর্তিব কথাটুকু আব মনে আইসে না। মরণান্তে মানুষকে চিন্তামূর্তিসঙ্কুল এবম্প্রকার বিপুল জগতে যাইতে হয। যিনি ঐ স্থানের অবস্থা সম্যক্ অবগত হইযা ঐ স্থানে প্রবাসজনিত ষোল আনা সুবিধা ভোগ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে বুঝিযা লইতে হইবে, কোন্‌টি চিন্তামূর্তি, কোন্‌টি দেহার্তি বিক্ত জীবাত্মা, আব কোন্‌টিই বা চিন্তা-মূর্তিতে আবেশ। তাঁহাকে আবও বুঝিয়া লইতে হইবে, ঐ স্থানে কোন্ কোন্ ব্যাপারগুলি বিশিষ্ট, আর কোন্ কোন্‌গুলিই বা অস্থায়ী। যাঁহাবা স্থূল-দেহে এই পৃথিবীতেই সূক্ষ্ম জগতের বেশ ভালরূপ আলোচনা করেন, মরণান্তে ঐ স্থানে তাঁহাদের খুব বেশী সুবিধা হইযা থাকে। এই পার্থিব দেহে যাঁহাব সূক্ষ্ম-জগতেব অনেক সংবাদ বাখেন, মৃত্যুর পব সজীব সহায়কদিগের ন্যায তাঁহাবা অপব অপব অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ জীবাত্মাদিগেব নিকটে যে সমুদয় ব্যাপার অদ্ভুত ও ভয়াবহ বলিযা বোধ হইতে, তাঁহারা সে সমুদয়েব ব্যাখ্যা কবিযা থাকেন।

মূর্ত্তিমৎ স্বর্গ

যাহাবা গোঁড়া, অজ্ঞ, ঐহিক উপভোগে ঘোব ব্যতিব্যস্ত, তাহাদেব তীব্রতব চিন্তা-প্রভাবে একটা মূর্ত স্বর্গেব কতকাটা স্থায়ী চিত্র সূক্ষ্মজগতে প্রকট হইয়া উঠে। এই স্বর্গচিত্রে উপাসনা করিবাব গির্জা আছে, বিদ্যালয ও আবামগৃহ আছে, নগব-সহব আছে। নগব-সহব স্বর্গের বলিয়া খুব মনোহব। উহার অধিবাসিবৃন্দ দেবদূতেব ন্যায় দিব্যকান্তিসম্পন্ন। এবম্বিধ ব্যক্তিবর্গ শত শত বৎসব যাবৎ স্বর্ণময় সরণী, মৌক্তিক তোরণ, অগ্নিময় স্ফটিক অর্ণব, রাজমুকুট ও বীণা,

মধ্যযুগের সন্ন্যাসীদিগের পরিচ্ছদে ভূষিত ভবিষ্যদবক্তা, পুরোহিতদিগের শিরশ্ছদ ও উত্তরীয়ধারী সাধু ও খৃষ্টশিষ্যবর্গ, অ-মানবসম্ভব, পালকসংবলিত ডানাযুক্ত দেবদূত ও দেবযোনিবৃন্দের অদ্ভুত অসম্পূর্ণ অনুভূতির সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। এইরূপ এক জন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে প্রথমেই তাহাকে সূক্ষ্মজগতের যে স্তরে উপনীত হইতে হয়, সেটি প্রকৃতপক্ষে পাপের ক্ষালনভূমি। সে স্তরটি যেন অন্য একটি স্তরের পার্শ্ব-প্রকোষ্ঠ। তাহার পরে ধীরে ধীরে তাহাকে আর একটি স্তরে যাইতে হয়। এই স্তরে প্রধানতঃ সূক্ষ্ম জড়-দেহীরা বিরাজ করে। এই স্থান-সুলভ সূক্ষ্ম জড় উপাদানেই চিন্তামূর্তিনিশ্চয় অতি সহজেই সংগঠিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলে মৃতব্যক্তির জীবাত্মা এই স্তরে আসিয়া এই স্থলটিকেই পূর্বকল্পিত স্বর্গ বলিয়া মনে করে। এই স্তরটিকে স্বর্গ বলিয়া বুঝিতে তাহার কিছুমাত্র দ্বিধা জন্মে না। কখন কখন তাহার মনে এইটিকে স্বর্গ বলিয়া বুঝিতে যেন একটু অসঙ্গতির ভাব জাগিয়া উঠে। তখন সে মনে মনে ভাবিতে থাকে,—"স্বর্গ যে ঠিক এইরূপ, তাহা আমি কখনই ভাবি নাই।" মৃত ব্যক্তির বুদ্ধি যদি একটু অনন্যসাধারণ হয়, তবে কখন কখন তাহাব প্রাণে নৈরাশ্যের ভাব আসিয়া দেখা দেয়।

মৃত ব্যক্তি সেখানেও স্থিব থাকে না। তাহাব প্রয়াণ অপরিবর্তনীয় ভাবে হইতেই থাকে। ক্রমে ক্রমে তত্রত্য চিন্তা-মূর্তিগুলির ও বিলোপ হইতে আরম্ভ হয়। তখন আর ইহাদিগের ততটা প্রভাব থাকে না। ক্রমে ক্রমে জীবাত্মার উপর একটা মহীয়ান্ ব্যাপারের ঊষালোক বিকীর্ণ হইযা পড়ে। তাহার প্রাণে একটা অতি চমৎকাব অনুভূতির সঞ্চার হয়। তখন তাহার মনে হয়, ইতঃপূর্বে যে সমুদয় ব্যাপার সে প্রীতিজনক বলিযা মনে করিয়াছিল, সেগুলি বাস্তবিকপক্ষে একটা মহতী অবস্থার পূর্ব্ব সূচনা মাত্র। এখন সে যে অবস্থায় উপনীত, সেখানকার ঐশ্বর্য, সেখানকার বিপুলতা, সেখানকাব সৌন্দর্য অতুলনীয়। ভুবর্লোক ঈদৃশী মহিমার কল্পনাও করিতে পারে না এ বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা পরে করা যাইবে। স্বর্লোকি শ্রেষ্ঠ হইলেও স্থূল জড়-জগতেরও কিছু উপযোগিতা আছে। ভুবর্লোকের এক জন সহায়ক, অমার্জিত জীবাত্মাদিগের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিলে, তাহারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকেই দেবদূত বা শুভানুধ্যায়ী মহাপুরুষ বলিয়া মনে করে। স্বর্লোকের ব্যাপার অবগত হইবার পূর্বে জীবাত্মগণ ঐরূপই মনে করে। যখন সাহায্যের বড় প্রয়োজন হইয়াছে, সেই সঙ্কটসময়ে জীবাত্মাদিগকে প্রতারিত করা সহায়কের পক্ষে খুব সম্ভব। এ সময়ে আপনাকে তাহাদিগের নিকটে যা- তা একটা বলিয়া দেওয়াও চলে। অনেক সহায়ক মহাপুরুষ এইরূপ অবস্থায় অনেক সময় আপনাদিগের অনায়ত্ত গুণের অধিকাব প্রকাশ করিয়া বাহাদুরী লইয়াছেন। যাহা হউক, কোন সহায়কেরই যখন কৃত কর্মের জন্য যশের বাসনা থাকে না তখন কে বাহাদুরী লইল, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। প্রধান ব্যাপাব এইটুকু হওয়া চাই যে, সম্ভব লইলেই সাহায্য করিতে হইবে। সে সাহায্য কোথা হইতে কে করিতেছে, তাহা কাহারও পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন নাই।

বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিবর্গ

পরাবিদ্যা-সমিতি ভুবর্লোক (The astral plane) সম্বন্ধে পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন। যাঁহারা উহা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাবাই অবগত আছেন যে, ভুবর্লোকের সর্বোচ্চ বিভাগ অন্যান্য বিভাগগুলি হইতে স্বতন্ত্র। অন্যান্য বিভাগে জীবাত্মগণ যেমন কাল্পনিক অনুভূতি করিয়া থাকে, তদ্রূপ তত্রত্য আণবিক জড়াবস্থায় উহারা সেরূপ কিছু করে না। এখানে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ও

বৈজ্ঞানিকগণ বাস করেন। ইঁহারা স্ব স্ব আলোচ্য বিষয়ের অনুশীলনে ঘোর ব্যস্ত। ইঁহারা অনুশীলনে যতদূর সম্ভব সূক্ষ্ম-জগতের শক্তি নিয়োগ ক রিয়া থাকেন। স্থূল-জগতেও প্রকারান্তরে অবতীর্ণ হইতে সমর্থ হয়েন। সাধারণ পার্থিব জীবনের সহিত সম্পূর্ণরূপে অসংশ্লিষ্ট থাকিয়াও ইঁহারা পার্থিব পুস্তকের সূ হইতে স্ব স্ব অভীপ্সিত বিষয়েব জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন। ইঁহাবা অতি সহজেই কোন নবীন গ্রন্থ কর্তাব মনের উপর প্রভাব বিস্তার কবিতে সমর্থ। কোন পুস্তকে ইঁহাবা আকৃষ্ট হইলে, গ্রন্থকর্তার মনের উপব নূতন নূতন চিন্তা-শক্তি স্ফুবিত করেন, আবাব নিজেরাও উহা হইতে নূতন চিন্তা ও ভাব গ্রহণ করিযা থাকেন। ভুবর্লোকে থাকিয়া এইরূপে বিদ্যালোচনায় ব্যাপৃত হওয়ার, স্বর্লোকে যাইবাব পক্ষে ইঁহাদের সময় সময় বডই বিপদ ঘটে। ভুবর্লোকের ব্যাপারে ইঁহারা এতই আকৃষ্ট থাকেন, ইহাতে এতই প্রীতি অনুভব কবেন যে, এতল্লোক অপেক্ষা উচ্চতর লোকের আবশ্যকতা বোধ করেন না। উচ্চতর লোক যে আছে, তাহাও ইঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। না চাহিলেও সময়ক্রমে উচ্চতর লোকের বিদ্যমানতা ইঁহারা বুঝিতে পাবেন। তখন ইঁহাদের প্রতীতি জন্মে যে, ভুর্লোক অপেক্ষা ভুবর্লোক অপেক্ষা তদ্রূপ স্বলোক প্রভৃতি উৎকৃষ্টতর।

আমরা কি মরণান্তে আত্মীয় স্বজনকে চিনিতে পাবিব?

মৃত্যুব পরে মানুষের আতিবাহিক দেহের কিরূপ আকৃতি হয়, তাহাকে চেনা যায় কি না, এ সম্বন্ধে লোকে সর্বদাই প্রশ্ন করিয়া থাকে। প্রত্যেক লোককেই সুন্দরবূপে চেনা যায়। পার্থিব জীবনে যাহাদেব সদ্‌গুণের ততটা বিকাশ ঘটে না, কেবল তাহাদের আকৃতিগুলি কিছু মলিন ও অস্পষ্ট থাকে। যিনি দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন, তিনি স্থূলদেহধাবী মানবেরও দেহেব চতুর্দিকে জ্যোতির্ময ডিম্বাকৃতি একটা আবরণ দেখিতে পান। ঐ আববণটিকে আমরা পবিবেশ বলিযা থাকি। এই পরিবেশ স্থূল শরীরেব চতুর্দিকে প্রায়১৮ ইঞ্চি দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বস্তুতঃ উহা বডই জটিল পদার্থ; কেন না, সূক্ষ্মজগতের ভিন্ন ভিন্ন স্তরেব ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জড়াংশে উহা গঠিত। ভুবর্লোকের বিষয়ই আমাদেব এখন আলোচ্য। সাধাবণ শ্রেণীর সূক্ষ্মদর্শীরা ভুবর্লোক সুলভ জডাংশ-গঠিত পরিবেশই দেখিতে পান। আমরা যদি মনোযোগ সহকাবে এই পরিবেশ জিনিসটি পরিদর্শন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, উহা যে কেবল স্থূল-শরীবের চতুর্দিকেই রহিয়াছে, তাহা নহে ; স্থূল শবীরের উপরিভাগ অপেক্ষা মধ্যেই ঐ পরিবেশ অধিক পরিমাণে ঘনীভূত। স্থূল-দেহের বাহ্যাভ্যন্তরস্থিত এই পরিবেশ নামক সূক্ষ্ম পদার্থটি মানুষের লিঙ্গশরীরাংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্থূল-দেহের স্থূল পরমামুপুঞ্জের আকর্ষণবশতঃই দেহাভ্যন্তরে পরিবেশের ঘনত্ব ঘটে। যিনি দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহার চক্ষুতে স্থূল-দেহ আদৌ পড়ে না। তিনি মানুষের লিঙ্গ-শরীরই দেখিয়া থাকেন। পরিবেশের মধ্যে ভুবর্লোকসুলভ ঘনতব জড়াংশে মানুষের লিঙ্গ-শরীর পবিস্ফুট হইয়া উঠে বলিয়া তাহাব স্থূল-দেহের যে কোন প্রকার পবিবর্তন ঘটে, তাহা নহে। নিদ্রিতাবস্থায় কিছুক্ষমের জন্য আর মৃত্যুব্যাপারে চিরদিনের নিমিত্ত জীবাত্মা স্থূল-দেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়। তখনও লিঙ্গ-দেহের পরমাণুপুঞ্জ সেইরূপ ভাবে বিন্যস্ত থাকে। এই পরমাণু বিন্যস্ত লিঙ্গদেহ সূক্ষ্ম জড়াংশ সম্ভূত হইলেও ইহাকে সুস্পষ্টভাবে চেনা যায়।

পার্থিব দেহে জীবিত থাকিবার সময়ে মানুষের লিঙ্গ-দেহের পরমাণু রাশি নিবন্তর দ্রুতগতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন শ্রেণীর লোকের অথবা যখন বিশেব প্রকার আবেগপ্রভাব সূক্ষ্মদেরে উপর যাইয়া পড়ে, তখন সকলেরই লিঙ্গ-শরীবে নির্দিষ্ট চিহ্ন-নিচয়,

অতীব সুস্পষ্ট রেখা সকল পরিদৃষ্ট হয়। মহাত্মা লেড্ বিটারে তদীয় "স্থূল ও সূক্ষ্মদেহী মানব" নামক গ্রন্থে সূক্ষ্ম-শরীরের যে সকল চিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল চিহ্ন বা রেখা অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে। যখন আবেগ উদ্বেগ থাকে না, অর্থাৎ সাধারণ স্থলে সূক্ষ্ম দেহের বর্ণ মিলাইয়া যাইতেছে, কোনটি বা ফুটিয়া উঠিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে, এই জ্যোতির্ময়, উজ্জ্বলবর্ণ পরিবেশের উপবিভাগটা যেন ভয়ানক ফুটন্ত জলের অনুরূপ। জল ফুটিবার সময় যেমন উপরের অংশ নিম্নে যায়, নিম্নের অংশ উপরে আইসে, একটা ভয়ানক অস্থিরতা, ভয়ানক চাঞ্চল্য, পরিবেশের অবস্থাও তদ্রূপ। উহার চাঞ্চল্যও সার্বক্ষণিক। মানুষের জীবিতকালে তাহার সূক্ষ্মদেহের অবস্থা এইরূপ হইতে থাকে। মানবদেহে উপবিভাগে যে সকল ভুবর্লোক-সুলভ পরমাণু বিন্যাস থাকে, তাহারা নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে। অথচ, মোটের উপর আকৃতির কোনরূপ বিপর্যয় ঘটিতেছে না। নিদ্রিতাবস্থায় মানুষের জীবাত্মা যখন স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখনও মূল আকৃতির পরিবর্তন হয় না, কিন্তু সাধারণতঃ একটু পরিবর্তন ঘটে। তাহার অর্থ ও হেতু পরবর্তী কোন একটি অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। কিন্তু সেইটুকু বুঝাইবার নিমিত্ত কতকটা অবান্তর বিষয়ের প্রয়োজন হইবে।

দশম অধ্যায়

বাসনা-উপাদান

জীবাত্মার জন্ম পরিগ্রহ ব্যাপারটি ঠিক যেন নিশ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার অনুরূপ। আমরা শ্বাসত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের দেহের অনেক পদার্থ বহির্গত করিয়া দিই, আবার নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতের বিস্তর দ্রব্য শরীরাভ্যন্তরে লইয়া থাকি। তদ্রূপ নিম্নস্তরে প্রকট হইবার সময় জীবাত্মার কিয়দংশ বহির্জগতে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, পরে উর্ধস্তরে প্রয়াণ-কালে তদংশ জীবাত্মা আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। যাহারা কুসীদ-জীবী, তাহারা টাকা কর্জ দিয়া সুদ গ্রহণ করিয়া থাকে। জীবাত্মাও যেন আপনার কিয়দংশ বিকীর্ণ করিয়া পরে বর্ধিত অভিজ্ঞতারূপ সুদ গ্রহণ করিয়া বসে। প্রতি জন্ম-পরিগ্রহেই জীবাত্মার অভিজ্ঞতা বর্ধিত হয়। প্রতি জন্মেই জীবাত্মার অন্তরে নূতন নূতন গুণের পরিপুষ্টি সংসাধিত হইয়া থাকে। জন্ম-পরিগ্রহের পূর্বে জীবাত্মা কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত থাকে, এক্ষণে আমরা তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পুনঃ পুনঃ জন্ম-পরিগ্রহে জীবাত্মার ক্রম-বিকাশ সংসাধিত হইতে থাকে। এই ক্রম বিকাশের পথে পদার্পণ করিবার পূর্বে জীবাত্মা স্বীয় বাসোপযোগী যে স্তরে অবস্থান করিত, পার্থিব দেহাবসানেও ঠিক সেই স্তরেই তাহার অবস্থিতি ঘটে। তবে পুনঃ পুনঃ পার্থিব দেহান্তে তাহার জ্ঞানৈশ্বর্য বিপুলভাবে বর্ধিত হইতে থাকে। এইটুকুই বৈশিষ্ট্য। কেন না, প্রত্যেক জন্মে তাহার অন্তর্নিহিত গুণাবলী ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত নবীন গুণরাজিও তাহাতে অনুস্যূত হইতে থাকে। সূক্ষ্ম-জগতের যেটি মনোময় স্তর, জীবাত্মা পার্থিব দেহান্তে সেই স্তরের উচ্চতর স্থানে অবস্থান করে। উচ্চ হইতে নিম্নদিকের গণনা করিয়া আসিলে মনোময় স্তরের যে স্থানটি তৃতীয় ভূমি বিবেচিত হয়, সাধারণ শ্রেণীর মানবের সূক্ষ্ম-দেহ-সুলভ চৈতন্য সেই ভূমিতে কেন্দ্রীভূত থাকে। স্বর্গবাসের পর পার্থিব জন্ম পরিগ্রহের পূর্বে জীবাত্মাকে উপরি-উক্ত তৃতীয় ভূমিতে অধিক দিন থাকিতে হয় না; কেন না, ঐ স্থানের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে কার্যতঃ উহার কোন অভিজ্ঞতাই জন্মে না, সুতরাং ঐ স্থানে অবস্থিতি বশতঃ উহার কোনরূপ শিক্ষালাভও ঘটে না। তত্রত্য পারিপার্শ্বিকনিচয় বিদিত হইয়া জ্ঞান ও শিক্ষালাভ করিতে হইলে জীবাত্মাকে বহুল পরিমাণে উন্নত হইতে হয়। সাধারণ শ্রেণীর মানবের জীবাত্মা তত উন্নত নহে বলিয়াই ঐ স্থানের উপকারে উপকৃত হয় না। পরে বহু জন্মান্তে উন্নতাবস্থায় জীবাত্মা ঐ স্থানে আসিয়া পৌঁছিলে, তাহার সমক্ষে ঐ স্থানের জ্ঞান সম্যক্‌ভাবে ফুটিয়া থাকে। তখন ঐ স্থানে বসবাস তাহার নিকট অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়। সময়ক্রমে আরও বিস্তর জন্মের পর জীবাত্মা যখন আরও জ্ঞান-গরিমায় গরীয়ান্‌ হইয়া উঠে, তখন উহা মনোময় স্তরের দ্বিতীয় ভূমিতে আপনাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া বসে। এইরূপে জ্ঞান-সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা ঘটিলে জীবাত্মা মনোময় স্তরের সর্বোচ্চ ভূমিতে অধিরূঢ় থাকে। ঐ অবস্থায় উন্নীত হইলে জীবাত্মাকে উচ্চ শ্রেণীর সূক্ষ্মদেহী বলা চলে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, সাধারণ শ্রেণীর মানবের জীবাত্মা মরণান্তে মনোময় স্তরের তৃতীয় ভূমিতে অবস্থান করে। সেখানেও তাহার তত্রত্য বস্তুনিচয়ের সম্যক্‌ উপলব্ধি ঘটে না। সৌররশ্মির সঞ্জীবন তাপ-প্লাবনে প্লাবিত হইলে অপ্রস্ফুটিত কুসুম-

কোরকের মধ্যে যেমন একটা প্রাণ-শক্তির উন্মেষ ঘটিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ তৃতীয় ভূমিতে অবস্থিত জীবাত্মা সর্বপ্রকার বহিরাগত স্পন্দনে উদাসীন থাকিলেও উপযুক্ত সদ্‌গুরুর উপস্থিতি ও আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে উহার কিযৎপরিমাণে পরিবর্তন ঘটে।

জীবাত্মার জন্ম-পরিগ্রহ-প্রণালী

তবেই দেখা যাইতেছে যে, অভিজ্ঞতা ও পরিপুষ্টিলাভার্থ স্থূল-জগতে জন্মগ্রহণ করা জীবাত্মাব আবশ্যক হইয়া উঠে। প্রাচ্য-দেশের মত এই তৃষ্ণাই উহার জন্ম-গ্রহণেব মূলীভূত হেতু। তৃষ্ণাপ্রভাবে উহাকে বাধ্য হইয়া জন্ম-পবিগ্রহ করিতে হয। ঐ তৃষ্ণাপ্রযুক্ত জীবাত্মার প্রথমতঃ মনে হয যে আমি অভিব্যক্ত হইব। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল বহিরাগত স্পন্দন ও ভাব লহরী গ্রহণ করিতে পাবিলে আপনাকে সজীব বলিয়া বিবেচনা হয়, সেই সকলস্পন্দন প্রভৃতি গ্রহণ করিবাব একটা ইচ্ছা জীবাত্মার প্রাণে ঐ তৃষ্ণা জাগাইয়া দেয়। এইরূপে পবিস্ফুট, পবিব্যক্ত হইবাব বলবতী আকাঙক্ষাবলেই জীবাত্মার ক্রমোন্নতি ঘটিতে থাকে। ক্রমবিকাশেব ইহাই পদ্ধতি। এই তৃষ্ণা বা বাসনাকেই পালিভাষায় "তন্‌হা" বলে। অন্তঃকরণে তৃষ্ণার সঞ্চাব হইবামাত্র জীবাত্মা বহির্দেশে অর্থাৎ মনোময় স্তবের নিম্নাংসে অবতবণ করিতে থাকে। কাবণ, ঐটিই তাহাব অবস্থিতি স্থানেব নিকটবর্তী। এক্ষণে আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝিবাব পক্ষে দুইটি ভ্রম ঘটিতে পারে। সুতরাং আমাদিগকে একটু সতর্ক হইয়া কথাগুলি প্রণিধান করিতে হইবে। প্রথমতঃ, জীবাত্মা নিম্নস্তবে অবতরণ করে বলিলে ইহা যেন কেহ না বুঝেন যে, জীবাত্মা কতকটা স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। উহার অবতবণ অর্থ এই যে, উহা নিজ সম্বিৎকে নিম্নস্তবে কেন্দ্রীভূত করে। ঐরূপ করায নিম্নস্তবের স্থূলতর জড়াংশে উহাব কতকটা অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, নিম্নস্তরে কেন্দ্রীভূত চৈতন্য বশতঃ উহার যে প্রকাশটুকু ঘটে, তাহা অতীব আংশিক। কেন না, নিম্নতর রৈখিক মানের (dimension) সহিত উচ্চতর মানের যে সম্বন্ধ, নিম্নস্তরের সহিত উচ্চস্তরের সম্বন্ধও তদ্রূপ। নিম্নতর বৈখিক মানে যেমন উচ্চতর মানের সর্বায়তন প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ নিয়স্তরে কেন্দ্রীভূত হইলে তত্রত্য জড়াংশ জীবাত্মার সর্বাঙ্গ পরিব্যক্ত করিতে পারে না। কথাট আর একটু ভাল করিযা বুঝা যাউক। আমরা সকলেই জানি যে, কতকগুলি সরল রেখা টানিয়া গেলেই একটি চতুষ্কোণ হইতে পারে না ; কতকগুলি চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিলেই একটি ঘন ক্ষেত্র গঠিত হয় না ; তদ্রূপ নিম্নতর স্তরে জীবাত্মাব যুগপৎ কতকগুলি অভিব্যক্তি ঘটিলেইই তাহাদিগের দ্বারা উহার সম্যক্ প্রকাশ ঘটে না। কেন না, জীবাত্মার মধ্যে এমন সকল সম্প্রসারণ আছে, যাহার অনুভূতি নিম্নতর স্তরে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। আর যে যৌগপদিক অভিব্যক্তির কথা বলা হইল, তাহা মনোময স্তরে সম্ভবপর, কিন্তু স্থূল জগতে অসম্ভব। পরে এই তথ্য ব্যাখ্যাত হইবে। জীবাত্মার ঐ জন্ম পরিগ্রহ ব্যাপার পার্থিব ভাষায় যথাযথভাবে পবিব্যক্ত হওযা সম্ভবপর নহে। যত দিন না আমরা সাধনা-বলে মনোময় প্রভৃতি সূক্ষ্ম স্তরের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, যতদিন না আমাদিগের দিব্যজ্ঞানের তাদৃশ উন্মেষ সংসাধিত হইয়া উঠে, তত দিন জীবাত্মার অবতরণ-ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা হইবে না। যদি ব্যাপারটা বুঝিতে চেষ্টা করি, তবে মাত্র এইটুকুই মনে হইবে যে, অগ্নির জিহ্বা যেমন প্রসৃত হইয়া দ্রব্যান্তরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ জীবাত্মাব কিয়দংশ স্থূল নিম্নতর স্তরে আসিয়া প্রকট য়। ইহাপেক্ষা আমরা স্পষ্টতর ধারণা করিতে পারি না। কিন্তু

দিব্যজ্ঞানের উন্মেষ সাধন করিয়া সূক্ষ্ম-জগতেব উপলব্ধি করিতে পারিলে তত্রত্য ব্যাপার খুব সুন্দবরূপে দৃষ্টিগোচর হয়।

যিনি মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে যদি কোন প্রেতবাদীদিগের বৈঠকে আসিয়া দেখা দিতে হয়, তবে তাঁহার এই স্থূল ভূলোকের স্থূল পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণ কবিয়া দেহরচনা কবত স্থূল নেত্রের বিষয়ীভূত হইবার প্রয়োজন। তদ্রূপ জীবাত্মা যে মুহূর্তে মনোময় স্তরের নিম্নাংশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই সেখানে প্রকট হইবার নিমিত্ত তত্রত্য পরমাণুপুঞ্জ সংগ্রহ করিযা আপনাকে ব্যক্ত করিয়া থাকে। মনোময় স্তরের পরমাণু স্থূলজগতেব পবমাণু অপেক্ষা খুব সূক্ষ্ম হইলেও জীবাত্মার পক্ষে উহা স্থূল। আপনাকে ব্যক্ত করিতে হইলে যাদৃশ পবমাণু আবশ্যক, জীবাত্মা ঠিক সেইরূপ পরমাণুরাশিই সংগ্রহ করিয়া লয। বৈঠকে প্রেতাত্মা স্থূল পবমাণু আকর্ষণ কবিযা যখন দেহরচনা কবত মানবের দৃষ্টিপথের পথিক হয়, তখন তাহাব সেই দেহের সাহায্যে স্থূল পার্থিব বস্তুও পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

অতএব দেখা গেল, সূক্ষ্মতম অবস্থা হইতে অবতরণব্যাপারে জীবাত্মার কিয়দংশমাত্র এক একটি স্তরে পবিব্যক্ত হইয়া থাকে। উহাব স্বরূপ পূর্ণ পরিমাণে কোন স্তরেই অভিব্যক্ত হয না। এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমরা কোন একটি লোককে যখন স্থূল-দেহের হিসাবে দেখি, তখন আমাদিগেগব সেই দেখাটা কতই অসম্পূর্ণ। সে ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃত মানুষটির কত অল্পাংশ দেখিয়া থাকি। আর এই রূপ অল্পাংশ দেখিয়াই সচবাচব মনে করি যে, খুব দেখিযাছি। যদি আমরা স্থূলদেহের হিসাব ছাড়িয়া আর একটু উন্নতভাবে তাহাকে মনোময় স্তরের দিক্ দিয়া দেখি তাহা হইলেও তাহাকে সম্যক্‌ভাবে দেখা হয় না। মনোময় স্তরের জড়াংশে তাহার স্বরূপেব যতটুকু ব্যক্ত হইবার কথা, মাত্র ততটুকুই আমরা ঐ দেহে তাহাকে বুঝিতে পারি; তাহাব স্বরূপেব মাত্র বুদ্ধির দিক্‌টাই মনোময় কোষে ব্যক্ত হইয়া থাকে। কাম-স্তরের দিক্ দিয়া দেখিলে আমরা আব একটি নূতন দিক্ দেখি মাত্র। বাসনা থাকাব জন্য মানুষের একটা কাম দেহ রচিত হয়। এই দেহে জীবাত্মার একটা নিম্নাংশ প্রকট হয় মাত্র। ভুবর্লোকে জীবাত্মা এই দেহে অবস্থান করিয়া থাকে। ভূলোকে আমাদের অবস্থা আরও হীন হইয়া পড়ে. কেন না, এখানে মানুষের স্বরূপ আরও আচ্ছন্ন। এখানে কোন একটি লোককে দেখিলে, সে দেখা দেখাই হয় না। এখানকার দেখা বড়ই আংশিক, বড়ই অসম্পূর্ণ। আমরা এই ভূ-লোকে মানুষের প্রকৃত মূর্তি দেখিতে পাই না এখানে তাহাব অতীব নিকৃষ্ট অংশই দেখিয়া থাকি। তাই আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভূ-লোকে মানুষের অতীব সামান্য শক্তির প্রকাশ হয় মাত্র। তাহার মধ্যে আরও অনন্ত শক্তি নিহিত থাকে।

জীবাত্মা মনোময় স্তরে আসিয়া তত্রত্য জড়াংশ আকর্ষণ কবিয়া একটি মনোময় শরীর বা কোষ গঠন করিয়া লয়। এই স্তরে অবতীর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্বে স্বর্লোকে অবস্থান-কালে উহার যে মানসিক উন্নতি আয়ত্ত হইয়াছিল, তদনুসারেই এই নবীন মনোময় কোষ সংগঠিত হয়। স্বর্লোকে যতটুকু মানসিক উন্নতি করিয়া উহাকে ঐ লোক ত্যাগ করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে ঠিক সেই স্থান হইতেই আবার ঐ উন্নতি প্রবাহ বহিতে থাকিবে। কিন্তু জন্ম-পরিগ্রহ-ব্যাপাবে এই মনোময় স্তরে অবতরণ করিয়া জীবাত্মা কিরূপ মনোময় কোষ রচনা করিয়া লয়, তাহা তাহার অতীত পার্থিব জীবনের অবস্থা ও শিক্ষার উপর খুব বেশী পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে, মানুষ সারাটা জীবনই মনোময় কোষ রচনা করিতে থাকে। সারা জীবনের কার্যপ্রভাবে ঐ কোষের পরমাণুপুঞ্জের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। কখন ঐ কোষের উৎকর্ষ, কখন বা অপকর্ষ ঘটিয়া থাকে।

মনোময় উপাদান বা তেজস্তত্ত্ব

মনোময় স্তরে আসিয়া জীবাত্মা প্রকট হইবার মানসে যে সকল জড়াংশ সংগ্রহ করিয়া লয়, সেগুলি নির্জীব পদার্থ নহে। থিওসফিস্ট অর্থাৎ যোগদৃষ্টিসম্পন্ন মনীষিগণ "নির্জীব পদার্থ" বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম-পদার্থের তৃতীয় বিভাগের প্রথম নিষেচনে যাবতীয় পদার্থই সঞ্জীবিত হইয়াছে মহাত্মা লেড বিটার তদীয় "খৃষ্টীয় ধর্ম" নামক গ্রন্থে এই তৃতীয় বিভাগের বর্ণনা করিয়াছেন। স্থূল-জগতের অভিমুখীন প্রত্যেক স্তরের আণবিক জড়াংশই ব্রহ্মের দ্বিতীয় নিষেচনে অনুপ্রাণিত হয়। এই নিষেচনকেই নিরবয়ব জীবৎপদার্থ বলে। মনোময় স্তরের যে জড়াংশ জীবাত্মার চতুর্দ্দিকে এক্ষণে সংগৃহীত, সেগুলি এই দ্বিতীয় নিষেচনেও প্রাণময়। এই নিরবযব জীবৎ-পদার্থকেই অন্যান্য স্তরে উপাদান-সার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব দেখা গেল যে, উপাদন রাশি তিনটি প্রকৃষ্ট বিভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগ মনোময় স্তরের উচ্চতর অংশসম্পৃক্ত দ্বিতীয় বিভাগ ঐ স্তরের নিম্নতর অংশ-সংবলিত, তৃতীয় বিভাগ ভূবর্লোক-সংশ্লিষ্ট। তৃতীয় বিভাগের কথা আমরা পরে বলিব। দ্বিতীয় বিভাগই এক্ষণে আমাদিগের আলোচ্য।

অতত্রব দেখা গেল, জীবাত্মা মনোময় স্তরে আসিয়া শুধু যে তত্রত্য জড়াংশই আকর্ষণ করিয়া লয়, তাহা নহে। কিন্তু উপরি উক্ত দ্বিতীয় বিভাগীয় পদার্থও অর্থাৎ নিরবযব জীবৎপদার্থও সেই সঙ্গে আপনার অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ব্রহ্ম সম্ভূত জীবৎপদার্থ একটা ক্রমোন্নতির পন্থা অনুসরণ করিয়া থাকে। এই পদার্থে স্বভাবতঃ কতক গুলি প্রবৃত্তি নিহিত থাকে। উহাদের প্রেরণায় ঐ পদার্থ ক্রমোন্নতির অনুকূল অবস্থার অন্বেষণ করে। তদবস্থায় পরিস্পন্দই ঐ ক্রমোন্নতির পক্ষে আবশ্যক। বহিরাগত আবেগ-উদ্বেগে সাড়া দিতে দিতেই উহার ক্রমোন্নতি ঘাটতে থাকে। ঐরূপেই উহার বৃদ্ধি ও পুষ্টি হয়। আমাদেরও যখন খুব বেশী উন্নতি ঘটে, তখন আমরাও অনেক সূক্ষ্ম পরিস্পন্দে সাড়া দিতে সমর্থ হই। তাই বলিতেছি, ঐ জীবৎ-পদার্থ বিবিধপ্রকার স্পন্দনে সাড়া দিবার হেতু নিরন্তরই বহির্মুখ হইয়া থাকে। একটা বিষয়ে নিবদ্ধ থাকা উহার পক্ষে একেবারেই প্রকৃতিবিরুদ্ধে। উহা কিছুতেই বিষয় বিশেষে অধিক কাল আবদ্ধ থাকিতে চাহে না।

আদিভূত জীবৎ পদার্থের বহির্মুখীন হইবার বিষয় সম্ভবতঃ আমাদিগের সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। যখন আমরা ধ্যান-ধারনা করিতে বসি, তখন আমরা বিষয়বিশেষে নিবিষ্টচিত্ত হইবার চেষ্টা করি, তখনই দেখি যে, আমাদিগের চিত্ত কিছুতেই নিবদ্ধ হইতে চাহে না, অতর্কিতভাবে বাহিরে চলিয়া যায়। আমরা সকলেই বেশ বুঝিয়াছি যে, আমাদিগের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহার প্রভাবে আমরা নিরন্তর অস্থির চিন্তার আয়ত্ত হইয়া উঠিতেছি। উহারই দারুণ শক্তিতে আমরা কোন একটি বিষয়ে চিত্ত সংলগ্ন রাখিতে পারিতেছি না। আমরা চিত্ত স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছি, আর ঐ প্রভাব উহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। মনকে বশীভূত করিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছি, যাহাতে স্ফূর্তি করিয়া মন স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে না পারে, সে বিষয়ে আমাদিগের তীক্ষ্ম দৃষ্টি রহিয়াছে। দৃষ্টি থাকিলে কি হইবে, কে যেন মনকে আকুল-ব্যাকুল করিয়া বাহিরের দিকে যাইবার প্রেরণা দিতেছে। এইরূপে একটা প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে আমাদিগের নিরন্তর সংগ্রাম চলিতেছে।

অপ্-তত্ত্বে প্রকট হইবার প্রণালী

মনোময় উপাদানকে আমবা তেজস্তত্ত্ব বলিতে পবি। এই তত্ত্বেব সাহায্যে জীবাত্মাও যতটুকু পবিব্যক্ত হইবার কথা, তাহা হইয়া গেলে উহা নিম্নতব ও স্থূলতব অবস্থায় আসিযা উপনীত হয়। এই স্থূলতর জগতেব জড়াংশকে অপ্-তত্ত্ব বলে। জীবাত্মা তেজস্তত্ত্বেব সাহায্যে যেরূপ-ভাবে প্রকট হইযা ছিল, এখানেও তদ্রূপভাবে ব্যক্ত হইবাব চেষ্টা কবে এই অপ্-তত্ত্বে তাহাব যতটুকু প্রকাশ হওয়া সম্ভবপব, ততটুকু ব্যক্ত হইবাব মানসে নিজেব চতুর্দিকে তত্রত্য জড়াংশ সংগ্রহ কবিযা থাকে। এই জীবাত্মা পার্থিব দেহ ত্যাগ কবিযা স্বর্লোকে যাইবার সময় সঙ্গে সঙ্গে যে সূক্ষ্ম প্রেতদেহ পরিত্যাগ কবিযা গিযাছিল, সেই দেহেব সহিত এখনকাব এই অপ্‌তত্ব সঞ্জাত দেবে অতীব সুন্দব সামঞ্জস্য দেখা যায়। তেজস্তত্ত্বেবই হউক বা অপ্ তত্ত্বেবই হউক প্রত্যেক স্তবেই জীবাত্মার কিযদংশমাত্র ব্যক্ত হইযা থাকে। ঐ সকল স্তবে জীবাত্মাকে পূর্ব্বেও অনেকবার অবস্থান কবিতে হইযাছিল। ঐ ঐ স্তবে তাহার যেমন যেমন অভিজ্ঞতা ঘটিযাছিল, এক্ষণে কার্যতঃ তাদৃশ অভিজ্ঞতাই ফুটিয়া উঠে। জীবাত্মাব পূর্বজন্মে যে যে মানসিক আবেগ ও প্রবৃত্তি ছিল, এখন এই অপ্-তত্ত্ব-সঞ্জাত নবীন দেহেব জড়াংশ-বিন্যাসে সেই সকল পৌর্বদৈহিক প্রবৃত্তি প্রভৃতি স্ফুরত হইবাব কথা। এই জড়াংশ-বিন্যাস ঐ স্ফুবণেব অনুকূল। পূর্ব প্রেত-দেহে জীবাত্মা যাদৃশী প্রকৃতি সম্পন্ন ছিল, ইচ্ছা কবিলে এখনও সে সেইরূপ হইতে পাবে। কিন্তু সেরূপ হওযা না হওযা তাহাব ভূ-লোকেব শিক্ষা ও পাবিপার্শ্বিকেব উপব খুব বেশী পবিমাণে নির্ভব কবিযা থাকে মানসিক উন্নতিব সম্পর্কে এ কথা পূর্বেও বলা হইযাছে।

জীবাত্মাব অন্তবে পূর্বজন্মেব বিস্তব বাসনা বীজ সঞ্চিত থাকে। সে সমুদয়গুলিকেই যে অঙ্কুবিত হইযা ফলপ্রসব কবিতে হইবে, তাহা নহে। একটু সতর্ক হইতে পাবিলে সুবাসনা বীজগুলিব উন্নত-সাধন ও কুবাসনা বীজগুলিকে শক্তিহীন কবা সম্পূর্ণরূপে সম্ভবপব। যাহাতে কু-বাসনা বীজ অঙ্কুবিত হইযা বর্ধিত হইতে পাবে, সেরূপ যাবতীয় সুযোগ দূব কবিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ কুবীজগুলি অঙ্কুরোদগমশক্তি বিনষ্ট হইযা যাইবে। অভিভাবকগণ এইরূপ সতর্ক হইলে সন্তানগণেব অশেষ কল্যাণসাধন কবিতে পাবেন। সন্তান-সন্ততি ভূমিষ্ঠ হইযা যতই বড হইতে থাকে, সতর্ক অভিভাবকের গুণে তাহাদেব সদ্‌বৃত্তিগুলিব উন্নতি, ব্যাপ্তি ও বৃদ্ধি হইযা উঠে। উহাদেব পূর্বজন্মেব যে সকল কুপ্রবৃত্তিব বীজ সঙ্গে আসিযাছিল, সেগুলিকে প্রশ্রয় না দেওযাব তাহাবা কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয না; পবন্তু সেগুলি বীজরূপে বালকদের অন্তবে এ জন্মে থাকিযা যায। এইরূপে ঐ সকল কুপ্রবৃত্তিব বীজ শক্তিশূন্য হইযা পডে। শেষে ঐগুলি অন্তর্হিত হয, আর উহাদের স্থানে নূতন নূতন সদ্‌বৃত্তি আসিযা সঞ্চিত হইতে থাকে। সতর্ক অভিভাবক-পবিচালিত এই বালকদিগেব ভাবী জন্মে ঐ সকল শক্তিহীন কুপ্রবৃত্তিব বীজ আব আদৌ পবিলক্ষিত হইবে না। আব কোন দিনই কু-প্রবৃত্তিব জ্বালায উহাদিগকে জ্বলিতে হইবে না। আব কোন দিনই কু-প্রবৃত্তিব জ্বালায উহাদিগকে জ্বলিতে হইবে না। কেন না, তাহাদেব অন্তরে বিপরীত গুণেব অর্থাৎ সৎপ্রবৃত্তিব পরিপুষ্টি হওযায তথায অসদ্‌বৃত্তিব অবস্থান অসম্ভব হইযা উঠিবে।

জীবৎ-উপাদান

তেজস্তত্ত্ব যেমন ব্রহ্ম-শক্তির নিষেচনে প্রাণময় হইয়া থাকে, তদ্রূপ অপ্‌তত্ত্বও ঐ জীবৎ উপাদানে আচ্ছন্ন হয। তাই জীবাত্মা অপ্-তত্ত্বে প্রকট হইবাব সময তত্রত্য জড়াংশেব সহিত

ঐ ব্রহ্ম-শক্তি অনেক পরিমাণে নিজের ভিতবে আকর্ষণ কবিয়া লয। ঐ শক্তি অনেক পরিমাণে নিজের ভিতরে আকর্ষণ করিয়া লয়। ঐ শক্তি বা জীবৎ-পদার্থ সে সময়ের জন্য জীবাত্মার দেহাংশস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায। স্মরণ রাখিতে হইবে, ঐ জীবৎ পদার্থ ভগবৎ সত্তারই অংশ। ভগবৎ সত্তা সৃজন-ব্যাপারে লিপ্ত হইবার ইচ্ছায় জড় পরমাণুপুঞ্জেব অভ্যন্তবে অনুসৃত হইয়া থাকে। অপ তত্ত্বের এই ব্রহ্ম-উপাদানই বিবর্তন প্রথানুসাবে পববর্তী পর্যায়ে খনিজ বাজ্যকে প্রাণময় করিয়া তুলে। তখন সেই খনিজ রাজ্যার্ন্তগত ব্রহ্ম-শক্তির আবার উর্দ্ধদিকে নবীন বিবর্ত্তন গতির সূত্রপাত হয! অপ্‌তত্ত্বের এই জীবৎ উপাদান খনিজ বাজ্যেব দিকে নিম্ন গতি হওযায উহাব মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়ে যাহার সহিত আমাদিগেব প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য রক্ষা করা আমাদেব পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে। উন্নতি বলিতে আমবা স্থূল হইতে সূক্ষ্মেব দিকে—ভৌতিক হইে অধ্যাত্মেব দিকে অগ্রসব বুঝি। কিন্তু উপবিউক্ত জীবৎ-পদার্থের প্রকৃতি বিপরীত। উহা সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের দিকে অবতবণ করিতেছে। অতএব উহার পক্ষে উন্নতি বলিতে অধিকতর স্থূলত্ব-প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে , সুতবাং অতীব স্থূল স্পন্দনে সাড়া দেওয়াই উহার বাসনা। কিন্তু উন্নতিকামী মানবেব আশা, আকাঙক্ষা ও প্রয়োজন বিভিন্ন প্রকার। মানব যথাসাধ্য স্থূল হইতে সূক্ষ্মের দিকে যাইতে চেষ্টা কবে। উচ্চতর বাসনার সুকুমার পবিস্পন্দে সাড়া দেওয়াই তাহার আবশ্যক মনে হয।

অপ্‌-তত্ত্ব অতীব সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত উপাদান। উপবি উক্ত নিরবয়ব জীবৎ ভগবদংশ জীবাত্মাব ঐ অপ্‌-তত্ত্ব গঠিত কামদেহে অবস্থান কবে। এই রূপে কাম দেহ গঠিত হইবাব পরে জীবাত্মা স্থূল-শবীব পরিগ্রহে প্রবৃত্ত হয। পূর্ব-জন্মেব কর্মানুসাবে এই জীবাত্মাব জন্য মাতৃজঠবে একটি স্থূলদেহ নির্মিত হইতে থাকে। এখন কাম- দেহ সংবলিত লইয়া উহা ঐ জঠবস্থিত স্থূলদেহ অধিকার কবিযা লয়। এই স্থূলদেহটি ধীরে ধীবে গঠিত হইতে থাকে বলিয়া জীবাত্মা অপ্‌-তত্ত্ব দিন দিন আয়ত্ত করিয়া ফেলে। এইরূপে ভূমিষ্ঠ হইযা আত্মপ্রকাশেব উপযুক্ত ইন্দ্রিয গ্রামও সুন্দবরূপে গঠন কবিতে আরম্ভ করে। ইন্দ্রিয়াদি গঠনেব উপাদান তাহাতে প্রদত্ত হইযা থাকে। প্রদত্তই বা বলি কেন, উহার পূর্ব-জন্মেব কর্মনুসারেই ঐ উপাদানেব ব্যবস্থা হয়, সুতবাং বলা যাইতে পারে যে এ উপাদানও তাহার স্বোপার্জিত। তাহাকে উপাদন, দেওয়া হয় বটে, উহা দ্বারা কিরূপভাবে কাজ করিতে হইবে, সেটা তাহাব নিজেব উপর নির্ভর কবে। এই উপাদানের সম্পূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে কি উহাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, পরিশ্রম সহকাবে ও নিরন্তন সতর্ক ব্যবহাব দ্বাবা উহাব অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জেব উন্মেষসাধন করিতে হইবে, কি অব্যবহার্য রাখিয়া উহাদিগকে ক্ষীণ কবিয়া ফেলিতে হইবে, তাহা তাহার নিজের বিবেচনাসাপেক্ষ। মাতৃ-জঠরে স্থূল-দেহধারী জীবত্মা যতই বর্ধিত হইতে থাকে, ততই তাহার অন্তরে বাসনা-বাশি পুষ্টিলাভ করিতে আবম্ভ করে। ক্রমে তাহার অতিসূক্ষ্ম অব্যক্ত কাম-দেহটিকে একটি বর্ণ ও স্পন্দনযুক্ত সুস্পষ্ট লিঙ্গ শবীবে পরিবর্তিত করিয়া তুলিবার ইচ্ছা জন্মে। জীবাত্মা তখন এতদিচ্ছাব একটা বেগ অনুভব করিতে থাকে। জঠরে অবস্থান কালে প্রবল ইচ্ছার বশে জীবাত্মা যেমন অপ্‌-তত্ত্ব গঠিত কাম দেহটিকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলে তদ্রূপ, ঐ ভাবে তাহার তেজস্তত্ত্ব- নির্মিত মানস-দেহও সৌষ্ঠব সম্পন্ন ও সুস্পষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা আপাততঃ অপ্‌-তত্ত্বেরই আলোচনা করিব।

একটি অস্থায়ী পদার্থ

মানুষ অপ্-তত্ত্বের স্তরে অবস্থান-কালে যে নিরবযব জীবৎ-পদার্থ আপনার অভ্যন্তরে আকর্ষণ করিয়া লয়, তাহা তদীয় কাম-দেহে পৃথক্ পদার্থরূপে অবস্থিত থাকে। ঐ পদার্থের একটা জগদ্ব্যাপী মহার্ণব বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ কবিতেছে। মানুষের লিঙ্গ-দেহস্থ ঐ পদার্থ সেই বিশ্বব্যাপী জীবন সমুদ্র হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া পড়ে। উহার প্রকৃতিব একটু বৈশিষ্ট্য আছে। উহাকে জ্ঞানময় বলা চলে না ; কেন না, উহা এখনও খনিজ পদার্থে পর্যন্ত স্ফুরিত হয় নাই। আব তাহাতেই বা কি? আমরা খনিজ পদার্থকেও "জ্ঞানময়" আখ্যা প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি। জ্ঞানময় না হইলেও ঐ পদার্থের একটি অসাধারণ শক্তি আছে। শক্তিটি এই যে, উহা পারিপার্শ্বিকেব সহিত উপযোগী হইয়া চলিতে পারে ও তাহা হইতে আপনাব প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রহণ কবিতে সমর্থ। এই শক্তি থাকা প্রযুক্ত উহাকে কতকটা জ্ঞানময় বলিয়া মনে হয। আর যদি ভাবা যায়, এটা সীমাবদ্ধ জ্ঞানেব কার্য, তাহা হইলেও মনে হয় যে, এবম্প্রকাব সীমাবদ্ধ জ্ঞান অতীব তীক্ষ্ণ। আমবা পূর্বেই বলিয়াছি, পবিস্পন্দ দ্বারাই উহাব ক্রমোন্নতি সংসাধিত হইয়া থাকে। ভুবর্লোকে যে সমুদয় পবিস্পন্দ হয, তাহা কোন না কোন প্রকাব অনুবাগ বা আবেগেব ফল। ঐ জীবৎপদার্থ যখন ব্যোমপ্রদেশে ভাসমান হইয়া অবস্থান কবে, তখন উহাব উন্নতি নানাবিধ আবেগ উদ্বেগের লহরী-লীলাব উপব নির্ভব কবিযা থাকে। যে সকল জীবিত প্রাণী উন্নত ও শক্তিসম্পন্ন, তাহাদিগেব মানসিক স্পন্দন ভুবর্লোকে লহরী তুলিযা ছুটিতে থাকে। জীবিত প্রাণী বলিতে এখানে শুধু মানুষকে বুঝিতে হইবে না, উহাতে মানব, মনুষ্যেতব জন্তু, স্বভাব-শাসক দেবযোনি ও নিম্নশ্রেণীব দেবগণকেও বুঝিতে হইবে। শেষোক্ত দেবগণকে সংস্কৃত ভাষায কাম-দেব বলা হইবা থাকে। কেন না, দেবত্ব পাইলেও উহাবা এখনও কামনাশূন্য হইতে পাবে নাই। পূর্বেই বলা হইযাছে যে, ব্যোম-প্রদেশে জীবৎ-পদার্থের একটা বিরাট বারিধি বিরাজ করিতেছে। উপরি উক্ত মানব, দেবযোনি প্রভৃতির আবেগ উদ্বেগ বশতঃ যে স্পন্দন উদ্ভূত হয়, তাহাতে ঐ পদার্থ সমুদ্রেব দুই একটি কণামাত্র উপকৃত হইয়া থাকে। সে উপকারও নিবন্তর পাওয়া যায না , কচিৎ তাহা পাইবাব সুযোগ ঘটে।

কিন্তু ঐ বিপুলার্ণব হইতে যে অংশ আকৃষ্ট হইয়া মানবের কাম-দেহে নিবদ্ধ থাকে, তাহা স্পন্দন কেন্দ্রে অবস্থিতি প্রযুক্ত নিরন্তবই স্পন্দন বেগ অনুভব করিতে পায়। তন্নিমিত্ত অল্পসময়ে অত্যধিক পরিমাণে স্পন্দনেব উপকার প্রাপ্ত হয়। পূর্বেই বলা হইযাছে যে, জ্ঞানময না হইলেও অদ্ভুত শক্তিপ্রযুক্ত উহাকে কতকটা জ্ঞানময় বলিয়া বোধ হয। অদ্ভুত অর্দ্ধচৈতন্য থাকায় মনে হয়, উহা যেন ঐ উপকাবটা অনুধাবন করিতে সমর্থ হইতেছে। যেরূপেই হউক, ঐ জীবৎ-পদার্থ বুঝিতে পারে যে, উহা বেশ বাঞ্ছনীয় অবস্থায অবস্থিত আছে। তাই উহার পরমাণুপুঞ্জ সংশ্লিষ্ট ভাবে একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে অবস্থান করিতে কৃতসঙ্কল্প। এইরূপ অবস্থানে উহাদেব সুবিধা অধিক। আর উহারা যে এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ়, তাহা নিজেরাও বেশ বুঝিতে পারে। স্থূল দেহের পরমাণুপুঞ্জের মত কাম-দেহের পরমাণু-বাশি নিবন্তরই বিক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু তথাচ নবাগত পরমাণুপুঞ্জেও মানবের স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি বিজ্ঞাপিত হইয়া পড়িতেছে. কামদেহস্থ ঐ জীবৎপদার্থ নিঃসংশয়রূপে আপনাকে পৃথক সত্তা মনে করিয়া নিজের অভিলষিত কার্যে ব্যাপৃত হইতেছে।

বিপরীত স্বার্থ

আমবা পূর্বে যাহা বলিযাছি, তাহা আমাদিগেব বর্তমান আলোচনায পবিস্ফুট হইবে। জীবাত্মা ও কাম-দেহস্থ জীবৎপদার্থ এতদুভযেব স্বার্থ সাধাবণতঃ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা অনাবিল স্পন্দনই প্রথমটিব বাঞ্ছনীয। উহা স্থূল-জগৎ পরিহার কবিয়া নিরন্তরই ঊর্ধ্বদিকে উঠিতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীযটিব কেবলই চেষ্টা যে, উহা অধিকতর বেগবান্ ও স্থূলতব স্পন্দনের বিষযীভূত হয়। এই বাসনা উপাদান বা জীবৎপদার্থ নিম্নদিকে ক্রমশঃ নিবিড হইতে নিবিডতরভাবে জডাভ্যন্তরে যাইযা মিশিতেছে। তা জীবাত্মাব সঙ্গে বাসনা উপাদানেব নিবন্তব সংগ্রাম চলিতেছে। সাধু পল (St Paul) বলিযাছেন—এ যুদ্ধটা ঠিক যেন দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব সহিত মনেব যুদ্ধেব মত। ব্যাপাবটা যে ঠিক এই রূপই হয়, তাহাও নহে। ইহাপেক্ষাও গুরুতব কাণ্ড ঘটে। লিঙ্গ দেহেব সেই জীবৎপদার্থ ক্রমে বুঝিতে পারে যে, তাহাব মধ্যে একপ্রকাব সূক্ষ্মতত্ত্ব জড়াংশ বিদ্যমান আছে। সেটি মানস দেরে জডাংশ ব্যতীত আব কিছুই নহে। সেই অস্থাযী সত্তা ইহাও বুঝিতে পারে যে, যখন ঐ সূক্ষ্মতব জডাংশেব সহিত তাহাব নিজেব যুগপৎ স্পন্দন হইতে থাকে, তখন সেই স্পন্দন অনেকটা স্থাযী ও সুস্পষ্ট আকাব ধাবণ কবে। তাই ঐ সত্তাব প্রতীতি জন্মে যে, যদি উহা মানস দেহেব সূক্ষ্মতব জডাংশেব সহানুভূতি আকর্ষণ কবিতে পাবে, অর্থাৎ কথাটি সহজ করিয়া বলিলে এইরূপ বলা যায যে, যদি উহা আমাদিগেব মনে এমন একটা বিশ্বাস আনিযা দিতে পাবে যে, ঐ সত্তার ইচ্ছাও আমাদেব ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে একইরূপ, তাহা হইলে উহাব প্রবৃত্তি আবও প্রকৃষ্ট হইযা উঠে। অতত্রব দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগেব লিঙ্গদেহস্থ ঐ স্বতন্ত্র সত্তা আমাদেব নিকটে বৃত্তিব উত্তেজকস্বরূপ হইযা দাঁডায। উহা আমাদিগেব অন্তবে যাবতীয স্থূল ইন্দ্রিযবৃত্তিব বাসনা সৃজন কবিবাব প্রযাস পায।

তথাচ আমাদিগকে সাবধান হইতে হইবে, যেন আমবা ধর্মসম্বন্ধীয পুবাকালেব সেই ভ্রমে পতিত না হই। ভ্রমটি এই—"ঐ সত্তা কুসত্তা, উহা একটি শযতানবিশেষ, মতলব আঁটিযা আমাদিগকে বলপূর্বক পাপকর্মে প্রবৃত্ত কবিবাব চেষ্টা কবিতেছে।" ঐ জীবৎ উপাদান কোন বিবর্তন বিধিব প্রসূত ফল নহে। উহাব জন্মান্তব প্রভৃতি নাই। আমাদিগেব উপব এই অসাব সত্তাব কোন প্রকাব কুমতলবও নাই। উহা নিজেব ব্যাপাবেই নিবিষ্টচিত্ত থাকে। উহা যাহার কাম দেহেব অংশস্বরূপ, তাহাবও কোন খোঁজখবব বাখে না। তাহাব সম্বন্ধে কিছু পবিজ্ঞাত থাকা অথবা তাহাব ক্রমোন্নতি প্রাণী সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান লাভ কবা উহাব পক্ষে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। যদিউহা কোনরূপে অস্পষ্টভাবে তাব উর্ধগতির প্রযাস বুঝিতে পাবে, তবে সেইপ্রযাসকে প্রলোভনেব কার্য বলিয়া মনে কবে। মনে কবে। মনে কবে,, ঐ প্রলোভন উহাকে ক্রমোন্নতিব পথ হইতে নিম্নাভিমুখে টানিযা আনিতেছে।

কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কাম দেহস্থ ঐ জীবৎ উপাদান মানবেব কিছুই পবিজ্ঞাত থাকে না। উহা কেবল এইটুকু বুঝিতে পাবে যে, ঐ স্থানে থাকা প্রযুক্ত উহাব একটা ইন্দ্রিয-বৃত্তি ঘটে, আব সেই বৃত্তিটি যতই প্রখবা হয উহা ততই প্রীতি অনুভব কবিতে থাকে। ঐ বৃত্তিটি তৎসংশ্লিষ্ট মানবের নিকটে সুখকব কি অপ্রীতিকব, তাহা উহা দেখিতে চাহে না। উহা মাত্র স্বকীয পবিপুষ্টি লইযাই ব্যস্ত থাকে। তাদৃশী পবিপুষ্টিতে যে উহাব উন্নতি পথে ব্যাঘাত ঘটিতে পাবে, উহাতে উন্নতিব পবিবর্তে যে অবনতি হইতেছে, সে তাহা হৃদযঙ্গম কবিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ।

অতএব ঐ জীবৎ উপাদানকে কোনক্রমেই শত্রু বলিয়া ভয়ের চক্ষুতে দেখিবার আবশ্যক নাই। মানবের জীবাত্মা যেমন ভগবদংশ, উহাও তদ্রূপ সেই অংশবিশেষ। উহাদের উন্নতির ক্রমে কেবল তারতম্য ঘটিয়াছে মাত্র।

অতএব আমাদের দৃষ্টিতে মনে হয় যে, ঐ জীবৎ উপাদানের কার্য—"প্রলোভন।" আমরা বলিয়া থাকি যে, আমাদিগের বাসনা নিম্নদিকে প্রধাবিত হইয়া আমাদিগকে অশেষ যাতনা দিতেছে; কিন্তু যথার্থরূপে দেখিলে বুঝা যায় যে, ঐ বাসনাপুঞ্জ আদৌ আমাদিগের নহে। উহারা ঐ জীবৎ সত্তারই সামগ্রী। আমাদিগের অভ্যন্তরে নিহিত ঐ সত্তার জন্য প্রকৃতপক্ষে আমরাই দায়ী। উহা আমাদিগেরই উপার্জিত সম্পত্তি। উহা দ্বারা আমাদিগেরই প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। পূর্বজন্মে যদি আমরা সংযত হইয়া বাসনা পুঞ্জের পবিত্রতাসাধন করিতাম, তাহা হইলে এক্ষণে এই উচ্চতর ও পবিত্রতর জীবনযাপন করিবার চেষ্টার সময় আমাদিগের বাসনা উপাদন ঘৃণিত ভোগাসক্তিব্যঞ্জক স্পন্দনের সহিত অশুভভাবে সংশ্লিষ্ট না হইয়া অধিকতর প্রীতিপ্রদ হইয়া দাঁড়াইত। ঐ অসৎ বাসনা উপাদান আমরা নিজেরাই সৃজন করিয়াছি। তাই বলিয়াই যে আমাদিগকে উহার দাস হইয়া চলিতে হইবে, তাহার কোন হেতু নাই। বরং আমাদিগকে উহা সংযত করিতে হইবে। আমাদিগকে অনুধাবন করিতে হইবে যে, উহা হইতে আমরা স্বতন্ত্র। উহার সম্বন্ধে আমাদিগের সর্বোৎকৃষ্ট কর্তব্য কি?

বাসনা দমন করিবার উপায়

যখন কোন কু-বাসনার সহিত আমাদিগের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে, তখনই সর্বাগ্রে আমাদিগকে স্পষ্টতঃ অনুধাবন করিতে হইবে যে, আমরা ঐ ঘৃণিত বাসনার অনুকূল নিম্নশ্রেণীর সামগ্রী নহি। কোন নিম্নতর পদার্থের আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমরা কদাচ বলিব না যে, আমরা এইটি বা ওটি চাইই। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বলিতে হইবে—"আমি জীবাত্মা, যাহা আমার উন্নতির অনুকূল, উন্নততর সোপানে আরোহণ করিবার পক্ষে যাহা আমার ও অন্যের সহায়স্বরূপ যাহাতে আমার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ ঘটাইবে, আমি তাহাই চাই। আমি কোন প্রকার নিম্নতর পদার্থের প্রয়াসী নহি।" যখন কোন বেগবান্ স্পন্দনে তাহার কাম দেহ আলোড়িত হইবে, যখন ক্রোধের উন্মত্ত তরঙ্গে কিংবা ভোগাসক্তির বিপুল বেগে যে অস্থির হইয়া উঠিবে, তখন তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে—"আমি কদাচ ক্রোধের বশীভূত হইব না," কিংবা "আমি কদাচ কাহারও অপকার করিব না।" তাহাকে আরও ভাবিতে হইবে— "আমি প্রকৃতিস্থ থাকিব, এই সকল উৎপাতকে মনেও স্থান দিব না। এই যে বাসনা উপাদান ক্রোধের সুখ উপভোগ করিবার নিমিত্ত আমাকে ক্রোধোন্মত্ত করিতে ব্যস্ত হইয়াছে, কিংবা ইন্দ্রিয় বৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আমাকে তৎসংশ্লিষ্ট কার্যে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি বাসনা উপাদানকে কখনই ঐরূপ প্রশ্রয় দিব না। আমি আত্মন্ পদার্থ। আমি আমার নিজের কর্তব্যসাধন করিব। ঐ সকল ঘৃণিত, ভয়াবহ কার্য আমার দ্বারা হইতেই পারে না। আমি যখন আত্মন্ তখন ঐরূপ কার্য্য আমার লক্ষ্য ও চেষ্টার বিষয়ীভূত হইবে কেন? হইতেই পারে না। যে জীবৎ পদার্থ বাসনা উপাদান হইয়া আমায় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, তাহা অতীব নিকৃষ্ট—এত নিকৃষ্ট যে, নিজ দেহ পর্যন্ত ধারণ করিবার সুযোগ ও পায় নাই। উহা স্বার্থ সাধন নিমিত্ত আমাকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। উহার ক্রীড়া পুত্তলিকা হইয়া আমি স্বীয় মানসম্ভ্রম নষ্ট করিব কেন?"

এক্ষণে প্রকৃত কথা এই যে, বাসনাপীড়িত ব্যক্তিকে অনুধাবন করিতে হইবেযে, সে উচ্চতর শক্তি, নিবন্তর কল্যাণ অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, মঙ্গললাভার্থই সংগ্রাম কবিতেছে; আব এই বাসনা পুঞ্জ নিম্নতব শক্তি, সে ইহা হইতে সম্পূর্ণরূপ স্বতন্ত্র, এই নিম্নতর শক্তি উহাব একটা নিম্নতর কোষের অসংযত ক্ষুদ্রাংশমাত্র। উহাকে সংযত করা, সম্পূর্ণরূপে বশীভূত কবাও উহাকে সুশৃঙ্খল করিয়া তোলা তাহার শিখিবার প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া সে যেন মনে না করে যে, ঐ বাসনা উপাদান অসদ্‌বস্তু। উহাও দিব্য শক্তির নিষেচন। উহাও একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে শৃঙ্খলার সহিত ছুটিতেছে। তবে ও ক্ষেত্রে উহাব গতি নিম্নাভিমুখে—জড়ের দিকে। আমাদিগের ন্যায় উহাব গতি উর্ধ্বদিকে নহে। সে দিক্ হইতে দূরে।

অপন্যস্ত মমতা

যাঁহারা পরাবিদ্যাব আলোচনা করিযা থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এতই কোমল হৃদয়, নিঃস্বার্থ ভাবটিকে তাঁহাবা এতই পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন যে, তাঁহাদের মতে পূর্বকথিত বাসনা-উপাদানেব প্রতি আমাদেব অনুকূল হওযা ও ঐ উপাদানের আকাঙক্ষা কিয়ৎপরিমাণে চবিতার্থ হইতে দেওয়াই আমাদিগেব কর্তব্য। ঐ স্নেহশীল ব্যক্তিবর্গেব এই সহানুভূতি-সূচক নিঃস্বার্থ ভাবটি আদবণীয হইলেও যুক্তিযুক্ত নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি আমাদিগেব কামদেহে স্থূল-বৃত্তিকামী উপাদান নিহিত হইযা পড়ে, তবে উহা বড়ই গর্হিত ব্যাপাব বলিতে হইবে। যদি ঐ উপাদান আমাদেব শবীবে সঞ্চিত না হইযা একটি কুকুর বা তদপেক্ষাও কোন হীনতব প্রাণীব সূক্ষ্মদেহের অংশস্বরূপ হইত, তাহা হইলে উহার সমক্ষে স্থূল বৃত্তি চবিতার্থ কবিবার সুযোগ আরও প্রকৃষ্টরূপে দেদীপ্যমান হইযা উঠিত। অতএব এবম্প্রকাব উপাদান বিদূরিত কবিযা তৎস্থানে যত সত্বর উচ্চতর উপাদানের সমাবেশ কবা যায়, ততই আমাদের মঙ্গল।

ঐ প্রকার উপাদান সম্বন্ধে আমাদিগেব একটা কর্তব্য আছে। যে উচ্চতব উপাদান উপযুক্ত আশ্রয় ব্যতীত পরিপুষ্টি লাভ কবিতে পাবে না, তাহাকে তাদৃশ আশ্রয় সংগ্রহ কবিয়া দেওয়াই আমাদের সেই কর্তব্য ঐ উপাদানের মধ্যে যেগুলি নিম্নশ্রেণীভুক্ত, অসভ্য মানুষ ও জীবজন্তুব দেহেই তাহাদের বিকাশসাধন ঘটিতে পাবে। আমাদিগের স্বজাতিব মধ্যে অর্থাৎ মানুষের মধ্যে যাহাবা অপেক্ষাকৃত অনুন্নত, তাহারাই ঐ বিকাশসাধনেব বিপুল ক্ষেত্র। তা ছাড়া সমগ্র প্রাণীবাজ্যেই ঐ নিম্ন শ্রেণীর উপাদান-ঘটিত পবিপুষ্টি সম্ভবপর। অতএব আমাদিগেব উচ্চতব কর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া অন্যেব কার্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিপথগামী হইবাব কোনই হেতু নাই। আমাদের অন্তর্নিহিত কু-বাসনাগুলি চবিতার্থ হইবার নিমিত্ত আমাদিগকে অনুক্ষণ প্রেরণা দিতে থাকে। আমবা যদি ঐ প্রেবণায় দৃক্‌পাত না কবি, তাহা হইলে ঐ বাসনা উপাদান ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া একটি স্বতন্ত্র জীবৎপদার্থ হইয়া উঠে। নিম্নশ্রেণীর কণাগুলি বহির্নিক্ষিপ্ত হওয়ায় উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর পরমাণুপুঞ্জ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লয। যদি আমরা বাসনাগুল সংযত কবিতে ও অধ্যাত্ম জীবন যাপনে সমর্থ হই, তাহা হইলে যেরূপ বাসনা-উপাদান লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ কবিযাছিলাম, তদপেক্ষা অনেক উচ্চ ৎবনেব উপাদানে মণ্ডিত হইয়া আমরা জীবনের পবিসমাপ্তি করিতে পারি।

পুনর্গঠন

মৃত্যু হওয়ায যখন মানুষের স্থূলশরীর পরিত্যক্ত হয়, তখন তাহাব অন্যান্য কোষেরও পরমাণু-বিন্যাস পরিবর্তিত হইতে আরম্ভ হয়। তাহার কাম-দেহের বিশ্লেষণ পূর্ব হইতেই হইতে থাকে। ঐ দেহস্থ বাসনা উপাদান ঐ বিশ্লেষণব্যাপার স্বভাবতঃই বুঝিতে পারে। তাই বুঝিবামাত্র ত্রস্ত হইয়া পড়ে। তখন উহার মনে হয়, " আমি সুবিরাট উপাদান সমুদ্র হইতে পৃথকভাবে এ লিঙ্গ দেহে বাস করা প্রযুক্ত পরিপুষ্টি লাভ করিবার একটি অসাধারণ সুযোগ ভোগ কবিয়া আসিতেছিলাম; এখন বুঝি সেই সুযোগ বিনষ্ট হইতে চলিল। কেন না আমাব আবাস ভগ্ন হইতে আবম্ভ হইয়াছে।" এই ভাবিয়া উহার ভয় হইতে থাকে। তাই, সে কালবিলম্ব না কবিযা আত্মবক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। এই আত্মরক্ষার উপায়টি সুবুদ্ধিচালিত। কেন না, তখন সে কামদেহেব পবমাণুপুঞ্জ পুনরায একরূপভাবে বিন্যস্ত করে যে, ঐ নবীন বিন্যাস বহুদিন যাবৎ বিশ্লেষণ-ব্যাপারে বাধা দিতে সমর্থ হয। পরিশেষে যখন ঐ কাম-দেহ চূর্ণ হইয়া যায়, তখন এই উপাদানের আব পূর্ববৎ স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তাই বলিতেছি, ঐ বাসনা উপাদান স্বকীয় জীবনেব নিমিত্তই যেন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

কাম-দেহেব এই নবীন গঠন প্রযুক্ত মানুষ বাসনা-উপাদানেব আবও আযও হইয়া পড়ে। কিন্তু ঐ উপাদানের সেটুকু জানিতে পাবে না। উহা কাম-দেহেব অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত অংশেব জড়পবমাণুগুলিকে কতকগুলি এক-কেন্দ্রিক কোষে সজ্জিত কবে। সজ্জিত কবিবার সময় যে পবমাণুগুলি সর্বাপেক্ষা স্থূল, সেইগুলিকে বর্হিভাগে রাখে। সেইগুলিকেই ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য কবিতে হয। স্থূল-শরীবেব উপরিভাগে অবস্থান করিয়া যে সকল জড পরমাণু পূর্বে ভাস্বর পবিবেশাল গঠন করিয়া ছিল, উহা সেগুলিকে সচবাচব গ্রহণ কবে না। উহাব বেশ ভালরূপ জানা আছে যে, ঐগুলিকে উপেক্ষা করিলেও চলিতে পারে কোনরূপ ক্ষতি হয না। তাব পবে আবও ঘনীভূত অপ্-তত্ত্বেব বিপুল বাশির মধ্যে আবৃত হইযা সে আপনাকে নিবাপদ কবিয়া তুলে। এই বাশীকৃত অপ্তত্ত্ব পূর্বে স্থূল-দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিল। এই পুনর্গঠন ব্যাপাবের ফল বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা দ্বারা জীবাত্মাব শান্তি ও অগ্রগতিতে বাধা জন্মে। কেননা, উহা এখন দ্রুতগতিতে বহিবাসক্তি ত্যাগ করিযা অন্তর্মুখী হইতে চেষ্টা পায। তাই বলিতেছি, উহাব পক্ষে ভুবর্লোকে দীর্ঘ অবস্থান অবাঞ্ছনীয। ইহাই যে একমাত্র অসুবিধা, তাহাও নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ঐ নবগঠিত কাম-দেহের উপবিভাগটায় স্থূল পবমাণুব আববণ থাকে, উহা দ্বারা বাহিবেব প্রতিস্পন্দ বা বোধ গৃহীত হয। মানুষেব দেহাভ্যন্তবে নানাধরণেব জড় পবমাণু বিদ্যমান থাকে। ঐ সকল বিভিন্ন পবমাণু স্ব স্ব প্রকৃতিব অনুকূল স্পন্দনেই সাড়া দেয। এখন দেখা যাইতেছে, নবগঠিত কাম-দেহেব স্থূল পবমাণুপুঞ্জেই বর্হির্জগতেব সাড়া জাগিয়া উঠে। ঐ স্থূল পরমাণু ভু-লোক সুলভ পবমাণুব অনুরূপ। সুতবাং এই ভুবর্লোকবিহাবী নবগঠিত প্রেতাদেহ স্থূল-জগতেব প্রকৃতিসংশ্লিষ্ট, আব যত দিন উহাব এই স্থূল ভৌতিক ভাব বিদ্যমান থাকে, তত দিন ভুবর্লোকেব উচ্চতর ও অধিকতব সুন্দব দৃশ্য উহার জ্ঞানগোচব হয না। এই দৃশ্য থাকা না থাকা উহার পক্ষে দুই-ই সমান কোন একটি স্তবে আবদ্ধ থাকাব ইহাই অর্থ। আবদ্ধ থাকা বলিতে বুঝিতে হইবে না যে, তাহাব বোধ শক্তি মাত্র শ্রেণীর জড়াংশেব ভিতবেই স্ফুরিত হইতেছে। আর তদ্ধেতু তদীয় প্রবাস ভূমিব একটা অতীব আংশিক দৃশ্য তাহাব চক্ষুতে পড়িতেছে। ঐ স্তবের অভ্যন্তরে যে সমুদয় অত্যুৎকৃষ্ট, অত্যুজ্জ্বল ও অতীব মনোবম বস্তু

বিদ্যমান আছে, সেগুলি তাহাব দৃষ্টির অন্তবালে অবস্থিত। তএত্য উচ্চতব প্রভাবনিচয় কামদেহেব নবগঠিত ঐ স্থূল জড়াববণ ভেদ কবিতে পাবে না। এই কাবণে দেহধাবী জীবাত্মাকে পৃথিবীব সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পৃক্ত থাকিতে হয। আব এই হেতুই উহাব যে সকল আত্মীযস্বজন সূক্ষ্ম-জগতেব উচ্চতব স্তবে ইতঃপূর্বেই পৌঁছিযাছেন, সে তাঁহাদিগকে দেখিতে পায না।

পুনর্গঠনের কু-ফল

বাস্তবিকপক্ষে লিঙ্গ -দেহেব ঐরূপ নবগঠন-প্রযুক্ত প্রেতাত্মা মৃত আত্মীযকে যথার্থরূপে দেখিতে পায় না। তবে যদি ঐ আত্মীয উহাব সঙ্গে একই সমযে পার্থিব দেহ ত্যাগ কবে, তাহা হইলে দেখিবাব বাধা জন্মে না। মনে কব, এক ব্যক্তিব আত্মীয ১২বা১৫ বৎসব হইল মরিয়া গিযাছেন, আব এখন ঐ ব্যক্তিব মৃত্যু হইল। মবণেব পব ঐ ব্যক্তি সেই মৃত আত্মীযকে অন্বেষণ করিতে আবম্ভ কবিল। দেখা পাইবে কিছু সম্ভবতঃ সেই আত্মীয এখন উচ্চতব স্তবে যাইযা পৌঁছিযাছেন। তাঁহাব জ্ঞান চৈতন্য এখন সেখানেই নিবদ্ধ। সেই আত্মীযেব সূক্ষ্ম-দেহেব যে অংশটাব পরমাণু এই ব্যক্তিব বাস স্তবেব পবমাণুব সদৃশ, মাত্র সেই অংশটাই ইহাব দৃষ্টিপথে পড়িবে ইহাব মনে হইবে, যেন ঐ আত্মীয ইহাকে ভাল কবিযা চিনিতে পাবিতেছেন না। ঐ আত্মীযকে যেন স্বপ্নময বিভ্রান্ত বলিযা বোধ হইবে। এই ব্যক্তি দেখিবে যে, ঐ আত্মীয নিবন্তবই নিম্নতব স্তবগুলি হইতে চিত্ত আকর্ষণ কবিযা লইযা উচ্চতব পদার্থে উহা নিবিষ্ট কবিতেছেন, কাবণ, উহাতেই তাঁহাব স্বার্থ প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীভূত।

জীবাত্মা নিম্নতব স্তব হইতে ক্রমান্বয়ে অপসৃত হইযা উচ্চতব স্তরে যাইযা উপনীত হয। তখন তথায তাহাব চৈতন্য কেন্দ্রীভূত হইযা পড়ে। তখন সেখানেই সে কর্মঠ স্বতন্ত্র জীবৎপদার্থরূপে বিবাজ কবে। নির্দিষ্ট নিযামনুসাবে তাহাকে নিম্নতব স্তবেও দেখা যায, কিন্তু তখন তাহাকে সংজ্ঞাশূন্য কোষমাত্র বলিযা মনে হয। উচ্চতব স্তবে উন্নীত হইযা গেলেও তাহাব সূক্ষ্ম-দেহে নিম্নস্তবসুলভ জড়াংশ তখনও কিযৎপরিমাণে থাকা প্রযুক্ত তাহাকে নিম্নতব স্তবে আনিযা ফেলা যায , কিন্তু সে অল্পসমযেব জন্য। নিম্নস্তবেব জড়াংশ যথেষ্টরূপে তীব্র উত্তেজনায উত্তেজিত হইলেই তাহাকে নিম্নে আসিযা দেখা দিতে হয। পৃথিবীস্থ আত্মীযস্বজনের সংযত শোকোচ্ছ্বাসেব ফলে অনেক সময মৃত ব্যক্তিব অবস্থা ঐরূপ ঘটে। "মিডিযম" অর্থাৎ কোন বাহনেব দ্বাবা কোন মৃত ব্যক্তিব সহিত কথাবার্তা বলিবাব চেষ্টা কবিলেও ঐরূপ ব্যাপাব ঘটিযা থাকে। উচ্চস্তবারূঢ় জীবাত্মাকে স্নেহেব টানে নিম্নস্তবে আনিযা ফেলা যায বটে, কিন্তু নিম্নস্তবে তাহাব চৈতন্য খুব অল্পসমযেব জন্য থাকে মাত্র। সেখানে অধিকক্ষণ তাহাকে বাখা যায না, তাই বলিতেছিলাম. সেই বহুদিনেব মৃত আত্মীয এখন বাশি বাশি চিন্ত্যমূর্তিব সম্মুখীন, তাহাদিগকে লইযাই তিনি এখন বিব্রত। আব উহাব যে স্বজনটি এখন মবিল, এ ব্যক্তি ভুবর্লোকে ভূ-লোকেব পদার্থ-নিচযেব প্রতিরূপই দেখিতে পায। উহা লইযাই এই ব্যক্তি ঘোর ব্যস্ত। এখন দুজনই সূক্ষ্মজগৎবাসী বটে, কিন্তু উহাদেব অবস্থা স্বতন্ত্র প্রকাব। উহাদেব এক জন অপবকে অস্পষ্ট অবাস্তব বলিযা মনে কবে, এক জন অপবকে ছাযা জগৎবাসী বলিয়া ভাবিতে থাকে। সেই আত্মীযটিব নিকটে চতুস্পার্শ্বস্থ চিন্তা-মূর্তিনিচযে সজীব ও সুস্পষ্ট বাস্তব-সত্তা বলিযা মনে হয। এই নূতন মৃত ব্যক্তিব সূক্ষ্মদেহে উচ্চতব স্তবেব জড়াংশও বিদ্যমান থাকে

করিয়া ঐ সূক্ষ্মদেহ সেই আত্মীয়েব দৃষ্টিগোচব হইযা থাকে। কিন্তু তাঁহার চৈতন্য অন্যত্র সংবদ্ধ থাকা প্রযুক্ত ঐ সূক্ষ্ম দেহটি তাঁহাব নিকটে সংজ্ঞাশূন্য বলিযা প্রতীয়মান হয। এই দুই ব্যক্তিব মধ্যে যদি গভীব ও প্রকৃত ভালবাসা থাকে, তবে সম্ভবতঃ ইহাদেব উভযেই বাসনা উপাদান সংযত কবিযা কিছু সমযেব জন্য পবস্পবকে পবিষ্কাবরূপে দেখিতে পাবে। কিন্তু একোকেন্দ্রিক কোষেব বিন্যাস প্রভাবে শীঘ্রই ব্যাপাব অন্যরূপ হইযা দাঁডায। তখন এক জন অপবকে ছাযামথ বলিযা মনে কবে।

বাসনা উপাদানের প্রত্যাখ্যানে সুবিধা

পূর্বেই বলা হইযাছে যে, মৃত্যুব পব বাসনা উপাদান নূতন কবিযা অপ্ তত্ত্বেব বিন্যাস সাধন দ্বাবা কামদেহ বচনা কবিযা লয়। বচনা কবিবার সময সমুদয (=) জডাংশকে সমকেন্দ্রিক করিয়া সজ্জিত কবে। যে ব্যক্তি এই নবীন দেহ-বচনায অস্বীকৃত হযেন, তিনি পূর্বকথিত অসুবিধা ও বিপ্রলম্ভেব হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইযা থাকেন। ঐ ব্যক্তিব মৃত আত্মীয সূক্ষ্মজগতেব যে স্তবেই স্থিব থাকুন না কেন, ইনি তাঁহাব সহিত ইনি তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ ও মুক্তকণ্ঠে কথোপকথন কবিতে সমর্থ হযেন। অনেক সমযে এতদপেক্ষাও বেশী সুবিধা হইযা উঠে , কেন না, নিজে বাসনা উপাদানেব দাসত্ব হইতে পবিমুক্ত থাকায ইনি ঐ আত্মীযকেও মুক্তির উপায নির্দেশ কবিযা দিতে পাবেন। এতদুপায়ে ইঁহাবা উভযেই সূক্ষ্ম-জগতে আপন আপন জীবনকে খুব বেশী সুখীও অধিকতব প্রযোজনীয কবিযা ভুলিতে সমর্থ হন। বাসনা উপাদানেব হাত হইতে মুক্ত হইবাব চেষ্টা প্রথমে না কবিলে এক্ষণে উহাদেব জীবনেব এইরূপ সুখও সফলতা সম্ভবপব হইত না।

সাধাবণ শ্রেণীব মানব এই সকল তথ্য কিছুমাত্র অবগত না থাকায বাসনা উপাদানেব এই নবীন দেহ তদানীন্তন অভিনব ও অদ্ভুত অবস্থাব অঙ্গস্বরূপ। মবণেব পব সাধাবণ মানুষ এই নবীন দেহেব দেহী হইযা মনে কবে যে, সে মৃত্যুব পবপাবস্থ জগতেব সমগ্র ভাগটাই দেখিতেছে , কিন্তু বস্তুতঃ সূক্ষ্ম জগতেব অর্ন্তগত মাত্র একটি ক্ষুদ্র স্তবেব অতীব আংশিক দৃশ্য তাহাব চক্ষুর্গোচব হইযা থাকে। যাঁহাবা এই নিগূঢ তত্ত্বের আলোচনা কবিযা থাকেন তাঁহাবা প্রকৃত ব্যাপাব অবগত আছেন। জীবিতকালে তাঁহাবা যেমন বাসনাব আযত্ত হইতে চাহেন না, মবণেব পরও তদ্রূপ বাসনা উপা দানেব শাসন স্বীকাব কবিযা লইাব কোনই কাবণ দেখেন না। এরূপ নিগূঢতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ঐ উপাদান-কৃত দৃঢীভূত কাম দেহ গ্রহণ কবিতে অনিচ্ছুক হযেন। এবম্প্রকাব দেহ গ্রহণ কবিলে তাঁহাকে মাত্র একটি ক্ষুদ্র স্তবে আবদ্ধ থাকিতে হয। তিনি ভূবর্লোকেব উচ্চতর স্তবেব সহিত মিশিবার সুযোগ অব্যাহত রাখিতে সতত সচেষ্ট। মবণেব পূর্বে মানুষ স্বপ্নাবস্থায় ভূবর্লোকে বিচবণ কবিযা থাকে। উহাব অবস্থাও কার্যতঃ সেইরূপ হইযা দাঁডায। নিম্ন শ্রেণীব বাসনা পুঞ্জেব ক্রীতদাস হইযা পডিলে তাঁহাব অবস্থা শোচনীয হইযা পডিত। এখন তিনি বাসনাব অনায়ত্ত হওযায় খুব স্বাধীনভাবে বিচবণ ও আপনাকে পবোপকাবে অধিকতব ব্রতী কবিতে সমর্থ হযেন।

মবণেব পব বাসনা উপাদানের নবীন দেহ বচনায বাধা প্রদানেব ও প্রেত দেহটিকে পূর্ব অবস্থায় বাখিবাব চেষ্টা অবিকল পার্থিব জীবনেব বল বতী বাসনা দমন কবিবাব চেষ্টাব অনুরূপ। ঈদৃশী চেষ্টাব সময ঐ অদ্ভুত ধবণেব অর্দ্ধ চেতন বাসনা উপাদান ভীত হইযা পডে।

তখন উহা নিজের ভয়টা ঐ চেষ্টাশীল ব্যক্তির অন্তরে প্রবিষ্ট করিবার প্রয়াস পায়। তখন একটা অব্যক্ত বিপদের প্রবল অনুভব অজ্ঞাতসারে তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসে। সর্বদা যেন এই অনুভূতি তার প্রাণে জাগিতে থাকে। তাহার মনে হইতে থাকে যে, বাসনানুরূপ নবীন দেহ গঠিত হইলেই আব কোন বিপদ ঘটিবে না। যদি ঐ ব্যক্তি এই অমূলক ভয়ের অনুভূতিটিকে ধীবতার সহিত বাধা দিতে পারে, যদি স্থিরভাবে নিজের মনে এই বিশ্বাস জাগাইতে পারে যে, ভয়ের কোনই কারণ নাই, তাহা হইলে কপালক্রমে ঐ উপাদানঘটিত বাধার বেগ প্রশমিত হইয়া যাইবে। পার্থিব জীবনেও ঐ ব্যক্তিকে অনেক সময় ঐরূপভাবে বাসনা বেগ দমন কবিতে হইয়াছিল। এইরূপ কবিতে পারিলে ঐ ব্যক্তি ভূবর্লোকে সজীব শক্তি হইয়া উঠিবে। তখন সে অপবের উপকাবসাধন কবিতে সমর্থ হইবে। নিদ্রা-কালে স্বপ্নাবস্থায় আমরা ভূবর্লোকে যাইয়া কত লোকের ঐরূপ উপকার করিয়া থাকি। অতএব মৃত্যুর পববর্তী অবস্থানিচয় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে যে প্রভূত সুবিধা আছে, তাহা আমরা আর একটি বাবু বুঝিতে পারিলাম।

একাদশ অধ্যায়

নূতন মাপের কথা

শ্রীযুক্ত লেডবিটার সাহেবেব 'Other side of Death' গ্রন্থ অবলম্বনে পবলোক সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা করিয়াছি। আজ একটি নূতন বিষয়ের আলোচনা করিব। সকলেই লম্বা, চৌড়া ও পুরু—এই তিন মাপ বা Dimension এব কথা জানি। পরলোকতত্ত্বের অনুসন্ধানে দেখা যায়, এই তিন মাপ ছাড়া একটা চতুর্থ মাপ বা Fourth Dimension আছে। আমবা অন্য সেই বিষযেব আলোচনা করিব।

আমরা স্থূল জগতে জীবিত আছি। মরণেব পর আমাদেব দেহটা আত্মীয় স্বজনে পুড়াইয়া ফেলিবে বা সমাধিস্থ কবিবে। তখন আমাদেব আত্মাটা সূক্ষ্মজগতে যাইয়া উঠিবে। সেই সূক্ষ্ম-জগৎ স্থানটা কিরূপ, তাহা বুঝিয়া উঠা বড সহজ নহে। স্থূল জগতে বসিযা সূক্ষ্ম জগৎটাকে বুঝিযা লওয়া খুবই শক্ত কথা। অথচ আমবা এখন সেই চেষ্টাই করিতেছি। মবণেব পরই আমবা ভুবর্লোকে যাইব, তাব পব স্বর্লোক যাইব, আব পর জনলোকে, তার পব মহর্লোকে তাব পব তপোলোকে তাব পব সত্যলোকে যাইয়া উঠিব। সচবাচর আমবা স্বর্লোক পর্য্যন্তই যাই, তাব পর আবার আসিযা এই পৃথিবীতে জন্মাই।

এই পৃথিবী আর স্বর্লোক—ইহাব মধ্যেই আমাদিগকে অনেক কাল এমন কি, কোটি কোটি বৎসব ধরিযা ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় ; আব মুনি, ঋষি প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর লোকেবা তপঃ সত্য প্রভৃতি লোকে যাইতে পারেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, সূক্ষ্ম-জগৎ বলিতে একটা স্থান নহে। সূক্ষ্মজগতের নীচের ধাপ হইল ভুবর্লোক। এই স্থানটিতেই আমরা মরিতে মবিতে যাইয়া উঠি। এ স্থানটি পৃথিবী অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম, আবার ইহাব অপেক্ষাও সূক্ষ্ম—স্বর্লোক ; আবাব স্বর্লোক অপেক্ষা সূক্ষ্ম জনলোক। এইরূপ ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে হইতে গিয়াছে। পৃথিবীতে আমাদেব যতটুকু বুঝিবাব দেখিবাব ও জানিবার শক্তি আছে ভুবর্লোকে গেলে তার চেয়ে আমাদের শক্তি আরও বাড়িয়া যায়। এখানে যাহা দেখিতে পাই না, সেখানে গেলে তাহা দেখি, এখানে যাা শুনিতে পাই না, সেখানে গেলে তাহা শুনি। আবার স্বর্লোকে গেলে আমাদের জানিবার শুনিবার শক্তি আরও অনেক বাডিয়া যায়। ভুবর্লোকেও যাহা দেখিতে পাই নাই, স্বর্লোকে গেলে তাহা দেখি; ভুবর্লোকেও যাহা শুনিতে পাই নাই, জানিতে পারি নাই, স্বর্লোকে তাহা শুনি ও জানি। এইরূপে সূক্ষ্ম জগতেব উপরদিকে আমরা যতই অগ্রসর হই, আমাদের দেখিবাব, শুনিবার, জানিবার শক্তি ততই বাড়িতে থাকে। আমরা যতই স্থূল-জগতেব দিকে আসি, আমাদের জ্ঞানও ততই কমিতে কমিতে আইসে। এইটুকুই মজার কতা। পৃথিবীতে থাকিয়া আমবা যাহা দেখি, মনে করি, বুঝি সবই দেখিয়া ফেলিলাম, দেখিবার বুঝি আর কিছুই নাই। কিন্তু ভুবর্লোকে যখন আরও বেশী দেখিতে পাই, তখন মনে করি—তাই ত, পৃথিবীতে দেখিবাব শক্তি কতই কম ছিল। আবার স্বর্লোকে যাইয়া মনে করি—তাই ত, ভুবর্লোকে কতই কম দেখিয়াছি! ইহা হইতে আমরা এইটুকু বুঝিতে পারি যে, জ্ঞানের সীমা নাই, জানিবার, শুনিবার, বুঝিবার, দেখিবার বিষয়ের অন্ত নাই। কেবল আমাদের জ্ঞান অল্প বলিয়া অল্প দেখি

শুনি। জ্ঞান যত বাড়ে, ততই বেশী দেখি শুনি, এই স্থূল জগতে আমাদের দেখিবার শক্তি খুব কম। আমরা লম্বা বলিলে বুঝি, চৌড়া বলিলে বুঝি, পুরু বলিলেও বুঝি। এই তিন রকম মাপ বেশ বুঝিতে পারি। ভগবান আমাদের চোখও ঐ রকমভাবে গড়িয়া দিয়াছেন। তাই আমরা সব জিনিসেই ঐ তিন রকম মাপ দেখিতে পাই, কিন্তু ঐ তিন রকম ছাড়া আরও কোটি কোটি রকমের মাপ হয় ত আছে, অন্ধের মত আমরা তাহা দেখিতে পাইতেছি না। মরিয়া গেলে যখন ভুবর্লোকে যাইয়া উঠিব, তখন হয়ত আরও দুই একটি নূতন মাপের কথা জানিতে পারিব আবার যখন স্বর্লোকে যাইয়া উঠিব, তখন হয় ত আবার আরও নূতন নূতন মাপের কথা জানিতে পারিব। তখন কি স্ফূর্তিই হইবে। তাই বলিতেছি, এই পৃথিবীতে আমরা মাত্র তিনটি মাপের কথা জানি। যে কাজেরই চেষ্টা করা যাক্, একটা ফল নিশ্চয় ফলে। তাই অনেকে খুব চেষ্টা করিয়া, না মরিতে মরিতেই আর একটা মাপের কথা জানিতে পারিয়াছেন। সেইটির বিষয় আমরা ক্রমে আলোচনা করিব। সেইটি জানিলে, একজনকে ঘরে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিলেও সে বাহিরে আসিয়া পড়িতে পারে। বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! অনেক সিদ্ধ পুরুষকে ঐরূপ করিতে দেখা গিয়াছে। ঐ অদ্ভুত মাপটার নাম আমরা চতুর্থ মাপ রাখিলাম। তাই বলিতেছি, ইচ্ছা করিলে জ্ঞানটাকে বাড়াইয়া তুলা যায়। এ পৃথিবীতে আমাদের সকল শক্তিই কম, বুঝিবার শক্তিও খুব কম। আমরা কথায় কথায় ভুল করিয়া বসি। একজন একটা কথা হয় ত ঠিকই বলিল, আমরা সেটিকে ভুল বুঝিয়া বসিলাম। সিদ্ধ পুরুষেরা হয়ত ভুবর্লোকের কথাটা আমাদের কাছে ঠিক্ ঠিক্ই বলিলেন, আমাদের বুঝিবার শক্তি কম বলিয়া আমরা বুঝিলাম বা বুঝিলামই না। সূক্ষ্ম জগৎ ত পরের কথা, এই জগতের কথাই আমরা অনেক সময় বুঝিতে পারি না। মনে কর, একটি স্থানের আলোক চিত্র তোলা হইল, আমরা দেখিয়া এক গাল হাসি হাসিয়া বলিলাম—বাঃ, বেশ উঠিয়াছে! কিন্তু যে সূক্ষ্মদর্শী, সে হয় তো উহার মধ্যে কত ভুল—কত অসঙ্গতি দেখিয়া বসিবে। তবে আমার দেখাটা দেখা হইল কৈ? তাই বলিতেছি, আমাদের পদে পদেই ভুল। আমাদের দেখা দেখা নহে, আমাদের শুনা শুনা নহে; আমাদের জানা জানাও নহে। দেখিবার, শুনিবার জানিবার শেষ নাই, অন্ত নাই, অবধি নাই।

সূক্ষ্ম-জগৎটাকে বুঝিয়া লইবার একটা ভাল উপায়

আমাদের মধ্যে অনেকের জ্ঞান চক্ষুটা বেশ খুলিয়া যায়। ভুবর্লোকের কথা, স্বর্লোকের কথা এখানে বসিয়াই জাতিতে পারেন, মরা মানুষের আত্মা দেখিতে পান, আরও কত কি দেখিতে ও জানিতে পারেন। কিন্তু যাহাদের ঐ রকম জ্ঞান চক্ষুটা খোলে না, তাহারা যদি ইচ্ছা করে, আমরা সূক্ষ্ম জগৎটাকে দেখিব, তবে তাহাদের পক্ষে ব্যবস্থা কি? তাহাদের জন্য একটি সুন্দর উপায় আছে। আগে একটা চতুর্থ মাপের কথা বলিয়াছি। প্রথমে সেইটির আলোচনা করিতে হইবে। লম্বা, চৌড়া পুরু ছাড়া আরও একটা মাপ ভাবিয়া ভাবিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপ চেষ্টা করিলে কালক্রমে বুদ্ধিটা আস্তে আস্তে খুলিয়া যাইবে। তখন ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম জগতের অনেক ব্যাপার চক্ষুতে পড়িবে। এইটিই হইতেছে সেই উপায়। ভাবিয়া ভাবিয়া ঐ মাপটি বাহির করিতে হইবে। বড় সহজ কথা নহে। এখন যেমন ভাবি, এ রকম ভাবনা ভাবিলে হইবে না। ভাবনার রকমারি করিতে হইবে—ভাবনার ভঙ্গী বদলাইতে হইবে। তাহা হইলে আস্তে আস্তে মস্তিষ্কটাও আর এক রকম লইয়া, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া উঠিবে। আমাদের

মস্তিষ্কেব মধ্যে ভগবান্ অনন্ত শক্তি পূবিয়া দিযাছেন। সেই শক্তিগুলো যেন ঘুমাইযা অসাড হইযা বহিযাছে। ঐ নূতন মাপটা ভাবিযা ভাবিযা বাহিব কবিতে গেলে আমাদে অনবরত তীব্র চেষ্টাব ফলে সেই ঘুমানো অসাড শক্তিগুলা জাগিযা উঠিবে। নূতন শক্ত যেমন জাগিবে, অমনই ভুবর্লোকেব সূক্ষ্ম বিষয় অনেকটা আমাদেব চক্ষুতে পডিবে। মূল কথা, শক্তিগুলোকে জাগান চাই। কিন্তু এই বকম চেষ্টা করিযা মাপটাকে বাহিব কবা বা চেষ্টা কবিযা ঘুমানো শক্তিগুলাকে জাগিযে তোলা সাধাবণ মানুষেব পক্ষে বড সহজ কথা নহে। কেহ বা সহজেই জাগাইতে পাবে, আবাব কাহাব কাহাব পক্ষে বডই কঠিন হইযা উঠে। কেহ বলে, ঘুমানো শক্তিগুলাকে জাগিযে তোলা খুবই সহজ, কেহ বলে বড কঠিন, অসম্ভব বলিলেও হয়।

লম্বা-চৌডা-পুরু ছাড়া আব একটা মাপ ভাবিযা ভাবিযা বাহিব কবিবাব কথা বলিতেছিলাম। কিবকম ভাবনা ভাবিয়া সেইটি বাহিব কবিতে হইবে? অনেক বকমে সে ভাবনাটা ভাবা যায। হিন্টন্ সাহেব এইরূপ ভাবনাব প্রণালীগুলা খুব ভাল কবিযা একখানি পুস্তকে লিখিযাছেন। পুস্তকখানির নাম—"আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক ঘটনাবলী।" বইখানি পডিয়া লেড বিটাব্ সাহেবেব বডই ভাল লাগিযাছিল। তিনি পডিযা এইরূপ বলিযাছেন—"হিন্টনেব পুস্তকখানি আমাব বড়ই ভাল লাগিযাছে। যাহাবা পড়িবে, তাহাদেব সকলেবই ভাল লাগিবে বলিযা আমাব বিশ্বাস। বইখানিতে হিন্টন্ উপবি-উক্ত চতুর্থ মাপেব কথা বলিযাছেন। তিনি বলেন, ভাবিযা চিন্তিযা একপ একটা মাপ বাহিব কবা একান্ত অসম্ভব নহে।" এই মাপটি বুঝিতে পাবিলে তাহাব সাহায্যে সূক্ষ্ম জগতেব অনেক বিষয বুঝিবাব উপায হইযা আইসে। হিন্টন্ অঙ্কশাস্ত্রেব উন্নতি কবিতে গিযাই ঐরূপ ধাবণাব চেষ্টা কবিযাছেন। সম্ভবতঃ তিনি সূক্ষ্ম-জগতেব বড একটা ধাব ধাবিতেন না। ধাবিতেন কি না, তাহাও আমবা ঠিক জানি না। যাহা হউক, তাঁহাব এই নূতন মাপেব আবিষ্কাবে পারলৌকিক ব্যাপাব বুঝিবাব পথ সহজ হইযা উঠিযাছে। হিন্টন্ বলেন—"মানুষ বিশেষ মনোযোগেব সঙ্গে ভাবিলে এই চতুর্থ মাপটি অবগত হইতে পাবে, মানুষেব চিন্তা ইহাব অপেক্ষা স্থূল-জগতে থাকিযা আব উঠিতে পাবে না। এইটিই মনুষ্য চিন্তাব চবম উন্নতি।" তিনি আবও বলেন—চতুর্থ মাপ ব্যাপাবটা কল্পনা নহে, বাস্তবিকই এটা সত্য ব্যাপাব। জীবিত মানুষেব মধ্যে অনেকে ইহা অবগতও হইযাছেন। চতুর্থ মাপ কেন? অনন্ত কোটি মাপ এই পৃথিবীতেই আছে। আমবা শুধু তিনটি মাপ সহজে বুঝিতে পাবি, তাই ভাবি, বুঝি এই তিনটিই আছে, আব নাই। ভুবর্লোক অন্য স্থানে নাই, এই পৃথিবীব মধ্যেই—এই স্থূল-জতের ভিতরেই মিশানো আছে। শুধু ভুবর্লোকই বা কেন? স্বর্লোক, জনলোক প্রভৃতি সমস্ত সূক্ষ্ম জগতেব মধ্যে মিশানো বহিযাছে। তাই বলিতেছি, চতুর্থ মাপটা বুঝিয়া লইতে পারিলে স্থূল-জগতে থাকিযাই আমবা সূক্ষ্মজগতের কতকটা ভাব বুঝিতে পাবিব। চেষ্টা কবিলে সকলেই যে ভাবিয়া চিন্তিযা এই নূতন মাপটি বাহব কবিতে পাবিবেন, আমবা তাহা বলিতেছি না। ঐ জিনিসটা বুঝিয়া উঠা সকলের কাছে সহজ নহে, কিন্তু এ কথাটা খুব ঠিক যে, যাঁহাবা এইটি বুঝিবাব চেষ্টা কবিযাছেন, তাহাদেব অনেকেবই একটা নূতন শক্তি ফুটিয়া উঠিযাছে। অতএব এ কথা বলা যাইতে পাবে, যাঁহাবা এই নূতন মাপটি ভাবিযা বাহির কবিবাব চেষ্টা কবিবেন, কোন কিছু বুঝিয়া উঠাব পক্ষে অন্য লোক অপেক্ষা তাঁহাদেবই বেশী সহায়তা হইবে। তাঁহাদেব বুদ্ধি-শক্তি অন্যেব অপেক্ষা একটু ভাল হইবেই।

আমরা স্থূল জগতের মানুষ—আমাদের জ্ঞান খুবই কম। আমবা অতি ক্ষুদ্র। কোন কিছুর ধাবণা কবিতে গেলেই আমাদেব চিন্তা বেশী দূব যায না। আমাদেব চিন্তাশক্তি যে খুবই অল্প,

তাহা আমরা পদে পদে বুঝিতে পারি। মানুষের শক্তি, মানুষের জ্ঞান মানুষের বুদ্ধি, ক্ষুদ্র নহে অল্পও নহে। কেবল জড়জগতে স্থূলদেহে আবদ্ধ হইলেই মানুষের ঐ সকল গুণ কমিয় আইসে। এই তথ্যটুকু ভারতবর্ষ প্রভৃতি পূর্ব অঞ্চলের ভাল ভাল লেখকেরা খুব সুন্দররূপেই বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, মানুষের জ্ঞান ও চৈতন্য অনন্ত; দেশ ও কাল এই দুইটি জ্ঞানকে ছোট কবিয়া রাখে মাত্র ; বস্তুতঃ দেশ ও কাল কিছুই নহে; জ্ঞান চৈতন্য দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে ; উহা অনন্ত—অসীম। জ্ঞান চৈতন্য অনন্ত—এ কথাটা বুঝিয়া উঠা বড় সহজ নহে। যাহারা শুধু এই স্থূল জগৎটাইদেখে ও বুঝে, কখন সূক্ষ্ম জগতের আস্বাদ পায় নাই, তাহারা "জ্ঞান অনন্ত" এ কথা কিছুই বুঝে না। যাঁহারা সাধনা দ্বারা বুদ্ধিকে তীক্ষ্ম কবিয়া সূক্ষ্ম-জগতের আভাস পাইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই ঐ কথাটা বুঝিতে পারেন। সূক্ষ্ম জগতের একটু ধারণা হইলেই বুঝা যায় যে, দেশ ও কাল এই দুইটি কিছুই নহে। স্থান জিনিসটিকে বুঝিতে গেলেই আমরা উহার তিনটি মাপ দেখিতে পাই। দেখি, উহা লম্বা চৌড়া ও পুরু। ঐ তিনটি দিক্‌ই আমাদের জ্ঞানে ফুটিয়া উঠে। এই তিনটি মাপ ছাড়া আরও একটা বেশী মাপ উহার সঙ্গে যুক্ত করিয়য়া চিন্তা করিতে পারি না। কথাটা আর একটু সহজ করিয়া বুঝা যাক্। মনে কব, যদি কোন একটা দিক্ লক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে কেহ যাইতে বলে, তাহা হইলে আমরা হয় লম্বা লম্বি যাইব, নয় আড়াআড়ি যাইব, নয় উচ্চ-নীচ ধরিয়া চলিব। ইহা ছাড়া আর কোন দিক্ ধরিয়া আমরা যাইতে পারি না একটা উদাহরণ দিই, তাহা হইলে কথাটা আরও সহজে বুঝা যাইবে। মনে কর, ঘরেব মধ্যে মেঝের উপরে একটা জিনিস বহিয়াছে। ঐ জিনিসটি যদি আমরা অন্য স্থানে লইয়া রাখি, তাহা হইতে জিনিসটির সরান কাজে তিন বকম গতি হইবে। প্রত্যেক গতিটায় একটা সরল রেখা হইবে। আর প্রতি দুইটি সরল বেখায় একটি কবিয়া সমকোণ হইবে। মেঝের যেখানেই জিনিসটি থাকুক না কেন, সেটাব সঙ্গে মেঝেব লম্বা চৌডাব একটা হিসাব থাকিবে। আর সেই লম্বা চৌড়ার রেখা দুটিও সমকোণে অবস্থান করিবে। আবার সেই জিনিসটি তুলিযা উঁচু করিতে গেলেই হাত থেকে মেঝে পর্যন্ত আর একটা যেন সবল রেখাব সৃষ্টি হইবে। এ রেখাটিও আগেকার দুটি রেখার প্রত্যেকটির সঙ্গে সমকোণে দাঁড়াইবে। তাই বলিতেছি, চলাফেরাই কর, আর জিনিসপত্রই নড়াও চড়াও, সবই তিনটি দিকেব মধ্যেই করিতে হইবে।

অঙ্কের হিসাবে আমরা এইটুকু বুঝিলাম যে, লম্বা, চৌডা পুরু—এই তিনটি দিক্ ধরিযা তিনটি রেখা টানিলে তাহারা পরস্পর সমকোণে দাঁড়ায়। এইটুকুই আমরা দেখি, আর এইটুকু বুঝি। পৃথিবীতে সাধারণতঃ আর কিছু বুঝা যায় না। আমরা ঐ তিন দিক্ ছাড়া আর এক দিক্ দিয়া এমন একটা রেখা টানিতে পারি না, যাহা ঐ তিনটা রেখার সঙ্গে পরস্পর সমকোণ হইয়া থাকিবে। তিন দিক্ ছাডা আব এক দিকের ধারণা আমাদের হয় না। আমরা ধারণা করিতে পারিব না বলিয়াই কি তাহা নাই বুঝিতে হইবে? অবশ্যই আছে। আমরা ধাবণা করিতে পাবি না, তাহাতে এইটুকু প্রমাণ হয় যে, সেই নূতন দিক্‌টার বা মাপটার কল্পনা করিয়া উঠা আমাদেব বুদ্ধির পক্ষে একরূপ অসম্ভব। তবে যদি নানারূপ তুলনা, নানারূপ কল্পনা, নানারূপ অনুমান লইয়া বুঝিতে চেষ্টা করি, তবে ঐ নূতন দিক্ বা মাপের একটু আভাস আমরা পাইতে পারিব। আমাদেব যতটা জ্ঞান আছে, হয় ত খুব ছোট ছোট পোকার ততটা জ্ঞান নাই। হয় ত কেন, মনে করিয়া লওয়া যাক্, তাদেব জ্ঞান আমাদের মত নহে। লম্বা, চৌড়া, পুরু—এ তিনটা দিকের জ্ঞান আমাদের আছে; কিন্তু ঐ ছোট পোকাব পুরু বলিয়া একটা জ্ঞান হয়ত নাই। উহারা

হয়ত লম্বা ও চৌড়া এই দুইটি দিক্ই বুঝে। এখন ঐ পোকার তুলনা করিয়া যদি আমরা চতুর্থ মাপ কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করি, তবে সেই তুলনা দ্বারা আমাদের একটু ধারণা হইয়া আসিবে। আর ঐ রকম পোকামাকড় দিয়া বুঝিবার চেষ্টাই সব চেয়ে ভাল। উঁচু, নীচু পুরু—একই মাপের নাম। এই মাপটি বুঝে না, এণন কোন ক্ষুদ্র কীট আছে কিনা আমরা জানি না। থাকাই সম্ভব। তর্কের খাতিরে বা আমাদের চতুর্থ মাপের ধারণাটা করিযা লইবার নিমিত্ত ধরিয়া লওয়া যাউক যে, একটা ছোট পোকা শুধু লম্বা ও চৌডাই বুঝে, উঁচু বলিযা একটা ধারণা তার আদৌ নাই।

নূতন মাপের কথা

উঁচু বুঝে না, শুধু লম্বা-চৌড়া দিক্ বুঝে, এমন প্রাণীর আলোচনা

আমরা ধরিয়া লইলাম, এমন পোকা সত্যই পৃথিবীতে আছে। এখন একটা কল্পনা করিয়া লওয়া যাক্ যে, ঐ পোকাটা একখানি কাগজেব উপর আছে। কাগজখানি মনে কর বেশ সমান—একটুও উঁচুনীচু নহে। ঐ কাগজখানি উহার কাছে যেন খুব বড় একটা পৃথিবী! কাগজখানা যে সমতল, তাহাও ঐ পোকাটি বুঝিতে পারে না; কারণ, যাহা সমতল নহে, তাহা উঁচুনীচু হইবে। কিন্তু উঁচুনীচু বলিতে যে দিক্টার কথা আসে, সে জ্ঞান উহার না, তাহা গোড়াতেই ধরিয়া লইয়াছি। পোকাটি চলিয়া ফেরিয়া বেড়াইলে ঐ কাগজখানির উপরেই থাকিবে। কাগজ খুঁড়িয়া নীচের দিকে যাওয়া বা কিছু বাহিয়া উপরের দিকে উঠা—এসব করিবে না ; কেন না, সে দিক্টা সে জানে না। উঁচুনীচু দিকের জ্ঞান তার একটুও নাই। মনে কর, এই পোকাটাব বিচারশক্তি আছে। পোকাটা লম্বা করিলে বুঝে, চৌড়া বলিলেও বুঝে, কিন্তু উঁচুনীচু বলিলে বুঝে না। এখন এই বুদ্ধিমান্ পোকাটির যদি উঁচুনীচু দিক্টা ভাবিয়া বাহির করিতে বলা হয়, তবে কি সে তাহা ভাবিয়া বাহির করিতে পারে? আমরা মানুষ, আমরা লম্বা, চৌড়া, পুরু—এই তিন মাপের জিনিস দেখিতে পাইতেছি। পোকাটা লম্বা, চৌডা এই দুই মাপ দেখিতেছে। এখন ঐ পোকাটার সম্মুখে যদি আমরা একটা তিন মাপের পদার্থ রাখি, সেটা উহার চক্ষুতে কিরূপ বোধ হইবে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। তাহা হইলে পুরু কিংবা উঁচুনীচু দিকের কল্পনা করা উহার পক্ষে সহজ কি কঠিন, তাহা আমরা বুঝিয়া লইতে পারিব। আবার তাহা হইতে এটুকুও ধারণা করিতে পারিব যে, আমাদের সম্মুখে যদি কোন একটা চারি মাপের পদার্থ আনিয়া ফেলে, তবে সেইটি আমাদের চক্ষুতেই বা কিরূপ বোধ হওযা সম্ভব। তিন মাপের পদার্থ পোকাটির কাছে যেমনটি বোধ হইবে, চারি মাপের পদার্থ আমাদের চক্ষুতে সেই রূপই বোধ হইবে।

মনে কর, পোকাটি খুব ক্ষুদ্র ; কাগজখানি উহার কাছে যেন বহু ক্রোশের পথ—খুবই বড়। ধরিয়া লইতে হইবে পোকাটা যেন কেটা পরমাণুর মত ছোট। এখন ঐ কাগজখানির উপবে যদি একটি রেখা টানি তবে পোকাটা ঐ রেখা ডিঙ্গাইয়া আসিতে পারিবে না। রেখাটিতে পেন্সিলের গুঁড়া প্রভৃতি থাকায় তাহার একটা পরুত্ব আছে, সেটুকু ডিঙ্গান পোকা র পক্ষেঅসম্ভব। কেন না, পুরুত্ববোধ উহার আদৌ নাই কাগজের উপর মনে কর, একটা আড়াআড়িভাবে রেখা টানিয়া দিলাম। এখন কাগজের দুইটির ভাগ হইল। পোকাটা এক ভাগ হইতে রেখাটাকে ডিঙ্গাইয়া আর ভাগে আসিতে পারিবে না। রেখাটা উহার কাছে একটা প্রাচীরের মত হইয়া থাকিবে। উঁচুনীচু

জ্ঞান থাকিলে বেখাটাকে ডিঙ্গাইয়া আসিতে পাবিত। সে জ্ঞান নাই বলিয়া ডিঙ্গাইবাব কল্পনাও উহাব মাথায় আসিবে না। ঐ বেখাটিব কাছেই উহার জগৎ শেষ মনে কবিবে। অথচ বেখাব এ পিঠেও ঠিক ঐরূপ আব একটা জগৎ বহিযাছে, তাহা সে ধারণাই কবিতে পারিবে না। একই কাগজ, মাঝে কেবল একটি বেখা। তাব দুইটে ভাগ এত কাছাকাছি, এত লাগালাগি তবুও পোকাটা শুধু ঐ বেখাটাব জন্য তাহা বুঝিতে পাবিতেছে না। যে ভাগটায পোকাটি নাই, সেই ভাগে কোন কিছু ঘটিলে সে খুব কাছে থাকিযা ও তাহা জানিতে পাবে না।

আমবা তিন মাপ দেখিতে পাই। আমবা উপব হইতে পোকাটিব দশা দেখি। কাগজেব যে ভাগে পোকাটা নাই, সেই ভাগ হইতে একটা জিনিস লইয়া আমবা উহাব জগতে ফেলিযা দিতে পাবি। ফেলিযা দিবার সময় বেখাটাতে আমাদের কিছুই আটকায না। ফেলিযা দিলে, জিনিসটি কোথা হইতে আসিল, তাহাব ধাবণাই সে কবিতে পাবিবে না। সেভাবিবে—এটা একটা ভৌতিক কাণ্ড। উহাব চাবিকোণা কবিযা একটা বেড আঁকিলাম। পোকাটা এখন কি কবিবে? ঐ বেডেব মধ্যেই ঘুবিযা বেড়াইবে, ঐ টুকুই উহাব জগৎ। বেডের বাহিরে আসিবাব যো নাই, কাবণ, উঁচুনীচু দিক্ উহাব জানা নাই। তাই বেডেব বাহিবে যে আরও স্থান আছে, সে ধাবণাও উহাব হয না। বেডাটাব বাহিব হইতে কোন একটা দিক্ ভাঙ্গিযা একটা জীব যে ভিতবে ঢুকিতে পাবে, সে কথাই উহাব অনুমান কবিযা উঠা অসম্ভব। সে কথা আনুমান কবা উহাব বুদ্ধিব অতীত। কিন্তু আমবা দেখি, উহাব কাছে বাহিব হইতে একটা জিনিস লইযা উপস্থিত কবা খুবই সহজ। যদি আমবা ঐরূপ কোন একটা জিনিস উহাব কাছে উপস্থিত কবি, তবে অনেক দিন ধবিযা ও ভাবিবে যে, এটা বাস্তাব জিনিস নহে। আবাব ঐ জিনিসটি যদি আমবা বেডেব বাহিবে আনি, তাহা হইলেও পোকাটা অবাক্ হইযা যাইবে। ভাবিবে—তাই ত, কোথায গেল। ঐ বেডেব মধ্যে খুব ছোট কবিযা পোকাটাব গা ঘেঁষিয়া যদি আমবা আব একটা বেড আঁকি, তবেও মনে কবিবে, আমি একটা বাক্সেব মধ্যে বহিযাছি। উহাব যদি বাক্স গডিবাব ক্ষমতা থাকিত, তবে বড অদ্ভুত বাক্সই গডিত। সে মনে কবিত, আমাব বাক্সটা খুব আটকান আছে, অথচ আমবা উপব হইতে বাক্সটিব সমস্ত জিনিসই দেখিতে পাই। উপব নীচে বলিলে যে দিক্‌টাব কথা হয, পোকাব সেটা দেখিবাব শক্তি নাই, কিন্তু আমাদেব সে শক্তি আছে। আমবা সেই দিক্‌টা দিযা উহাব বাক্সের সবই দেখিযা ফেলি। শুধু ঐ দিক্‌টাব সাহায্য উহাব আমবা উহাব কাছে কত কাণ্ডই কবিতে পারি—একটা জিনিস উহাব কাছে হাজিব করিতে পাবি, আবাব উহাব কাছ থেকে অন্তর্হিত কবিতেও পাবি। উহাব হিসাবে উহাব বাক্স বন্ধ থাকিলেও আমবা ঐ বাক্সেব মধ্যস্থিত সব দেখিতে পাবি। কিন্তু ঐ দিক্‌টা না জানাব দরুণ উহাব কাছে এ সমস্তই ঘোব বহস্য বলিযা বোধ হয।

আমাদেব দশাও ঠিক ঐরূপ। আমবা তিন মাপেব জীব। অন্য কোন পবিমাপেব প্রাণী যদি আমাদেব অজানা সেই চতুর্থ মাপেব দিব সাহায্যে কোন জিনিস আমাদের কাছে আনিয়া ফেলে বা আমাদেব কাছ হইতে লইযা যায, তবে আমবা অবাক্ হইযা যাই। আমাদের বাক্স তোরণবন্ধ থাকিলেও চাবি মাপ জানা প্রাণীবা তাহাব মধ্যস্থ সবই দেখিতে পায়। তিন মাপের বাহিবে যে বিপুল বিশ্ব পড়িয়া আছে, তাহাও আমবা টেব পাইতেছি না। তই বলিতেছিলাম, আমাদের অবস্থা ঠিক ঐ পোকাবই মত।

পোকাটিব বুদ্ধিও আমরা এলোমেলো করিয়া দিতে পারি। মনে কব, কাগজখানির দুই মোডে দুইটি বিন্দু দিযা চিহ্ন কবিলাম। পোকাটার কাছে একটা বিন্দু থেকে আর একটা বিন্দু

পর্যন্ত বিস্তর ক্রোশ পথ। আমরা কাগজখানিকে বাঁকাইয়া দুইটি বিন্দু বেশ কাছাকাছি করিয়া ফেলিতে পারি, কাছাকাছিই বা কেন, একেবারে সংলগ্নও করিয়া ফেলিতে পারি। এইরূপ ব্যাপার করিলে সে মনে করিবে—তাই ত! দুইটি স্থান এত দূরে দূরে ছিল, হঠাৎ এমন কাছাকাছি কি করিয়া হইল! কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত ব্যাপার! কাগজখানিকে বাঁকাইয়া বিন্দু দুইটিকে একত্র করিতে হইলে উঁচুনীচু দিক্‌টার আবশ্যক হয়। আমরা মানুষ, আমাদের সেইটা জানা আছে, তাই ওরূপ করা আমাদের পক্ষে খুবই সহজ। কিন্তু পোকার সে দিক্‌টার ব্যাপার জানা নাই, তাই তার বিন্দু দুইটির কেত্র হওয়া বুদ্ধির অতীত। সে ভাবিবে—কেমন করিয়া এত দূরত্ব চলিয়া লে, কেমন করিয়াই বা একই সময়ে একই স্থানে দুইটি স্থান আসিয়া একত্র হইল! তাই, সে এ ব্যাপারটাকে একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড বলিয়া মনে করিবে। উহার অপেক্ষা আমরা একটা মাপ বেশী জানি বলিয়া উহার কাছে কত অদ্ভুত ব্যাপারেরই সৃষ্টি করিতে পারি।

ভূত-প্রেতেরাও আমাদের লইয়া ঐ কাণ্ড করে। ভুবর্লোকে যাওয়ায় তাহাদের একটা বাড়তি মাপের জ্ঞান বেশী হয়। তাই তাহা অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারে। পারে কেন, করিয়াই থাকে। তারা হঠাৎ দেখা দেয়, হঠাৎ মিলাইয়া যায়, বাক্স রুদ্ধ অথচ তার মধ্যে কি আছে বলিয়া দেয়, বাক্সের মধ্যে কিছু আটকান আছে, ভূতেরা তাহা বাহিরে আনিয়া ফেলিল অথচ বাক্স আটকানই থাকিল, বাক্সের মধ্যে লেখা কাগজ একখানা আছে, তাহারা বাহির হইতে তরতর করিয়া সেই লেখাগুলি পড়িয়া গেল। এরূপ নিরন্তরই ঘটিতেছে। ইহার একমাত্র কারণ-- আমরা তিনটি মাপ জানি, তারা আমাদের অপেক্ষা বেশী মাপ জানে। তারা যে দিকের সাহায্যে ঐ সব কাণ্ড করে, আমরা সে দিক্‌টার খবরই রাখি না। উঁচুনীচুর দিক্‌টা না জানাই পোকাটার কাছে আমাদের কাজগুলি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, অথচ আমরা দেখি, ইহা খুবই স্বাভাবিক। সেইরূপ ভূত-প্রেতের কাজগুলি আমাদের চক্ষুতে ঘোর অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, অথচ তাহারা দেখে যে, এ সব খুবই স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক কিছুই নহে।

নূতন মাপের কথা

অগ্রহায়ণের 'ব্রহ্মবিদ্যা'য় আমরা আমাদের পরিচিত লম্বা, চৌড়া ও পুরু—যাহাদিগকে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ বলে—ঐ তিন মাপ ছাড়া একটা যে চতুর্থ মাপ বা Fourth Dimension আছে, তাহার বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম। কিন্তু সকল কথা বলা হয় নাই। আজ আমরা গণিত শাস্ত্রের দিক দিয়া দেখিব, চতুর্থ মাপ সমর্থিত হয় কি না।

আচ্ছা, দুই ইঞ্চি লম্বা একটা সরল রেখা টান। এক এক ইঞ্চি লম্বাটে মাপের এক একটা মাত্রা বা মান ধরা যাউক। তাহা হইলে আমাদের রেখাটির মাপ হইবে দুই। জ্যামিতি, পাটীগণিত প্রভৃতি অনেক রকম অঙ্কশাস্ত্রের অঙ্ক আছে। জ্যামিতির নিয়ম অনুসারে একটা বিন্দুকে বর্ধিত করিয়া লইয়া গেলেই একটা রেখার উৎপত্তি হয়। একটা রেখার উপর আর একটা রেখা ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইলে সেই দাঁড়ানো রেখাটিকে লম্ব বলে। আচ্ছা, এখন যদি আমাদের আঁকা ঐ দুই ইঞ্চি সরল রেখাটাকে এমন করিয়া সরাইতে থাকি যে, উহা নিজেই নিজের লম্ব হইবে অথচ সব লম্বগুলিই লম্বায় দুই ইঞ্চির বেশী হইবে না, তাহা হইলে সেইরূপ আঁকার ফলে বা সরানোর ফলে চারিদিক্ সমান একটা চারিকোণা মূর্তি তৈয়ারী হইবে। ভাল কথায় ইহাকে চতুষ্ক বলে। (x২) এই সংখ্যার চতুষ্ক, এইটুকু বুঝাইতে হইলে

আমরা পাটীগণিতের নিয়মানুসারে (২^{২}) এইরূপ লিখিয়া থাকি। আর এই চতুষ্কটিকে যদি এমন করিয়া সরান যায় যে, উহা নিজেই নিজের উপর সমকোণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে, তবে তাহাতে যে মূর্তিটি হইবে, তাহাকে ঘন-ক্ষেত্র বলা হয়। সেই মূর্তিটির সব বাহুই—সব দিকই দুই ইঞ্চি লম্বা। পাটীগণিতেব নিয়মে ঐ ঘন-ক্ষেত্রকে (২^{৩})এইরূপ অঙ্গে প্রকাশ করা হয়। এখন একটু বিবেচনা আবশ্যক। দেখিতে হইবে যে, বিন্দু হইতে আরম্ভ করিয়া ঘন-ক্ষেত্র পর্যন্ত যতগুলি মূর্তি তৈযারী হইল, সমস্তগুলিই বেশ শৃঙ্খলাযুক্ত গতির ফল। বিন্দু গতিযুক্ত হইয়া একটা রেখা হইয়া দাঁড়াইল, বেখা গতিযুক্ত হইয়া একটা চতুষ্ক হইয়া উঠিল, চতুষ্ক আবার গতির ফলে ঘন-ক্ষেত্র হইয়া পড়িল। সরলরেখা, চতুষ্ক, ঘন-ক্ষেত্র—তিনটিই নিয়মিত গতির ফল। এই তিনটিই জ্যামিতিব মূর্তি। পাটীগণিতে উহাদিগকে ব্যক্ত করিতে হইলে (২^{২}, ২^{৩}) এইরূপ ভাবে করিতে হয়।

জ্যামিতির সাহায্যে আমরা ঘন-ক্ষেত্রের উপর আর উঠিতে পারি না। ইহাতে ধারাবাহিক গুণ তিন বারেব বেশী হয় না। কিন্তু পাটীগণিতে ৪, ৫ বা যে কোন সংখ্যায় উঠিতে পারি। এখানে আব একটু সূক্ষ্ম চিন্তার প্রয়োজন। দেখা যাইতেছে, পাটীগণিতেব ২, ২^{২}, ২^{৩}) এই সংখ্যাগুলি যখন জ্যামিতিব সাহায্যে আঁকা যায়, তখন পাটীগণিতের (২৪) এই সংখ্যাটিকে জ্যামিতির সাহায্যে আঁকিলে সেই মূর্তিটা কিরূপ হইতে পাবে? সেই ভাবেব একটা জিনিস আমবা গডিয়া ভুলিতে আপারগ। ওরূপ ভাবের মূর্তি কোথাও আমাদের চোখে পডিবে না। তাই ঐরূপ একটা মূর্তি খুব চেষ্টা কবিযা কল্পনা করিতে হইবে। কল্পনা কবিয়া উঠিতে পারিলেই প্রকারান্তবে আমাদের সেই চতুর্থ মাপেব ধাবণাটাও হইযা পডিবে। মনে মনে অঙ্কগুলির খুব আলোচনা করিতে হইবে। (২) এই বাশিটিকে (২^{২}) এই বাশি কবিবাব সময, (২^{২}) এই বাশিকে (২^{৩}) এই বাশি করিবাব সয কেমন কবিযা মূর্তিগুলিকে ঘুবাইযা ফিবাইয়া আঁকা হইল ভাবিতে হইবে। আবাব ভাবিতে হইবে, (২^{৩}) এই বাশিকে কেমন কবিয়া ঘুবাইয়া ফিরাইযা (২^{৪}) এই মূর্তি কবা চলে। অনববত ভাবিতে ভাবিতে একটা উপায আসিযা যাইবে।

চাবিদিক্ সমান, এক এক দিক্ দুই ইঞ্চি লম্বা, এইরূপ একটা মূর্তি প্রকাশ কবিতে হইলে (২^{২}) এই অঙ্ক দ্বাবা প্রকাশ কবা যায। দুই ইঞ্চি লম্বা একটা সবল রেখা হইল এক জিনিস, আব চাবি-কোণা মূর্তিটি কি না চতুষ্কটি হইল আর এক জিনিস। সরল বেখাব মাপের মাত্রা হইল একরূপ, চতুষ্কটিব হইল অন্যরূপ। দুইটিব মাপেব মাত্রা বা মান এক বকম নহে। বেখাটিব মাপেব মাত্রা হইল—এই ইঞ্চি, আব চাবি কোণা মূর্তিটি কি না চতুষ্কটিব হইল—এক বর্গ-ইঞ্চি। আব একটু লক্ষ্য কবিযা দেখিতে হইবে যে, রেখাব মাত্রাটিব মত বাশি বাশি মাত্রা একত্র করিলেও চতুষ্কেব মাত্রা গডান যায না। বেখা জিনিসটাই অদ্ভুত, উহাব শুধুই লম্বা ভাবটা আছে, চৌড়া দিক্‌টা মোটেই নাই। অঙ্ক-শাস্ত্রে এরূপ অদ্ভুত জিনিসটাকেই বেখা বলা হইযাছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যাহাব আদৌ চৌডাভাব নাই, তাহা বাশি বাশি একত্র করিলেও একটা চতুষ্ক হইতে পারে না—কখনই পারে না। আবাব ভাবিয়া দেখিলে মনে হয়, বেখা জিনিসটা দেখাও যায না, কাবণ, যাহাব আদৌ চৌডাভাব নাই, তাহা কেমন কবিযা দেখিবাব বিষয হইতে পাবে? রেখাকে যদি বেখাব মত করিয়া আঁকা হয, তবে সে রেখাও ঠিক রেখা হইল না মনে কবিতে হইবে।

রেখা নিজের উপবে নিজে দাঁডাইলে চতুষ্ক হয়। সেইরূপ চতুষ্ক আবার নিজের উপবে নিজে দাঁডাইলে ঘন-ক্ষেত্র তৈযাবী হয। চতুষ্কেব পবিচয় এই যে, উহাব আদৌ স্থূলত্ব—পুরুষ

নাই, শুধুই লম্বা আর চৌড়া-ভাব দুইটি আছে। তাই, রাশি রাশি চতুষ্ক একত্র করিলেও একটা ঘন-ক্ষেত্র তৈয়ারী হয় না। রেখার মাপের মাত্রা, চতুষ্কের মাপের মাত্রা যেমন পৃথক পৃথক, তেমনই ঘন-ক্ষেত্রের মাপ বা মানও একেবারে স্বতন্ত্র। রেখার মাত্রা—ইঞ্চি, চতুষ্কের মাত্রা—বর্গ ইঞ্চি ; আর ঘন-ক্ষেত্রের মাত্রা—ঘন ইঞ্চি। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, রেখা, চতুষ্ক, ঘন-ক্ষেত্র—এই তিনটি তিন রকম দিক্ বা তিন রকম মাপ বা তিন রকম পরিসর। মাপের হিসাবটাও তিন দিকের তিন রকমের। আরও দেখিতে হইবে যে, উচ্চতর দিক্‌টা নিম্নতর দিকের মাপের মাত্রায় স্থির করা যায় না।

অঙ্কের হিসাবের মধ্যে আর একটি সূক্ষ্ম কথা বুঝিবার আছে। কথাটা এই—আমরা একটা চিত্রকে সরাইয়া বা চালিত করিয়া আর একটা মূর্তি তৈয়ারী করিতে গেলে, যেটিকে চালিত করা যায়, তাহার প্রত্যেক বিন্দু হইতেই অদৃশ্যভাবে একটা করিয়া রেখা তৈয়ারী হইতে যায়। আবার সেই রেখাগুলিও এলোমেলো নহে, তাহাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা থাকে। মনে কর, একটা চতুষ্ক গড়িতে বসিলাম। আমাদিগকে কি করিতে হইবে? একটা সরল রেখাকে চালিত করিয়া নিজের উপরে নিজেকে সমকোণযুক্ত করিয়া দাঁড়া করাইতে হইবে। এরূপ করিলে চতুষ্কের সীমাসূচক চারিদিকে চারিটি রেখা ত আঁকিতেই হইবে ; তা ছাড়া, আমাদিগকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, চালিত রেখার প্রত্যেক বিন্দুটিও চালিত হইয়াছে সময় একটা করিয়া রেখার সৃষ্টি করিয়াছে। আবার যখন আমরা একটু চতুষ্ককে চালিত করিয়া একটা ঘন-ক্ষেত্র তৈয়ারী করি, তখন ঐ চতুষ্কের রেখা চারিটি যে শুধু আর একটা চতুষ্ক সৃষ্টি করে, তাহা নহে। ঐ চালিত চতুষ্কের উপরিভাগস্থ প্রত্যেক বিন্দুটি উপরিভাগের উপর সমকোণযুক্ত হইয়া বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে চালিত হইতে থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ঘন ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চালিত চতুষ্কের প্রত্যেক বিন্দুটি কাজে লাগে। আর মনে রাখিতে হইবে যে, চতুষ্ক বলিলে চারিধারের শুধু রেখা চারিটি বুঝিতে হইবে না। উহাতে রেখা-ঘেরা স্থানটি বুঝিতে হইবে। আর একটি কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেখিবার দিক্‌গুলো যত বাড়িয়া যাইবে, ততই কম দিক্‌ওয়ালাদের সমস্তটাই দেখিয়া ফেলিব। পোকাটার কথা ভাবিয়া দেখ। পোকাটা দুই দিক্‌ওয়ালা, আর আমরা তিন দিক্‌ওয়ালা। আমরা উহার আটকানো বাক্সও দেখিয়া ফেলি। আবার ভূতযোনিরা আমাদের অপেক্ষা বেশীদিক্‌ওয়ালা বলিয়া আমাদের রুদ্ধ, গুপ্ত, আটকানো স্থানগুলি, বাক্সগুলি সবই দেখিয়া ফেলে। যতই বেশী দিক্‌ওয়ালা হওয়া যায়, ততই দৃষ্টিটা উপর হইতে নীচে পড়ে, তখন কমদিক্‌ওয়ালাদের সবই দেখিতে পাওয়া যায়।

বলা হইয়াছে যে, বিন্দুকে চালিত করিলে রেখা হয়, রেখাকে চালিত করিলে চতুষ্ক হয়, আবার চতুষ্ককে চালিত করিলে ঘন-ক্ষেত্র হয়। আচ্ছা, ঘন-ক্ষেত্রকে চালিত করিলে কি রকম মূর্তিটা হয়? মনে করা যাক্, একটা দিক্ আছে অথচ সেই দিক্‌টার কথা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, সেই দিক্‌টার সঙ্গে সমকোণযুক্ত করিয়া একটা ঘন-ক্ষেত্রকে চালিত করিলাম। এখন সেই মূর্তিটা কেমন হইবে? উত্তর—আমরা যে তিনটি দিক্ বা মাপের কথা জানি, তাহা দ্বারা সে মূর্তির ধারণা হইতে পারে না। সে জিনিসটি নূতন মাপের জিনিস। তাহার আমরা "চতুর্থ মাপ" নাম দিয়াছি। নূতন মাপ বলিয়া তাহার পরিমাপের মাত্রাও স্বতন্ত্র। সুতরাং রাশি রাশি ঘন-ক্ষেত্র একত্র করিলেও তার একটা মাত্রা তৈয়ারী হইবে না। আগেও বলা হইয়াছে, নীচের মাপের মাত্রায় উপরের মাপের মাত্রা বুঝা যাইবে না।

ঐ অদ্ভুত চারি পরিসরযুক্ত মূর্তিটির কাল্পনিক নাম—“টেসার‍্যাক্ট্”

একটা অজানা, কল্পনাব অতীত বেখাব সঙ্গে সমকোণযুক্ত কবিয়া একটা ঘন-ক্ষেত্রকে চালিত করিলে যে মূর্তিটি হইবে, হিন্টন্ সাহেব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাব একটা মন গডা নাম দিয়াছেন--“টেসাব্যাক্ট্”। ঐ কথাটিব অর্থ “আটটি ঘন-ক্ষেত্রেব মিলন।” তিনি ঐ মূর্তিটি সম্বন্ধে এইরূপ বলিযাছেন—“আমবা দেখিতে পাই, একটা বেখা দুইটি বিন্দুতে সীমাবদ্ধ, একটি চতুষ্ক চাবিটি বেখায আবদ্ধ ; আবাব একটি ঘন-ক্ষেত্র ছযটি পৃষ্ঠ, ১২টি বেখা ও ৮টি বিন্দুতে পবিমিত। সেইরূপ টেসাব্যাক্ট্ মূর্তিটিতে ১৬টি বিন্দু, ৩২টি বেখা, ২৪টি পৃষ্ঠ ও ৮টি ঘন-ক্ষেত্র থাকিবে।”

আচ্ছা, আমবা যদি সত্য সত্যই ঐ বকম একটা মূর্তি দেখিতে পাই, তবে সেটিকে দেখিয়া আমবা কি মনে কবিব? ঐটি আমাদেব চক্ষুতে চাবি মাপেব পদার্থ বলিয়া মনে হইবে না। আমাদের মনে হইবে, ওটা একটা ঘন-ক্ষেত্র ভিন্ন আব কিছুই নহে। আমাদের চোখে ওটা তিন মাপেব জিনিস বলিযাই মনে হইবে। এই কথাটুকু বুঝিতে হইলে আমাদেব আবাব সেই কাগজেব উপবকার দুইটি মাপ-জানা পোকাটিব কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমবা যদি লম্বা, চৌড়া, পুরু—এই তিন মাপেব একটা জিনিস পোকাটাব সম্মুখে বাখিয়া দিই, তাহা হইলে সে ভাবিবে যে, এইটি দুই মাপেব জিনিস। পুরুত্ব—কি না উঁচু দিক্‌টাব জ্ঞান না থাকাব সে দিক্‌টা সে দেখিতে পাইবে না। আমাদেবও ঐরূপ অবস্থা। হয ত আমাদেব সম্মুখে কত শত চাবি মাপেব জিনিস বহিযাছে অথচ সেই চতুর্থ মাপটা দেখিবাব শক্তি আমাদেব নাই বলিযা আমবা সেগুলিকে তিন মাপেব বলিযাই বুঝিযা লইতেছি।

আমাদেব চাবি মাপেব জিনিস দেখিবাব শক্তি নাই সত্য, কিন্তু একটু আভাসে বুঝিবাব চেষ্টা কবা যাক্। আচ্ছা, যে ক্ষুদ্র প্রাণী লম্বা চৌড়া—এই দুই দিক্ ছাড়া আব বুঝে না, তাকে যদি লম্বা, চৌড়া, পুরু---এরূপ তিন মাপেব জিনিস বুঝাইতে হয, তাহা হইলে কি কবা উচিত? সেইটুকু বুঝিতে পাবিলেই আবাব আমবা বুঝিযা লইতে পাবিব যে, চাবি মাপেব জিনিস বুঝিতে হইলে আমাদেব পক্ষে কর্তব্য কি? একটা তা'-দেওযা ডিন লইয়া যদি খুব পাতলা পাতলা কবিয়া কাটা যায়, তবে দেখা যায যে, প্রত্যেক খণ্ডে ভ্রূণটিব একটু একটু অংশ আছে অবশ্য, অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বাবা সেটা দেখিতে হয, শুধু চোখে দেখা যায না। ভ্রূণেব সেই অংশগুলি এত পাতলা যে, তাব পুরুত্ব নাই বলিলেও হয, শুধুই লম্বা চৌড়া ভাব আছে। সেইগুলিকে পর পর সাজাইলে পুরুত্ব বলিয়া দিক্‌টা ফুটিয়া উঠে। তখন তাকে তিন মাপের জীব বলা চলে তখন একটা কথা বুঝিবাব আবশ্যক। লম্বা-চৌড়াই বুঝে, পুরু বলিলে বুঝে না, এমন কোন ক্ষুদ্র প্রাণী যদি লম্বা, চৌড়া, পুরু প্রাণীব ধাবণা কবিযা যায, তবে তাকে কি কবিতে হইবে? তাকে নিজেব মত অনেকগুলি দুই মাপেব জীবকে মনে মনে একত্র কবিযা ভাবিতে হইবে। ভাবিতে ভাবিতে ক্রমে পুরুত্ব দিক্‌টা বুঝিযা উঠিতে পারিবে। আবাব ঐ বকমভাবে যদি আমবা তিন মাপেব কতকগুলি জিনিস একত্র কবিয়া ক্রমাগত ভাবিতে থাকি, তবে ক্রমে ক্রমে চতুর্থ মাপটিব জ্ঞান মনেব মধ্যে ফুটিয়া উঠিবাব সম্ভাবনা।

আমাদেব মনে হয, আমবা যে সকল পদার্থ বা জীব দেখিয়া থাকি, তাহাদেব সকলগুলিরই চাবিটি মাপ। চতুর্থ মাপটা দেখিবাব শক্তি আমাদেব নাই, তাই ঐগুলিকে লম্বা, চৌড়া, পুরু এই তিন মাপযুক্ত বলিযা বুঝি। তাহা হইলে সকল জীবেবই এমন একটা অংশ আছে, যেটি

আমরা দেখিতে পাইতেছি না। সেইটিই চতুর্থ মাপ। এই পৃথিবীতে যাহাকে আমরা সাধারণ শ্রেণীর মানুষ ভাবিতেছি, হয় ত তার চতুর্থ মাপটি খুব উচ্চ, খুব উন্নত, খুব অসাধারণ।

হিন্টন সাহেব চতুর্থ মাপেব কথা খুব ভাল করিয়া আলোচনা কবিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি আমবা চেষ্টা করিয়া এই মাপটা বা দিক্‌টা বুঝিযা লইতে পারি, তবে আমাদেব বিস্তব গুণ বাড়িযা যাইবে। তখন কত রকম শক্তি আসিযা পড়িবে। কিন্তু ঐ মাপটা বুঝিযা উঠাই কঠিন, বিশেষ মন না দিলে বুঝা যায না। হিন্টন্ একটি সুন্দব উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন। সেটি এই —

একটি সুন্দর উপমা

আচ্ছা, আবাব আমাদেব সেই দুই দিক্‌দর্শী পোকাটার কথা ভাবা যাক্। আগে যখন তাহার কথা ভাবিযাছি, সে যেন একখানা কাগজের উপব আছে। এবার তাহাকে কাগজেব উপব না ভাবিয়া ভাবা যাক্, সে যেন একটা পাতলা মোমেব পাতের উপর আছে। বেশ, এখন কল্পনা কবা যাক, যেন একটা সূতা ঐ মোমের পাতেব ভিতব দিযা উঁচু-নীচুভাবে খাটান আছে। এখন আমবা সূতাটিব দুই মোড দুই হাতে ধবিযা যদি টান-টান কবিযা উঁচু-নীচুভাবে সূতাটিকে উঠানো-নামানো কবি, তবে ঐ পোকাটি সূতার ঐ গতি আদৌ বুঝিতে পাবিবে না। মোমপাতেব উপবকাব ছিদ্র, আব সেই ছিদ্রটুকুতে সূতাব যে অংশটুকু আছে, মাত্র তাহাই তাহাব চোখে পড়িবে। আবাব যদি সূতাটি মোটা-সরু হয বা নানা রঙ্গেবই হয়, তবে ছিদ্রমধ্যস্থ অংশটুকুব আকাব ও বঙ পোকাটিব চোখে ঘন ঘন বদ্‌লাইতে থাকিবে। উঁচু-নীচু দিকেব জ্ঞান না থাকায সে সমগ্র সূতাটিব কখনই ধাবণা কবিতে পাবি না। আবাব আব একটি কথা ভাবা যাক্। তোমবা অনেকেই কলার ফুল বা মোচা দেখিযাছ। মোচাব আগাব দিক্‌টা দুই তিন আঙ্গুল লম্বা কবিয়া কাটিয়া লইলে সেই জিনিসটি দেখিতে কিরূপ হয বল দেখি? তাব একদিকে মোটা, আব একদিকে খুব সরু ছুঁচাল। মোটা দিকটা হইতে ক্রমে ক্রমে সরু হইযা গিয়াছে। ভাল কথায় এ রকম জিনিসকে ক্রমসূক্ষ্ম বলে। আচ্ছা, এখন যদি এই ক্রমসূক্ষ্ম একটা জিনিসকে মোমপাতেব উপব রাখিযা ধীবে ধীবে চাপ দিযা পাতটিকে ফুঁড়িযা অন্য পিঠ দিযা ঐটিকে বাহিব কবা যায, তবে সেই ব্যাপাবটা পোকাব চক্ষুতে কিরূপ বোধ হইবে? যখন সরু আগাটা পাতেব উপর বাখা হইবে, তখন পোকাটা দেখিবে, পাতের উপব একটা ছোট গোল দাগ পড়িল। ক্রমে আমবা যতই জিনিসটিকে চাপ দিতে থাকিব, পোকাটা দেখিবে, সেই দাগটা ক্রমেই বড হইতেছে। তাহার পব জিনিসটা বাহিব হইযা গেলে ফাঁকটা বুজিযা যাইবে। মোমটা মনে কর এত নবম যে, ফাঁক হইতে হইতেই বুজিযা যায। এ ক্ষেত্রে জিনিসটা বাহির হইযা যাইবামাত্র ফাঁকটি বুজিয়া যাইবে, গোল দাগটাও মিলাইযা যাইবে। পোকাটি তখন অবাক্ হইযা ভাবিবে—তাই ত। কি অদ্ভুত ব্যাপার। দাগটা আসিলই বা কোথা হইতে, আর গেলই বা কোথা? গোল দাগটা ক্রমে বাড়িতেছে দেখিয়া সে অবাক্ হইবে। কিন্তু সেই বৃদ্ধিটা যে একই জিনিসেব সহিত গাঁথা, তাহা সে ভাবিতে পাবিবে না।

আবাব সূতাটিকে ঠিক উঁচু-নীচুভাবে না ধবিয়া যদি একটু কাত কবিয়া, টান-টানভাবে উঠানো-নামানো করি, তাহাব ফল কি হইবে? তাহাতে মোমপাতটা সূতাব সঙ্গে চিবিতি চিবিতে যাইবে। আচ্ছা, যদি মোমেব এমন একটা গুণ থাকে যে, চেবাটা সঙ্গে সঙ্গে বুজাইয়া দেয, তবে তাব ফল পোকাব চোখে কেমন দাঁড়াইবে? সে তাহা হইলে মনে কবিবে ...

পাতের উপর চলিয়া বেড়াইতেছে। সূতাটা সোজা করিয়া ধরা যায়, আবার কাত করিয়াও ধরা যায়। ধরিবার গুণে এক স্থানেই রাখিয়া উঠানো-নামানো যায়, আবার পাতটির সকল দিকেও লওয়া যায়। তাই তার মনে হইবে, ছিদ্রটি পাশাপাশি চলিয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সূতাব গতিটি হইতেছে উঁচু-নীচু গতিকে সে পাশাপাশি বলিয়া বুঝিবে। পোকাটির কি ভ্রম।

আচ্ছা, আবার মনে কর, যেন একটি সূতার পরিবর্তে আমবা অনেকগুলি সূতা ধরিয়া আছি, সূতাগুলির সংখ্যা যেন সহস্র সহস্র , একটি কাঠের সঙ্গে যেন এমনভাবে জুড়িয়া দেওয়া আছে যে, কোনটি সোজা হইয়া, কোনটি উপুড় হইয়া, কোনটি চিৎ হইযা, কোনটি কাত হইয়া পাতের ভিতর দিয়া ফুঁড়িয়া গিয়াছে বা অপরটার সঙ্গে সমান দূরে দূরে গিয়াছে ; কোনটা অপবটার উপর দিয়া ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে। মনে করা যাক্, সুতাগুলির মোড় একই কাঠের সঙ্গে আঁটা অথচ এলোমেলোভাবে মোম-পাত ফুঁড়িয়া গিয়াছে। এমন এই কাঠখানা ধরিয়া টান-টানভাবে সূতাগুলিকে উঠানো-নামানো কবিলে উহার চক্ষুতে কিরূপ বোধ হইবে? সে দেখিবে, বড চমৎকাব ব্যাপাব! বিস্তব বিন্দু চলাফেরা করিয়া বেড়াইতেছে , কতকগুলি পরস্পর তফাৎ হইতেছে, কতকগুলি মিলিয়া যাইতেছে, আবার অল্পসময় পরেই পৃথক্ হইয়া পডিতেছে , কতকগুলি ধীরে যাইতেছে, কতকগুলি দ্রুত চলিতেছে। সে মনে করিবে, একটা ঘোর বিশৃঙ্খলা ব্যাপার। আর আমরা তিন-দিক্‌দর্শী মানুষ, আমরা দেখি, বিশৃঙ্খলা কিছুই নাই, সবই সুশৃঙ্খল। আমবা দেখি, বিন্দুগুলিব ঐ সকল পাশাপাশি গতি প্রকৃত গতি নহে, সূতা খাটানো কাঠখানির উঁচু-নীচু গতিই প্রকৃত গতি। এখানেও আমাদেব পোকা বেচাবীর মস্ত বড় ভ্রম।

আমাদেব অবস্থাও অনেকটা ঐ পোকারই মত। আমাদেরও চাবিদিকে কত রকম গতি। ভিন্ন ভিন্ন মানুষেব ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃত, কত কত রকমেব জটিলতা, কুটিলতা, কত কত রকমের গণ্ডগোল। কিন্তু সকলগুলি একটা ক্রম-বিকাশের কাঠেব সঙ্গে জুডিয়া দেওয়া আছে। ভিন্ন ভিন্নমুখী হইলেও প্রকৃতপক্ষে সবগুলি উন্নতিব উঁচুদিকে চলিতেছে। দেখিবার শক্তিটা বাড়িয়া গেলে আমরা দেখিতাম, কিছুই গণ্ডগোল নহে, বিশৃঙ্খল নহে, ভগবানেব রাজ্যের সবই সুশৃঙ্খল। হিন্টন্ বলেন, এই উপমাটি ভাল করিয়া বুঝিলে বিজ্ঞানেব অনেক জটিল কথা বুঝা যায়।

চতুর্থ মাপ বুঝিবার পক্ষে আরও কয়েকটা সঙ্কেত

চতুর্থ মাপটা হিন্টন সাহেব আরও উপমা লইয়া বুঝাইযাছেন। তিনি বাষ্পের কথা তুলিয়াছেন। কথাটা বেশ একটু মজাব। আমরা দেখি, তরল পদার্থকে সমতলে ঢালিয়া ফেলিলে উহা লম্বা-চৌডা দিকে ছড়াইযা যায়। আব যতই ছড়ায়, ততই পুরুত্বের দিকটা ক্ষীণ হইয়া আইসে। দুইটি মাপে ছড়াইলে, তৃতীয় মাপটা কমিযা যায়। উহা হইতে আমবা ধরিয়া লইতে পারি যে, বাষ্প লম্বা, চৌড়া, উচ্চ—এই তিনটি দিকে যতই ছডাইতে থাকে, ততই চতুর্থ দিক্‌টা বা মাপটা কমিয়া আইসে। তাহা হইলে বাষ্পের ঘনত্ব দেখিয়া উহাব চতুর্থ মাপের অবধারণ করা অসম্ভব নহে।

পৃথিবীতে আমরা একই রকমের অনেক জিনিস দেখিতে পাই। যেমন ডান হাতখানা বাঁ হাতেবই মত অথচ ঘুবাইয়া ফিরাইয়া একখানির স্থানে আর একখানিকে বসান যায় না। আবার মনে কর, একখণ্ড কাগজের উপর বিপরীতমুখ কবিয়া দুইটি সমকোণ ত্রিভুজ আঁকিলাম। তার

র ঐ দুইটিকে কাটিয়া টেবিলের উপর রাখিলাম। এখন ঐ দুইটিকে একটি বলিয়া বোধ হইবে, মনটি করিতে হইলে উহার একটিকে তুলিয়া উল্টাইয়া অপরটির উপরে বসাইতে হইবে। াহা হইলে মনে হইবে, ঠিক যেন একটা ত্রিভুজই রহিয়াছে। একটিকে না তুলিয়া অন্য কোন তি দ্বারা ঐরূপ একীভূত করা অসম্ভব। একটি দুই মাপের পদার্থকে তিন মাপেব মধ্যে ল্টান যায় ; শুধু উল্টান নহে, মুকুরের মধ্যে প্রতিবিম্বিত পর্যন্ত করা যায়। সেই রকম, তিন াপেব জিনিসগুলিকে চারি মাপের মধ্যে নানাপ্রকারে পরিবর্ত্তিত করা যায়। হিন্টন্ বলেন, ইরূপ তর্ক-সূত্র ধরিলে বিদ্যুতের অনেক অদ্ভুত ব্যাপার খুব সহজে ভাল করিয়া বুঝা যায়। তিনি আরও বলেন যে, আমরা চতুর্থ মাপ হইতে নৈতিক জীবনেরও উন্নতি করিতে পারি।

চতুর্থ মাপ বুঝিতে হইলে অহঙ্কার দূর করিতে হইবে। যাঁহারা পরাবিদ্যার আলোচনা কবেন, তাহাবা জানেন যে, স্বার্থভাব ত্যাগ করিতে হইবে। শুধু পরের ভাবনা ভাবিতে হইবে, পরকে আপন করিতে হইবে, পরের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে হইবে, নিজের চিন্তা একেবারেই ভুলিয়া যাইতে হইবে। মানবজাতির মঙ্গলকামনা করিয়া কার্য কবিতে হইবে। তবেই চতুর্থ মাপ বুঝিবার অবস্থা হইয়া আসিবে। কতকগুলি ঘন-ক্ষেত্র অর্থাৎ লম্বা, চৌড়া, পুরু এই তিনটি সমান মাপের জিনিস লইয়া সাজাইয়া সাজাইয়া দেখিতে হইবে।

সাজাইলে একটা খুব বড় রকমেব ঘন-ক্ষেত্র তৈয়ারী হইবে। তাহার পব একটা ছোট ঘন-ক্ষেত্রের সঙ্গে অপরটির বা সকল ছোটগুলিব পরস্পর কিরূপ সম্পর্ক, তাহা বুঝিবার শিক্ষা কবিতে হইবে। এই সম্পর্ক বুঝিবার সময় আমরা স্বভাবতঃ দেখিয়া থাকি যে, কোন্‌টি কাহার উপবে বা নীচে, কোন্‌টা কাহার সম্মুখে বা পিছনে, কিংবা কোন্‌টি কাহাব ডাহিনে বা বামে আছে ; কিন্তু এরূপ দেখাটা ঠিক দেখা নহে। এ সম্বন্ধটাও ঠিক সম্বন্ধ নহে। এ সম্পর্কটি আমাদেব দৃষ্টিধাবাব সঙ্গে জড়িত, এই ব্যক্তিগত সম্পর্ক ; এ ছাড়াও উহাদের ভিতরে নিজেদের সম্বন্ধ আছে। সেইটি কোন বাহিরের পদার্থেব সঙ্গে জড়িত নহে। সেই ভিতরেব অথচ খাঁটি সম্বন্ধটা চেষ্টা করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন। বুঝিবার সময় আমাদের নিজের নিজের ব্যক্তিত্বটা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া যাইতে হইবে। ঘনগুলির ঐ সূক্ষ্ম সম্বন্ধটা বুঝিয়া সওয়া বেশী লোকের কাছেই খুব কঠিন ব্যাপার। একেবারে নিঃস্বার্থ হইতে পাবিলেই ঐ সূক্ষ্ম সম্বন্ধটি চোখে পড়িবে, ক্রমে চতুর্থ মাপও বুঝা যাইবে। আত্মার প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে ঐরূপ চেষ্টা—ঐরূপ সাধনা করা আবশ্যক।

চতুর্থ মাপ জানিবার পক্ষে আমবা খুব অল্প আলোচনাই করিলাম। যদি কাহারও এ বিষয় সম্বন্ধে আবও অধিক জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে তিনি যেন হিন্টনের বহিগুলি পড়েন। হিন্টন লেডবিটারকে বলিয়াছিলেন যে, বিষয়টিও আরও সহজ করিয়া তিনি সাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। অনেকেই সেই নূতন ব্যাখ্যাটার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছেন। ধ্যান-ধারণা-নিদিধ্যাসন দ্বাবাও জ্ঞানবৃদ্ধি হয় ; আবার চতুর্থ মাপের চিন্তা দ্বাবাও বুদ্ধিব বিকাশ ঘটে। প্রথম উপায়টি অনেকের কাছে সহজ। দ্বিতীয় পথটি কঠিন ; কেন না, অঙ্কেব পথ বলিয়া সকলেরই মাথায় ঢুকে না। পথটি কঠিন হইলেও এটিকে তাচ্ছীল্য করা উচিত নহে। ইহার আলোচনাতেও বিশেষ সুফল হয়। এ পথে সকলেরই যে দিব্যদৃষ্টি ফুটিয়া উঠে, সকলেই যে চতুর্থ মাপটি হৃদযঙ্গম করিতে পারে, আমরা তাহা বলি না ; তবে যে একটা নূতন রকম দৃষ্টিশক্তির বিকাশ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা ধ্যান-ধারণার বিষয় পরে আলোচনা কবিব।

দ্বাদশ অধ্যায়

সহায়কদিগের কার্য

লোকে কখন কখন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, পরাবিদ্যা মরণের নিমিত্ত কিরূপভাবে প্রস্তুত হইতে উপদেশ দেয়? এ সম্বন্ধে আমরা পর্বেও যাহা বলিযাছি, এখনও তাহাই বলিতে চাই। পার্থিব জীবনটিকে নিষ্কলঙ্ক করিযা তোলাই প্রধান কর্তব্য। এইটিই মরণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার পক্ষে একমাত্র ফলদ অনুষ্ঠান। কবে মবণ হইবে, যে বিষযে চিন্তা করিয়া যত ব্যাকুল না হওয়া যায়, ততই ভাল। তত্ত্ব-বিদ্যাবিষয়ক পুস্তকাবলীতে বিস্তব উপদেশ আছে ঐগুলির সহিত যতই আমাদের পরিচয় হয, ততই মঙ্গল। তাহা হইলে মরণান্তে সূক্ষ্ম জগতে আমাদের অবস্থা যেমন যেমন ঘটিবে, আমবা তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারি। শুধু তাহাই নহে। সেখানে যদি আমাদিগের সম্বন্ধে বা আমাদের সাহায্যপ্রার্থী কাহাবও ভাগ্যে কোন অদৃষ্টপূর্ব দুর্ঘটনা ঘটিয়া উঠে, তাহা হইলেও আমবা তাহা বিদূরিত করিবাব নিমিত্ত দৃঢ়সঙ্কল্প হইযা প্রস্তুত থাকিতে পাবি। মৃত্যু যে সম্পূর্ণভাবে একটি নৈসর্গিক ব্যাপাব, সেটুকু বুঝিযা রাখা আমাদের নিতান্ত প্রযোজন। মৃত্যুকে আদৌ ভয কবা উচিত নহে। পবন্তু, উহাকে আনন্দেব ব্যাপাব বলিযা বুঝিযা বাখাই আমাদিগেব কর্তব্য , কেন না, মবণেব পবই পার্থিব পবই পার্থিব জীবনেব জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হয চ তখনই জীব উচ্চতব জীবনে প্রবেশ কবে , তথায় নানা প্রকাবে বিপুল পরিমাণে পরোপকার ব্রত পালন কবা যায়। এ পৃথিবীতে সেরূপটি পাবা যায না। যাহারা এ পৃথিবীতে মবণেব নিমিত্ত প্রস্তুত হয না, তাহাদিগকে ভুবর্লোকে যাইযা অনেক বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। তত্রত্য জ্ঞান আমাদের যতই পরিস্ফুট হইবে, আমবা সে লোকেব পক্ষে ততই উপযুক্ত চালক, বান্ধব ও স্বাচ্ছন্দ্য-বিধাতা দাঁড়াইতে পাবিব। ভুবর্লোকে কত প্রকার সাহায্য কবা যাইতে পারে, তাহার আলোচনায় ফল আছে। কেন না, জীবাত্মা তথায কিরূপ অবস্থায কিরূপ সাহায্যের প্রার্থী হয়, তাহা জানিতে পাবিলে আমবাও সর্বোৎকৃষ্ঠভাবে প্রস্তুত থাকিতে পাবি। আমরা পার্থিব দেহেও সেবা-ধর্মেব অনুশীলন কবিতে সমর্থ , কাবণ, নিদ্রিতাবস্থায় এ দেহেও আমবা সাহায্য-প্রার্থী মৃতব্যক্তিগণেব সাক্ষাৎ পাইযা থাকি। শুধু সাক্ষাৎ নহে, উহাদের উপকাবসাধনও কবি। সপ্নাবস্থায ভুবর্লোকে যাইযা তত্রত্য জীবাত্মাদিগের উপকার করিবার অভ্যাসটা আমবা এই পার্থিব দেহেই করিযা বাখিতে পারি। আব, এরূপ অভ্যাস করাও মন্দ নহে। মরণান্তে ভুবর্লোকে ঐরূপ পরোপকাবই আমাদেব জীবনের প্রধান কার্য হইযা দাঁড়াইবে।

পরলোক আমাদিগের খুবই সুপরিচিত স্থান

পার্থিব জীবনে স্বপ্নাবস্থায ভুবর্লোকে যাইযা মৃত ব্যক্তিগণেব উপকাব কবা যদি আমাদিগেব অভ্যাস থাকে, তবে মবণান্তে যখন আমবা তথাই যাইযা উপনীত হইব, তখন সেই স্থান আমাদের নিকটে কিছুমাত্র অপবিচিত বা ভীতিজনক বলিযা মনে হইবে না। তখন মনে হইবে, ইতঃপূর্বে এই স্থানে কতবাব আসিযাছি। তত্রত্য জিনিস-পত্র, বন্ধু-বান্ধব সমস্তই আমাদেব সুপরিচিত বলিয়া বোধ হইবে। মনে হইবে, মৃত্যু কিছুই নহে, পার্থিব জীবন হইতে সূক্ষ্ম-জগতে যেন একটা

পাদক্ষেপমাত্র। মরণান্তে আমরা ভূবর্লোকে গেলে পূর্বপরিচিত আত্মীয়-স্বজনেরা আমাদিগকে দেখিয়া কতই আনন্দিত হয়। আমরা পার্থিব জীবনে স্বপ্নাবস্থায় ইহাদের নিকটে কতবার আসিতাম। আসিলে কি হইবে, আবার অল্পসময়ের মধ্যেই জাগরিত হওয়ায় ইহাদিগকে দীর্ঘকালেব জন্য ত্যাগ করিয়া যাইতাম। তখন ইহাদের কাছে আমাদের খুব অল্পসময় থাকা ঘটিত : কিন্তু এখন আমরা পূর্বপেক্ষা বেশী সময় থাকিতে পারিব ভাবিয়া ইহাদেব আনন্দেব পবিসীমা থাকে না। আমরা এই ভুবর্লোকে যাইয়া কিছুমাত্র অসুবিধা মনে করি না। তথায় কোন প্রকার সঙ্কোচ, কোনরূপ অচেনা-ভাব মনে আইসে না। পূর্বেও তথায় স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ কাজ কবিতাম, এখনও সেইরূপ কার্য্যেই স্বভাবতঃ ব্যাপৃত হইয়া পড়ি। পূর্ব্বেও যাহাদিগের উপকাব কবিতাম, এখনও তাহাদিগের উপকারেই প্রবৃত্ত হই। এখন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সময় এখানে থাকিতে সমর্থ হওয়ায় আমরা অত্রত্য কাজ-কর্মের গণ্ডী প্রসারিত কবিয়া লইতে পাবি ; সুতরাং এখন আমবা পূর্বাপেক্ষা অধিক পবোপকাবসাধমে সমর্থ হই।

প্রেতাত্মাদিগকে সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক

পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে ধর্মোপদেষ্টাবা যুক্তিযুক্ত ও সত্য সংবাদ না দেওযায, আব ধর্ম-কর্ম বিষযে লজ্জাকর তাচ্ছীল্য বিদ্যমান থাকায ভুবর্লোক-গত হতভাগ্য ব্যক্তিবা তত্রত্য বিস্তব বিষয অনবগত থাকে। বিস্তব ব্যাপাব তাহাদেব নিকটে দুর্বোধ্য বলিযা মনে হয , অনেক সময তাহাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। অনেকে তখনও বিস্তর পার্থিব দ্রব্য দেখিতে পায়, বিস্তব পার্থিব জীবনেব অনুভূতি তখনও স্ফুবিত হইতে থাকে। উহারা তখনও ঐ সকল জিনিসের মায়া ছাড়িতে চাহে না। তখনও ঘোর আগ্রহে পৃথিবীব স্নেহবন্ধনে জড়িত থাকিতে চাহে। এইরূপ ব্যাপার হইবাব কারণ এই যে, মবণের পরও পর্যন্ত উহারা পার্থিব বিষয ব্যতীত অন্য কোন কিছুব চিন্তা করে নাই বা অন্য কোন কিছু উহাদের চিত্তাকর্ষক বলিযা মনে হয নাই। উহাদের এ পর্যন্ত মনে হইযাছে যে, পার্থিব বিষয় ভিন্ন যদি অন্য কিছু বিদ্যমান থাকে, তবে তাহা শূন্যগর্ভ ও অবাস্তব। কু-শিক্ষা প্রাপ্ত বালক-বালিকাবা যেমন অন্ধকার দেখিয়া ভয পায়, সেইরূপ উহাবাও এই ভূলোকাবিতিক্ত অবস্থা স্মরণ করিযা ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠে। সত্য সত্যই যে উহাদের মৃত্যু হইয়াছে, উহারা তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, আব তাদৃশী ধাবণা করিতেও চাহে না। না চাহিলে কি হইবে? উহাদেব মৃত্যুর কথা ক্রমেই পবিস্ফুট হইতে থাকে। কিন্তু তখনও উহাবা তহা বিশ্বাস করিতে ঘোব অনিচ্ছুক। মরণ হইয়াছে বুঝিবামাত্র উহারা ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা দিবাব প্রয়োজন হয। পরিশেষে বেশ মিষ্ট ভাষায় এই খাঁটি সত্যটুকু উহাদিগকে জানান হয যে, পূর্বাচবিত চিন্তাধাবা ও জীবনোদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে পবিবেষ্টিত করিয়া ফেলিতে না পারিলে এই নবীন অবস্থায প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হইবার যো নেই। এই চিন্তা ও উদ্দেশ্যপুঞ্জের পরিবর্তন বড় সহজ নহে। চেষ্টা কবিলেও পবিবর্তন-কার্যটা কষ্টকব। উহা অতীব ধীরে হইতে থাকে। তাই উহারা এরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, প্রবৃত্ত হইতে ভয় পায়। তাই উহাবা পূর্ব-বর্ণিত চিকিৎসকেব ন্যায় বিমর্ষ ও নিরুদ্যম জীবন অতিবাহিত কবিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকে। সন্দিগ্ধ ও ধনলিপ্সু ব্যক্তিবা অতীব শোচনীয়রূপে পার্থিব বন্ধনে বদ্ধ থাকে। ইহাদিগকে উদ্ধার কবিতে হইলে, সাহায্য কবার নিতান্ত প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইহারা এমনই সাধারণ জ্ঞানবর্জিত, এতই বিচার-শক্তিশূন্য যে,

ইহাদের অনুকূলে প্রায়ই বেশী কিছু করিয়া উঠা যায় না। আবার কোন কোন লোক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে পৃথিবীর সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকে। সেই কারণটি পার্থিব কার্যাবলীর প্রতি অসাধারণ আসক্তি নহে। হয় তো উহারা কোন ঋণ পরিশোধ করিয়া আসিতে পারে নাই, কিংবা কোন একটি কর্ত্তব্যপালন হয় নাই, এই প্রকার একটা না একটা দায়িত্ব-বোধই উহাদের পার্থিব বন্ধনের মূলীভূত কারণ। এই পৃথিবীতে কত শত লোক মরণের পূর্বে ঘোর অন্যায় "উইল" (চরমপত্র) করিয়া যায়। পরে ভুবর্লোক-সুলভ সূক্ষ্মদৃষ্টি বলে যখন উহারা আপনাদেব অন্যায় বুঝিতে পারে, তখন অনুতপ্ত হইয়া প্রতীকারের চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হয় আবার অনেকে কোন না কোন গুপ্ত কথার নিমিত্ত পৃথিবীমুক্ত হইতে পারে না। এরূপ গুপ্ত ব্যাপার সাধারণতঃ অখ্যাতিকর। উহারা যদি কাহাকেও মরণের পূর্বে উহা না বলিয়া যাইতে পারে, তবে প্রেত-লোকে উহাদের বিবেক ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে ; পার্থিব জীবনে হয় তো ঐ কথাটির জন্য কোন দিন অতটা অশান্তি মনে আইসে নাই, কিন্তু এখন উহার জন্য মৃত ব্যক্তি ঘোব উদ্বেগ বোধ করিতে থাকে। কখন কখন প্রয়োজনীয় দলীলপত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কোন ব্যক্তি হয় তো উহার সন্ধান জানিত। সে এখন পরলোক। কখন কখন টাকাকড়ি খুব গুপ্তস্থানে থাকে, উহা হয় তো কাহারও আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। উহা যে কোথায় লুক্কায়িত আছে, তাহা মনে কর, উহার উত্তরাধিকারী জানে না। যে জানে, সে হয় তো মারা গিয়াছে। এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তি ঐ টাকার কথা সেই উত্তরাধিকারীকে বলিবার নিমিত্ত মহা ব্যস্ত হইয়া উঠে। যখন ঐরূপ ঘটনা ঘটিয়া দাঁড়ায়, তখন অনেক স্থলে ঐ মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা ভূলোকে কোন-না-কোনরূপে আসিয়া আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য করিতে বলে। সাহায্য করিতে পারিলে একটু প্রীতি অনুভব করিয়া থাকে, আর তখনই পার্থিব বন্ধন হইতে তাহার মুক্তি ঘটে। কিন্তু সকলের ভাগ্যে এরূপ সাহায্য করিতে আসা ঘটিয়া উঠে না। খুব বেশীর ভাগ প্রেতাত্মাকেই পরিশেষে বুঝিতে হয় যে, মরণান্তে পার্থিব জীবনের অন্যায় কার্যের প্রতীকার করিবার চেষ্টা নিস্ফল। বুঝিতে হয় যে, ঐ সকল দুষ্কৃতি স্মরণ করিয়া অনুতাপ করা বৃথা, কেন না, প্রতীকারের এখন কোনই সুযোগ নাই। মৃত ব্যক্তির এখন পার্থিব চিন্তা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। এই নবীন জীবনের সুবিধাগুলি যাহাতে সম্যকপ্রকারে পাওয়া যায়, এখন উহার পক্ষে সেই দিকে লক্ষ্য করাই শ্রেয়ঃ।

যাহারা কাহারও উপর ক্রোধ পোষণ করিয়া পৃথিবী ত্যাগ করে, তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। এইরূপ ব্যক্তিদিগের অনেকে মরণান্তে আপনাদের অন্যায় বুঝিতে পারে। তখন উহাদের মনে হয়, আমরা পার্থিব জীবনে অন্যায়রূপে ক্রোধ পোষণ করিয়াছিলাম কিংবা রোষান্ধ হইয়া কত অন্যায় কাজ করিয়াছি। এই ভাবিয়া উহাদের হৃদয় দুঃখে পূর্ণ হইয়া উঠে। উহারা তখন যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণের অভিলাষী হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থলে অন্যরূপ ব্যাপারও ঘটিয়া দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ কখন কখন বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার ভাব মরণের পরও প্রেতাত্মার প্রাণে পুঞ্জীভূত থাকিয়া যায়। তখন ঐ প্রেতাত্মা পৃথিবীর কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে চায়। কাহারও উপকার করা তখন উহার উদ্দেশ্য নহে। শত্রুপক্ষের অনিষ্টসাধনই সে সময় উহার অভিপ্রায় হইয়া উঠে। এরূপ বিদ্বেষভাবাপন্ন প্রেতাত্মার কয়েকটা কাহিনী আমরা পূর্বেও বিবৃত করিয়াছি।

বিদ্বেষ ব্যতীত আরও কয়েকটি তীব্রভাব কখন কখন মৃত্যু-তোরণ অতিক্রম করিয়া চলিতে থাকে। একটি দরিদ্রা রমণীর কাহিণী আমাদের জানা আছে। জাহাজে আগুন লাগায় তাহার

মৃত্যু হইয়াছিল। জাহাজে আগুন লাগিলে রমণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে নাই। পুড়িয়া মরিব ভাবিব তাহার খুব ভয় হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দাহ-জনিত কোন প্রকার দৈহিক যাতনাই তাহার ঘটে নাই ; কেন না, রমণী অগ্নিশিখার আয়ত্ত হইবার পূর্বেই রুদ্ধ-শ্বাস হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল। মরিয়া গেলে, কয়েক ঘন্টা পরে তাহাকে দেখা গেল যে, তখনও যেন সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সে যে মরিয়াছে, যেন তখনও সে তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। উহার মুখের ভাবটি দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন তখনও ভাবিতেছে যে, 'আমি প্রজ্জ্বলিত কক্ষের মধ্যে আটক পড়িয়াছি।' মরিয়া গেলেও তাহার মুখে সেই ভাব। এরূপ উৎকট ভয়, বস্তুতঃ বায়ু-রোগেরই পরিচায়ক। সচরাচর এরূপ ঘটনা খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু অশিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রায়ই ভয় ও স্নায়বিক দুর্বলতায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। আর এরূপ আক্রান্ত হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। তাই উহাদিগকে সান্ত্বনা করা, ভরসা দেওয়া, প্রকৃত কথা বুঝাইয়া দেওয়া প্রভৃতি কার্যই সহায়কদিগের কার্যের মূল-মন্ত্র হইয়া উঠে।

নিঃস্বার্থ প্রেতাত্মা

ভুবর্লোকের নিম্নতর স্তর-বিহারী বিস্তর নিঃস্বার্থ জীবাত্মা বিদ্যমান আছে। ইহারা স্বেচ্ছায় পৃথিবীর সহিত নিকট-সম্পর্কে সম্পৃক্ত থাকিতে চায়। ইহারা যে পৃথিবীর উপর খুব আসক্ত, তাহা নহে ; কোন প্রকার স্বার্থের প্রেরণাও ইহাদের প্রাণে জাগে না। তবে পৃথিবীর কাছে কাছে ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? তাহার কাবণ এই যে, ইহারা উপচিকীর্ষু। অন্যের হিত করিবে, তাহাই ইহাদের বাসনা। ষষ্ঠ অধ্যায় এইরূপ একটি উপচিকীর্ষু স্বামীর বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। তদপেক্ষাও একটি বিস্ময়কর কাহিনী আমাদের জানা আছে। কাহিনীটি এই—এক জন সুবিখ্যাত ব্যক্তি মরণের পর অধ্যাত্ম-মার্গীদিগের অধিনায়কত্ব হাতে লইয়াছিলেন। শুনা যায়, ইঁহার পার্থিব জীবন পাপ ও অন্যায় অত্যাচারের গাঢ় কলঙ্কে কলঙ্কিত ছিল। মৃত্যুর পর না কি ইনি পার্থিব জীবনের সেই সকল দুষ্কৃতির গভীরতা অনুধাবন করিতে সমর্থ কয়েন। তখন আত্ম-নির্বেদ উপস্থিত হওয়ায় স্বীয় কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পৃথিবীবাসীদিগের উপকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। হয় তো ইঁহার মনে হইয়াছিল, কিম্বা কোন উন্নততর সহায়কের সঙ্কেতে ইনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, পার্থিব জীবনে বিস্তর অসৎকার্য করিবার ফলে এই ভুবর্লোকে ইঁহার স্থিতি দীর্ঘকালব্যাপী হইবেই, সুতরাং বৃথা অনুতাপে কাল নষ্ট না করিয়া যথাসম্ভব পৃথিবীবাসীদিগের উপকার করাই ভাল, তাহাতে দুঃখের মধ্যেও একটু শান্তি পাওয়া যাইবে। তাই ইনি অক্লান্ত ধৈর্য ও অবিশ্রান্ত স্বীকার করিয়া পৃথিবীবাসী মানবগণের সমীপে পারলৌকিক জীবনের যাথার্থ প্রতিপাদন নিমিত্ত নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার চেষ্টায় দুঃখ-ভারাক্রান্ত শত শত ব্যক্তি যে উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে. তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সহায়ক হওয়া অবশ্য কর্তব্য

সহায়কদিগের কার্য যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বিশদভাবে বলা হইয়াছে। পার্থিব জীবনে স্বপ্নাবস্থারই হউক কিম্বা মৃত্যুর পরে ভুবর্লোকে যাইয়াই হউক, অসহায় জীবাত্মাদিগের উপকার করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য আর নাই। ঐ কার্য্যে দয়া ও উদারতা যুগপৎ প্রকাশ পায়। আমাদের সকলেরই যথাসম্ভব পূর্ণ-পরিমাণে উহাতে আত্ম-নিয়োগ করা উচিত। ইচ্ছা করিলে সকলেই

এই মহান্ ব্রতে ব্রতী হইতে পারে, এই সেবা-ধর্মের পথ সকলের সমক্ষেই উন্মুক্ত রহিয়াছে। মননশীল ব্যক্তিমাত্রই এই পরোপকার-সাধনে সমর্থ। এ বিষয়টি মহাত্মা লেডবিটার একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। আমাদিগের প্রত্যেকেরই যথাসাধ্য সহায়কগণকে সাহায্য করা উচিত। তাঁহারা যে কার্য করিয়া থাকেন, তাহার কতক আমাদিগেরও করিতে চেষ্টা করা কর্তব্য। শুধু তাহাই নহে, নিঃস্বার্থভাবে উপকার-সাধন করিতে গিয়া তাঁহার যে সকল বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হয়েন, সেগুলি অপসারিত করিবার চেষ্টা করাও আমাদের কর্তব্য। প্রেতাত্মাদিগের সঙ্গে খুব বেশী পরিমাণে স্বার্থ-ভাব জড়িত থাকে, পৃথিবীর উপর আসক্তি খুবই প্রকাশ পায়। সহায়কগণ ঐ ভাব ও আসক্তি বিদূরিত করিয়া থাকেন। এইটিই তাঁহাদের পক্ষে খুব কঠিন কার্য। পার্থিব মায়া ও স্বার্থভাব প্রেতাত্মাদিগের পক্ষে বড়ই স্বাভাবিক। তথাচ উহা পার্থিব জীবনেরই অজ্ঞান-প্রসূত ফল। এই ফল যাহাতে না ফলিতে পারে, তাহা করিতে হইলে আমাদেগির যথাসাধ্য তত্ত্ব-বিদ্যায় উপদেশগুলি প্রচার করা আবশ্যক। উহার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

মৃত ব্যক্তিদিগের সহায়কগণ উপকারব্রতের পথে আর একটি বাধাও দেখিতে পান। সেটি এই যে, অনেকে ধর্ম সম্বন্ধে অদ্ভুত ও অসঙ্গত ধারণা পোষণ করে , আবার কেহ কেহ বা পার্থিব আত্মীয়ের স্বার্থজড়িত অসংযত শোকের আবেগে বিচলিত হইয়া উঠে। উহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেও সহায়কদিগকে অকারণ বেগ পাইতে হয় , কিন্তু উহারা পার্থিব মায়ায় বিচলিতই হউক কিম্বা ধর্ম্মবিষয়ক হউক, উভয়, স্থলেই প্রতীক্ষার-বিধি একই রূপ। প্রকৃত জ্ঞানলাভই সেই বিধি। উহাতে জীবিতগণ শোকের হাত হইতে ও মৃতগণ নৈরাশ্য হইতে তুল্যরূপে রক্ষা পাইয়া থাকে। যাঁহারা তত্ত্ব-বিদ্যাবিৎ, তাঁহারা ঐ প্রকৃত জ্ঞানবিস্তার করা একটি পবিত্র কর্তব্য . বলিয়া মনে করেন। প্রকৃষ্ট দক্ষতার সহিত এই কর্তব্যটি পালন করা আবশ্যক। অশুশ্রূষু ব্যক্তিবর্গের নিকট সর্বক্ষণ উহার আলোচনা করা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে . করিলেও তাহা ফলবতী হইবে না। এবং বিধ আলোচনায় শ্রোতৃবর্গ বিরক্ত হইয়া উঠিবে। এরূপ ক্ষেত্রে উহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে না। মনে কর, সদুদ্দেশ্যপরিচালিত হইয়া যদি কোন আগন্তুক অকস্মাৎ আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হবেন ও আমাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমাদের মেজাজ কিরূপ হইয়া উঠে? ঐ অসাময়িক প্রবেশে আমরাও হয় তো বিরক্ত হইয়া উঠি। কিন্তু তত্ত্ববিদ্‌গণ যাহাতে অপরকে স্বর্গীয় জ্ঞানের মহীয়ান্ আলোকে আলোকিত করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহাদের নিকট হইতে এই শান্ত, স্নিগ্ধোজ্জ্বল, দিব্য জ্ঞানালোকের বিমল রশ্মি নিঃসৃত হইতে পারে, তদনুরূপ গুণে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিভূষিত হওয়া একান্ত কর্তব্য।

আবশ্যক হইলে যাহাতে পারলৌকিক তাবৎবিষয় অতীব বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, প্রত্যেক তত্ত্ববিদ্যাবিৎকে সেইরূপ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এতদ্বিষয়ে হইবে। এতদ্বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞানলাভ রাখা কর্তব্য। তাঁহার উপর এ সম্বন্ধে যে কোন সুসঙ্গত প্রশ্নই হউক না কেন, তাঁহাকে তাহার উত্তর দিতে সমর্থ হইবার মত প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এমন হইতে পারে যে, কাহারও আত্মীয় মারা গিয়াছে , ঐ বিয়োগবিধুর ব্যক্তি হয় তো সান্ত্বনা ও উপদেশের আশায় আসিয়া উপস্থিত। তখন তাত্ত্বিকের কর্তব্য কি? যাহাতে ঐ শোকাকুল ব্যক্তির যাবতীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন, তাঁহাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তাঁহার উত্তর দিতে সমর্থ হওয়া চাই। আর এইরূপে সেই সমাগত শান্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তিবর্গকে মৃত্যু ও পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানদান করিতে হইবে। সাধারণ শ্রেণীর মানবকে যথার্থ জ্ঞানের পথে পরিচালিত করিবার পক্ষে এইরূপ ক্ষেত্রই সুবর্ণসুযোগ বলিতে হইবে। এই

প্রকারে ঐ সকল শোকাকুল ব্যক্তি দুঃখেব হ্রাস ও জ্ঞানেব বিকাশ করিয়া দিতে পারিলে, উঁহারা আর তখন সূক্ষ্ম-লোকচাবী সহায়কদিগেব কার্যের বাধা উৎপাদন কবিতে পারেন না ; সুতরাং উঁহারাও তখন ঐ সকল শোকাচ্ছন্ন ব্যক্তিবর্গের মৃত আত্মীয়েব উপকার কবিতে সমর্থ হয়েন। শোকাকুল ব্যক্তিবর্গকে যথার্থভাবে বুঝাইয়া উপযুক্ত তাত্ত্বিক এতটা উপকারসাধন করিতে পাবেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার উপদেশে উহাবাও মৃত্যুব্যাপারটি প্রকৃতভাবে দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ হয। এক দিন না এক দিন উহাদের নিকটেও মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে। সে ভয়ানক সময়েব জন্য উহাবা প্রস্তুত হইতে পারে। ইহলোক পবলোক সর্বত্রই তত্ত্ব-বিদ্যা উপকারসাদন করিয়া থাকে। তত্ত্ববিদ্যায় আমরা অকাট্য বেদব্যাসের ন্যায সত্য দেখিতে পাই। সে সত্য সকলেবই উপকাব-সাধক। সত্যটি এই—"মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই।" এই সত্যে জীবন ও অমবত্ব-রহস্য উদঘাটিত হইয়াছে। যাহারা এই সত্য লাভ কবিতে প্রয়াসী, তাহাদিগকে উহা দান কবা আমাদেব কর্তব্য। আমবা আনন্দেব সঙ্গে উহা দান করিতে চাই। এইরূপ দানে আমবা প্রীতি অনুভব কবি, আর এই সত্য প্রচাব করিতে আমবাই একমাত্র অধিকাবী।

পারলৌকিক জীবনে আবও অনেক সুবিধা আছে

পূর্ববর্তী পার্থিব জীবনেব সহিত পারলৌকিক জীবন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইলেও উহাব একটু বৈশিষ্ট্য আছে। উহা পার্থিব জীবনেরই ফল, তদ্ভিন্ন উহা আব কিছুই নহে, এরূপ ভাবা একটা মহাভ্রম। যাহারা মবণেব পব পরমাণুব নবীন বিন্যাসসঞ্জাত সূক্ষ্ম-দেহ ও পাবিপার্শ্বিক বিনা ওজরে গ্রহণ করিয়া বসে, তাহাদের নিকট পারলৌকিক জীবন অনেকটা পার্থিব জীবনেরই ফলস্বরূপ বটে। কিন্তু যে ব্যক্তি পরলোক ও তত্রত্য সুযোগ সম্বন্ধে কিযৎপবিমাণও জ্ঞানলাভ কবিযাছে, তাহাব পক্ষে পারলৌকিক জীবন স্বতন্ত্র প্রকাব। সূক্ষ্ম-জগতে প্রভূত পবিমাণে উপকাব অপকাব দুই-ই করা যাইতে পাবে। সেখানে বিস্তর শিখিবাব বিষয রহিয়াছে, শিখিবার পন্থাও অনেক। যাহারা কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাহাবা যেখানে অনন্ত কর্ম পাইয়া থাকে। কাজের সেখানে শেষ নাই। সাধাবণ শ্রেণীব মানব স্বভাবতঃ ঐরূপ কার্যে লিপ্ত হয় না। একপ লোক পার্থিব জীবনে স্বার্থপরায়ণ হয, পরলোকে গেলে ইহাদের চিন্তা স্বার্থকলুষিতই থাকে। কখন কখন ইহাদের দৃষ্টিপ্রণালী ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয , তখন প্রকৃত রূপ দেখিতে পায। তখন বুঝিতে পারে যে, এ পর্য্যন্ত স্বার্থচিন্তায তাহাদেব সময বৃথা নষ্ট হইয়াছে। যেমন এইরূপ বুঝে, অমনই আত্মোৎকর্ষে সঙ্গতরূপে চেষ্টা করিতে আবম্ভ করে। কখন কখন মৃত্যু হওয়ায় মানুষেব প্রকৃতি আমূল পরিবর্তিত হইযা যায়, আর সেই পবিবর্তনে শুভফলই ফলিযা থাকে। এমন দেখা গিযাছে যে, এক জন অসৎ লোক মরণেব পব খুব শীঘ্র শীঘ্র ভাল হইযা উঠিল ; সাধাবণ শ্রেণীব মানব উচ্চতব ও প্রশস্ততব সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হইযা বসিল ; যে ব্যক্তি সৎ, তিনি হয তো মরণেব পব আবও ভাল হইয়া উঠিলেন, পূর্বাপেক্ষা হয তো আবও পবোপকাবী হইযা দাঁড়াইলেন।

একটি তৃপ্তিকর ঘটনা

একটি গল্প বলিব। গল্পটিতে উপরি-উক্ত কথাব প্রমাণ পাওয়া যাইবে। গল্পটি এই—দুইটি যুবতী অকস্মাৎ মৃত্যু-মুখে পড়িল। এক জনেব বযস ১৬, অপরেব ১৮। দুই জনই পার্থিব জীবনে বেশ

ভাল'ছিল। সৎ বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, তাহাদের পার্থিব জীবন সেইরূপই ছিল। বেশ কোমল-প্রকৃতি, স্নেহময়ী, সদভিলাষিণী। কিন্তু একটু সুখ্যাতি শুনিতে উহারা ভালভাসিত, আর একটু বেশভূষারও পক্ষপাতিনী ছিল। যুবতীরা প্রায়ই এরূপটি হইয়াও থাকে। জীবন কতই সুখী হইবে ভাবিতেছে, ভাবী জীবনের দিকে যতই আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গ উৎফুল্ল-প্রফুল্লভাবে চাহিতেছে, এমন সময় মৃত্যুর করাল ছায়া আসিয়া তাহাদের উপর পড়িল। এই আকস্মিক মরণে তাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, ভুবর্লোকের নবীন অবস্থার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতে প্রথম প্রথম তাহাদের একটু অসুবিধা হইতে লাগিল। কিন্তু এক দল অদৃশ্য সহায়কের সাহচর্যে তাহারা শীঘ্রই সেবাব্রতের উৎসাহে উৎসাহিনী হইয়া উঠিল। তখন পরোপকারে সম্পূর্ণভাবে প্রাণমন উৎসর্গ করিল। পূর্ণযৌবনে ঢল-ঢল লাবণ্যের মধ্যে এই আকস্মিক মরণটি হওয়ায় উহাদিগকে স্বভাবতঃ ভুবর্লোকে একটু দীর্ঘকাল থাকিতে হইল। কিন্তু ঐ সময়টা তাহারা পরোপকারে উৎসর্গ করিয়াছিল।

রমণী দুইটির পার্থিব আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে তাহাদের পারলৌকিক অবস্থা জানিতে না পারায় এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিল, "আহা, উহাবা বড় অল্পবয়সে মারা গেল, বাঁচিয়া থাকিলে উহারা কতই সুখী হইত। আহা! উহাদের বড়ই শোচনীয় মরণ হইয়াছে।" অথচ, প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা অপেক্ষা সুবিধাজনক মরণ আর হইতে পারে না। কেন না, ভূলোকে স্থূলদেহে উহারা বিংশতি বৎসরে যে পরোপকার করিতে পারিত, তদপেক্ষা অনেক অধিক কার্য এই উচ্চতর নবীন জীবনে মাত্র এক বৎসরমধ্যেই করিতে এখন সমর্থ। তদ্ভিন্ন পার্থিব জীবনে পার্থিব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কার্য-ফল যেরূপ হইবার কথা, তদপেক্ষা অনেক অধিক মহীয়ান্ ফল উহাদের কার্যে এখন ফলিতেছে। উহাদের কার্যক্ষেত্রও এখন খুব বেশী বস্তৃত। পার্থিব জীবনে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রও পাওয়া যায় না। পার্থিব জীবনে বাধা হইয়া উহাদিগকে নানা কার্যে সময় দিতে হইত। উহারা কতকটা সময় সৎকার্যে ও পর-সেবায় উৎসর্গ করিতে পারিত, সন্দেহ নাই ; কিন্তু তথাচ বাধ্য হইয়া অনেকটা সময় উহাদিগকে তুচ্ছকার্যে নষ্ট করিতে হইত। কারণ, ভূলোকে তুচ্ছ কার্যই খুব বেশী। এখন উহাদেব একটি মুহূর্তও নষ্ট হয় না। উহারা এখন মহোল্লাসে, স্ফূর্তির সহিত উন্নতির পথে ছুটিয়া বেড়ায়। এই নবীন জীবনে উহাদের ক্লান্তি নাই, কষ্ট নাই। কেন না, মুহূর্তের জন্যও উহারা এখন আপনাদের ভাবনা ভাবে না ; এখন কেবল পরের ভাবনাই ভাবে। শত শত ব্যক্তিকে কেমন করিয়া সাহায্য করিবে, কেমন করিয়া তাহাদের প্রাণে শান্তির সঞ্চার করিবে, উহাদের মনে এখন কেবল চিন্তাই জাগিতে থাকে।

অতএব দেখা গেল যে, ভুবর্লোকে প্রেতাত্মা অনেকটা আত্মোন্নতিসাধন করিয়া লইতে পারে। চিন্তা করিলে ইহা আমরা পূর্বে বুঝিতে পারিতাম ; কেন না, উন্নতিই ভাগ্যবতী ব্যবস্থার চিরন্তন বিধি। এতদ্বিধি অন্যত্রও যেরূপ, এখানেও সেইরূপ। আমাদের জ্ঞানের পরিপুষ্টির অনুপাতেই এখানে আমাদের উন্নতি হইয়া থাকে ; যে ব্যক্তি বাসনার দাস, বাসনা-ক্ষয় হইলে তাহার উন্নতি হইবে। ভুবর্লোকে বাসনা-পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে উহাই সর্বোৎকৃষ্ট বিধি, ইহাপেক্ষা সুন্দর ব্যবস্থা তথায় আর সম্ভবপর নহে। কিন্তু যিনি দয়াশীল ও পরোপকারী, তিনি সেখানে নানাবিধ কার্য করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন। তাই তাঁহার অভিজ্ঞতার গণ্ডীরও বহুদিক্ হইতে বর্ধিত হইয়া থাকে। তাঁহাকে যখন আবার এই ভূ-লোকে আসিয়া জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়, তখন তিনি এই নিঃস্বার্থভাবের অনুশীলন-ফলে অনেক অতিরিক্ত শক্তি ও গুণের অধিকারী হইয়া আইসেন।

আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ

পরলৌকিক জীবন সম্বন্ধে অনেকে সর্বদাই অনেক প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এই—"আমরা কি মৃত আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে ও চিনিত পারিব?" নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব, নিশ্চয়ই চিনিতে পারিব। কেন না, মরণের পর তাহাদের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না, আমাদেরও কোনপ্রকার রূপান্তর ঘটিবে না। তবে কেন তাহাদিগকে চিনিতে পারিব না। সূক্ষ্ম-জগতে গেলেই স্নেহ-ভালবাসা অন্তর্হিত হয় না। স্নেহ সেখানেও আছে। যাহাদের সহিত আমরা মায়া-ডোরে আবদ্ধ, মরণের পর তাহাদের সহিত একত্র হইয়া পড়ি। ঐ ভালবাসাই চুম্বক-ধর্ম্মী হইয়া আমাদিগকে সমবেত কবিয়া ফেলে। পার্থিব জীবনে মিলিত হইতে একটু বিলম্ব ঘটে, কিন্তু তথায় একত্র হইতে মুহূর্তও বিলম্ব লাগে না। কোন প্রাণ-প্রিয় আত্মীয় যদি আমাদের মৃত্যুর অনেক দিন পূর্বে মরিয়া থাকে, তবে বাস্তবিকপক্ষে সে হয় তো আমাদের মরণ-সময়ে ভুবর্লোক ত্যাগ করিয়া স্বর্লোকে যাইয়া উপনীত হইয়াছে। আমরা ভুবর্লোকে যাইয়া দেখি, সে তৎপূর্বেই হয় তো স্বর্লোকে চলিয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে যত দিন আমরা স্বর্লোকে না যাই, তত দিন তাহার সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ ঘটে না, প্রতীক্ষা করিতে হয়। পরে স্বর্লোকে যাইয়া তাহাকে দেখিতে পাই। এই পার্থিব দেহের কারাগৃহে আমরা তাহাকে যতটুকু দেখিয়াছিলাম, স্বর্লোকে তাহাকে তদপেক্ষা অনেক সুন্দর দেখিয়া থাকি। আমাদিগের যে সকল স্নেহভাজন ভালবাসার পাত্র মারা গিয়াছে, আমরা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে দেখিতে পাইব, এ কথাটি খাঁটি সত্য। আমরা তাদাদিগকে হারাই নাই।

মৃত্যু ব্যাপারটি একটি অধিকতর প্রশস্ত ও পূর্ণ জীবনে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ। যদি আমরা ঐটুকু বুঝিয়া রাখিতে পারি, তবে আত্মীয়-স্বজনের মরণ আমাদিগের নিকটে স্বতন্ত্র মূর্তিতে আসিয়া দাঁড়াইবে। তাহা হইলে কাহার বিবহ-যাতনা এত বেশী ও এরূপভাবে অনুভূত হইবে না। কেন না, প্রথমতঃ আমরা জানি যে, জীবাত্মাগুলির মধ্যে বিরহ-বিচ্ছেদ অসম্ভব। আমরা আত্মীয়ের জীবাত্মাকেই ভালবাসি, তাহার দেহটি মাত্র ভালবাসিবার জিনিস নহে। দেহটি তাহার বহিরাবরণমাত্র, আমরা মানুষটাকেই ভালবাসি, পোষাকটাকে নহে। উচ্চতর স্তরে মৃত আত্মীয়-স্বজনের সহিত দেখা ত হইয়াই থাকে, তাহার নিম্নস্তরেও যে আমাদের কাছে থাকে, আমরা তাহাও বুঝিতে পারি। মৃত আত্মীয়ের নিকট হইতে আমরা কখনই বিচ্ছিন্ন নহি। আমরা পৃথিবীতে বাঁচিয়া রহিয়াছি, আমাদের আত্মীয় মরিয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু তাহা নহে, সে সর্বদার জন্যই আমাদের নিকটে আছে। সে যে খুব দূরে নক্ষত্রনিকরেরও ও-পিঠে স্বর্গ-নামক একটা অজানা অনিশ্চিত স্থানে রহিয়াছে, তাহা নহে। সে এই পৃথিবীতেই আমাদের নিকটে আছে। আমরা যে ভাবনা ভাবিতেছি, তাহা সে সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছে। আমাদের মনে যে সকল চঞ্চল আবেগরাশি উদ্ভূত হইতেছে, অনেক সময় সে তাহা জানিতে পারিতেছে। আমরা প্রতি রাত্রিতেই নিদ্রাকালে তাহার সহিত মিলিত হইতেছি। যদি তাহার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই আমাদের মরণ হয়, তবে অনতিবিলম্বেই আমরা তাহাকে ভুবর্লোকে দেখিতে পাই। তাহার মৃত্যুর পরেও যদি আমরা অনেক দিন বাঁচিয়া থাকি, তবে মরণান্তে স্বর্লোকে তাহাকে দেখিতে পাইব। যদি স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন থাকে, তবে ভুবর্লোকেই হউক, আর স্বর্লোকেই হউক, এক স্থানে না এক স্থানে সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই ঘটিবে। কেন না, ভালবাসাই জাগতিক শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি। জীবনে মরণে উহার প্রভাব অপ্রতিহত।

তত্ত্ব-বিদ্যার পূর্ণ আলোচনায় আমাদিগের বাস্তবিক লাভ আছে। উহাতে আমরা প্রকৃত সত্য অবগত হইতে পারি। তাহার ফলে আমাদের মরণ-ভয় দূরে যায়, আর জীবনযাপন ব্যাপারও প্রীতিকর হইয়া উঠে। কেন না, তখন আমরা উহার উদ্দেশ্য ও পরিমাণ বুঝিতে পারি। যাঁহারা অকলঙ্ক নিঃস্বার্থ জীবন অতিবাহিত করেন, মৃত্যু তাঁহাদিগকে আনন্দই প্রদান করিয়া থাকে। লাটিন ভাষায় একটি প্রবচন আছে যে—"মৃত্যু জীবনের দ্বার।" কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বাস্তবিকই তাই। সত্যই উহা পূর্ণতর ও উচ্চতর জীবনের তোরণস্বরূপ। পরলোকেই হউক, আর ইহলোকেই হউক, একই ন্যায়সঙ্গত ঐশ নিয়ম সর্বত্র বিরাজ করিতেছে। আমরা ঐ ঐশ বিধির উপর সর্বত্রই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি। ঐ বিধির প্রভাব আমাদের উপরেও যেমন, আমাদের স্নেহ ভালবাসার পাত্রদিগের প্রতিও তদ্রূপ। জীবন অনন্ত ; উহার বিনাশ নাই। এই তথ্যটুকু একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই যাবতীয় ভুল ধারণা অপগত হইবে। তখন আমরা প্রত্যেক বিষয়টিকে যেরূপ ভাবে দেখা উচিত, সেইরূপ ভাবে আরম্ভ করিব। তখন আর মৃত্যুকে ভয়ঙ্করমূর্তি যমরাজ বলিয়া মনে করিব না, আমরা তখন তাহাকে ক্রমোন্নতির দিব্যকান্তি স্বর্গদূত বলিয়া বরণ করিয়া লইব। কেন না, আমরা জানি যে,—

"জীর্ণ বাস পরিহরি, নব বাস অঙ্গে ধরি,
কতই আনন্দ পাই মনে।
সেইরূপ স্থূলদেহ, রক্ত-মাংস-মজ্জা-গেহ,
ত্যজি যাই নূতন সদনে ॥"

ভগবদ্‌গীতা।

— ——— —

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রেত-মূর্তিটি দেখা দেওয়া

পরাবিদ্যা-সমিতিব ও প্রেতানুসন্ধান-সমিতিব অনুসন্ধান-ফলে আজকাল ভূত-প্রেতেব অনেক ব্যাপার জানা যাইতেছে। কিছু দিন আগে লোকে ভূতে বিশ্বাস কবিত না। যাহাবা ভূতে বিশ্বাস করিত, লোকে তাহাদিগকে ঘোব অজ্ঞান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভাবিত। ভূত-বিশ্বাসীবা প্রায়ই উপহাসের আস্পদ ছিল। কিন্তু এখন আর উপহাস করিলে চলে না। এখন ভূত সম্বন্ধে খোঁজ-খবরের ধূম পডিয়া গিয়াছে। ভাল ভাল জগৎপ্রথিত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা খাঁটি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভূতের তত্ত্ব-তল্লাস সংগ্রহ কবিতেছেন। এ যাবৎ বিস্তব লোক ভূত দেখিয়াছে, কিন্তু যাহাবা দেখিয়াছে, তাহাবা প্রাযই দেখাব সময ভযে কেমন একরূপ জডসড় হইয়া পডিয়াছিল ; তাই তাহাদেব কথা অনেক সময ঠিক ঠিক বিশ্বাস কবা চলে না। সবগুলি বিশ্বাস না কবিলেও অনেকগুলিবই যে খাঁটি সত্য, সে বিষযে সন্দেহ নাই। ভূতেব গল্পগুলি একটু এলোমেলো হইলেও একটু চেষ্টা কবিয়া বুঝিলে উহাদেব মধ্যে একটা শৃঙ্খলা—একটা সামঞ্জস্য পাওযা যায়।

পবাবিদ্যা-সমিতি বলেন যে, আমবা এই স্থূল-শবীবেই সূক্ষ্ম-জগতের বিষয অবগত হইতে পাবি তাহা হইলে ভূতেব খোঁজখবব ঠিক পাইবাব আশা আমাদেব প্রাণে নিশ্চয়ই আসিতে পারে। আমবা কযেকটি ভূতেব গল্প পডিব। মৃত্যুব পব মানুষেব অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায, সে সব কথা ঐ গল্পে অনেকটা বুঝা যাইবে। পবাবিদ্যা সূক্ষ্ম-জগতেব অনেক সংবাদ দেয। পবাবিদ্যাব্রিৎ লেড্‌বিটাব সাহেব বলেন যে, ভূতেব কাহিনীগুলি একটু প্রণিধান কবিয়া দেখিলে সূক্ষ্ম-জগতের অনেক কথাই অনুমান কবিযা লওযা যায। হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম যাঁহাবা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাবা সহজেই বুঝিতে পাবেন যেও, পবাবিদ্যা-প্রদত্ত বিববণ একটুও মিথ্যা নহে। পরাবিদ্যা ছাড়া ধর্মমতে পবলোক সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রচাবিত হইযাছে, সেগুলি ভুল। প্রেত-দর্শনেব বিস্তর সত্য বিববণ লিপিবদ্ধ আছে। সেই বিববণেব কযেকটা আমবা এখানে বলিব। যে গল্পগুলি বলিব, তাহা অতীব সুস্পষ্ট ও সত্য। কযেকটা স্থলে যতটা বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা উচিত ছিল, তাহা ঘটে নাই। এখন সেই বিশেষ তথ্যগুলি জানিবাবও উপায নাই।

ভূতযোনি সম্বন্ধে বিস্তর গল্প আছে। গল্পগুলি খুব বেশী বকম অতিবঞ্জিত, হঠাৎ যেন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যাঁহাবা পবাবিদ্যার গূঢ বহস্যেব আলোচনা কবিযা থাকেন, তাঁহাবা উহার মধ্য হইতেই প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিযা লযেন , কোনটুকু সত্য, কোননটুকু মিথ্যা, তা বেশ বুঝিতে পাবেন। অনেক সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকায বেশ নামজাদা লোকেবাও অনেক ভূতের গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি এত বাডিযে লেখা, যেন অসম্ভব বলিযা বোধ হয়, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। বডই দুঃখেব বিষয, যাঁহাবা লিখিযাছেন তাঁহাবা প্রকৃত ব্যাপাবটা জানিবার জন্য একটুও কষ্ট-স্বীকাব কবেন নাই। যদি সত্য ব্যাপাবটা তাঁহাবা লিখিতেন, তবে তাঁহাদেব লিখিত গল্পগুলি আরও চিত্তাকর্ষক হইত, লোক আবও আগ্রহ কবিয়া পডিত।

যতগুলি ভূতের গল্প লিপিবদ্ধ আছে, সেগুলির মধ্যে প্রায়ই অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য। আবার অনুসন্ধান করিলেও অনেকগুলির এখন প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব। তথাচ গল্পগুলি মূলতঃ সত্য বলিয়াই মনে হয়। কেন না, একই ধরণের বিস্তর গল্প শুনা যায়। আর অনেকগুলি যে সত্য, তাব প্রমাণও পাওয়া গিযাছে। আমাদের বিশ্বাস এতই সত্যমূলক, এতই প্রমাণ-বাহুল্যে দৃঢ়ীকৃত যে, একটা আধটা গল্প মিথ্যা হইলেও তাহাকে কিছু আসিয়া যায় না। আমরা যে গল্পগুলি বলিব, সেগুলি সংক্ষেপেই বলিব, বিশেষ বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ; কেন না, তাহাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটান আমাদের ইচ্ছা নহে।

ভূতের গল্পের আমাদের অভাব নাই। বরং এত বেশী গল্প আমাদের জানা আছে যে, কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি বলিব, তাহার নির্বাচন করাই আমাদের পক্ষে কঠিন। গল্পগুলি এতই অদ্ভুত যে, তাহার পরীক্ষা করিয়া উঠাই মহা দুরূহ ব্যাপার। সূক্ষ্ম-জগতের ব্যাপাব জানিবার জন্য অনুসন্ধানসমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপক সিজ্ উইক্ যথার্থই বলিয়া ছিলেন যে, সক্ষ্ম-জগতের বাস্তব ব্যাপার এ পর্যন্ত উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে, ইহা বড়ই লজ্জার কথা। সূক্ষ্ম-জগতের ঘটনাপুঞ্জ খুব সত্য। সেগুলি এতই দুর্বোধ্য যে, সম্যক্‌ভাবে বুঝিয়া উঠা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ঠিক একই রকমের অনেকগুলি ভৌতিক ব্যাপার একাল-সেকাল ঘটিয়া আসিতেছে মনে হয়। সেগুলির মধ্যে একটু একটু পার্থক্য আছে।

যাহাদের চক্ষুতে ঐ রকম ভৌতিক ব্যাপার পড়ে, তাহারা সাধাবণতঃ ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া উঠে। তাই তাহাবা ভূতেব ব্যক্তিগত ভাবটাই দেখিযাছে, তাহারা বৈজ্ঞানিক হিসাবে উহার পরীক্ষা কবিবার সুবিধা পায নাই। বৈজ্ঞানিক হিসাবে দেখিলে হয় তো অনেক তথ্য জানা যাইত। ভয-বিহ্বল হওযায় যে সব তত্ত্ব অপরিজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। যাহারা কখন ভূত-যোনির আলোচনা করে নাই, ভূতের কি জানিতে হইবে না হইবে, তাহা তাহারা আদৌ জানে না। আবার যাহারা ভূত দেখিবার জন্য খুব বেশী ইচ্ছুক, ভূত তাহাদিগকে বড় একটা দেখা দেয় না। এইরূপে প্রকৃত ব্যাপার না জানার পারলৌকিক ব্যাপার অনেকের কাছে ভয়ানক এলোমেলো বলিয়া বোধ হয়। তাই কোন্‌টা প্রকৃত ভূত, আর কোন্‌টাই বা স্থূলদেহধারী সূক্ষ্মমূর্তি, তাহা জানিতে অনেকে চেষ্টাও কবে না। সূক্ষ্ম-জগতে ভূত-যোনির মত চিন্তা-মূর্তি প্রভৃতি অনেক বকম মূর্তি বিচরণ করিয়া থাকে। কোন্‌টা কিরূপ মূর্তি, তাহা জানা আবশ্যক।

আমরা পরে সে সব বিষয়ের কিছু কিছু পরিচয় দিব। মানুষ স্থূলশরীরী, অথচ তাহার সূক্ষ্ম-দেহ স্থূল-শরীর ছাড়িয়া বিচরণ কবিতে পারে, আমরা সেই অদ্ভুত ব্যাপারটাই প্রথমে আলোচনা করিব। আমাদের এ দেহ হইতে অল্পসময়ে জন্য কোন কোন সময একটি সূক্ষ্মদেহ বাহির হইযা অন্যত্র বিচবণ করে ; এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমরা অতি সহজে এ কথা বুঝিতে পারিব যে, মরণকালে চিরদিনেব জন্য এই স্থূল-দেহ বিনষ্ট হইলেও একটা সূক্ষ্ম-দেহ-ধাবী জীবাত্মা বর্তমান থাকা অসম্ভব নহে , পরন্তু, থাকাই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই বলিতেছিলাম, আমরা প্রথমেই আমাদের প্রেতমূর্তিটা বহির্গমন-বিষয় আলোচনা করিব ম্যাডাম্ ডিএস্‌পাব্যান্স নাম্নী বমণী এক জন খুব ভাল মিডিয়ম্ ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার উপর খুব শীঘ্র শীঘ্র ভূতযোনির আবেশ হইত। এই স্ত্রীলোকটি নিজের জীবন-চরিত নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানির নাম "ছায়া-রাজ্য।" এই পুস্তকের ৩৫৫ পৃষ্ঠায় একটি অদ্ভুত ব্যাপার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। জীবিতকালেই ইহার প্রেত-মূর্তি এক দিন স্থূল-শরীব ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বিচরণ করিতে ছিল, সেই বিস্ময়কর ব্যাপাব তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি এইরূপ বলিযাছেন ঃ—

সূক্ষ্ম-জগতের প্রথম আভাস

"গ্রীষ্মকাল। রবিবারের প্রাতঃকালে এক দিন আকাশ বেশ নির্মল। দিব্য ফুটফুটে রৌদ্র। আমি একখানি বই লইয়া সোফায় বসিয়া পড়িতে বসিয়াছিলাম। বইখানি আমার হাতে ছিল বটে, কিন্তু মনটা আমার বিষয়ান্তবে পবিভ্রমণ করিতেছিল। কাজেই কেমন একরূপ তন্দ্রার ভাবে আমি আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। ক্রমে পুস্তকেব অক্ষরগুলি যেন চোখের সম্মুখে অস্পষ্ট হইতে লাগিল। যেন কেমন একটা মূর্ছার ভাব আসিয়া পড়িল। চারিদিক যেন আমার আঁধারে ঘিরিয়া ফেলিল—আমার মনে হইতে লাগিল, আমি আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলাম। অন্যকে এ সময় ডাকিতে আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও বেশ মনে হইতে লাগিল যে, তখন সে স্থানে কোন লোক ছিল না। অল্পসময়ের মধ্যেই আমার সেই মূর্ছার ভাবটা অপসারিত হইল। কাহাকেও ডাকিয়া হাঁকিয়া জ্বালাতন করিতে হইল না ভাবিয়া মনে মনে একটা আনন্দও হইল। আবার বাহির দিকে চাহিলাম। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার! বহিখানি খুব দূরে আর অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি আগেই সোফা হইতে উঠিযা গিয়াছিলাম। কিন্তু আমার স্থানে আব এক ব্যক্তি বহি হাতে করিয়া বসিয়াছিল। ভাবিলাম, লোকটা কে? তখন সেই অবস্থায় আমি বড়ই আরাম বোধ করিতেছিলাম। শবীর অতি চমৎকার হাল্‌কা আব বেশ সবল। মূর্চ্ছার ভাব গিয়াছে আব সেই সঙ্গে সঙ্গে কেমন এক রূপ বিস্ময়কর স্বাস্থ্য ও শক্তিব অনুভূতি আমাকে যেন ভরপুব করিয়া বাখিয়াছে। এমন সুন্দর সুখানুভূতি তাহার পূর্বে আমার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই।

"আমার দেহটাব মধ্যে যেন জীবন জিনিসটি জাগিয়া উঠিতেছিল। আমার শিবার মধ্যে যেন জীবন স্ফুবিত হইয়া, উচ্ছলিত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেহটার সর্বাংশেই একটা নবীন শক্তি, একটা চমৎকার মুক্তভাবের অনুভূতি যেন তড়িত-গতিতে ছড়াইয়া পড়িল। বাঁচিয়া থাকার প্রকৃত আস্বাদটা আমি যেন সেই দিনই প্রথম উপভোগ করিলাম।

"আমাব সেই ঘরটিকে অদ্ভুত বলিযা বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যে, ঘরটি খুব ক্ষুদ্র, ভয়ানক রুদ্ধ, বিশ্রী অন্ধকার। আর ভাবিতে লাগিলাম, সোফাব উপরিস্থ ঐ অস্পষ্ট মূর্তিটিই বা কে? মূর্তিটি স্ত্রীলোকের, কিন্তু কে? মূর্তিটি নীরবে স্থিব হইয়া বসিয়া আছে। কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমি উহাকে একটু একটু চিনি। তখন আমার প্রাণে একটু মুক্তভাবের হাওয়া লাগিয়াছিল। সেই ভাবই আমার বড ভাল লাগিতেছিল। তাই আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু যাই কোথায়? জানলাব কাছে গেলাম। অদ্ভুত! আমার চারিদিকেব সব জিনিসপত্রই অস্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, দেওয়ালগুলি আমাব নিকট ধরিয়া আসিতেছে, আবার তখনই অন্তর্হিত হইয়া গেল। কিন্তু কোথায় যে গেল, জানি না।"

আমাদেব স্থূল-শরীর ত্যাগ করিয়া যখন জীবাত্মা বাহিরে চলিযা যায, তখন তাহার ভারি স্ফূর্তি। তখন সে চমৎকার স্বাস্থ্য ও শক্তি অনুভব করে। তাহার মনে হয়, যেন এক ভয়ানক বোঝা তাহার ঘাড়ের উপর হইতে সরিয়া গিয়াছে। জীবাত্মা তখন নিজেকে খুব হাল্‌কা মনে করে, খুব চমৎকার একটা আরাম অনুভব করে। লেড্‌বিটার প্রভৃতি অনেক যোগীই এই অবস্থা পরিজ্ঞাত আছেন। মরণের সময় রুগ্ন দেহ ত্যাগ করিলে জীবাত্মার এই আরাম-বোধ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। এমন কি, সুস্থ দেহ ত্যাগ করিলেও এরূপ আরাম বোধ হয়। স্থূল-দেহটা আত্মার পক্ষে একটা ভয়ানক ভার-স্বরূপ। যোগীরা ইচ্ছা করিলেই স্থূল-শরীর খানিকটা সময়ের জন্য

ত্যাগ করিয়া ঐরূপ চমৎকার মুক্তভাব উপভোগ করিতে পারেন। তাঁহাদিগের পক্ষে এটি খুব সহজ ও দৈনন্দিন ব্যাপাব। কযেদীকে অন্ধকার হইতে ফুটফুটে আলোতে আনিলে তাহার যেমন আনন্দ হয়, দুর্বল সসীম অবস্থা হইতে সবল বিবাট অবস্থায় আসিলে যেমন আনন্দ হয়, স্থূল-জগতেব উন্নততব জীবনে আরূঢ় হইলে প্রাণে সেইরূপ আনন্দের সঞ্চার হইযা থাকে।

জীবিত ব্যক্তির প্রেতদেহে পরিভ্রমণ

মিঃ আব, ডি, আইযেন্ "অপর জগতের দ্বারদেশে" নামক পুস্তকেব ২৫৬ পৃষ্ঠায় সূক্ষ্মদেহে পরিভ্রমণের একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যিনি পরিভ্রমণ কবিয়াছিলেন ও যাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, এই দুই ব্যক্তিরই বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পরে মিলাইয়া দেখা গিয়াছে। যিনি প্রেত-দেহে বিচরণ কবিতেন, তিনি এক জন স্ত্রীলোক। বাত্রিকালে স্বামীর কাছে শুইয়া থাকিতে থাকিতে উহার সূক্ষ্মমূর্তি স্থূল-শরীর হইতে সূক্ষ্ম জড়াংশ আকর্ষণ করিয়া লইয়া একটি দেহ রচনা কবিত। তাহার পরে তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইযা দূববর্তী কোন স্থানে যাইয়া অন্য একটি আত্মীয়ার সহিত কথাবার্তা কহিতেন। যাইবাব সময ইঁহাব মনে হইত যে, ইনি মাবা গিযাছেন ; কিন্তু রাত্রিশেষে যখন আবার স্থূল-শরীরে প্রবেশ কবিতেন, তখন বুঝিতে পাবিতেন যে, মরি নাই, সত্য সত্যই বাঁচিয়া আছি। এই সূক্ষ্মদেহ অনায়াসে স্থূল দেওয়াল প্রভৃতিব ভিতর দিযা যাতায়াত করিতে পারিত, কোন প্রকাব অসুবিধা ঘটিত না। ইহাতে তাঁহার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সূক্ষ্মদেহে চলিয়া যাওযা আবার ফিবিয়া আসা, এ সব ব্যাপাব বমণীর মনে থাকিত না ; কারণ, এই সব ব্যাপাব কালে অনেকটা জ্ঞানেব লোপ ঘটিত।

স্ত্রীলোকটির প্রেতমূর্তি এইরূপে নিশাভ্রমণ কবিত। বিশেষ উদ্দেশ্যেই প্রেতমূর্তিরা এইরূপে নিষ্ক্রান্ত হইযা থাকে। একটু অনুসন্ধান কবিলেই সে উদ্দেশ্য স্থিব করা যায। এ ক্ষেত্রেও নিশ্চযই কোন একটা উদ্দেশ্য ছিল।

পোস্ত-গাছ

লেড্‌বিটারেব এক জন অল্পবযস্ক বন্ধু তাঁহাকে এইরূপ একখানি পত্র লিখিযাছিলেন—"প্রায় সপ্তাহকাল হইল, মাতা পিতা উভযেই অন্যত্র গিযাছিলেন। এক দিন জি-নাম্নী আমাব ছোট ভগিনীব অসুখ হইযা পড়ে। অসুখেব সময দেখা গেল, বাত্রিকালে জি কাঁপিয়া কাঁপিযা উঠিতে লাগিল। আব দেখা গেল, বিছানাব চাদব দিব্য পবিষ্কার-পবিচ্ছন্নভাবে কে যেন পাতিয়া মুড়িযা দিযা গিযাছে। জি যখন শুইয়াছিল, তখন চাদব এরূপ সুন্দব পাতা ছিল না, অথচ বাত্রিব শেষে দেখা গেল, চাদবখানি অতি সুন্দবভাবে পাতা। পর পর তিন বাত্রি ধবিযা এইরূপ ব্যাপাব হইতে লাগিল। তৃতীয বাত্রিব শেষে হঠাৎ ঘুম ভাঙিযা গেল, জি দেখিল, মা তাহাব বিছানায বসিয়া আছে। একটু পবেই সেই মাতৃ-মূর্তি উঠিযা ঘব হইতে বাহিব হইয়া গেল।ঐ বাত্রিতে বিশ্রী ঝড হইয়াছিল। সেই ঝড়ে পোস্ত-গাছগুলি ভূমিসাৎ হয়। গাছগুলি পিতা বাড়ীব সম্মুখস্থ বাগানে রোপণ কবিযাছিলেন। কিছু দিন পবে মা বাড়ী আসিলে তাঁহাব মুখে শুনিলাম যে, তিনি সেই বিদেশে পব পব তিন-বাত্রি ধবিযা 'জি'কে স্বপ্নে দেখিযাছেন। তিনি দেখিতেন, যেন তিনি 'জি'ব বিছানা পরিষ্কার কবিযা দিতেছেন। তিনি বলিলেন, তৃতীয বাত্রিতে তিনি যেন ঘব হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন আর গাছগুলিকে ধবাশাযী দেখিযা দুঃখিত হইয়া বলিতেছেন যে, 'আহা,

এমন কবিয়াও গাছগুলি পডিয়া গিয়াছে।' এ কথাগুলি যেন তাঁহাব এখনও মনে জাগিতেছে। মা বলিলেন, বাড়ীব দরজা খোলা ছিল, এখনও তাঁহার সে কথা মনে আছে।

এই ব্যাপাবটিতে আমাদেব মনে হয়, স্নেহবশতঃই মায়েব সূক্ষ্ম-মূর্তি নিষ্ক্রান্ত হইযাছিল। মা বিদেশে থাকিয়া স্বভাবতঃই সন্তানেব অসুখ বুঝিতে পারিযাছিলেন। তাই সন্তানকে যত্ন-শুশ্রূষা করিবার জন্য সূক্ষ্ম-মূর্তি তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইযাছিল আব বিছানা জুতববাত কবিয়া দিতোছিল। তৃতীয় বাত্রিতে ঐ মূর্তি সূক্ষ্ম জডাংশ সংগ্রহ কবিযা অল্প একটু স্থূলভাব ধারণ কবিয়াছিল। তাই 'জি' নাম্নী কন্যা তাঁহাকে স্থূলচক্ষুতে দেখিতে পায। সূক্ষ্ম-মূর্তি গাছগুলি দেখিয়া একটু দুঃখ কবিযাছিল, দবওযাজা খোলার কথা মনে কবিযা বাখিযাছিল। এ সব ব্যাপাবে প্রেত-মূর্তি যথার্থ আসিবারপ কথাই প্রমাণিত হয।

কাহারও কাহারও দিব্যদৃষ্টির শক্তি সহজেই স্ফুবিত হয। আবাব কাহাবও কাহারও ঐ শক্তি গভীবভাবে অন্তর্নিহিত থাকে। উপবি-উক্ত স্ত্রীলোক দুইটির শক্তি খুব অল্পেই প্রকাশ পাইবাব মত ছিল। যাহাদেব শক্তি অন্তর্নিহিত, বিশেষ বিপদেব সম্ভবনাস্থলে তাহাদেব সেই শক্তি জাগিয়া উঠে, কিংবা খুব একটা অভাবেব সময়েও উহা জাগিযা থাকে।

অচৈতন্য অবস্থায সাহায্যের অন্বেষণ

স্থূল-শবীব মূর্ছিত হইযা বহিযাছে অথচ সূক্ষ্ম-দেহটা স্থানান্তবে যাইযা অপবেব সাহায্যে প্রার্থনা কবিতেছে, এরূপ ঘটনা বিস্তব শুনিতে পাওযা যায। ডাক্তাব "ল" নামক এক ব্যক্তি "দৃশ্য ও ছাযা" নামক পুস্তকেব ৮৮ পৃষ্ঠায এইরূপ ভাবেব একটি গল্প লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। গল্পটি এইরূপ ঃ— বিলাতেব অক্সফোর্ড প্রদেশে দুই জন পুবোহিত ছিলেন, এক জনেব নাম ডব্‌লিউ, অপবেব নাম—পি। দুই জনে এক কলেজে পডাশুনা কবিযাছিলেন। ডব্‌লিউ অক্সফোর্ড শহবেই থাকিতেন, কিন্তু "পি" ১৮ মাইল দূবে অবস্থান কবিতেন। এক দিন বাত্রিকালে ডব্‌লিউ একটা দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। ঘুম ভাঙিলেও স্বপ্নটি মন হইতে মুছিযা গেল না, খুব সুস্পষ্টভাবে মনে জাগিতেই লাগিল। শুধু তাহাই নহে, এক বাত্রিব মধ্যেই স্বপ্নটি দুইবার দেখা গেল। ডব্‌লিউ স্বপ্ন দেখিলেন যে, "পি" যেন খুব ভীত হইযা তাঁহাব কাছে আসিয়া বলিতেছে, "ভাই আমাকে জীবিত অবস্থায লোকে কবব দিচ্ছে।' বাত্রি প্রভাত হইলে প্রাতভোজনেব পব ডব্‌লিউ একখানি চেযাবে বসিযা আছেন, এমন সময শুনিতে পাইলেন, কে যেন দবওযাজায একটি মৃদু আঘাত কবিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ভিতরে এস।" যাই বলা, অমনই দবজা খুলিযা গেল, কে এক জন যেন ঘবে ঢুকিযা পডিল। ডব্‌লিউ মনে কবিলেন, হয তো এক জন চাকর এসেছে। পবে তাঁহাব কানেব কাছে কে যেন ফিস্-ফিস কবিযা বলিযা উঠিল—"ডব্‌লিউ, আমাকে ভাই সজীব অবস্থায কবব দিতে যাইতেছে।" এই কথাগুলি শুনিবামাত্র ডব্‌লিউ চমকিত হইযা উটিলেন, কেন না, কথাগুলি তাঁহার বন্ধু "পি"ব কণ্ঠস্বরে উচ্চাবিত হইয়াছিল। ডব্‌লিউ ঘরেব মধ্যে চাবিদিকে চাহিযা দেখিলেন, ঘবে চাকব বা অন্য কেহই নাই। তখন তিনি তাড়াতাডি বাহিবে আসিলেন। আসিযা দেখিলেন, তাঁহাব কাছ দিযা কতকগুলি লোক একটা মডাব বাক্স লইয়া যাইতেছে। বাক্সটা এরূপভাবে আঁটা, যেন উহাব মধ্যে মডা আছে। ডব্‌লিউ লোকগুলিকে বলিলেন—'বাক্সটা খোল।" তাহাবা কিছুতেই খুলিতে চাহে না। তখন ডব্‌লিউর মনে ঘোব সন্দেহ হইল। তিনি জববদস্তী কবিয়া বাক্স খোলাইলেন। দেখিলেন, তাহার মধ্যে

"পি"র দেহ অসাড় অবস্থায় আবদ্ধ। তখন তিনি দেহটিকে বাহিব কবিযা যত্ন ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই দেহে জ্ঞানে সঞ্চার হইয়া উঠিল। স্বেদ-তাপের প্রভাবে কয়েক দিনের মধ্যেই 'পি' সুস্থ হইযা উঠিলেন। ইহাব পব তিনি আরও নয় বৎসব বাঁচিয়াছিলেন।

মানুষ ঘুমাইয়া থাকিলে তাহার জীবাত্মা স্থূল-শরীরের জড়ভাব কতকটা অতিক্রম করিয়া সূক্ষ্ম-জগতে মিশিবার উপযোগী হয়। তাই ডব্‌লিউব নিদ্রিত অবস্থায় "পি"র প্রেতাত্মা আসিয়া নিজেব বিপদের কথা প্রথমে জানাইয়াছিল , কিন্তু যখন তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না, ডব্‌লিউ স্বপ্নের ব্যাপাব বলিয়া ""পি"র জন্য যখন বিশেষ কিছু করিলেন না, অথচ "পি" বিপদ ক্রমেই ভযানক হইতে চলিল, তখন আব "পি"ব প্রেতাত্মা স্থিব থাকিতে পাবিল না, তখন সেই প্রেতাত্মা বিপদে বাধ্য হইয়া কতকটা স্থূলভাব ধারণ করিয়া ডব্‌লিউব কাছে যাইয়া মানুষেব গলায় কথা বলিল আব নিজেব বিপদের সংবাদটা দিয়া আসিল। কাজে কাজেই তখন ডব্‌লিউ বন্ধুর দশা স্মবণ কবিয়া আকুল হইযা উঠিলেন। এরূপ ভাবেব বিস্তর গল্প আমাদের জানা আছে। কিন্তু মধ্যে হইতে আমবা একটা অতি অদ্ভুত বকমেব গল্প বলিব। মিঃ ববার্ট ডেল্ আউয়েল "সূক্ষ্ম-জগতেব দ্বাব-দেশে" নামক গ্রন্থে ২৪২ পৃষ্ঠায সেই গল্পটি লিপিবদ্ধ কবিযাছেন, গল্পটি আমবা যথাযথ উদ্‌ধৃত করিতেছি। কাবণ, ব্যাপাবটা বডই অদ্ভুত । গল্পটি এই—

"উত্তর-পশ্চিম মুখে জাহাজ চালাও"

একখানি বাণিজ্য-পোত লিভাবপুল, সেন্টজন্, নিউব্রন্সউইক্ প্রভৃতি স্থানগুলিব মধ্যে যাতাযাত কবিত। মিঃ ববার্ট ব্রুস এই জাহাজের প্রধান মালিক। একবাব জাহাজখানি প্রায ৫/৬ সপ্তাহকাল কূলত্যাগ করিযা ভাসিয়াছে ; পণ্যদ্রব্য বুকে কবিযা পশ্চিমাভিমুখে চলিযাছে, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড নামক স্থলভাগের পূর্ব-উপকূল নিকটবর্তী হইযা আসিতেছে, এমন সময ববার্ট ও কাপ্তেন একদিন দুপুর-বেলায় জাহাজেব পাটাতনেব উপব দাঁড়াইয়া সূর্যেব গতিবিধি পর্যবেক্ষণ কবিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পবেই তাঁহাবা জাহাজ-পবিচালন-সংক্রান্ত কার্যেব জন্য পাটাতন হইতে নামিলেন। ভাবিলেন কামবাব যাইযা লেখাপডি কবি।

কামরাটি খুব ছোট, জাহাজেব পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত। কামবাটিব কাছেই অবতবণ কবিবাব সিঁড়ি, সিঁড়ির কাছে অল্প একটু চতুষ্ক আকাবে অবতবণস্থান , তাহারই কাছে ঐ মালিমেব একটা ছোট ঘর। এই ঘবটি কামবাব ঠিক সম্মুখে। কামবা ও মালিমেব ঘব ঠিক যেন ঋজু ঋজু ভাবে অবস্থিত। মালিমের ঘবেব দবজাব কাছে একটি ডেস্ক্ ছিল। সে স্থানটিতে বসিলে কামবাব ভিতব পর্যন্ত নজব চলে।

পাটাতন হইতে নামিযা আসিযা মিঃ ববার্ট তাঁহাব ঘবে বসিযা খুব মনোযোগেব সঙ্গে জাহাজেব গতিবিধির হিসাব-নিকাশ কবিতেছিলেন। হিসাব ভুল হইতেছিল বলিযা সমস্ত মনোযোগটুকু সেই দিকেই ছিল। অধ্যক্ষ নামিযা আসিযা কোথায গেলেন না গেলেন, সে দিকে তাঁহাব লক্ষ্য ছিল না। গণনা ঠিক হইবার পব ববার্ট ওদিকে না চাহিয়াই বলিযা উঠিলেন যে, "কোন্ দিকে জাহাজ যাইতেছে, এতক্ষণে তাহা ঠিক কবিতে পাবিযাছে। কেমন, আমাব গণনা ঠিক হয় নাই কি? মহাশয! আপনাব গণনা কিরূপ হইল?"

মিঃ রবার্ট অধ্যক্ষকে উদ্দেশ্য কবিযা ঐরূপ প্রশ্ন কবিযাছলেন , কিন্তু কোন উত্তব না পাইযা

আবার ঐ কথাগুলি বলিলেন। এবার বলিবার সময় মুখটা উঁচু করিয়া অধ্যক্ষেব কামরার দিকে একটু চাহিলেন। দেখিলেন, অধ্যক্ষ যেন নিবিষ্টচিত্ত হইয়া শ্লেটে কি লিখিতেছেন। ববার্ট এবারও কোন উত্তর পাইলেন না। কাজে কাজেই তখন তিনি অধ্যক্ষেব কামরায় গিয়া দাঁড়াইলেন ; যে লোকটা বসিয়া লিখিতেছিল, সে অধ্যক্ষ নহে, এক জন সম্পূর্ণ অপিবিচিত ব্যক্তি। সে ব্যক্তিও মাথা তুলিয়া ববার্টকে একবার দেখিল। অধ্যক্ষেব কামরার মধ্যে এক জন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া রবার্ট খুবই বিস্মিত হইলেন।

সেই অপরিচিত ব্যক্তিকে রবার্ট আর কোন দিন কোন স্থানে দেখেন নাই। একেবারে ঘোর অপরিচিত। তাহা ছাড়া কেমন এক রকম নীরব অথচ অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তি রবার্টেব দিকে চাহিতে লাগিল। রবার্টের মনে কেমন একরূপ ভয় জন্মিল। তিনি দ্রুতবেগে ব্যস্ত-সমস্ত হইযা পাটাতনের উপরে যাইয়া হাজিব। অধ্যক্ষ তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, "ববার্ট। ব্যাপারখানা কি? তুমি এমন ভাবে আসিলে কেন?"

"ব্যাপাবখানা, মহাশয়? আপনার ডেস্কে বসিয়া লিখ্‌ছে ও ব্যক্তি কে?"

"কই, আমি তো কাহাবও কথা জানি না!"

"মহাশয়, সত্যই কে এক জন লিখ্‌ছে। লোকটা অপবিচিত।"

"অপবিচিত। কেন হে, তুমি কি স্বপ্ন দেখেছ? হয তো কর্মাধ্যক্ষকে কিম্বা তোমাব সহকাবীকে দেখিযা থাকিবে। নচেৎ, বিনা অনুমতিতে আমাব কামবায় আর কে সাহস করিযা প্রবেশ করিতে পারে?"

"কিন্তু মহাশয়, লোকটি আপনাব চেয়াবে বসিথা প্লেটের উপবে লিখিতেছে, আমাব দিকে মুখ তুলিযা স্পষ্ট করিয়া চাহিল। আমি তাহাকে খুব ভাল কবিয়াই দেখিযাছি।"

"তাহাকে। কাহাকে?"

"ঈশ্বব জানেন, মহাশয , আমি চিনি না। দেখিলাম, একটা লোক , আর লোকটাকে কখনও দেখি নাই।"

"মিঃ ব্রুস, তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। অপবিচিত ব্যক্তিব কথা কি কহিতেছ। আমবা প্রায দেড মাস সমুদ্রেব উপব আছি, অপবিচিত ব্যক্তি কি করিযা এখানে আসিতে পারে?"

"তাহা' ত জানি, মহাশয , কিন্তু আমি যে স্ব-চক্ষে দেখিলাম।"

"নীচে যাও, ভাল করিযা দেখ লোকটা কে?"

নীচে আসিতে ব্রুসের পা সরিল না। তিনি বলিলেন- -"মহাশয়, আমি কোন দিনই ভূত মানি না , কিন্তু আজ আমার একা নীচে যাইতে সাহস হইতেছে না।"

"থাম, থাম। মাঝি-মাল্লাদের কাছে আর পাগ্‌লামী কবিত না। এখনই নীচে যাইয়া দেখ।"

ব্রুস ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেলেন—বলিলেন, "আমি ববাববই আপনার আদেশ পালন করিযা আসিতেছি , কিন্তু আজকাল ব্যাপাবটা অন্য বকম, আ— আপনিও চলুন, দু'জনে একসঙ্গেই যাই।"

অধ্যক্ষ নামিলেন। মালিমও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আসিয়া দেখিলেন, কামরায় কেহ নাই। তাঁহারা ঘবগুলি খুব ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন। কিন্তু কোথাও কেহ নাই!

অধ্যক্ষ বলিলেন—"কই, কেহই তো নাই। মিঃ ব্রুস, তাই বলিতেছিলাম যে, তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছ।"

"মহাশয়। এখন তো তাই বলিবেন! আমি দিব্য করিযা বলিতেছি যে, বাস্তবিকই একটা

লোককে শ্লেটে লিখিতে দেখিযাছি। যদি আমি মিথ্যা কথা বলি, তবে যেন আর আমি পুত্র-কলত্র না দেখি—এই দিব্য করিলাম।"

"আঁ্যা শ্লেটে লিখছিল! তা, হ'লে শ্লেটে নিশ্চযই লেখাটা আছে!"—এই বলিযা অধ্যক্ষ শ্লেটখানি তুলিলেন।

তিনি বিস্মিত হইযা বলিয়া উঠিলেন—"এই যে, কি লেখা বহিয়াছে! মিঃ ব্রুস! এ লেখাটা কি তোমাব?"

মালিম শ্লেটখানি লইলেন। দেখিলেন, স্পষ্ট স্পষ্ট অক্ষবে লেখা রহিযাছে-"উত্তব-পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাও।"

অধ্যক্ষ একটু রুক্ষ স্ববে বলিলেন,—"আমাব সঙ্গে একটা বহস্য লাগিযেছ?"

ব্রুস্ বলিলেন—"আমি যথার্থ বলিতেছি, এ সব কাণ্ড আমি কিছুই জানি না। যতটুকু জানি আপনাব কাছে তাহাই বলিযাছি।"

অধ্যক্ষ তখন শ্লেটখানি সম্মুখে কবিযা ডেস্কে বসিযা গভীব চিন্তা কবিতে লাগিলেন। তাহাব পব শ্লেটখানি উল্টাইযা ব্রুসেব সম্মুখে ধবিযা বলিলেন, "উত্তব-পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাও' এই কথা কযটা তুমি লেখ ত।"

ব্রুস লিখিলেন। অধ্যক্ষ দুই পিঠে লেখা খুব মনোযোগেব সঙ্গে মিলাইযা দেখিলেন। তাহাব পর বলিলেন, "মিঃ ব্রুস, তোমাব সহকাবীকে ডাকিযা আন।"

সহকাবী আসিলেন। তিনিও অধ্যক্ষেব কথামত শ্লেটে লিখিলেন। কর্মাধ্যক্ষও লিখিলেন। এইরূপে মাঝি-মাল্লাদেব মধ্যে যাহাবা লিখিতে জানিত, একে একে সকলেই লিখিল , কিন্তু কাহাবও লেখাই সেই লেখাটাব সঙ্গে মিলিল না।

মাঝি মাল্লাবা নিজেব নিজেব কাজে চলিযা গেল। তখন অধ্যক্ষ বসিযা ভাবিতে লাগিলেন তাঁহাব মনে হইতে লাগিল—"তবে কি কোন বদমাযেস ভাডা না দিযা এই জাহাজে লুকাইযা যাইতেছে?" এই ভাবিযা, তিনি বলিলেন—"জাহাজ তন্ন তন্ন কবিযা খোঁজ, দেখি, কে লুকাচুবি খেল্‌ছে।'

জাহাজখানিব আগাগোডা খোঁজা হইল—কোণগুলি, কুলুঙ্গীগুলি, কোন স্থানেই খুঁজিতে বাদ পডিল না। খুব ভাল কবিযা দেখা হইল। সকলেই শুনিযাছিল, একটা অপবিচিত লোক জাহাজে ঢুকেচে— খুঁজিযা বাহিব কবিতে সকলেই উৎসুক। কিন্তু মাঝি-মাল্লা ব্যতীত আব কাহাকেও পাওযা গেল না।

অনুসন্ধানে কোন ফল হইল না। তখন অধ্যক্ষ বলিলেন—"মিঃ ব্রুস! এ ব্যাপাবটা তোমাব কিরূপ বোধ হয?"

"মহাশয! বলিতে পাবি না। আমি লোকটাতে লিখ্‌তে দেখেছি। আপনিও লেখাটা দেখলেন। ব্যাপাবটা খুবই বহস্যজনক।"

"ওহে, বহস্য বলিযাই বোধ হইতেছে। বাতাস বেশ অনুকুল আছে, আমি ভাব্‌ছি, ঐ লেখা অনুসাবে আমি জাহাজখানিকে উত্তব-পশ্চিম দিকে চালাইব। দেখি ব্যাপাব কিরূপ দাঁডায!"

"আমি অধ্যক্ষ হইলে ইহাব আগেই জাহাজ সেই দিকে লইযা যাইতাম। অনর্থক কয়েক ঘন্টা সময নষ্ট কবা হইল।"

"বেশ তাই কবা যাক? "টাতনেব উপব যাও। জাহাজেব গতি উত্তব-পশ্চিম দিকে

ফিবাইয়া দাও।" মিঃ ব্রুস যাইবার জন্য উদ্যত হইলেন। অধ্যক্ষ আবাব বলিলেন—"একটা বিশ্বাসী লোককে উপবে বেখ, সে যেন খুব দূরে চারিদিকে নজর কবিতে কবিতে যায়।"

অধ্যক্ষেব আদেশ অনুসারে জাহাজ চলিতে লাগিল। চাবিদিকে দেখিবাব লোকও নিযুক্ত হইল। পবে বেলা তিনটাব সময সেই পাহারাব ব্যক্তি সংবাদ দিল যে, সম্মুখে অদূবে একটি তুষাব শৈলদেখা যাইতেছে ; আবাব অল্পসময পবেই সংবাদ দিল—ঐ তুষাব-শৈলেব কাছে একখানি জাহাজেব মত কি একটা দেখা যাইতেছে।

আবও নিকটবর্তী হইয়া অধ্যক্ষ দূববীক্ষণ-যন্ত্রেব সাহায্যে দেখিলেন যে, বাস্তবিক একখানি জাহাজ ভগ্ন অবস্থায় ভাসিতেছে। জাহাজখানি যেন ববফে আচ্ছন্ন হইযা গিযাছে। আব তাহাব উপরে অনেকগুলি মানুষ বহিযাছে। দেখিযাই—অধ্যক্ষ সেই মানুষগুলিকে উদ্ধাব করিবাব নিমিত্ত নৌকা পাঠালেন।

পবে জানা গেল, জাহাজখানি আবোহী লইয়া কুইবেক সাগর হইতে লিভাবপুলে যাইতেছিল। পথে তুষাব-শৈলেব মধ্যে পড়িয়া এই দশা ঘটিযাছে। কয়েক সপ্তাহকাল এই ভযানক অবস্থায বহিযাছে , সমস্ত খাদ্য, সমস্ত পানীয নিঃশেষ হইযা গিয়াছে। আরোহী ও মাঝি-মাল্লারা সকলেই জীবনের আশা ত্যাগ কবিযাছিল। তখন অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য পাইয়া তাহাদিগেব কৃতজ্ঞতাব অবধি বহিল না।

নৌকা কবিযা লোকগুলিকে আনা হইতে লাগিল। তৃতীযবারে যে লোকগুলি আসিতেছিল, তাহাদের মধ্যে এক জনক দেখিয়া মালিম অর্থাৎ ব্রুস ভযে চমকাইযা উঠিলেন। এই ব্যক্তিকে তিনি অধ্যক্ষেব কামবাব মধ্যে বসিযা শ্লেটে লিখিতে দেখিযাছিলেন। তিনি দেখিলেন, এ ঠিক সেই লোক।

ব্রুস প্রথমে মনে কবিলেন, এ কেমন কবিযা জাহাজে আসিবে? হয তো আমাব ভ্রম হইতেছে! কিন্তু যতই ভাল কবিযা লোকটিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাব সন্দেহ দূর হইল। বেশ বুঝিলেন যে, ঠিক এই লোকই কামবায গিযাছিল। শুধু মুখখানিতেই যে মিল, তাহা নহে। শরীর, পোষাক, সবই ঠিক সেই ব্যক্তির।

সেই অনশন-ক্লিষ্ট, মৃতপ্রায় ব্যক্তিদিগকে জাহাজে আনিবাব পব তাহাদিগের শুশ্রূষাব ব্যবস্থা কবিয়া দেওয়া হইল। জাহাও নির্দিষ্ট দিকে চলিতে লাগিল। তখন মালিক অধ্যক্ষকে ডাকিয়া গোপনে বলিলেন—"আজ যে লোকটিকে কামরায় দেখিয়াছিলাম, বোধ হইতেছে, সেটি ভূত নহে। লোকটি এখনও জীবিত আছে।"

"কি বলিতেছ? কে জীবিত?"

"যে সকল আবোহীদিগকে আমরা উদ্ধার করিলাম, তাহাদেব মধ্যে এক জনকে আমি আপনার কামবায বসিয়া শ্লেটে লিখিতে দেখিযাছি। এ বিষয়ে আমি আদালতে হলফ পড়িযা বলিতে পারি।"

অধ্যক্ষ বলিলেন—"মিঃ ব্রুস! আমি যথার্থই বলিতেছি, ব্যাপাবটা আমাব কাছেও খুব আশ্চর্যজনক বলিয়া বোধ হইতেছে। চল, আমবা যাইয়া লোকটিকে দেখি।"

তাঁহাবা যাইয়া দেখিলেন যে, লোকটি নিজেদেব অধ্যক্ষের সঙ্গে গল্প কবিতেছে। তাহারা উদ্ধাব পাইয়াছে বলিযা ইঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবিবাব নিমিত্ত কাছে আসিল। বলিল—"আপনাদেব দয়া ব্যতীত আমবা অনাহাবে ঠাণ্ডা বাতাসে নিশ্চযই কষ্ট পাইযা মবিযা যাইতাম।" অধ্যক্ষ বলিলেন—"বেশী আর কি কবিয়াছি? আমবা ঐ অবস্থায় পড়িলে

আপনারও আমাদিগকে নিশ্চয় উদ্ধার করিতেন। আপনারা নীচে আমার কামরায় আসুন।" কামরায় প্রবেশ কবিয়া অধ্যক্ষ সেই অদ্ভুত আরোহীটিকে দিকে চাহিযা বলিলেন, "আপনি এই শ্লেটখানিক উপর অনুগ্রহ করিযা কয়েকটা কথা লিখুন। আমি একটা খেয়াল করিয়া আপনাকে এ কথা বলিতেছি না, এরূপ বলিবাব একটা বিশেষ হেতু আছে।" এই কথা বলিয়া অধ্যক্ষ তাহার হাতে শ্লেটখানি দিলেন। শ্লেটের যে দিকে জাহাজ চালানর কথা লেখা ছিল, সেই দিক্‌টাব বিপরীত দিক্ উপরে রাখিয়া শ্লেটখানি দেওযা হইল। আরোহী বলিল,—"যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব, কিন্তু কি লিখিব?"

"কযেকটি কথা মাত্র আমি দেখিতে চাই। আচ্ছা, লিখুন—উত্তব-পশ্চিম দিকে জাহাজ চালাও।"

এরূপ লিখিতে অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্য কি, ভাবিয়া স্থির করিতে না পাবিলেও আবোহী একটু হাসিযা তাহাই লিখিল। অধ্যক্ষ শ্লেটখানি লইযা এই লেখাটার সহিত সেই আগেকাব লেখাব তুলনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর একটু সবিয়া আসিয়া, আরোহী দেখিতে না পায, এমন ভাবে আগেকার লেখাটা উপরদিকে উল্টাইয়া উল্টাইয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"এ লেখাটা আপনার তো?"

আরোহী লেখাটা দেখিযা বলিল—"এ কথা বলাই বাহুল্য, কাবণ, আপনি তো আমাকে লিখিতেই দেখিলেন।"

তখন অধ্যক্ষ অপর দিকের লেখাটা আবাব উল্টাইয়া বলিলেন, —"এ লেখাটা?"

আবোহী একবাব এটা, একবাব ওটা, এইরূপ কবিযা দুইটি লেখাই দেখিল। দেখিয়া ভ্যবাচাকায় পডিল। কি বলিবে, স্থিব কবিতে পারে না। পবে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিল,—"আমি ত এক দিকে লিখিলাম, অথচ দুই দিকেই আমার লেখা। ইহাব অর্থ কি? আব এক দিকে আমাব মত করিযা কে লিখিল?"

অধ্যক্ষ বলিলেন—"সে কথাটা আমিও জানি না। আমার মালিম বলিতেছে, আপনি আজ দুপুরে এই কামরায বসিযা ঐরূপ কথা কয়টি এই শ্লেটের উপব লিখিয়া গিযাছেন।"

আবোহী ও তাহাদেব অধ্যক্ষ এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া পরস্পরেব দিকে চাহিল। পরে অধ্যক্ষ আরোহীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই শ্লেটে লিখিয়াছ, এমন স্বপ্ন কি দেখিয়াছিলে?"

"না মহাশয়, কই, তা ত মনে পডে না।"

কামরার অধ্যক্ষ তখন ভাঙ্গা জাহাজের অধ্যক্ষকে বলিলেন,—"আপনি স্বপ্নের কথা বলিতেছেন! আচ্ছা, এই আরোহী আজ দুপুববেলায় কি অবস্থায় ছিলেন?"

সেই বিপন্মুক্ত অধ্যক্ষ বলিলেন—"ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত! আপনার নিকট বলিব বলিয়াই আমি স্থির কবিযাছিলাম। আরোহীকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এই ভদ্রলোক অবসন্ন হইযা দুপুবের কিছু আগে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। কিঞ্চিদধিক এক ঘন্টার পর ইনি জাগিয়া উঠেন। উঠিয়াই আমাকে বলেন—'মহাশয়! আজই আমরা উদ্ধার পাইব।' জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কিসে বুঝিলেন যে, উদ্ধার পাইব? ইনি বলিলেন যে, ইনি স্বপ্নে একখানি জাহাজে গিয়াছিলেন আর সেই জাহাজখানি আমাগিদের উদ্ধারের জন্য আসিতেছে। শুধু বলা নহে, ইনি জাহাজখানিক বর্ণনা পর্যন্ত করিলেন। আরও বিস্ময়ের বিষয়, যখন আপনার এই জাহাজখানি আমাদের চক্ষুগোচর হইল, তকন দেখিলাম, ইঁহার বর্ণনার সঙ্গে আপনার

জাহাজের চমৎকার সাদৃশ্য।"

কামরার অধ্যক্ষ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন,—"লেখাটা শ্লেটেব উপর যেরূপেই আসুক, এই লেখাটার জন্যই আপনাদেব জীবন রক্ষা পাইয়াছে ; সে সময আমি অনেকটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিয়া জাহাজ চালাইতেছিলাম। তাহার পর লেখাটা দেখিয়া উত্তব-পশ্চিমে চালাইলাম, আর দূবে নিরীক্ষণ করিবার জন্য এক জন পাহারার বন্দোবস্ত কবিলাম।" অধ্যক্ষ তাহার পব সেই আরোহীব দিকে চাহিয়া বলিলেন—"শ্লেটে লিখিবার কথা আপনি কি স্বপ্নে দেখেন নাই?"

"না মহাশয! সেরূপ কোন কথাই আমার মনে পড়ে না। কেবল মনে পড়ে যে, একখানি জাহাজ উদ্ধারের জন্য আসিতেছে! তাই স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। উদ্ধারের জন্য আসিতেছে, এ ধারণা কেমন করিয়া হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আর একটি বিষয়ে আমি বিস্মিত হইতেছি, এখানকার সমস্ত দ্রব্যই যেন আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। অথচ আমি কখনই আপনার জাহাজে ইতঃপূর্বে আসি নাই। আমার কাছে এ সব ব্যাপার রহস্য বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনার মালিম কি দেখিয়াছিলেন?"

এই কথা শুনিয়া মিঃ ব্রুস যেরূপ যাহা দেখিয়াছিলেন, সেগুলি যথাযথ বলিলেন। শেষে তাঁহাবা স্থির কবিলেন যে, ভগবান্ বিশেষ কৃপাপরবশ হইয়াই আসন্ন মৃত্যু হইতে বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে বাঁচাইবার জন্য ঐ সকল ব্যাপার করিয়াছেন।

এই গল্পটি 'জুলিয়া হ্যালক্' নামক ক্ষুদ্র অর্ণব-পোতের অধ্যক্ষ জে, এস, ক্লার্ক লেড্‌বিটার সাহেবকে বলেন। তিনি ইহা মালিম ব্রুসেব প্রমুখ্যাৎ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ব্রুস কিরূপ প্রকৃতির লোক, জানিতে চাওয়ায় ক্লার্ক বলেন যে—"সেরূপ সত্যবাদী, সাঁচ্চা লোক আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। আমাদের উভয়ের মধ্যে সহোদবের মত ভালবাসা। আমরা দুজনে ১৭ মাসকাল একসঙ্গে কাটিযেছি। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি। গল্পটি বলিবার সময তাহাব কথায সম্মান ও শ্রদ্ধার ভাব ব্যক্ত হইত , কারণ, এগুলি সূক্ষ্ম-জগতের পবিত্র ব্যাপার। তাহার বিশ্বাস—এরূপ ব্যাপার দেখিতে দেখিতে ক্রমে ভগবানের কাছে উপনীত হওয়া যায়। আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি, ব্রুস কখনই মিথ্যা কথা বলে নাই।"

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, গল্পটি অতীব সুন্দর, আদর্শ-স্থানীয়, উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। এরূপ কাহিনী যে মাত্র এই একটাই পাওয়া গিয়াছে, তাহা নহে। "থিওসফিক্যাল রিভিউ" নামক পত্রিকার ২২শ খণ্ডে ২৭৪ পৃষ্ঠায় এনি বেশান্ত এইঅরূপ একটি গল্পের অবতারণা কবিযাছেন—"আমি অনেকবার সমুদ্র-ভ্রমণ করিয়াছি, একবার একটি জাহাজেব অধ্যক্ষ আমার সঙ্গে তাঁহাব জীবনের ঘটনাবলী বলিতে আরম্ভ করেন। তিনি বললেন, এক দিন একটা লোক আমার কাছে আসিয়া হাজির। জলাভেদ্য কাপড়ের পোষাক পবা, সকল শবীব বাহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল গড়াইতেছে। লোকটা আসিয়া কোন একটা বিশেষ দিকে জাহাজ চালাইয়া কতকগুলি জলমগ্ন জাহাজের লোককে বাঁচাইতে অনুবোধ করিতে লাগিল। আমি তাহার কথামত জাহাজ চালাইলাম, বাস্তবিক একখানা জাহাজ ভগ্ন হইয়া ভাসিতেছে, অনেকগুলি মাঝি-মাল্লা বিপন্ন। আশ্চর্যের বিষয়, যে লোকটি আমাব কাছে আসিয়া অনুরোধ করিয়াছিল, বিপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে তাহাকেও দেখিয়া বেশ চিনিলাম।" এনি বেশান্ত আর একটি গল্পও বলিয়াছেন। সে গল্পটি পূর্ব-বর্ণিত ব্রুসের গল্পেরই অনুরূপ। পশ্চিম-ভারতীয় বাণিজ্য ব্যাপৃত 'মোহক' নামক ক্ষুদ্র জাহাজের অধ্যক্ষ মিঃ বেনায়ের সম্বন্ধেই এনি বেশান্তের এই গল্পটি সম্পর্কিত।

দ্বি-মাস্তুল-বিশিষ্ট মোহক নামক একখানি জাহাজ

গল্পটি এইরূপ। এক দিন রাত্রে ঐ জাহাজখানির অধ্যক্ষের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি দেখলেন, তাঁব সম্মুখে এক জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির গায়ে সবুজবর্ণ পোশাক। লোকটি তাঁহাকে বলিল, আপনি জাহাজখানি দাক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চালান। অধ্যক্ষেব মনে হইল, বুঝি বা তাঁহাব মালিম তাঁহার নিকট এই সংবাদ পাঠিয়েছে। তাই তিনি তাড়াতাড়ি পাটাতনের উপর গেলেন। যাইযা শুনিলেন, মালিম তাঁহাকে এ সংবাদ দেয় নাই। অধ্যক্ষ তখন কামবায় ফিরিয়া আসিলেন। আবাব সেই লোকটা আসিযা জাহাজখানিকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চালানোব জন্য অনুবোধ কবিতে লাগিল। তিনি আবার মালিমেব কথা মনে কবিযা পাটাতনেব উপব গেলেন। তখনও শুনিলেন, মালিম এই সব কথা বলে নাই, লোকটাকেও পাঠায নাই। সেই সবুজ, পোশাক-পবা অদ্ভুত লোকটা তখন তৃতীযবার আবার আসিল, আসিযা বলিল, জাহাজ দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে না চালাইয়া বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভবনা, আব সময নাই, শীঘ্র জাহাজ চালাইযা দিউন। তখন অধ্যক্ষ জাহাজেব গতি সেই দিকে ফিবাইলেন। খানিক পবে দেখা গেল, জলমগ্ন জাহাজেব একখানি ক্ষুদ্র তবী ৪টি লোককে বুকে কবিযা অকূল সাগবে ভাসিতেছে। লোকগুলিব মধ্যে এক জনেব গাযে সবুজ বঙেব পোযাক। আব এই লোকটাই রাত্রে স্বপ্ন দেখিযাছিল, যেন সে তিনবাব এই দ্বি-মাস্তুলবিশিষ্ট 'মোহক' জাহাজেব কামবায় প্রবেশ কবিয়াছে, আব অধ্যক্ষকে জাহাজের গতি ফিবাইয়া আপনাদিগকে বাঁচাইবাব অনুরোধ কবিযাছে। গল্পটিব উৎপত্তি বিষযে আমবা আর কিছু জানি না।

ঘটনাগুলিব আলোচনা কবিলে দেখা যায যে, সূক্ষ্মমূর্তিগুলি স্থূলশবীব পবিত্যাগ কবিতে নিতান্ত বাধ্য হইযাছিল। শুধু তাই নহে। পবিত্যাগ কবিযা অপবকে দেখা দেওযা অনেকটা সহজ হইযা দাঁড়াইয়াছিল। পূর্ব-বর্ণিত "পি" নামক পুবোহিতের অজ্ঞানাবস্থাটা খুব খাঁটি বকমেব হইযাছিল। আব জাহাজেব লোকগুলিব আবসন্নভাবটা কতকটা ঠাণ্ডা লাগিযা, কতকটা অনশনে ঘটিযাছিল। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী উপবাস কবিযা যেরূপ শক্তি লাভ কবেন, বাধ্য হইযা উপবাস কবিলেও বহুস্থলে সেরূপ শক্তিব উন্মেষ হইযা থাকে। মহা বিপদে পড়িলে মানুযের প্রেত-মূর্তি ঐরূপভাবে বাহিব হইতে পাবে বটে, কিন্তু সেটা খুব বাঞ্ছনীয নহে। আবাব আব্হাওযা অনুকূল না হইলেও প্রেত-মূর্তিব নির্গমন ঘটে না। বিপন্ন আবোহীদেব বেলায নির্গমনেব অবস্থা অনুকূল ছিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

মৃত্যুর ঠিক পূর্বেই প্রেতাত্মা আসিয়া দেখা দেয়

মরণের আগে প্রেতাত্মা আসিয়া দেখা দিল, এইরূপ বিস্তর গল্প আমাদের জানা আছে। একটা মানুষ যখন মর-মর হয়, তখন তাহার শরীরটা খুবই দুর্বল হইয়া পড়ে। অত দুর্বল আর কখনই হয় না। সেই অবস্থায় যদি ঐ ব্যক্তির কোনরূপ উৎকট তীব্র ইচ্ছা হয়, তবে সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত মরণের ঠিক আগে বা ঠিক পরেই প্রেতাত্মা তাহা পূর্ণ করিয়া লয়। মরণের পরে প্রেতাত্মা ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত কাহাকেও দেখা দিলে আমরা তাকে যথার্থ ভূত বলিয়া থাকি। এই যথার্থ ভূত সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্র অধ্যায় আলোচনা করিব। মরণের অব্যবহিত পূর্বে ও প্রেতাত্মা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া দূরবর্তী আত্মীয় স্বজনকে দেখা দেয়। আমরা এখন তাহারই বিষয় বলিব। লেড্‌বিটার সাহেব তদীয় "দিব্য-দৃষ্টি" নামক পুস্তকে রোচেস্টার প্রদেশের মেরীগফের একটা সুবিখ্যাত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেইটি পড়িয়া মিঃ অ্যানড্রু ল্যাং নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে—"এমন সুন্দর প্রামাণিক ভূতের গল্প খুব বেশী শুনিতে পাওয়া যায় না।" লেড্‌বিটার আর একটি বিখ্যাত গল্পও বলিয়াছেন। উহা তিনি ডাক্তার এফ জি লী লিখিত "সূক্ষ্ম জগতের আভাস" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৪পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মিসর হইতে তুরস্ক

একটি স্ত্রীলোকের স্বামী ভারতবর্ষে একটি উচ্চপদে থাকিয়া চাকুরী করিতেন তিনিও স্বামীর কাছে থাকিতেন। তাঁদের ছেলেপুলে তুরস্কে কোন বন্ধুর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেছিল। স্ত্রীলোকটি ও তার স্বামী ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে বাড়ী আসিতেছিলেন। তাঁহারা চারি বৎসরকাল বাড়ী ও সন্তানগুলির কাছছাড়া। আসিতে আসিতে যখন মিশরে পৌঁছলেন, তখন রমণীর সাংঘাতিক ব্যারাম দেখা দিল। জীবনের আর আশা রহিল না। তখন তিনি সন্তানগুলিকে দেখিবার নিমিত্ত ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহাকে শুশ্রূষা করিতেছিল, তাহাদিগকে বার বার ছেলেপুলেগুলিকে দেখিবার ইচ্ছা জানাইতে লাগিলেন। জ্বরের বেগে যখন অজ্ঞান হইয়া পড়েন, কেবল তখন চুপ করিয়া থাকেন আবার যেই বিকারের বেগ একটু উপশমিত হয়, অমনই তাহাদের নিমিত্ত ছট্‌ফট্ করেন। এইরূপ হইতে লাগিল। সন্তানগণগুলিকে দেখিবার নিমিত্ত তিনি সাতদিন ধরিয়া অস্থিরতা প্রকাশ করিলেন। বলিতে লাগিলেন—"আমার আর কোন ইচ্ছা, কোন বাসনা, কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, তোমরা একটিবার মাত্র আমার ছেলেমেয়েগুলিকে আনিয়া দেখাও। একটিবার দেখিলে আমি মরিয়াও সুখ পাইব; তা' হইলে আমি শান্তির সঙ্গে মরিতে পারিব।"

যে দিন মরিবেন, সেই দিন প্রাতে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া খুব সুন্দর ভাবে গাঢ় নিদ্রা গেলেন। শুশ্রূষাকারিণীদের ভয় হইল; তাহারা সে ঘুম ভাঙ্গিতে পারিল না। এমন ঘুম যে, একটু 'টুঁ' শব্দ নাই—হাত-পা পর্যন্তও একটু নড়িল না। দুপুরের অল্প একটু পরেই তাঁহার ঘুম

ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন। জাগিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"আমি তাহাদিগকে দেখিয়া আসিলাম। দেখিয়াছি! দেখিযাছি! আমার ছেলেপুলেগুলিকে দেখিযাছি। ভগবান আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া তিনি আবাব ঘুমাইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমাইলেন। সন্ধ্যাকালে মাবা গেলেন।

পূর্বেই বলিযাছি, ছেলেপুলেগুলি তুরস্কে কোন বন্ধুর বাড়ীতে থাকিয়া পডাশুনা কবিতেছিল। তাহারা দোতলায় থাকিত। তাহাদেব পৃথক্ দুইটি ঘর ছিল। সেই ঘরে তাহাবা খেলা-ধূলা করিত,, বসিত উঠিত। সে দিন তাহাবা সকলেই এক স্থানে ছিল। এক জনও এদিক্ ওদিক্ যায় নাই। বই নিযে খেলানা নিয়ে খেলা করিতেছিল। কাছে ঝি ছিল। ঝি কখনও তাহাদেব মাকে দেখে নাই তাহাবা খেলা-ধূলা করিতেছে এমন সময়ে তাহাদের মা হঠাৎ সেই ঘরে আসিযা উপস্থিত। খুব আগে এই বকম করিযা হঠাৎ আসা তাঁহাব অভ্যাস ছিল। এবারও মা হঠাৎ আসিলেন। যে ঘবটি বড়, সেইটিব মধ্যেই আসিলেন। আসিযা চুপটি করিয়া একটু দাঁডাইলেন, সব ছেলেপুলেব দিকে বেশ কবিযা চাহিয়া দেখিলেন, তাহাব পব একটু মুচ্কি হাসিয়া কাছের ছোট ঘরটিতে গেলেন। তাহাব পবই অদৃশ্য হইয়া পডিলেন। তিনি ঘবে প্রবেশ কবিবামাত্র তিনটি বড বড ছেলে তাঁহাকে চিনিতে পাবিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাবা চুপ করিয়া থাকা, কেমন কেমন চেহাবা, কেমন কেমন ভাব দেখিয়া তাহাবা হতবুদ্ধি হইয়া পডিল। ছোট ছেলেটি ভাল কবিযা চিনিতে পারিল না। সে আব ঝি কেবল দেখিল যে, সাদা পোশাকপরা একটা মেযেমানুষ ছোট ঘবেব মধ্যে যাইযাই হাওযায মিলাইযা গেল।

১৮৫৪ খৃস্টাব্দেব ১০ই সেপ্টেম্বব তাবিখে এই ঘটনাটি ঘটে। তাবিখটি বেশ যত্ন করিযা লিখিযা বাখা হইল। তাহাব পর জানা গেল, বমণীব মৃত্যু আব ছেলেপুলের কাছে আসিয়া এইরূপে দেখা দেওযা প্রায একই সময়ে ঘটিযাছিল। এই ব্যাপাব লিপিবদ্ধ কবিযা বাখা হইল। পবে পাবিবাবিক ধর্মপুস্তকেব মধ্যে সাদা পাতায় লিখিয়া বাখা হইল। গ্রন্থকাব সেখান হইতে গল্পটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ঐ গ্রন্থকাব আব একখানি পুস্তকে আর একটি বিবরণ দিয়াছেন। পুস্তকখানির নাম—"গোধূলি-সম্ভোগ।" বিবরণটি এই পুস্তকেব ৯৪পৃষ্ঠায লিপিবদ্ধ আছে। এটাও এক জন স্ত্রীলোকেব কাহিনী। ইনি জর্জ ফক্স্ প্রবর্তিত সম্প্রদায়বিশেষের লোক। ইনি "ককার মাউথ" নামক স্থানে মাবা যান। ইঁহার তিনটি সন্তান 'সেট্‌ল্' নামক স্থানে ছিল। মরণের একটু আগেই দিনে দুপুবে ইনি ছেলেপুলেগুলিকে দেখা দিয়াছিলেন। ছেলে তিনটিও ইঁহাকে খুব ভাল কবিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। এ গল্পটি আগেকার গল্পেরই অনুরূপ। এ ব্যাপাবটিরও যথাযথ প্রমাণ লিপিবদ্ধ আছে।

লেড্‌বিটাব সাহেব তাঁহাব বন্ধুর কাছে অনেক দিন পূর্বে একটা অদ্ভুত ব্যাপাব শুনিয়াছিলেন। ঘটনাটি যে পবিবারেব মধ্যে ঘটে, লেড্‌বিটার তাহার পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। বন্ধুটি কলেজে অধ্যয়নকালে ঐ ব্যাপারটি ঘটে; তাহাব পরেলেড্‌বিটারকে বলেন। ব্যাপারটি এইরূপঃ—

প্রেতাত্মা মরণের একটু আগে একই রাত্রে দূরবর্তী পুত্রকে তিনবার দেখা দিয়াছিল

ঐ দিন বন্ধুটি সকাল সকাল শুইলেন। অন্যদিন যত রাত্রি জাগেন, সে দিন তাহা জাগিলেন না। বসা-উঠার ঘরটিব বাহির দিকের দরজা শুইবার সময় তালা দিয়া আটকাইয়া শুইলেন। শুইবাব ঘব ও বসা-উঠাব ঘার—এ দুইটির মধ্যে একটা দরজা। কেবল এই দরজাটা খোলা থাকিল।

বসিবার ঘরটিতে আগুন জ্বালিয়া রাখা হইয়াছিল; আগুনও বেশ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল; সেই আলোকে ঘবটিও বেশ আলোকিত ছিল। দিন-দুপুরের মত ঘরের প্রত্যেক দ্রব্যই খুব সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। রাত্রি সাড়ে-দশটা বাজিল, তখন বন্ধুটি সুখদায়িনী নিদ্রা উপভোগের নিমিত্ত শয্যা আলিঙ্গন করিলেন। ঠিক সেই সময় দেখিলেন যে, দুই ঘরের মধ্যে যে দবজাটি খোলা অবস্থায় ছিল, সেইখানে সেই সুস্পষ্ট প্রদীপ্ত আলোকে তাঁহার পিতাব মূর্তি দাঁড়াইযা আছে। দেখিয়াই তিনি কয়েক সেকেণ্ড কাল বিস্ময়স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। শুধু স্তব্ধ নহে, আগুনের আলোক পিতাব সেই বিষাদ মাখা মুখখানিব উপর পডিয়া কেমন খেলা করিতেছে, তাহাও দেখিলেন। এক মিনিটকাল সেই পিতৃ-মূর্তিটি ভাল কবিযা দেখিলেন। দেখিলেন, যেন সেই মূর্তি হাতছানি দিয়া তাঁহাকে নিজের কাছে ডাকিতেছে। তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, স্তব্ধভাব দূবে গেল, তিনি লাফাইয়া বিছানা হইতে উঠিয়া বসিলেন। তাহাব পর বেগে দরজাব দিকে ছুটিলেন, কিন্তু সেখান না যাইতেই মূর্তিটি অদৃশ্য হইল।

বন্ধুটি বিস্ময় বিহ্বল হইযা শুইবাব ঘব ও বসিবার ঘঘব তন্ন তন্ন কবিয়া খুঁজিলেন। বেশ বুঝিলেন, বাহির হইতে কোন লোকের আসিবাব সম্ভাবনা নাই। বাহিবেব দরজা তালা বন্ধই আছে। আর ঘবেও দ্বিতীয় মনুষ্য নাই। তাহা ছাড়া পিতার মূর্তিটি তিনি বেশ ভাল কবিযাই দেখিযাছিলেন। কযেক সপ্তাহ পূর্বে তাঁহাকে যেমনটি দেখিয়া আসিয়াছেন, এ মূর্তি ঠিক সেইরূপই; কেবল তাঁহার মুখে একটা বাসনাব আবেগ প্রকাশ পাইতেছিল। বন্ধুটি ভাবিলেন— আমাব কোন ইযাববন্ধু ভয দেখাইবার নিমিত্ত যে এইরূপ সাজিয়া আসিবে, তাহা ত হইতে পারে না। শেষে মনকে একরূপ কবিযা বুঝাইলেন—এ আর কিছু নহে, দৃষ্টিবিভ্রম। মনকে বুঝাইলেন বটে, কিন্তু মন সে কথা বুঝিতে চাহিল না; কেন না, পিতার স্বাভাবিক মূর্তি খুবই স্মবণ হইতেছিল, সেই মুখের উপর আলোকেব খেলা স্পষ্ট কবিয়া মনে জাগিতেছিল। এ অবস্থায় দৃষ্টিভ্রম বলিলে মন সে কথা মানিবে কেন? যাহা হউক, মনকে একরূপ জোড়াতাড়া দিয়া বুঝাইয়া তিনি আবার ঘুমাইবার চেষ্টা কবিলেন।

অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া মন আলোড়িত হইয়াছে। ঘুম কি সহজে আইসে? অনেকক্ষণ ঘুম আসিল না। দেওযালেব উপর চাহিলেন, দেখিলেন, ছায়াগুলি তবতর করিযা নড়িতেছে, সেই ছায়ার খেলা প্রায় এক ঘন্টা ধরিযা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে আবাব একটু তন্দ্রাব ভাব আসিল। শরীর একটু অবসন্ন হইয়াও পডিল। ঠিক এমনই সময় তিনি একেবারে জাগিযা উঠিলেন। জাগিয়া চমকিত হইয়া দেখিলেন যে, ঠিক সেই দরজায় আবার সেই পিতৃমূর্তির মূর্তির মুখে ঠিক সেইরূপ বাসনা-বেগ, যেন একটা তীব্র আকাঙক্ষা মুখের উপর প্রকাশ পাইতেছে। এবার মূর্তিটি আরও আগ্রহেব সহিত তাঁহাকে হাতছানি দিযা ডাকিতে লাগিল। বন্ধুটি আগে হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এবার প্রেতমূর্তি আসিলে যাইতে দিবেন না, নিশ্চযই ধরিয়া ফেলিবেন। তাই এবার মূর্তিটিকে দেখিবামাত্র তিনি এক লাফে বিছানা হইতে মূর্ত্তির কাছে যাইয়া উঠিলেন। শুধু যাওয়া নয, খুব শক্ত করিয়া তাহাকে চাপিযা ধরিলেন; কিন্তু ভূতকে কখন কি ধরা যায়? সে যে ছায়ার মত। তাই ধবা বৃথা হইল। ভূতটিকে দুই হাত দূরে আবার দেখা গেল। আবার বন্ধুটি হাত বাড়াইয়া ধবিলেন। সেবারও হাতের মধ্যে কেহ নাই! মুঠা খালি। ভূত মিলাইয়া গেল। সেবাবও ঘরগুলি বন্ধুটি খুব ভাল কবিযা দেখিলেন, বুঝিলেন, ঘঘর হইতে কেহ বাহিবে যায নাই বা বাহির হইতেও কেহ ঘরে আইসে নাই। বাহিরেব তালা সেইরূপই বন্ধ আছে।

যুবকেরা প্রায়ই ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে না। বন্ধুটিও যুবক—কালেজের ছাত্র। ইনিও ভূত মানিতেন না। আজ স্পষ্টভাবে বার বার ভূত দেখিলেন, তবুও তাহাকে ভূত বলিয়া ভাবিলেন না। মনকে এই বলিয়া একটা প্রবোধ দিলেন, যে, হয় ত শরীরটা অতর্কিতভাবে অসুস্থ হইয়াছে, তাই এইরূপ একটা মনের ভ্রান্তি দেখা দিতেছে। মনকে এইরূপ বুঝাইয়া তিনি শীতল জলে মাথাটি ধুইলেন। তাহার পরে ঘুমাইবার জন্য আর একবার শুইলেন। মনে মনে ভাবিলেন—"যাহা সব দেখিলাম, উহা কিছুই নয়, মাথা গরম হইয়াছিল বলিয়াই ঐরূপ দেখিয়াছি; ও সব আর মনে করিব না।" শুইবামাত্র চারিদিক্ হইতে অনেকগুলি ঘড়িতে রাত্রি ১২ বাজিয়া উঠিল। তখন নিদ্রার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চেষ্টা করিতে করিতে নিদ্রা আসিল। খানিকটা ঘুমইবার পরই আার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আবার চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন। যাহাদের স্নায়ু দুর্বল, তাহারা অনেক সময় অকারণ ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে। যুবকও তাহাদের মত হঠাৎ ভয় পাইয়া নিদ্রোত্থিত হইলেন। তখন বসিবার ঘরের আলো মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। আলোটা তখন আর আগেকার মত সমুজ্জ্বল ছিল না। এখন কেমন একরূপ মিটমিটে লাল আভা দেওয়ালের উপর ও ছাদের নীচে পড়িয়াছিল। যুবক দেখিলেন যে, সেই অস্পষ্ট আলেকের মধ্যে ঠিক দরজাটার কাছে আর একবার পিতার সেই প্রেতমূর্তি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিলেন, এবার মূর্তিটি একটু অন্যরূপ। আগে মূর্তিটির মুখে একটা বাসনার বেগ—একটা উৎকট আকাঙক্ষা স্পষ্টরূপে দেখা গিয়াছিল; কিন্তু এবার সে ভাব নাই, এবার যেন একটা নিরাশ দুঃখের ভাব ব্যক্ত হইতেছে। আগে দুইবার হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল, এবার মূর্তিটি ভয় বিহ্বল যুবকের হাতের সঙ্কেতে আসিতে নিষেধ করিল। পূর্বে মূর্তিটি খুব তাড়াতাড়ি মিলাইয়া গিয়াছিল, এবার খুব ধীরে ধীরে দেওয়ালের উপরিস্থ আভার মধ্যে অস্পষ্ট হইতে হইতে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পিতার ঐ প্রেতমূর্তি ঐরূপে অন্তর্হিত হইবার পরক্ষণেই যুবকের জড়ভাব কাটিল—তাহার চমক ভাঙ্গিল। তিনি তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া পকেট-ঘড়িটিতে দেখিলেন, রাত্রি দুইটা বাজিতে ১০ মিনিট আছে। মনে করিলেন, এটা নিতান্ত অসময়, এখন বাড়ী যাইবার গাড়ী মিলিবে না বা এত রাত্রিতে কাহাকেও ঘুম থেকে ডাকিয়া তোলাও ঠিক নহে। যুবক ভাবিলেন, অতি প্রত্যূষে নিশ্চয়ই বাড়ী যাইব। তাঁহার পিতা একটি দূরবর্তী স্থানে পুরোহিতের কার্য করিতেন। বাড়ী হইতে আসিবার সময় কয়েক সপ্তাহ আগে তিনি তাঁহাকে বেশ সুস্থ দেখিয়া আসিয়াছিলেন। আসিবার পরও তাঁহার কোন অসুস্থসংবাদ পান নাই, কিন্তু রাত্রিতে তিন তিন বার তাঁহার মূর্তি দেখিয়া যুবকের মনে কেমন একটা খট্কা লাগিল। স্বচক্ষে পিতাকে সুস্থ না দেখিলে তিনি সুস্থ হইতে পারিবেন না। তাই বাড়ী যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার আর ঘুম আসিল না, ঘুমাইবার চেষ্টাও করিলেন না। অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই তিনি কলেজের অধ্যক্ষকে রাত্রির ব্যাপার সমস্ত বলিয়া ছুটী লইয়া বাড়ী রওনা হইলেন। বাড়ী যাইতে একটুও কালবিলম্ব করিলেন না।

যুবক খুব তাড়াতাড়ি বাড়ী যাইতে লাগিলেন। ব্যস্তসমস্ত হইয়া যাওয়ার গত রাত্রির উৎকণ্ঠা কতকটা কমিয়াছিল। সন্ধ্যাকালে যখন অল্প অল্প আঁধার হইয়া আসিতেছে, ঠিক সেই সময় তিনি বাড়ীর কাছে যাইয়া উঠিলেন। আজ বাড়ী যাইতেছেন, কত আনন্দের বিষয়, কিন্তু তাঁহার আনন্দ হইতেছে না, কেমন একরূপ ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার সে আনন্দ নষ্ট হইয়া যাইতেছিল। বাড়ীটা তাঁহার চোখে পড়িবামাত্র যেন প্রাণটা দমিয়া গেল। তিনি দেখিলেন—

ঘরের খড়খড়িগুলা সমস্তই বন্ধ। সন্ধ্যাকালে খড়খড়ি অনেকে বন্ধ করেন বটে আর সন্ধ্যাও হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তিনি জানিতেন যে, গো-ধূলির আলো-আঁধারের মিশামিশি ভাবটা তাঁহার পিতা খুব ভালবাসিতেন। তাই তিনি এ সময় খড়খড়ি বন্ধ করিতেন না। বেশ একটু অন্ধকার হইয়া আসিলে তাঁহার আলো জ্বালা অভ্যাস ছিল। আজ এ সময় খড়খড়ি বন্ধ দেখিয়া যুবকের প্রাণটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। বাড়ীর দরজায় গিয়া তিনি কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন, কাহাকেও ডাকিতে পারিলেন না। কিছু পরে একটু সামলাইয়া লইয়া দরজায় আঘাত করিলেন। চাকর দরজা খুলিয়া দিল। এই চাকরটি বহুদিন হইতে এই বাড়িতে চাকুরী করিয়া আসিতেছে। যুবকও ইহাকে জন্মাবধিই দেখিতেছেন। এই পুরাতন চাকরের মুখখানি দেখিয়াই তিনি বুঝিলেন যে, বাড়ীতে একটা দুর্ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে।

চাকর বলিল—"আঃ, আপনি বড়ই দেরী করিয়া আসিয়াছেন। গত রাত্রিতে আসিলেও দেখাটা হইত!" যুবক ভীতিজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা কি মারা গিয়াছেন?" চাকর বলিল—"হ্যাঁ, তিনি গিয়াছেন। ব্যারাম হওয়া অবধি কেবল আপনাকে দেখিবার জন্য ছটফট্ করিয়াছিলেন। রাত্রি দশটার সময় ফিট্ হইল, আধ ঘন্টা পরে জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইবামাত্র বলিলেন,'আমার ছেলেকে আনিতে পাঠাও, আমি একটিবার তাহাকে দেখিব।' আমরা বলিলাম, ভোর হইবামাত্র লোক পাঠাইব।' মনে হইল, আমাদের সে কথা তাঁহার কানে পৌঁছিল না। কারণ, তখনই আবার তিনি অজ্ঞান হইয়া গেলেন। তাহার পরে আবার পৌনে বারটার সময় কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁহার জ্ঞান হইল। তখনও বলিলেন—'আঃ। ছেলের সঙ্গে দেখা হইল না। এখনও আসিল না?' আবার অজ্ঞান হইলেন। ঠিক দুইটা বাজিতে দশ মিনিট থাকিতে আবার চোখ মেলিলেন, আমাদিগকে চাহিয়া দেখিলেন, সকলকেই যেন বেশ চিনিতে পারিলেন, কিন্তু কথা বলিতে পারিলেন না। কারণ, বড়ই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতি কষ্টে কেবল মৃদুস্বরে বলিলেন—'ছেলের সঙ্গে দুই একটা কথা বলিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। আমি এখনই চলিলাম, তাহাকে দেখা পর্যন্ত আর আমার সময় নাই।' এই কথা বলিয়াই তিনি চিরদিনের জন্য চোখ বুজিলেন। যেন সুখের নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িলেন।"

যুবক সূক্ষ্ম জগতের আভাস এই প্রথম পাইলেন। অনেকেই এরূপ আস্বাদ পাইয়া থাকেন। তবে এ ঘটনাটি খুবই চমৎকার। তাঁহার মনে এ ব্যাপার চিরদিনের মত অঙ্কিত রহিল। শুধু অঙ্কিত নহে, উত্তরকালে তাঁহার জীবনের গতিও ইহাতে একটু অন্যরূপ গিয়াছিল।

আমাদের মধ্যে এমন বিস্তর ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদের জীবনে এইরূপ ব্যাপার ঘটায় তাঁহাদের স্বভাব-চরিত্র পর্যন্ত একবারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের অতি সন্নিকটে সূক্ষ্ম-জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে, এ কথা না জানায় প্রথমে তাঁহারা কতকটা নাস্তিকভাবাপন্ন ছিলেন, কিছুই মানিতেন না, কিন্তু এইরূপ ব্যাপার দেখিয়াই তাঁহাদের সে ভাব গিয়াছে। এখন সবই মানেন। এটা অবিশ্বাসের যুগ। কেহ কিছু মানিতে চাহে না। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যায় যে, এরূপ সূক্ষ্ম জগতের কাণ্ড বিস্তর ঘটিতেছে।

অর্ধ-শতাব্দী আগে লোকে আরও নাস্তিক ছিল। তখন কিছুই মানিতে না। বরং এখন কতক কতক মানিতেছে। তখনকার অপেক্ষা এখন আমরা সূক্ষ্ম-জগতের অনেক তথ্য জানিতেও পারিয়াছি। সেই ঘোর অবিশ্বাসের সময় লর্ড লিটন্ "একটি আশ্চর্য গল্প" নামক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া গিয়াছেন ঃ- -

"আমাব প্রদত্ত বিবরণ অল্প লোকে পড়িবে কি বেশী লোকে পড়িবে, তাহা জানি না। তবে আমি একটা কথা বলিতে পাবি যে, অনেক লোক জীবনে কোন সময়-না কোন সময অদ্ভুত ভৌতিক কাণ্ড দেখিয়াছেন। সে সব কাণ্ডগুলি এমন ধবণের যে, সেখানে যুক্তি-তর্ক বড় খাটে না। অন্ধের মত সেগুলিকে ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। হয তো স্বপ্নে ঐরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে। প্রথমে কেহ স্বপ্ন দেখিল, পরে ঠিক তাহাই ফলিয়া গেল। স্বপ্ন কেমন করিয়া ফলিল, সে কথাব উত্তর কে করিবে? হয় তো কেহ কোন দুর্ঘটনার কথা দূরে থাকিয়া মনের মধ্যে জানিতে পাবিলেন। কেমন করিযা মনের মধ্যে সেই পূর্বাভাস আসিল, কে তাহার কারণ নির্ণয় করিবে? অদ্ভুত স্বপ্ন দেখা আব সেই স্বপ্ন ফলা, দুর্ঘটনার পূর্বভাস প্রভৃতি হইতে প্রেতেব দেখা দেওযা পর্যন্ত সমস্তগুলিতেই সূক্ষ্ম-জগতের প্রমাণ হয়। যাঁহারা জীবনেব মধ্য বযস পর্যন্ত বাঁচিযাছেন, তাঁহাদেব অনেকেই এরূপ অনেক ঘটনা হয দেখিযাছেন কিংবা কোন বিশ্বস্ত বন্ধুব প্রমুখাৎ শুনিযাছেন। যাহাবা সূক্ষ্ম-জগৎ প্রভৃতির কথা শুনিলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকে, ঐ সকল ঘটনাব সু-ব্যাখ্যা করিযা দেওযা তাহাদেব বুদ্ধিতে কুলায না। দুনিয়াব সকল ঘটনা হাসিযা উড়াইযা দেওযা যায না। আব এরূপ বিস্ময়জনক ঘটনাব সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। যাহাবা স্বচক্ষে ঐ সকল ভৌতিক ব্যাপার দেখিযাছে, তাহাবা আর অস্বীকার করিতে পাবে না। যাহাবা শুধু অন্যেব মুখে শুনিযাছে, কেবল তাহাবাই নির্বোধ নাম কিনিবাব ভযে বিশ্বাস করিতে চাহে না। যিনি আমাদেব লেখা নির্জনে বসিযা স্থিব হইয়া পড়িবেন, তিনি দেখিবেন যে, আমি প্রলাপ বকিতেছি না। পবন্তু যাহা বলিলাম, তাহা সমস্তই সত্য।"

অধুনা তত্ত্ববিদ্যা-সমিতি ও প্রেতানুসন্ধান-সভা ভৌতিক ব্যাপাবগুলি বেশ সুযুক্তির সঙ্গে ব্যাখ্যা কবিয়া দিতেছেন। লর্ড লিটনের সময় ঐরূপ যুক্তি-তর্কেব সঙ্গে ঐ সকল ঘটনাব আলোচনা হইত না। এখন আমবা এ সম্বন্ধে বেশী বেশী সংবাদ বাখি। মহাত্মা লিটনেব উপবি-উক্ত কথাগুলি খুব খাঁটি সত্য।

প্রেতদেহে পবিভ্রমণ কবিবাব অনেকগুলি কাহিনী বলা হইল। তাহা হইতে আমবা এইটুকু বুঝিলাম যে, তীব্র ইচ্ছা হওযায প্রেতাত্মা স্থূল শবীব ছাড়িযা আসিতে পাবিযাছিল। নতুবা আসিবাব ঐ ক্ষমতা কখনই হইত না। সাধাবণ মানুষেব ঐরূপ উৎকণ্ঠাও হয না, আসিতে পাবে না। ব্যাবামে পড়িযা মবণেব আগে অনেকটা সময মানুষ অজ্ঞান হইয়া থাকিতে পাবে। ঐরূপ স্থলে প্রেতাত্মা ইচ্ছা পূর্ণ কবিবাব নিমিত্ত স্থূল শবীব হইতে বাহিবে চলযা যায। এইরূপ ব্যাপাবেব ভুবি ভূবি গল্প আছে।

প্রেতাত্মা আফিসে যাইয়া ফটোগ্রাফ চাহিয়া বসিল।

মরণেব আগে তুচ্ছ বিষযেব নিমিত্তও উৎকট ইচ্ছা হইলে অনেক সময প্রেতাত্মা বাহিব হইযা পড়ে, তাহাব খুব ভাল প্রমাণ পাওযা গিযাছে। "প্রকৃত ভূতেব গল্প" নামক পুস্তকেব ১০১পৃষ্ঠায় একপ এক‌টা গল্প লিপিবদ্ধ আছে। ১৮৯১ খৃস্টাব্দেব জানুয়াবী মাসে একটি প্রেতাত্মা প্রাতে ৮টাব সময় নিউক্যাস্‌ল্ শহবেব সুপ্রশস্ত জনপূর্ণ বড় রাস্তার ধারে একটি দোকানে যাইযা হাজিব। সেখানি ফটোগ্রাফেব দোকান। প্রেতাত্মা সহজ মানুষের মত দিব্য স্বাভাবিক ভাবে ঐ দোকানে যাইযা নিজেব ফটোগ্রাফগুলি চাহিল। প্রায় এক মাস আগে ঐখানে তাহার ফটোগ্রাফ তোলা হইযাছিল। দোকানদার বলিল, "ছবিগুলি এখনও ঠিক করা হয় নাই; আপনি কা'ল

আসিবেন।" প্রেত বলিল, "আমি আসিতে পারিব না, কাবণ, আমাকে সমস্ত বাত্রি বেড়াইতে হয।" লোকটা যে প্রেতাত্মা, তাহা প্রথমে কেহই বুঝিতে পাবে নাই। কিন্তু এক সপ্তাহ পরে তাহাব পিতা ঐ দোকানে আসিলেন। তাঁহার মুখে শুনা গেল, যখন তাঁহাব পুত্রের প্রেতাত্মা দোকানে আসিযাছিল, তখন পুত্র বাড়ীতে অচেতন অবস্থায শয্যাশায়ী। তাহাব পবে তাহার আব জ্ঞানসঞ্চাবও হয় নাই। সেই অবস্থায় তার মৃত্যু হইযাছে। প্রেতাত্মা দোকানে আসিয়াছিল প্রাতে ৮টাব সময়, আর ঠিক ঐদিনই বেলা ২৷৷০ টাব সময় তাহাব মৃত্যু হয। যিনি ফটো তুলিতেন, তাঁহাব নাম—মিঃ ডিকেন্সন্। তিনি ঐ প্রেতের রক্তমাংসের প্রকৃত শবীরটা ইহার পূর্বে কখনও দেখেন নাই। অন্য লোকে তাহার ফটো তুলিয়াছিলেন। কিন্তু ফটো দেখিয়া বেশ চিনিযা ফেলিলেন যে, এ ফটো যিনি প্রাতে আসিযা ছিলেন, তাঁহাবই। মিঃ স্টেড্ এই গল্পটি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিযাছেন—"আমরা ইহাও মনে কবিতে পাবি যে, ঐ মূর্তিটি চিন্তা-মূর্তি। এরূপ মূর্তি ও চলা-ফেবা করিতে পাবে, কথাও বলিতে পারে। চিন্তা মূর্তি যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাইতে পাবে, ইচ্ছামত পোশাক পরিচ্ছদ পবিধান কবিতেও পাবে।"

মিঃ স্টেড্ উহাকে চিন্তা-মূর্তি বলিয়া বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমবা উহাকে সূক্ষ্মদেহ বলি। চিন্তা মূর্তি বলিযা কতকগুলি মূর্তিও আছে। সেগুলি সজীব মানুষেবই প্রেত-মূর্তিবিশেষ। মানুষ অজ্ঞানবস্থায থাকিলে সময সময ঐ চিন্তা-মূর্তিব নির্গমন ঘটে। স্বতন্ত্র অধ্যায আমবা উহাব আলোচনা কবিব।

পঞ্চদশ অধ্যায়

চিন্তার মূর্তি

যাঁহাবা পরাবিদ্যাব আলোচনা কবযা থাকেন, তাঁহাবা জানেন যে, মানুষেব চিন্তারাশি অনেক সময় মূর্তি পরিগ্রহ কবে, আব সেই মূর্তিগুলি সূক্ষ্ম-জগতেব তেজস্তরে প্রকট হইযা উঠে। অপ্-তত্ত্বে অর্থাৎ ভুবর্লোকেও অনেক সময ঐ সকল মূর্তি দেখা যায়। যদি কোন লোক খুব তীব্রভাবে সমস্ত মনটুকু দিযা ভাবিতে পাবে যে, আমি অমুক স্থানে যাইব, তবে তাহাব সেই উৎকট চিন্তাব ফলে একটা মূর্তি হইযা সেই ঈপ্সিত স্থানে যাইযা হাজিব হয। মূর্তিটা ঠিক লোকটাবই মত। তাহা হইলেও উহা লোকটিব সূক্ষ্মদেহ বা প্রেতাত্মা নহে। উহা একটা স্বতন্ত্র বস্তু। প্রেতাত্মাব নির্গমন-কালে প্রকৃত মানুষটা বহিব হইযা যায, কেবল স্থূল শবীরটা অচেতন অবস্থায পডিয়া থাকে , আব চিন্তা মূর্তিব বহির্গমনকালে প্রেতাত্মা কি না আসল মানুষটা কোথাও যায় না, স্থূলদেহেব মধ্যেই থাকে। মাত্র তাহাব চিন্তা ঘনীভূত অবস্থায় দৃশ্যমান হইযা অন্যত্র যায। স্থূলদেহেব সহিত প্রেতাত্মাব একটা বন্ধন থাকে, বাহিবে গেলেও আবাব ফিবিযা আইসে। চিন্তা-মূর্তিব সেরূপ কোন বন্ধন থাকে না। যোগৈশ্বর্যসম্পন্ন ব্যক্তিবা এই চিন্তাব মূর্তিব উদ্ভব কবিযা অনেকরূপ কার্য করেন, কিন্তু সাধাবণ লোকেব পক্ষে চিন্তা-মূর্তি গডিযা তোলা সহজ নহে। অনেক সময এই মূর্তি অপবেব দৃষ্টিগোচবও হইযা থাকে। লোকে তখন ইহাকে আসল মানুষ বলিযা মনে কবে। লোকে দেখিতে পায, এমন একটা সুন্দব সুস্পষ্ট মূর্তি গঠন কবিতে হইলে চিন্তা বা বাসনা খুব তীব্র হওযা আবশ্যক। এরূপ প্রকট মূর্তিব উদ্ভব কবিতে হইলে তিনটি কার্যেব কোন একটি কবা চাই। (১) যাহাব সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, তাহাব মনেব মনে মধ্যে নিজেব চেহাবাটা জাগাইযা ফুটাইযা তুলিতে হইবে। এ কৌশল সাধনা কবিযা শিখিতে হয, (২) যাহাব সঙ্গে দেখা কবিতে হইবে, তাহাব সূক্ষ্ম-শক্তিগুলিকে এরূপভাবে উদ্‌বুদ্ধ কবিযা তুলিতে হইবে, যেন সে চিন্তাকাবীব সূক্ষ্ম-দেহটা দেখিতে পায—এটাও সাধনাব ব্যাপাব, অথবা (৩) নিজেব নিজেব চিন্তাকে ঘনীভূত কবিযা স্থূল আকাবে পবিণত কবিযা তুলিতে হইবে, তাহা হইলে অপবেব গোচবীভূত হওযা যায। তিনটিব একটা না একটা কবা চাই। একটা গল্প বলিব, তাহাতে শেষেব শক্তিটি প্রকাশ পাইযাছিল। গল্পটি এই—

উদ্বেগের ফল

আলেক্‌জন্দব ড্রমণ্ড নামে একজন চিত্রকব ছিলেন। তাঁহাব কাববাব খুব বড, অনেক লোকজন খাটিত। ওযাল্‌টাব সুটাব নামে তাঁহাব এক জন শ্যালক কেবাণীব কাজ কবিতেন। দোকানটি ডণ্ডী সহবেব নর্থগেট বাস্তাব উপবে। সুটাব প্রত্যহ প্রাতে ৬টাব সময দোকানে যাইযা, লোকজন কে কি কাজে লাগিল, মাল মশলা কথা কি আছে, এই সব তত্ত্বতল্লাস কবিতেন। ড্রমণ্ডেব কন্যাও তাঁহাব সাহায্য কবিতেন। এক দিন প্রাতে ৬টাব সময সুটাব দোকানে আসিতে পাবিলেন না, কিন্তু ঠিক ৬--২০মিনিটেব সময খুব ব্যস্তসমস্ত হইযা ঘবে ঢুকিলেন। যে

ডেস্কের কাছে ড্রমণ্ড ও তাঁহার কন্যা সুটারের প্রতীক্ষা কারিতেছিলেন, সুটার সেখানে না আসিয়া সটান সম্মুখের দোকানে ঢুকিলেন; সেখান হইতে একটা দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। এই ব্যাপারটা ড্রমণ্ড ও তাঁহার কন্যা দুই জনেই দেখিলেন। আরও বিস্তর লোক দেখিল। ইহার ঠিক২০মিনিট পরে "সুটার" ব্যস্ত-সমস্ত হইযা দোকানে আসিলেন। আসিয়া বলিলেন—"আজ আমার দোকানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, কাবণ, আমার ৬—২০মিনিটের সময় ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, বড় বেশী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। বিলম্ব হইল ভাবিয়া আমি দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছি।" সুটার আধক্রোশ দূরে থাকিতেন। তিনি বরাবরই ঠিক ৬টায় আসিতেন। বড় খোঁটী খাঁটি, কখন এক সেকেণ্ডেরও এদিক্ ওদিক্ হয় না। কথাগুলি শুনিয়া ড্রমণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রথমবারে আসিয়া তুমি কোথায় গিযাছিলে?" ড্রমণ্ডের প্রশ্ন শুনিয়া সুটার যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সুটারের কথা ঠিক কি না অর্থাৎ সুটার ঠিক ৬—২০মিনিটে জাগিয়াছিল কি না, তাহা জানিবার জন্য ড্রমণ্ড সেই দিন বৈকালে সুটারের স্ত্রীর কাছে গেলেন। স্ত্রীও ঠিক ঐরূপই বলিল। সুটারের স্ত্রীও বলিল যে, সুটার ৬—২০মিনিটে জাগিয়াছেন, আর জাগিয়া বিলম্ব হইল ভাবিয়া খুব ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়িলেন। কারণ, এরূপ ভাবে আর কখনও ঘুমাইয়া পড়েন নি।

মিঃ স্টেড "প্রকৃত ভূতের গল্প" নামক পুস্তকেব ৪১পৃষ্ঠায় এই গল্পটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যিনি তাঁহাকে গল্পটি বলিয়াছিলেন, তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত বাক্তি, ২৫ বৎসর পুলিশ কমিশনাব ছিলেন। তাহা ছাড়া ডণ্ডী সহবে ম্যাজিস্টেটের পদেও পাঁচ বৎসর কার্য কবিয়াছেন। এরূপ লোকের কথা কখনই অবিশ্বাস করা যায় না। এরূপ গল্প শুধু এইটিই জানা গিয়াছে, এমন নহে, এরূপ ব্যাপাব বিস্তর ঘটিয়াছে, বহু লোকে এরূপ কাণ্ড দেখিযাছে। "প্রকৃতির নৈশ দিক্" নামক পুস্তকে ক্রো নাম্নী রমণী অনেকগুলি এই বকমের গল্প বলিয়াছেন। উহাদেব মধ্যে আমরা পাঠকবর্গকে কয়েকটি উপহার দিতেছি।

ট্রিপ্লিন নামক এক ব্যক্তির প্রেতাত্মা

স্টিলিং নামক জনৈক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, ট্রিপ্লিন সরকারী কর্মচারী ছিলেন। তিনি উইমার সহবে থাকিতেন। এক দিন একখানি প্রয়োজনীয় দলিল আনিতে আফিসে যান। আফিসে ঢুকিয়াই দেখেন যে, ঠিক তাঁহাবই মত অপর এক ব্যক্তি সেই দলিলখানি সম্মুখে কবিয়া বসিয়া আছে। ঐরূপ দেখিয়া তাঁহার মনে ভযেব সঞ্চার হইল। তখন বাড়ী আসিয়া চাকরাণীকে বলিলেন—"টেবিলের উপর কাগজখানি আছে, তুমি যাইয়া লইয়া আইস।" চাকরাণী তাঁহার আদেশমত উহা আনিবার নিমিত্ত আফিসে যাইয়া দেখে যে, তাহার মনিব বসিয়া আছেন। তখন সে মনে কবিল, তাহার মনিব বুঝি বা অন্যপথ দিযা তাহার আগেই আসিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, মনিবের মন আগেই আফিসে আসিয়া মূর্তি ধরিযা বসিয়াছিল।"

সরিফের কার্যাধ্যক্ষ

ফ্রাঙ্ক ফোর্ট সহরের জনৈক সরিফ তাঁহার কার্যাধ্যক্ষকে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছিলেন। রওনা হইবার পরই তিনি ফিরিয়া আসিয়া ঢুকিয়া একখানা পুস্তক হাতে করিলেন। সবিফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যেতে-না-যেতেই আবার ফিরিয়া আসিলে কেন?" যেমন এই প্রশ্ন, অমনই কার্যাধ্যক্ষের

মুর্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল, আর বহিখানিও ধপাস্ কবিয়া মাটিতে পড়িল। পুস্তকখানির নাম লিনস্ (Liunaeus)। সন্ধ্যাকালে কার্যাধ্যক্ষ ফিরিয়া আসিলেন। সবিফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত গিয়াছিলে, যাইয়া কিরূপ ভাবে কাজকর্ম কবিলে?" তিনি উত্তবে বলিলেন, যাইতে যাইতে জনৈক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইযাছিল; তাঁহাব সঙ্গে উদ্ভিদ্ তত্ত্ব লইযা আমাব মহাতর্ক উপস্থিত হয, তখন আমার মনে হইতে লাগিল,'হায! যদি লিনস্ বইখানা এ সময় আমার সঙ্গে থাকিত, তবে তাহা দেখাইয়া বন্ধুকে নিরুত্তব করিতে পাবিতাম।'

সূক্ষ্ম-মূর্তি প্রাযই দেখা দিত

এডওয়ার্ড ষ্টর্ণ এক জন জর্মাণ গ্রন্থকাব। তাঁহার জনৈক বন্ধুর সূক্ষ্ম মূর্তি প্রাযই স্থূল শরীব ছাড়িযা দেখা দিত। ঐ ব্যক্তিব পিতারও ঐ দশা ঘটিত। পিতা হয় তো মাঠে কাজ করিতেছেন, অথচ তাঁহার সূক্ষ্ম-মূর্তি বাড়ী আসিয়া ঘুরিযা বেডাইতেছে; পুত্রবধূ প্রভৃতির সঙ্গে গল্পস্বল্পও করিতেছে। এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার!

"এবার্সডর্ফ" নামক স্থানে সন্ন্যাসিনীদিগেব মঠ আছে। পাক করিবাব নিমিত্ত তথায় অবশ্যই এক জন পাচিকা থাকে। পাচিকা বান্নাঘারে বসিযা বান্না কবিতেছে, বাঁধিবাব সময তাহার শাকেব প্রযোজন্ হইল দেখা গেল, পাচিকাবই প্রেতাত্মা বাগানে যাইয়া শাক তুলিতে আবম্ভ কবিয়া দিয়াছে।

রোমের একটি অদ্ভুত গল্প

কিছু দিন আগে "ডাব্লিন্ ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিন্" নামক পত্রিকায একটি অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশিত হইযাছিল। ঘটনাটি বোমেব। বিববণ এইরূপ ঃ—জনৈক ভদ্রলোক ভ্রমণ কবিবাব পর বাড়ী আসিলেন। চাকব তাঁহাকে দেখিয়া অবাক্। সে বলিল, "মহাশয, আপনি তো কিছু আগেই আসিয়াছেন, আপনাব সঙ্গে উপর-তলায যাইয়া আপনার পোশাক পবিচ্ছদ খুলিয়া আপনাকে শযনঘবে শুইতে দিযা আমি নীচে আসিযাছি। আবাব এখন কোথা হইতে আসিতেছেন? একই মানুষ দুই-দুইবাব আসিল। এ যে ভয়ানক আশ্চর্য ব্যাপার দেখিতেছি।" তিনি বলিলেন—"কই আমি তো আসি নাই; চল, উপবে কে গেল দেখি গিয়া।" এই কথা বলিযা তিনি চাকবেব সঙ্গে উপরের শযন ঘবে গেলেন। চাকর যে পোশাক খুলিয়া বাখিয়াছে বলিল, সে পোশাক পরিচ্ছদ কিছুই নাই। শুইলে বিছানা যেমন জড়সড হইযা থাকে, দেখা গেল, বিছানাটি সেইরূপ হইয়া রহিযাছে, ঠিক যেন কিছু আগে কেহ শুইয়াছিল আব দেখা গেল, ঘরেব মধ্যে ছাদের গায় কি রকম দাগ রহিয়াছে, বিদ্যুৎ চলিয়া গেলে যেরূপ ঝল্‌সা পোড়া দাগ হয, ঐ দাগটাও ঠিক সেইরূপ। তিনি বড়ই চমৎকৃত হইলেন। ভাবিয়া আর স্থিব কবিতে পাবেন না, যে কেন এমনটি হইল। শেষে মনে পড়িল যে, বাহিবে থাকাব কালে মহাক্লান্ত হইয়া তিনি একটিবার চিন্তামগ্ন হইয়া পড়েন। খানিকটা সময়ের জন্য তাঁহার মনেই ছিল না যে, তিনি বাহিবে আছেন। মনে হইতেছিল, যেন বাড়িতেই আছেন।

এই গল্পটি বড়ই আশ্চর্যজনক। অনেকের মনে হয, পোশাক খুলিয়া দেওয়ার কথা আর ছাদের গায়ে সেই দাগটিব উল্লেখ, এ দুটিই অতি রঞ্জিত। এই অধ্যায়ের যতগুলি গল্প বলা হইল, সবগুলিই চিন্তামূর্তিব কাহিনী। মূর্তিগুলি প্রেতাত্মার নহে, সবগুলিও চিন্তামূর্তি, কেন না, প্রত্যেক স্থলেই দেখা যাইতেছে যে, আসল মানুষটা জাগিয়া ছিল অথচ দূরবর্তী স্থানে তাহার অবিকল মূর্তি বিচরণ করিয়া বেড়াইয়াছে।

পুরোহিতের একটা সূক্ষ্ম-মূর্তি

লেডবিটার সাহেব নিজেও একবাব নিজেব সূক্ষ্মমূর্তি দেখিযাছিলেন। সেটিকেও চিন্তা-মূর্তি বলিয়া ব্যাখ্যা কবা চলে। তিনি এইরূপ বলিযাছেনঃ—"অনেক দিন আগে আম একটি পল্লীতে পুবোহিত ছিলাম। তখন বিশেষ কোন কাবণে আমাব শবীবটা বডই রুগ্ন ও দুর্বল হইযা পডে। ববিবাবেব কাজকর্ম কবিয়া উঠা আমার পক্ষে যেন একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। উঠিলে কি হয, অতিকষ্টে কাজগুলি কবিলাম। কিন্তু ভযানক ক্লান্ত হইয়া পডিলাম। সন্ধ্যাব সমযও অনেক কাজ কবিবার ছিল। ভাবিতেছিলাম, সেই কাজেব ধাক্কাটা গেলেই অনেকটা বিশ্রাম কবিতে পাইব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি ধর্ম মন্দিরের দিকে চলিলাম। ঘবের মধ্যে যাইয়াই যাহা দেখিলাম, তাহা অতীব বিস্ময়জনক—দেখিযা আপাদমস্তক কাঁপিযা উঠিল! দেখিলাম, ঠিক আমবাই মত একটি লোক চেয়াবে বসিযা আছে। এ চেয়ারখানি ছাডা আব চেয়াব ছিল না। তাহার উপবে আবাব এই বকম কে জন বসিয়া বহিযাছে। আমাব যেমন পোষাক পবা, উহাব গাযেও ঠিক সেইরূপ পোষাক। লোকটা বিষন্নভাবে অথচ একদৃষ্টে আমাব দিকে চাহযা বহিল। যে সময এই ঘটনাটি ঘটে, তখন আমি পববিদ্যাব আলোচনা করিতাম না, তাই এই অদ্ভুত ব্যাপাবেব কাবণও নির্দেশ কবিযা উঠিতে পাবিলাম না। কিন্তু তখন শুনা ছিল যে, যদি কোন লোক নিজেব সূক্ষ্ম মুর্তি দেখিতে পায, তবে সে খুব শীঘ্রই মারা পড়ে। কিন্তু আমি সে সময়টা এত ক্লান্ত হইযা আসিযাছিলাম যে, লোকটি কে, হয তো আমি মরিব, এ সব চিন্তা কবিবাব সামর্থ ছিল না। আমি সটান সেই লোকটাব কাছে গেলাম, আব চেয়াবেব উপব, বলিতে কি, লোকটাব ঘাড়ের উপব বসিয়া পড়িলাম। সে জন্য কোন ত্রুটি স্বীকারও করিলাম না। তাহাব পর সেই লোকটার কি হইল, কোথায গেল, তাহা জানি না; কেন না, ১০দশ মিনিট পবে যখন আমি একটু সুস্থ হইযা উঠিলাম তখন সেই মূর্তিটি আব সেখানে ছিল না। ইহার পর আর কোন কিছু ঘটে নাই। তাহাব পর সেইরূপ ব্যাপারও আব কখন দেখি নাই। আমাব মনে হয যে, পুবোহিত্যের দৈনন্দিন কার্যেব দিকে আমাব ঐকান্তিক যত্ন থাকিলেও আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে নিরন্তরই একটা বিশ্রামের ইচ্ছা জাগিতেছিল। আর ঐ প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাবশেই মনে মনে এমন একটা মূর্তি গঠিত হইযাছিল, যেন ঘবেব মধ্যে চেয়ারে আমি উপবিষ্ট আছি, আর কার্যশেষে বিশ্রাম কবিতেছি। শরীরটা দুর্বল হওয়ায অন্তবেন্দ্রিয়গুলি সতেজ হইযা উঠিয়াছিল। আর সেই জন্যই আমার চিন্তা মূর্তিটি দেখিবার মত দিব্যচক্ষু ফুটিয়াছিল।"

ষোড়শ অধ্যায়

ভূতযোনি আসিয়া মৃত্যু সংবাদ দিয়া যায়

মানুষের প্রেত-মূর্ত্তি অনেক সময় স্থানান্তরে যাইয়া অনেকের সঙ্গে দেখাশুনা করে, কথাবার্ত্তা বলে, এ সব কথা আমরা পূর্বে বিশেষ করয়া বলিয়াছি। খাঁটি ভূতগুলিও ঠিক ঐরূপ; ঠিক ঐ সূক্ষ্ম-দেহের মত। ভূতেরা প্রায়ই মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে না। কেবল যখন দেখা করিবার নিতান্ত প্রযোজন হইযা উঠে, তখনই তাহাবা মানুষকে দেখা দেয। অনেক সময় তাহাদেব দেখা দিবার উদ্দেশ্যও আমরা সম্যক বুঝিতে পাবি না। ভূতের আবার দেখা কবিবার প্রযোজন। এ কথা শুনিলে অনেকে বিস্মিত হইতে পাবে; কিন্তু বিস্মিত হইবার কারণ নাই। যে সব লোক বাঁচিযা আছে, তাহাদেবও কার্যকলাপ মনেব ভাব, উদ্দেশ্য প্রভৃতি আমবা অনেক সময় বুঝিতে পাবি না। তবে ভূতের উদ্দেশ্যই বা সব সময় কেমন কবিয়া বুঝিব? দেখা যায়, জীবিত মনুষ্যেরাও তুচ্ছ বিষযে অনেক সময অনেক উৎসাহেব অপব্যয় করিয়া থাকে। হয তো কেহ ক্ষণস্থাযী বাসনা বা খেয়াল চবিতার্থ কবিবাব নিমিত্ত ব্যস্ত, হয তো কেহ তুচ্ছ অর্থ উপার্জনে বা কাহাবও সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায জয়ী হইবাব জন্য ঘোর উৎসুক, কিংবা হয তো কেহ কাহারও অনিষ্ট করিতে বা কাহারও উপর প্রতিশোধ লইতে প্রাণপণ কবিতেছে। সাধারণ মানুষ এইরূপ তুচ্ছ বিষয়ে সর্বদাই মহাব্যস্ত থাকে। তাহাদেব সময় ও উৎসাহ যদি এইরূপে নষ্ট না হয, যদি তাহারা ঐ সময ও উৎসাহের সদ্ব্যবহার কবে, তাহা হইলে মহোপকার হয, সন্দেহ নাই। সময ও উৎসাহেব যথাযথ ব্যবহাব কবিতে পা বিলে তাহাব আত্মোন্নত করিয়া লইতে পারে। মানুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, বুদ্ধিশুদ্ধি হইবার পরও যে কেন তুচ্ছ বিষয়ে সময় নষ্ট কবে, সেটা বুঝিয়া উঠা বাস্তবিক কঠিন। প্রবীণ লোকেও যে তুচ্ছ বিষযে ব্যস্ত থাকে, আমবা প্রত্যহই তাহা দেখিতে পাই।

মানুষ মরিয়া গেলে বিশেষ, একটা কিছু পবিবর্তন ঘটে না, স্থূল শবীবটা খসিয়া যায মাত্র। জীবিত অবস্থায় যেরূপ বুদ্ধি-শুদ্ধি ও যেরূপ প্রকৃতি থাকে, মরযা গেলেও তাহার জীবাত্মার সে সব ঠিক সেইরূপই থাকে। স্বভাবের একটুও এদিক্ ওদিক্ হয় না। যেমন স্বভাব, ঠিক তেমনই থাকে। বাঁচিয়া থাকার সময় যখন তুচ্ছ বিষযে মানুষ ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন মরিয়া গেলে তাহার জীবাত্মা বা ভূত যোনি তুচ্ছা বিষয়ের জন্য আত্মীযস্বজেনের সঙ্গে দেখা কবিবে, সেটা আর আশ্চর্যেব বিষয় নহে। ভূত অনেক সময মানুষের সঙ্গে দেখাশুনা করিযাছে; কিন্তু খুব বেশী স্থলেই কোন ভালবাসাব মানুষের কাছে আসিয়া নিজের মবণ সংবাদটা দিয়া গিয়াছে। মৃত্যু সংবাদ দিতে আসে, এইটিই বেশী দেখা যায। সেনাপতি হুইট্‌ক্রফট্ মরিয়া গেলে ভূত হইযা আসিয়া তাঁহাব স্ত্রীকে সংবাদ দিয়াছিলেন। সে গল্পটি বড চমৎকার! মৃত্যু সম্বন্ধে সরকারী কাগজে তারিখের ভুল হইযাছিল। সেনাপতির ভূতযোনি আসিয়া সে ভুল সংশোধন করিয়া দেয়। মিঃ আর, ডি, আউয়েনেব "পদসঞ্চাব" নামক গ্রন্থের ২০৯ পৃষ্ঠায় গল্পটি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জনৈক কর্মচারীর প্রত্যাগমন

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সেনাপতি হুইট্‌ক্রফট্ ৬নং অশ্বারোহী সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন।

তাঁহার স্ত্রী ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ শহরে ছিলেন। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর রাত্রির শেষভাগে স্ত্রী স্বপ্ন দেখিলেন যে, তিনি যেন স্বামীকে দেখিতেছেন ; স্বামী অসুস্থ ও উদ্বিগ্ন। স্বপ্ন দেখিয়াই জাগিলেন। শুধু জাগা নয়, ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন বাহিবে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না। জাগিয়া তিনি ভাল করিয়া চাহিলেন। চহিয়াই দেখিলেন যে, তাঁহার বিছানার পার্শ্বে স্বামীর মুর্তি দাঁড়াইয়া বহিয়াছে। মূর্তির পরণে সেনাপতির পোষাক, হাত-দুখানা জড হইয়া বুকের উপরে আছে; চুলগুলি আলুথালু; মুখখানি বড়ই ম্লান। স্ত্রী দেখিলেন, মূর্তিটির বড় কাল চোখ দুটি তাঁহার উপরে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। চোখ দুটিতেও খুব একটা উদ্বেগ প্রকাশ পাইতেছিল। তাঁহার স্বামীর হইলেই মুখে একরূপ বিশেষ রকমের সঙ্কোচ দেখা যাইত। দেখিলেন, মূর্তিটির মুখেও সেইরূপ সঙ্কোচ এখন বিদ্যমান। তিনি খুব ভাল করিয়া স্বামি-মূর্তির পোষাক পরিচ্ছদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। এইরূপ ভাবে দেখা তাঁহার বরাবরই অভ্যাস ছিল। আরও লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, জড়-করা হাত দুটির মধ্য হইতে বুকের উপবকার যে সাদা কামিজাংশ দেখা যাইতেছে, তাহাতে রক্তের দাগ নাই। কামিজটাও বেশ সাদা ধপধপে আছে। তাঁহার মনে হইল, যেন ঐ মূর্তি বেদনাপ্রযুক্ত সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া পডিতেছে আর যেন কথা বলিবার ও চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু কোনরূপ স্বর বাহির হইতেছে না। মূর্তিটা এইরূপ ভাবে এক মিনিটকাল দেখা দিয়াছিল। তাহহার পরই মিলাইয়া গেল।

"রমণী মূর্তিটি দেখিয়া প্রথমে ভাবিলেন—আমি সত্যই জাগিয়া আছি না স্বপ্ন দেখিতেছি? জাগিয়া আছেন কি না, ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য তিনি বিছানার চাদরের একটা মোড় তুলিয়া ভাল করিয়া চোখ দুটি মুছিলেন। চোখ মুছিতে মুছিতে বুঝিলেন যে, সত্যই জাগিয়া আছেন। তাঁহার একটি ছোট ভাই-পো তাঁহার কাছে ঘুমাইতেছিল। তাহার বুকের উপর নীচু হইয়া কান পাতিয়া তাহার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিলেন। তখন বুঝিতে পারিলেন যে, স্বপ্ন নয়, বাস্তবিকই জাগিয়া আছেন। সে রাত্রে তাঁহার ঘুম হইল না।

"রাত্রি প্রভাত হইলে তাঁহার মায়েব কাছে সমস্ত ব্যাপার বলিলেন। আর বলিলেন—'মা, যদিও আমার স্বামীর কোন স্থানে রক্তের দাগ দেখি নাই তথাচ আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, তিনি নিহত হইয়াছেন, নয় গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন।' এই ভূতযোনি দেখিয়া স্বামীর মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার এতই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি শোকে অধীরা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন হইতে তিনি মনের কষ্টে কোন স্থানে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেন না। কেহ নিমন্ত্রণ করিলে ফিরাইয়া দিতেন। একদিন তাঁহার একজন সখী তাঁহাকে বলল—'ভাই, আমার স্বামী মল্টা নামক দ্বীপ হইতে আমার জন্য একটা সুন্দর পোষাকী জামা পাঠিয়েছেন। আজ সেটা পরিয়া নাচ করিব। তোমাকে, ভাই, সাজিয়া গুজিয়া আমার সঙ্গে যাতেই হইবে।' শুনিয়া তিনি বলিলেন —'যত দিন না আমি আমার স্বামীর হাতের পত্র পাই, তত দিন বুঝিতেই পারিতেছি না, আমি বিধবা কি সধবা; এ অবস্থায় আমি কখনই আমোদ-প্রমোদ করিতে পারি না, আমাকে আব অনুরোধ করিও না; ১৪ই তারিখের পরের পত্র পাইলে বুঝিব, তিনি বাঁচিয়া আছেন, নচেৎ বুঝিব, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।'

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দেব ডিসেম্বর মাসে, মঙ্গলবারে, সেনাপতি হুইটক্রফটএর মৃত্যু-সংবাদের টেলিগ্রাম লণ্ডনে প্রচারিত হইল। টেলিগ্রামে প্রকাশ— তিনি ১৫ই নভেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌ শহরের নিকট নিহত হইয়াছেন।

"এই দারুণ সংবাদটি লণ্ডনে প্রাতেই সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়. উহা মিঃ উইল্‌কিন্সনেব চোখে পড়ে। তিনি লণ্ডনের একজন উকীল। সেনাপতির সংসার দেখাশুনার ভার ঐ উকীলের উপর ন্যস্ত ছিল। কিছুকাল পরে তিনি সেনাপতির স্ত্রীর নিকট যাইয়া এই দারুণ সংবাদ দিলেন। রমণী বলিলেন, 'আমি ইহা পূর্বেই জানিয়াছি; আর আপনি বলিতেছেন, আমার স্বামী ১৫ ই নভেম্বর মারা গিয়াছেন, সেটা ভুল কথা, তিনি তাহাব আগেই মারা পড়িয়াছেন। আমি১৪ই শেষ রাত্রে তাঁহাকে দেখিয়াছি। তিনি প্রেতমূর্তিতে আমায় দেখা দিয়াছিলেন।'

"যুদ্ধ -অফিস ইতে একটা মৃত্যুর সার্টিফিকেট লওয়া তখন মিঃ উইল—কিন্সনের কর্তব্য হইয়া উঠিল। শুধু টেলিগ্রামের উপর নির্ভর করা চলে না তাই তিনি সার্টিফিকেট লইলেন। তাহাতেও ঐ ১৫ই তাবিখে মৃত্যুর কথাই পাওয়া গেল। সার্টিফিকেটখানা এইরূপ ঃ—

নং ৯৫৭৯ যুদ্ধ অফিস;

৩০শে জানুয়ারী, ১৮৫৮

এই মর্মে সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতেছে যে, এই অফিসেব কাগজপত্র দেখিয়া মনে হয, ৬নং অশ্বারোহী গার্ড দলেব সেনাপতি জর্মান্ হুইটক্রফট ১৮৫৭খৃষ্টাব্দের ১৫ ই নভেম্বব তারিখে যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

(স্বাক্ষর) বি, হাউজ।

"মিঃ উইল্‌কিন্‌সন্ টেলিগ্রামে ও সার্টিফিকেটে মৃত্যুব তাবিখ দেখিলেন ––১৫ই নভেম্বব, আবার সেনাপতির স্ত্রী দৃঢতার সঙ্গে বলিলেন, ঐ তাবিখ ১৪ই নভেম্বব। কাজে কাজেই উইল্‌কিন্সনের মন সন্দেহেব দোলায দুলিতে লাগিল। কোন্ তাবিখটা ঠিক, ভাবিযা স্থিব করিতে পাবিতেছেন না, ঠিক এমন সময একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। তাহাতে তাঁহাব সন্দেহ আবও বাড়িযা গেল। তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, টেলিগ্রামেব ও সার্টিফিকেটেব তারিখ হয তো ভুল। ব্যাপারটা এইরূপঃ— উইলকিন্‌সন এক দিন জনৈক বন্ধুর সঙ্গে দেখা কবিতে গিযা ছিলেন। বন্ধুর স্ত্রী প্রাযই ভূত-প্রেত দেখিতে পাইতেন। সাবাটি জীবনই তাঁহাব ঐ দশা। যত ভূত তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া চাপিত। আবার বন্ধুটিও প্রায সেইরূপ। তাঁহার ঘাড়েও অতি সহজে ভূত আসিত। তাঁদের নাম ধাম আমরা খুব ভালরূপই জানি, কিন্তু প্রকাশ করা অকর্তব্য বিবেচনায পরিচয় দিতেছি না। পাঠক মনে করুন, যেন তাঁহাদের নাম মিঃ ও মিসেস্ এন্। উহাবা যে সহজে ভূতাবিষ্ট হইতেন, সে কথা উহাদেব বুন্ধ-বান্ধব ব্যতীত বাহিবেব লোকে বড একটা জানিত না।

"তাই বলিতেছিলাম, মিঃ উইলকিন্সন্ এক দিন ঐ বন্ধুটিব সঙ্গে দেখা কবিতে যান। যাইযা গল্পপ্রসঙ্গে উঁহাদিগকে হুইট্‌ক্রফটেব স্ত্রীব স্বপ্ন বৃত্তান্তটা বলিলেন। কেমন কবিয়া তাঁহাব প্রেতমূর্তি বুকের উপব হাত জড করিয়া আসিযা স্ত্রীব শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইযাছিল- –সমুদয গল্পটি কবিলেন। শুনিযা মিসেস্ এন তাঁহার স্বামীব দিকে চাহিযা বলিলেন-—'যে দিন আমরা ভারতবর্ষের আলোচনা করিতেছিলাম, সেই দিন একটা মূর্তি দেখিতে পাই, মনে আছে ত? এ ঠিক সেই মূর্তি। মিঃ উইলকিন্সন্ যেরূপ পোশাকেব কথা বলিতেছেন, যেরূপ হাত জড করিয়া বুকেব উপব বাখার কথা বলিতেছেন, যাতনায় সন্মুখদিকে যেরূপ ঝুঁকিয়া পডার কথা

শুনিতেছি—এ সবই ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইতেছে।' মিসেস্ এন বক্তার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, ঠিক, এই মূর্তি ঠিক, সে দিন আমাব স্বামীর পিছন দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার বাঁ কাঁধেব উপর দিয়া মুখ বাড়াইযা দেখিতেছিল।'

"উইলকিন্সন জিজ্ঞাসা কবিলেন—'তাহার নিকট হইতে আপনাবা কোন সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন কি?'

"মিসেস্ এন বলিলেন—'হ্যাঁ ভূতটি আমার স্বামীর ঘাড়ে আসিযা চাপিল, সুতরাং স্বামীব মুখ দিয়া সে একটা সংবাদ দিয়া গেল।'

'আপনাব সে সংবাদেব তাৎপর্যটা মনে আছে কি?'

"মিসেস্ এন্ বলিলেন—'যে দিন দেখা দিল, সেই দিনই বৈকালে ভাবতবর্ষে লোকটি মারা গিয়াছিল, বুকে দারুণ আঘাত লাগায় মৃত্যু হইযাছিল। আরও জানা গিয়াছিল যে, শবটা তখনও কবব দেওয়া হয নাই।' মিসেস্ এন্ আরও বলিলেন যে, ভূতেব কথাগুলি তাঁহাব বেশ মনে আছে।

'কখন এই ভূতযোনি আপনাদেব এখানে আসিয়াছিল?'

'কয়েক সপ্তাহ হইল, বাত্রি প্রায ৯টাব সময়; কিন্তু তাবিখটা আমাব ঠিক মনে পডিতেছে না।'

'তাবিখটা মনে পড়ে, এমন অন্য কোন ঘটনা সেদিন ঘটে নাই কি? এই প্রশ্ন শুনিয়া—মিসেস এন্ চিন্তা কবিতে লাগিলেন। পবে বলিলেন—কই এমন তো কিছু মনে পড়িতেছে না। কেবল একটা কথা মনে আছে যে, ঠিক সেই দিন এক জন ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিতে আসিযাছিলেন। আমিও তাঁহাব সঙ্গে গল্প কবিতেছিলাম। ঠিক সেই সময় একটি লোক জর্মণদেশীয় ভিনিগাব বিক্রয় কবিতে আইসে। আমিও বলিলাম যে, ইংলণ্ডের ভিনিগার ভাল। শুধু বলা নহে, আমি পবীক্ষাব জন্য এক বোতল কিনিযাও বাখিলাম।'

'তাব দাম সে সময দিযাছিলেন কি?'

'হ্যাঁ, আমি চাকব দিযা দাম পাঠাইযা দিযাছিলাম।'

'দাম পাইযা বিক্রেতা বসিদ দিয়াছে কি?'

'আমাব মনে হইতেছে—দিযাছে। কিন্তু বসিদখানি উপবে আছে দাঁড়ান দেখি।' মিসেস এন্ বিল ও রসিদ আনিলেন। দেখা গেল, তাহাতে তারিখ বহিযাছে—১৪ই নভেম্বর।

"এই তারিখ দেখিয়া মিঃ উইলকিনসনেব ধ্রুব বিশ্বাস হইল যে, হুইট্‌ক্রফটের স্ত্রীর স্বপ্নই সত্য—তাঁহার ধারণাই ঠিক। বুঝিলেন, মৃত্যুটা ঠিক১৪ই নভেম্বরই হইযাছে। তখন মেসার্স কক্‌স এণ্ড গ্রীনউডেব আফিসে গেলেন। যাইযা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাবা হুইট্‌ক্রফটের যে মৃত্যুর সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তাহাতে তাবিখ সম্বন্ধে কোনরূপ ভুল আছে কি না? কিন্তু আফিসেব কর্মচাবীবা কোনরূপ ভ্রম বুঝিতে পাবিলেন না।

'স্যর কলিন্ কাম্বেল দুইটি বিবরণেব মাঝে সেনাপতি হুট্‌ক্রফটেব মৃত্যুব কথা লিখিযাছেন। দুইটিতে ১৫ ই নভেম্ববেব কথা। এই তারিখেব সঙ্গে টেলিগ্রামেব তারিখেরও খুব মিল।'

"ভুল সংশোধনের আপাততঃ আর কোন উপায রহিল না। কাজে কাজেই সকলে কিছুদিন চুপচাপ করিয়াই থাকিলেন। অবশেষে ১৮৫৮খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে হুইট্‌ক্রফটেব স্ত্রী সেনাপতি জি, সি-র নিকটা ইতে একখানি পত্র পাইলেন। পত্রখানি ১৮৫৭খৃষ্টাব্দেব ১৯শে ডিসেম্বব তারিখে লক্ষ্ণৌ হইতে লিখিত। পত্রপাঠে জানা গেল, সেনাপতি হুইট্‌ক্রফট ১৪ই নভেম্বব

তারিখে বৈকালে লক্ষ্মৌর সন্নিকটে বীরত্বের সতি সৈন্য পরিচালন করিতে করিতে বুকে একটি গোলা লাগায় মারা পড়িয়াছেন। সেনাপতি জি,সি লিখিয়াছেন যে, ক্যাম্বেল ১৫ই তারিখে মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা ভুল। মৃত্যু ১৪ই তারিখের বৈকালে হইয়াছে। হুইট্‌ক্রফট ও আমি, আমরা দুজনে একসঙ্গে সৈন্য চালাইতেছিলাম। তিনি আমার পার্শ্বে মারা পড়িলেন। আমি স্বচক্ষে তাঁহার মৃত্যু দেখিয়াছি। গোলার আঘাত লাগায় পর তিনি আর কথা বলেন নাই। দিলকুশা নামক স্থানে তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে। ৯নং ভল্লধারী অশ্বারোহী সেনাদলের লেপ্টনান্ট আর হুইট্‌ক্রফটের বন্ধু। ইনি কবরের উপর একখানি কাঠের ক্রুশ পুতিয়া দিয়াছেন। সেই ক্রুশে সংক্ষেপে জি, ডবলিউ লেখা আছে; ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর তারিখে মৃত্যু—এ কয়টি কথাও খুদিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"যুদ্ধের আফিস পরিশেষে মৃত্যু-তাবিখের ভ্রম সংশোধন করিয়াছিল। সংংশোধনটা কিন্তু এক বৎসর পরে করা হয়. বেশ অবসর পাওয়ায় মিঃ উইল্‌কিন্‌সন ১৮৫৯ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাশে আর একখানি সার্টিফিকেট পাইবার দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঠিক আগেকার মত একখানি সার্টিফিকেট দেওয়া ইল। কেবল তারিখের বেলায় ১৫ই নভেম্বর না দিয়া এবার ১৪ই নভেম্বর লিখিয়া দেওয়া হইল।

"এই অদ্ভুত কাহনীটি মিঃ আউয়েন হুইট্‌ক্রফটের স্ত্রীর নিকট হইতে সোজাসুজি ভাবেই পাইয়াছিলেন। তিনি আউয়েনকে সেনাপতি স-র পত্রখানিও দিয়াছিলেন; কেন; কেন না, তাহাতে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর যথাযথ বর্ণনা ছিল। আউয়েন পত্রখানি মিঃ উইলকিন্সনকেও দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, যতটা আমি জানি, পত্রের লিখিত ব্যাপার সত্য বলিয়া আমার ধারণা। আর খুব ভাল মতে জানা গিয়াছে যে, মিসেস্ এনের প্রদত্ত বিবরণও খুব খাঁটি সত্য।

"মিঃ আউয়েন বলেন যে, ভূতের আর্বিভাব দেখিয়া আফিসের নথিপত্রের ভুল ধরা—এরূপ অদ্ভুত ঘটনা এইটি ছাড়া আর বোধ হয় ঘটে নাই। আর কাগজগুলিও বড় সোজা নহে।—প্রধান সেনাপতির প্রদত্ত বিবরণ, তা ছাড়া যুদ্ধ অফিসের প্রদত্ত মৃত্যু সার্টিফিকেট। এমন সব গুরুতর দলিলে ভুল! আর এ কথাও বলা চলে না যে, এক জন রমণীর কাছে ভূতের গল্পটি শুনিয়া আর এক জন রমণীর কাছে ভূতের গল্পটি শুনিয়া আর একজন রমণী মিথ্যা করিয়া একটি গল্প রচনা করিয়া লইল। তা বলা চলে না; কারণ, হুইট্‌ক্রফ্‌টের স্ত্রী ছিলেন কেম্ব্রিজে, আর মিসেস্ এন্ ছিলেন লণ্ডনে। আর দুই জনের দৃষ্ট ব্যাপার এক সপ্তাহ পরে পরস্পরের কাছে ব্যক্ত হয়। দৈবাৎ হইয়াছে বলিয়া যাঁহারা কথাটি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। প্রথম, মিসেস্ এন্ ভূতটিকে দেখিলেন, দ্বিতীয় মিসেস্ হুইট্‌ক্রফ্‌টও দেখিলেন, তৃতীয় মৃত্যুব তারিখ সকলেই একইরূপ দেখিলেন। আবার রমণী দুই জনের দেখা তাবিখে আর সেনাপতি সি প্রদত্ত বিবরণের তারিখে কেমন সুন্দর মিল।"

আমরা ঐ গল্পটিই প্রথমে বলিলাম; কেন না, মিঃ আউয়েন্ উহার সুন্দর প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গল্পটিতে কয়েকটি সুন্দর বিষয় বুঝিয়া লইবার আছে। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, হুইট্‌ক্রফ্‌টের প্রেতাত্মা মিঃ ও মিসেস্ এনকে জাগ্রত অবস্থায়ই আসিয়া দেখা দিল, অথচ নিজের স্ত্রীর কাছে আসিয়া তাঁহার নিদ্রিত অবস্থায় প্রথমে দেখা দিল। ইহার তাৎপর্য্য কি? ভারতে বৈকালে হুইট্‌ক্রফট্ মারা পড়েন। তখন বিলাতে প্রাতঃকাল। অতএব

তাঁহার প্রেতাত্মা অন্ততঃ১০ঘন্টা কাল সূক্ষ্ম জগতে অবস্থান করিবার পর লণ্ডনে আসিয়া মিসেস্ এন্‌কে দেখা দিল। আরও ৩/৪ ঘন্টার পর কেম্‌ব্রিজে, নজের স্ত্রীর কাছে আসিল। স্ত্রীকে যে শুধু স্বপ্নে দেখা দিয়াছিল, তাহা নহে। স্ত্রী জাগিলেও স্পষ্টভাবে দেখা দিল। ভূতেরা কখন কখন স্থূল শরীর ধারণ করে। কিন্তু হুইট্‌ক্রফটের প্রেতাত্মা স্থূল-শরীব গ্রহণ কবিয়াছিল বলিযা বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।

মিঃ আউয়েন্ "বিবাদভূমি" নামক পুস্তকের ২১৯ পৃষ্ঠায় আর একটি গল্প বলিয়াছেন। গল্পটি আরও চমৎকার। একটি স্ত্রীলোক মারা গিয়াছিল, তাহার প্রেতাত্মা আর এক জন স্ত্রীলোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া নিজেই সেই মৃত দেহটি দেখাইয়া দিয়াছিল। দেখাইবার সময় নিজে অতি চমৎকার উজ্জ্বলমূর্তিতে সেই দেহটার কাছে দাঁড়াইযা ছিল মিসেস্ এল্ নাম্নী এক জন মহিলা আউযেনকে ঐ গল্পটি বলেন। গল্পটি এইরূপ—

ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ

মিসেস্ এল্ নাম্নী রমণীর ভগিনীর নাম এস্‌থাব। সম্প্রতি বিবাহ হওয়ায় এস্‌থাব এই নূতন স্বামীর ঘর-কন্না করিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ হইল কালিফোর্ণিয়ায় গিয়াছেন। মিসেস্ এল্ এস্‌তারও তাঁহার স্বামীর পৌঁছান সংবাদ পাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। এক দিন রাত্রে মিসেস্ এল্ স্বপ্ন দেখিলেন, যেন এস্‌থার তাঁহার বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিতেছেন— "সিসিলিয়া, আমার সঙ্গে কালিফোর্ণিয়ায় আইস!" মিসেস্ এল্ বলিলেন—"না, স্বামীকে ফেলিয়া ছেলেপুলে ফেলিয়া আমি এত দূরদেশে যাইতে পারিব না, আর যাওয়াও বড় কষ্টকর।"

এস্‌থার বলিলেন—"আমরা খুব শীঘ্রই যাইতে পারিব: ভোর না হইতেই তুমি আবার আসিয়া পৌঁছিবে।"

স্বপ্নে মিসেস্ এলের মনে হইল যে, শীঘ্রই আসা যাইবে; তাই তিনি বিছানা হইতে উঠিলেন। তাহার পর তিনি ভগিনীর অথাৎ এস্‌থারের হাত ধরিয়া খুব উপরে উঠিয়া একটা বিপুল শূন্যমার্গ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পবে উপর হইতে নামিয়া একটি বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বাড়ীটি খুব ভাল নহে. মিসেস্ এল্ ভাবিতেন যে, ভাগ্যের উন্নতি করিবার নিমিত্ত তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতি বিদেশে যাইয়া হয় তো খুব সুন্দর বাড়ীতে বাস করিতেছেন; কিন্তু এখন দেখিলেন, তাহা নহে। বাডীটি খুবই বিশ্রী রকমের। বাড়ীতে ঢুকিয়াই সিসিলিয়া তাঁহার ভগিনীপতিকে দেখিলেন, দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন, তাঁহার ভগিনীপতি খুব দুঃখিতভাবে শোকের পোশাক পরিয়া বসিয়া আছে। এস্‌থার সিসিলিয়াকে লইয়া একটি ঘরের মধ্যে গেলেন সেই ঘরের মাঝখানে একটা কফিন্ (মড়ার বাক্স), বাক্সের মধ্যে একটা মড়া। এস্‌থার আঙ্গুল দিয়া মড়াটা দেখাইলেন। সেটি এস্‌থারের নিজেরই মৃত দেহ। মৃত্যু হওয়ায় দেহটা মলিন, বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মিসেস্ এল বিস্মিত হইয়া একবার সেই বিবর্ণ মড়াটার দিকে, আবার নিকটে দণ্ডায়মানা এস্‌থারের জীবন্ত সমুজ্জ্বল মূর্তিটির দিকে নীরবে চাহিতে লাগিলেন। ভগিনীর এই বিস্ময়ভাব দেখিয়া এস্‌থারের প্রেতমূর্তি বলিল—"হাঁ দিদি, ওটা আমারই দেহ; ব্যারামে ঐরূপ হইয়াছে। আমার কলেরা হইয়াছিল। আমি তাই মরিয়া এখন সূক্ষ্ম জগতে আসিয়াছি। আমার মৃত দেহটা তোমাকে দেখাইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তা তোমাকে লইয়া আসিয়া দেখাইলাম। শীঘ্রই তুমি আমার মৃত্যুসংবাদ পাইবে।

তাহার পরে মিসেস্ এল্ স্বপ্ন ঘোরেই যেন একা একা আবার উর্দ্ধে উঠিলেন। পরে বিপুল শূন্য রাজ্য অতিক্রম করিয়া নিজের শয়নঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যে দুইটি গল্প বলা হইল, তাহার দুইটি সূক্ষ্ম মূর্তিই ভূত যোনি। মরণেব পর জীবাত্মা ঐরূপভাবে আসিয়া দেখা দিয়াছিল। উহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মরণেব পরও মানুষেব জ্ঞানেব কিছুমাত্র এদিক্-ওদিক্ হয় না। বাঁচিয়া থাকিতে যেমনটি ছিল, মরিয়া গেলেও ঠিক সেই রূপটিই থাকে। ঐ ভূত যোনি দুইটির কোনটিই স্থূল শরীব ধারণ করিয়াছিল না। কবিলে সাধাবম মানুষেব দৃষ্টিগোচর হইত। তাহা হইলে যে সেই তাহাকে দেখিতে পাইত, যখন তখন দেখা যাইত। আমরা এখন আর একটি গল্প বলিব। সেটি আরও অদ্ভুত। সে গল্পেব ভূতটি স্থূল শবীর ধারণ করিয়া ঘন্টা বাজান, গল্প কবা প্রভৃতি পর্যন্ত করিয়াছিল।

ডাঃ ফ্রেডারক্ জর্জলী "গোধূলি আভাস" নামক গ্রন্থের ১০৮ পৃষ্টায় বিববণটি সন্নিবেশিত করিয়া বলিতেছেন—"এ গল্পটি খুব খাঁটি সত্য ইহার এক বিন্দুও মিথ্যা নহে, আমি এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রমাণ লইযাছি।" আমবা এখানে গল্পটি সংক্ষেপে বলিব। গল্পটি এইরূপ—

খালাসী বালকের প্রত্যাগমন

গ্রীন্‌উইচ শহরের ক্রুম শৈলেব উপরে হ্যামাণ্ড—নামক এক ব্যক্তি বাস কবিতেন। মিসেস্ পটার নাম্নী তাঁহার একজন চাকরাণী ছিল। পটারেব একটি ছেলে। ছেলেটিব বযস ১৫ বৎসব। ডোবিস নামক একখানি যুদ্ধ জাহাজে ঐ বালক খালাসীর কাজ কবিত। দেখিতে শুনিতে দিব্য সুচেহাবা, কিন্তু বড়ই অস্থিব। মাঝে মাঝে সে জাহাজ হইতে চলিয়া আসিত। তাই তাহাব বন্ধু বান্ধবেরা তাহাকে লইয়া বড়ই জ্বালাতন হইত। জাহাজেব অধ্যক্ষকে বলিয়া কহিয়া তাহাকে আবাব চাকরীতে বসান হইযাছিল আব অধ্যক্ষকে বলা হইযাছিল আপনি দযা করিযা উহাব প্রতি একটু নজব রাখিবেন,, দেখিবেন, যেন আর না পলায়। কিছু দিন পবে বালকেবা মা হ্যামণ্ডেব বাড়ীর চাকুবী ছাড়িয়া দিল। ছাড়িযা দিযা পুনরায় বিবাহ কবিল, কিন্তু বালকটি চাকুরীতে আবদ্ধ হইয়া দূরে ছিল, তাই মাযেব বিবাহের কথা জানিতে পাবে নাই। গল্পটিব পবেব অংশ আমরা লীব কথাতেই বর্ণনা করিব। লীর বর্ণনা এইরূপ—

"১১৬৬ খ্রীস্টাব্দেব ৮ই সেপ্টেম্বব তাবিখেব রাত্রে হ্যামণ্ডের বাড়ীব রাস্তাব উপরকাব দবজার ঘন্টাধ্বনি হইল, তখন সে বাডীতে মেবী নাম্নী এক জন চাকরাণী ছিল। মেবী আসিযা দরজা খুলিল। দু একটি কথাব পব আবাব দরজা বন্ধ করিয়া দল। হ্যামণ্ডের স্ত্রীর অসুখ,, তিনি শুইযা ছিলেন। যে ঘরে ছিলেন, সেখান হইতে সদর দরজা দেখা যাইত ; যেমন কি, দবজায দাঁড়াইয়া কথা বলিলে, তাহাও শুনা যাইত। যখন মেরী আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলিতেছিল, তখন তিনি শুইয়া শুইয়াই শুনিতেছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া বেশ বুঝিতেও পারিলেন যে, এটা টম্পটাবেব গলার স্বব। রমণী তখন বিস্মিত হইযা জিজ্ঞাসা কবিলেন,—'মেবী, দরজায কে কথা বলছে?' মেবী বলিল—'মা, ও একটা ছোট খালাসী বালক; মায়েব খোঁজে এসেছিল। আমি বলিলাম—তোমাব মায়ের খবর আমি জানি না। এই বলিযা উহাকে বিদায দিয়া দিলাম।'

"হ্যামণ্ডের স্ত্রী বড়ই ব্যস্ত হইলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বালকটি দেখিতে কেমন?' মেবী বলিল—'মা, বেশ ফুট-ফুটে ছেলেটি, গাযে জাহাজেব খালাসীর পোশাক, পা দুখানি খালি—জুতা নাই। আমি দেখিলেই এখন তাহাকে চিনিতে পারি। ছেলেটি বড়ই ম্লান মুখে

এসেছিল,, বড়ই কষ্টে আছে বলিয়া মনে হইল। আমি যখন বলিলাম, তোমাব মা এখানে নাই, তখন সে কপালে হাত দিয়া বলিল—হায়রে! এখন কি করি।

"রমণী তখন হ্যামণ্ডকে বলিলেন, 'এক জন লোক আসিয়া বলিয়া গেল যে, টম্পটাব আবার জাহাজ হইতে পলাইয়াছে।'

হ্যামণ্ড ও তাঁর পত্নী দুই জনেই তখন টম্পটারের মায়েব নিকটে পটাবের সংবাদ জানিবার নিমিত্ত লোক পাঠাইলেন। শুনিলেন, মা তাব খবর জানে না। তখন তাঁহাবা পটাবেব শিক্ষক ডাঃ টডের কাছে যাইয়া ব্যাপারটা বলিলেন। টড্ শুনিয়া বলিলেন—'টম্পটার জাহাজ হইতে পলাইয়া আসিয়াছে, এ কথা অসম্ভব। দুই মাস হইল, আমি তাব হাতেব পত্র পাইয়াছি। পত্রে লিখিয়াছিল, সে বেশ স্ফূর্তিব সঙ্গে কাজ কর্ম কবিতেছে।' ডাঃ টডেব কাছে তাঁহাব অনেকগুলি ছাত্রেব ফটোগ্রাফ ছিল। টম্পটারেরও একখানি ছবি তাহার মধ্যে ছিল। টড্ মেরীব সম্মুখে ছবিগুলি বাখিলেন। তার পর তাহাকে বলিলেন—'তুমি যে বালকটিকে দেখিযাছিলে, তাহার চেহারাখানি বাছিয়া লও দেখি। অন্য একখানি চেহারা লইয়া মেয়েটিকে ভাল কবিযা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—'কেমন, এই বালকটি নয়? বোধ হয়, এই বালকই জাহাজ থেকে পলাইযা আসিয়াছে।' মেবী দেখিযা বলিল—'না, মা ইহাকে আমি দেখি নাই।' এই বলিয়া যেখানি টম্পটারেব চেহারা সেখানি ছোঁ দিযা তুলিযা লইল। লইয়া বলিল—'এই যে সেই বালক! ইহাকেই আমি দেখিযাছিলাম আমি দিব্য করিয়া বলিতে পারি যে, সে এই।'

"শীঘ্রই রহস্যের মীমাংসা হইযা গেল। পবের মাসেই ডাঃ টড্ জাহাজেব কর্তৃপক্ষেব কাছ হইতে একখানি পত্র পাইলেন। কর্তৃপক্ষ লিখিতেছেন—'মহাশয, টম্পটারেব মায়েব ঠিকানা না জানাব দরুণ আপনাকেই লিখিতেছি যে, ৬ই সেপ্টেম্বর তাবিখে জ্যামেকাব নিকটে জাহাজে দারুণ দুর্ঘটনা ঘটায় টম্পটাব মারা পডিয়াছে' মৃত্যুর ঠিক দুই দিন পবেই তাহার প্রেতমূর্তি হ্যামণ্ডেব দবজায আসিয়া উপস্থিত হইযাছিল।'

"মেবী নাম্নী চাকরাণী যদি অত তাডাতাডি তাহাকে বিদায দিযা দবজা বন্ধ না কবিত, তাহা হইলে আমরা টম্পটাবেব ভূতযোনিব নিকট হইতে অনেক কথাই জানিতে পারিতাম। কিন্তু টম্পটাব নিজের মৃত্যু বুঝিতে পাবিয়াছিল কি না, বুঝিতে পাবিযা সেই সংবাদ তাহার মাকে দিতে আসিযাছিল কি না, অথবা নিজেব মরণটি আদৌ বুঝিতে পাবে নাই, এ সব ব্যাপার আমাদেব জানিবাব আব কোনই উপায নাই। সূক্ষ্ম জগতেব সঙ্গে একটু পবিচিত হইলেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাব মা যেখানেই থাকুক না কেন, তাহাব কাছে যাইয়া উঠা তাহাব পক্ষে কিছুমাত্র শক্ত নহে। মবিতে মবিতেই সেটুকু হয তো সে জানিতে পারে নাই, তাই বলিয়াছিল, —'হায রে, এখন কি করি?' স্থূল জগতে যেরূপ ঘটে, টম্পটারেরও প্রথম প্রথম সেইরূপ ঘটিয়াছিল. সে যেখানে তাহাব মাকে বাখিয়া চাকুবী কবিতে গিয়াছিল, প্রেতমূর্তিতে প্রথমে সেই খানেই তাহাকে খুঁজিতে আসিল।"

আমবা আব একটি গল্প বলিব। এ ক্ষেত্রেও একটি ছেলে তাহার মাতাপিতার কাছে আসিযা তাহাব আকস্মিক মবণের কথাটা বলিযা ছিল। এ গল্পটাও অদ্ভুত রকমেব।

একজন পরোপকারী সাধুর প্রেতমূর্তি

সাউদম্‌টন জেলার অর্ন্তগত আর্টাবস্ লজ্ বাসী মিঃ জেমস্ উইলডের পুত্র ফিলিপ সেন্ট এড্‌মণ্ড কলেজে পডিত। স্কুল-কলেজের ছেলেরা ছুটীব পব নৌকায় চড়িয়া প্রায়ই ব্যায়াম কবিত। এক

দিন নৌকায় উঠিয়া খেলাধূলা করিতে করিতে ফিলিপ জলে ডুবিয়া মারা গেল। কলেজের অধ্যক্ষের নাম—ডাঃ কক্‌স্। পরদিন প্রাতে এই দারুণ সংবাদ ফিলিপের পিতাকে দিলেন। পিতা উইল্ড পড়িবার ঘরে বসিয়া ছিলেন। কক্‌স্ যাইবামাত্র চাকরেরা তাঁহাকে উইল্‌ডের ঘরে পৌঁছাইয়া দিল। কক্‌স্ দেখিলেন, উইল্ড চোখের জলে ভাসিতেছেন। কক্‌স্‌কে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"প্রিয় মহাশয়, যে জন্য আসয়াছেন, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। আমি আগেই জানিয়াছি, ফিলিপ মারা গিয়াছে। গত কল্য আমার কন্যা ক্যাথেরাইনের সঙ্গে আমি মাশুল ফটক ওয়ালা বড় রাস্তার উপরে বেড়াইতে বেড়াইতে দিনে দুপুরে ফিলিপকে দেখিতে পাইলাম। দেখিলাম, রাস্তার উচ্চ বাঁধের উপর সে আব এক জন যুবকের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে। যুবকটির পোশাকের পার্শ্ব দেশ কালো রঙের! আমার কন্যাই প্রথম ফিলিপকে চিনিয়াছিল। কন্যা আমাকে বলিল—'বাবা দেখ দেখ, ঐ যে ফিলিপ দাঁড়িয়ে আছে।' আমি চলিলাম, দেখিলাম, ফিলিপই সত্য। আমি তখন আমার মেয়েকে বলিলাম—"সত্যই ত ফিলিপ! কিন্তু উহাকে আজ বড সুন্দর দেখাচ্ছে।' সে কেন ওখানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম বটে, কিন্তু সে যে মারা গিয়াছে, তাহা একবারও মনে আসিল না। আমি তাহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত তাহার কাছে চলিলাম. আর অল্প একটু গেলেই তাহার নিকটে যাইতে পারি, এমন সময় একটা মজুর সেই বাঁধের উপর দিয়া যাইতেছিল। দেখিলাম য সেই লোকটা আমার পুত্রের ও তাহার সঙ্গীর দেহের আড়াল দিয়া যখন চলিয়া গেল, তখন ফিলিপদেব দেহ দ্বাবা সে একটু ঢাকা পড়িল না। মনে হইল, যেন উহাদের দুই জনের দেহ স্বচ্ছ। চমৎকার ব্যাপার! এইরূপ কাণ্ড দেখিবামাত্র আমি বুঝিলাম যে, ফিলিপ ও তাহার সঙ্গী প্রেতমূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। আমি কন্যার সঙ্গে তাহাদিগকে স্পর্শ করতে যাইতেছিলাম। তখন ফিলিপ আমাদের দিকে চাহিয়া মুখ মুচকিয়া হাসিল। তাহার পরই তাহারা মিলাইয়া গেল।"

উইল্‌ডের মুখে এইরূপ শুনিযা কক্‌স্ বড়ই ব্যথিত হইলেন। তিনি তখন শোকার্ত পিতাকে মৃত্যুর কাহিনী বলিলেন। আর বলিলেন—"আপনি যখন ঐ প্রেত-মূর্তি দেখিয়াছেন, ঠিক তখনই ফিলিপও মারা গিয়াছে।"

কক্‌স্ উইল্ডকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা কালো পোশাকপরা একটি যুবক আপনার পুত্রের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, আর আপনি বলিতেছেন তাহার মূর্তি ও বেশ দেবদূতের মত অতি সুশ্রী, সে লোকটি কে?" উইলড্ বলিলেন,"আমি তাহাকে একেবারেই চিনি না।"

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে মিঃ উইল্ড একদিন ল্যাঙ্কাশায়ারের অন্তর্গত স্টোনীহর্স্ট নামক স্থানের নিকটবর্তী কোন একটি জায়গায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন. প্রাতে সেখানকার গির্জায় উপাসনা-কার্য শেষ কিরয়া গাড়ীর প্রতীক্ষায় আছেন, এমন সময় তাঁহাকে গির্জার চাকর আসিয়া বসিবার ঘরে লইয়া গেল। তিনি তখন বেড়াইতে বেড়াইতে আগুন রাখিবার স্থানটির কাছে যাইয়া উঠিলেন। ধূম-নির্গমনের চিমনীব কাছে একখানি ছবি দেখিতে পাইলেন। ছবিটির গায়ে কালো পোশাক। এই মূর্তিটিকেই তিনি ফিলিপের সঙ্গে দেখিয়াছিলেন। ছবির নীচে লেখা ছিল "সাধু স্ট্যানিস্লচ কোচ্‌ক।" খৃস্টানদের মধ্যে ইনি একজন খুব বড় সাধু। ফিলিপ "সমর্থন অনুষ্ঠানের" সময় ইঁহাকেই মনোনীত করিয়াছিল। "সূক্ষ্মজগতের আভাস" নামক গ্রন্থের ২য় অঃ, ৫১পৃষ্ঠা।

ডাঃ লী বলেন যে, ঐ গল্পটি খাঁটী সত্য ঘটনা। উহা যে সত্য, সে বিষয়ের বিস্তর প্রমাণ তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। বিস্তব পত্র, বিস্তর সার্টিফিকেট প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন

যে, গল্পটির কে বর্ণও মিথ্যা নহে। ফিলিপ যেমন মৃত্যু সময়ে বা মরণের খুব অল্প সময়ের পর তাহার পিতার সঙ্গে প্রেত-মূর্তিতে দেখা দিয়াছিল, সেরূপ দেখা বহুলোকে বহু সময়ে দিয়াছে. টম্পটারের ভূতযোনি ও সার উইল্ডের পুত্রের ভূতযোনি—এ দুইটিব মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। টম্পটারের ভূতযোনি স্থূলদেহ ধারণ করিত, তবে যে মজুব তাহার কাছ দিয়া যাইতেছিল, সে অবশ্যই তাহাকে দেখিতে পাইত; কিন্তু সে দেখিতে পায নাই। পিতা ও ভগিনী যে তাহার সূক্ষ্মদেহ দেখিতে পাইয়া ছিলেন, তাহার বিশেষ কাবণ আছে। তাহার উপব ইহাদের খুব স্বাভাবিক স্নেহ ছিল, কারণ, ইহাদের শরীরেব পরমাণুগুলিকে সূক্ষ্মদেহ দেখিবার মত স্পন্দিত করিয়া তোলা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া উঠে. আর মজুরের সহিত ভালবাসার সেরূপ কোন আকর্ষণ না থাকায় ঐ রূপ একটা স্পন্দন সেখানে করিতে পারে নাই। তাই সেই মজুর তাহার প্রেত-মূর্তি দেখিতে পাইল না। তাই সে সটান সোজা ভূতের কাছ দিয়া চলিয়া গেল। ভূত মোটেই তাহার চোখে পড়িল না। এরূপ গল্প আরও অনেক আছে। "থিওজফিক্যাল্ রিভিউ" নামক মাসিক পত্রিকায় কয়েক বৎসর হইল "যুদ্ধশিক্ষার্থীর গল্প" শীর্ষক একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। ঐ গল্পটি পডিলে জানা যায়, একজন মেজরের ভূতযোনি তাঁহার বন্ধবান্ধবকে দেখা দিয়াছিলেন। কিন্তু নাবিকরা তাঁহাকে দেখিতে পায নাই; কেন না, তাহাদের সঙ্গে ততটা ভালবাসা ছিল না।

একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা

ফিলিপ প্রেতমূর্তিতেই দেখা দিয়াছিল। তাহাব গল্পটির মধ্যে একটু অসাধারণ ব্যাপার দেখা যায়। সে ব্যাপাবটা এই যে, উহার সঙ্গে অন্য একটি মৃত ব্যক্তিব ভূতযোনিও উপস্থিত ছিল। অথচ সেটি চেনা নহে। পরে একখানি ছবি দেখিযা জানা গিয়াছিল যে, সে একজন সাধু। এই সাধুব প্রেতাত্মা সম্বন্ধে অনেক রকম ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু কোন্ ব্যাখ্যাটি ঠিক, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে। প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে যে সাধার যে মূর্তি দেখা গিযাছিল, তাহা যথার্থই সেই সাধুর। সাধু হয় তো ভূর্বর্লোকে ছিলেন, পরে মৃত ভক্ত ফিলিপের সঙ্গে আসিয়া জুটিযা পড়িলেন। সাধু সেন্ট স্ট্যনিস্লচ কোচকা হয় তো ভুবর্লোকে থাকিয়া তাঁহার বিশে, ভক্তবৃন্দকে নূতন বলে বলীয়ান্ কবিতেছিলেন। বলীয়ান্ করিবাব নিমিত্ত বিশেষ সঙ্কটসমযে শিষ্যবৃন্দকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে ভুবর্লোকে আজও অবস্থান করিতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে ভক্ত ফিলিপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এরূপ হওযা অসঙ্গত নহে। কথাটা উডাইয়া দেওয়া যায় না। আবার অন্য দিক দিয়া দেখিলে ইহা অসম্ভব বলিযে মনে হয়। সাধু ষ্ট্যানিস্লচ কোচকা বহু বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মত ব্যক্তি এত দিনও যে ভুবর্লোকে আছেন, তাহা নিতান্তই অসম্ভব। যাঁহারা কম বয়সে মারা যান, তাঁহাবা দীর্ঘকাল ভুবর্লোকে থাকেন সত্য, আব তিনিও খুব কম বয়সে মারা গিয়াছিলেন, সে কথাও সত্য। তথাচ তিনি আধ্যাত্মিক জীবনে এত উচ্চ ছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে এত দীর্ঘকাল ভুবর্লোকে থাকা একান্তই অসম্ভব। আর এত দীর্ঘকাল তথায় থাকিতে হইলে খুব বেশী ইচ্ছা-শক্তি থাকা চাই। আরও সেরূপ ভাবে থাকিতে হইলে অসম্ভব ঘঘটনাবও সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। যে সব লোক দুশ্চরিত্র, নর পিশাচ, ঘোব পাপাত্মা অথচ যাহাদের ইচ্ছাশক্তি বলবতী, তাহাদের পক্ষে এরূপ দীর্ঘকাল ভূবর্লোক থাকা সম্ভবপর হইত

পারে, কিন্তু যাঁহার স্বভাব খুব ভাল, যাঁহার চরিত্রে ভক্তি ও পবিত্রতার উৎস নিরন্তর ক্ষরিতেছে সেরূপ দেব চরিত্র ব্যক্তি কদাচ ভুবর্লোক তে দীর্ঘকাল থাকিতে পারেন না।

আবার অন্যভাবেও আলোচনা করা যাইতে পারে। মনে করা যাইতে পারে যে, সাধুর ঐ মূর্তিটি আদৌ ভূত-যোনি নহে। উহা হয় তো একটা চিন্তামূর্তি। জ্ঞাতসারে হউক, ফিলিপ নিজেই হয় তো ঐ মূর্তির উদ্ভব ঘটাইয়াছিল। অনেক সময় সূক্ষ্মজগতে আমাদের নিজের চেষ্টাতেই এরূপ বহু সঙ্গী আমরা আনিয়া ফেলি। সে বিষয়ে পরে আমরা অনেক কথা বলিব।

ফিলিপ এক জন ধার্মিক যুবক ছিল। পরমাত্মাঘটিত ধ্যান-ধারণা করিতে বসিয়া সে নিশ্চয়ই তাহার গুরু ও আদর্শস্থনীয় ঐ সাধুর একটা চিন্তা মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছিল। মৃত্যুকালে বা মৃত্যুর পরেই হয় তো সে ঐ সাধুর চিন্তা করিয়াছিল হয়তো এইরূপ ভাবনার ফলে সাধুর মূর্তি স্থূলদেবতা ফিলিপের পিতার ও ভগ্নির চক্ষুগোচর হয়।

মরণের পর সাধুগণ সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করেন—আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদিকে রক্ষা করেন। এই সুন্দর বিশ্বাসটি আমরা নষ্ট করিতে বসি নাই। ফিলিপের সঙ্গে অন্য একটি মূর্তির দেখা হওয়ার মত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিলে তার বৈজ্ঞানিক আলোচনা কতটা করা যাইতে পারে, মাত্র আমরা তাহারই চেষ্টা করিতেছি। তাই যত প্রকার কথা বৈজ্ঞানিক বলিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, একটা একটা করিয়া তাহারই উল্লেখ করিতেছি। তাই আমরা বলিতে বাধ্য হইয়াছি যে সাধুর মূর্তিটি ফিলিপেই নিজের তীব্র কল্পনার ফল হওয়া অসম্ভব নহে। আমরা কিন্তু উহাকে চিন্তামূর্তি বলি না।

মনে করা যাক্ যে, সাধুর ঐ মূর্তির একটি চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ মূর্তির সহিত পিতাকে দেখা দিবার উদ্দেশ্য কি? ফিলিপ জানিত, তাহার পিতা তাহার দারুণ মৃত্যু সংবাদ অচিরাৎ পাইবেন। তিনি যাহাতে হঠাৎ মর্মাহত হইয়া না পড়েন, সে জন্য তাঁহাকে একটু প্রস্তুত করিয়া লওয়া ফিলিপের উদ্দেশ্য হইয়াছিল। আর সে মনে করিল, পিতা যদি দেখেন, তাহার কাছে সাধুর মূর্তি সঙ্গিরূপে আছেন, তাহা হইলে তাঁহার কতকটা দুর্ভাবনা যাইবে। ফিলিপ পূর্বে তীব্র ভক্তির সঙ্গে উপাসনা করিয়াছিল। তাহারই ফলে পিতা ও ভগিনীকে সান্ত্বনা দিবার এই উপায়টি সে করিয়া তুলিতে পারিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, সাধুর মূর্তিটি ফিলিপ ইচ্ছা করিয়াও গড়িয়া তুলিতে পারে কিংবা গড়িয়া তুলিবার একটা উদ্দেশ্য না থাকিতেও পারে। দুই-ই সম্ভব। আর যদি ইচ্ছা করিয়া ঐ মূর্তি সঙ্গে লইয়া আসিয়া থাকে, সেটাও আশ্চর্য বা অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে; কেন না, ওরূপ ঘটনা আমাদের অনেক জানা আছে।

সাধুর মূর্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহাই যথেষ্ট। তবুও আমাদের একটি কথাও মনে আইসে। কথাটি যেন আমাদেরও ভাল বলিয়া বোধ হয়। ভুবর্লোকে অনেক অদৃশ্য সহায় থাকেন। তাঁহারা আমাদের বন্ধুর মত হিতৈষী। ফিলিপ জীবিত অবস্থায় সাধুর বিষয় চিন্তা করিয়া চিন্তা মূর্তিটা গড়িয়া তুলিয়াছিল, এখন সূক্ষ্মজগতের কোন অদৃশ্য বান্ধব সেইটি লইয়া তাহার উপকারার্থ ব্যবহার করিতে পারেন। মানুষ এই পৃথিবীতে জীবিতকাল অহরহঃ চিন্তা করিয়া হয় তো কত চিন্তা মূর্তি গড়িয়া তুলে। হয়তো কেন, সত্যিই গড়িয়া তুলে। মৃত্যুর পর ঐ মূর্তি তাহার সঙ্গিরূপে তাহার কাছে কাছে থাকে। সূক্ষ্ম জগতের অনেক পরোপকারী সাধু ব্যক্তি ঐ মূর্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে সদুপদেশ দিয়া, তাহার প্রাণে নূতন বলের সঞ্চার করিয়া, নূতন আশায় উৎসাহিত করিয়া, তাহার বিশেষ উপকার করেন। ফিলিপের উপকার

করিবার উদ্দেশ্যে যদি কোন মহাত্মা তাহার চির পোষিত, চিরগঠিত চিন্তা -মূর্তিব মধ্যে প্রবেশ কবিয়া থাকেন, তবে তাহাই বা অসম্ভব হইবে কেন?

এই রূপ ব্যাখ্যাই যদি সত্য হয়, তবে মনে করিতে হয় যে, কোন ব্যোমচাবী মহাত্মা সাধুর চিন্তা মূর্তির মধ্যে ঢুকিয়া ফিলিপের পিতা ও ভগিনীব দৃষ্টিগোচব হইযাছিলেন , কেন না, তাহা হইলে পিতা দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িবেন, এই ভাবনায় ফিলিপ আব অস্থির হইবে না। ফিলিপের মনে একটু শান্তি আনাই ঐ মহাত্মাব উদ্দেশ্য অতএব মূর্তিটি যথার্থই সাধু স্ট্যানিস্লচের হইতে পারে ; আবার না-ও হইতে পারে। কেবল চিন্তা মূর্তিরূপে তাহার সঙ্গী হইয়াও থাকিতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঐ সাধুর মুর্তিটি বাস্তবিক পক্ষে সাধুর প্রেতাত্মা নহে। কোন বন্ধু হয তো অল্পদিন আগে মরিয়াছির্ল তাহারই প্রেতাত্মা ফিলিপেব উপকার করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সাধুর মূর্তি ধরিয়া তাহাব কাছে কাছে ঘুবিতেছিল। কেন না, ঐ সাধুর উপব ফিলিপের একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল বলিয়া মৃত বন্ধুব জীবাত্মা য় তো ভাবিয়াছিল যে, ঐ মূর্তি ধরিয়া বেডাইলে ফিলিপের সম্ভবতঃ বেশী শান্তি হইবে। ইহাতেও আমবা আর একটা যথার্থ ভূতের অস্তিত্বেব প্রমাণ পাই।

নিম্নে আব একটি সত্য ভূতেব গল্প দেওযা হইল। গল্পটি আগেকার মত অতটা সুন্দর নহে। একটা মানুষ মবিতে মরিতেই ভূত হইয়াছিল, সেই বিষয় বলা হইয়াছে। এক জন সুইডেন্ দেশীয় পুরোহিত গল্পটি অপবকে বলেন। আমবা তাঁহার কাছে শুনিযাছি। 'থিওজফিক্যাল বিভিউ' নামক পত্রিকাব ২৩খণ্ডের ১৭৭পৃষ্ঠায় উহাব বিবৃতি আছে। আমরা গল্পটি যথাযথ উদ্ধৃত কবিলাম। পুরোহিত নিজেই ঘটনাটি দেখিযাছিলেন। ব্যাপাবটা এই—

ষোল জনে ভূতটিকে দেখিয়াছিল

পুরোহিত বলিযাছেনঃ—টীংস্টেড্ নামক পুবোহিত পল্লীতে একটা স্কুলে বাল্যকালে আমি কযেক বৎসর পড়িয়াছিলাম। স্কুল হইতে আমার বাডীটা দুববর্তী হওয়ায় আমি একটি স্ত্রীলোকের বাডীতে বাসা লইয়া ছিলাম। আমরা সবসুদ্ধ ষোল জন ছিলাম। যাঁহার বাড়ীতে ছিলাম, তাঁহার নাম ফ্রু স্মিথ্। ইহার অবস্থা ভাল নয় বলিয়া ইনি ছেলেদের বাসা দিয়েছিলেন। বাসা দেওয়া, খাইতে দেওয়া—এই সব কাজে দুপয়সা লাভ হইত। সেই লাভে ফ্রু স্মিথ্ কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাইতেন। তাহা ছাড়া তিনি মাঝে মাঝে ধাত্রীর কাজও করিতেন। আমি যে ঘরটিতে থাকিতাম, তাহাতে আর একটি ছাত্রও থাকিত।

ঘোর শীতের সময়। এক দিন সন্ধ্যার আগে ফ্রু স্মিথ্ বলিলেন, "আমি আজ রাত্রে স্থানান্তরে চলিলাম, আজ আর ফিরিব না, কা'ল প্রাতে আসিব। আজ তোমাদের খাবার ব্যবস্থা করিয়া গেলাম। তোমরা আলো আর আগুন সম্বন্ধে খুব সতর্ক হইবে।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমরা সন্ধ্যাকালে পডাশুনা করিতাম, সে দিনও সন্ধ্যায় পড়া মুখস্থ করিতে বসিলাম। অন্য দিনের মত সে দিনও সাড়ে নয়টার সময় শুইলাম। শুইবার আগে আমাদের ঘরের দরজার তালা বন্ধ করিয়া আলোটি নিভাইয়া দিলাম। আমাদের ঘরে কাঠের আগুন করা হইত। আগুন রাখিবার একটা নির্দিষ্ট স্থান ছিল। তাহাকে উনান বলা যাউক। সেই উনন হইতে খুব গন্ গনে আগুনের একটা আভা আসিতেছিল। সেই আভাতে ঘরের মধ্যে বেশ দেখা যাচ্ছিল। আমরা দুই জনে শুইয়া আস্তে আস্তে গল্প সল্প করিতেছিলাম—এমন সময় দেখি, একটা দীর্ঘ

পুরুষমূর্তি আমাদের বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। লোকটা মধ্যবয়স্ক, দেখিতে কৃষকের মত, গায়ের পোশাক সাধারণ লোকের ন্যায়—ধূসর রঙের। আমাদের মনে হইল, তার বুকে ও বাঁ পায়ে কি যেন একটা সাদা উঁচু জিনিস লাগিয়া আছে। আমার সঙ্গীটি আমাকে ঐ মূর্তি দেখাইবার নিমিত্ত চুপে চুপে বেশ একটু জোরে ঠেলা দিয়া আমার কানে কানে বলিল—"ঐ কিম্ভূতকিমাকার লোকটা কে?" আমি তাহাকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিলাম। তাহার পর দুই জনেই আগ্রহের সঙ্গে দেখিতে লাগিলাম যে লোকটা কি করে।

লোকটা অনেকক্ষণ ধরিয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ফিবিল। ফিরিয়া সমস্ত ঘরটার মধ্যে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইবার সময় কেমন একটা বিকট শব্দ হইতে লাগিল, মনে হইল, লোকটা যেন বরফের উপর দিয়া হাঁটিতেছে। তাহাব পর দেরাজের কাছে যাইয়া দেরাজের সব খোপগুলি খুলিল, আবার তখনই সেগুলি বন্ধ করিল। দেখিয়া মনে হইল লোকটি যেন কি খুঁজিতেছে। তাহার পর আবার উননের কাছে গেল। সেখানে যাইয়া ফুঁ দিয়া আগুন আর একটু গন্‌গনে করিয়া তুলিল। পরে হাত দুইটা আগুনের উপর বাড়াইয়া দিল, মনে হইল, যেন হাত দুইটা একটু গরম করিয়া লইতেছে। ইহার পরেই সে আবার আমাদের বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া বহিল, আমরাও তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম। দেখিলাম যে, তাহার দেহের ভিতর দিয়া দেহের আড়ালের জিনিসপত্র দেখা যাইতেছে। দেহটা যেন স্বচ্ছ। ঘরের এক মোড়ে একটা তাকওয়ালা ডেস্ক্ ছিল। সেটাকে উহার দেহের ভিতর দিয়াও দেখা গেল। আমরা বিস্মিত হইযা তাহাব দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতেই সে আস্তে আস্তে অন্তর্হিত হইয়াগেল—বেশ বেমালুম শূন্যে মিলাইয়া গেল। এই অদ্ভুত ব্যাপাব দেখিয়া আমরা কেমন একবকম হইয়া গেলাম। আমরা বিছানা হইতে উঠিত পারিলাম না জড়সড হইয়া পড়িয়া রহিলাম। তাহাব পর ঘুমাইযা পড়িলাম। প্রাতে উঠিলাম। তখনও আমাদের ঘর তালা বন্ধ ছিল। তালা খুলিয়া বাহিরে আসিলাম। অন্যান্য লোক যাহারা সেই বাড়ীতে ছিল তাহাদিগকে রাত্রির এই অদ্ভুত গল্পটা বলিলাম। সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল যে, তাহাবাও রাত্রে ঐরূপ দেখিয়াছে। সকলেব ঘরেই তালাবন্ধ ছিল, অথচ প্রত্যেক ঘরেই ঐ মূর্তি ঢুকিয়া ঐরূপ ভাবে দেখা দিযাছে। যোল জনের প্রত্যেকেই দেখিয়াছে। তাহা ছাডা আমাদের মধ্যে যাহারা ঐ বাড়ীতে অনেক কাল ছিল, তাহারা বলিল যে, ঐ লোকটা ফ্রু স্মিথের স্বামী। ইহাকে তাহারা দেখিয়াই চিনিয়াছে। আব বলিল, লোকটা অতি বিশ্রীস্বভাবেব, কোন কাজ কর্ম্মই কবে না, কয়েক বৎসর যাবৎ কেবল বাহিরে বাহিরে থাকে, আপন স্ত্রীব খোঁজ খবর রাখে না।

ইহার পরে লোকটার সম্বন্ধে সকলেরই কেমন একরূপ কৌতূহল হইল। সে আর কাহাকেও দেখা দিযাছে কি না, জানিবাব নিমিত্ত সকলে তখন অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিল. অনুসন্ধান করিতে করিতে জানা গেল যে, ঠিক ঐ রাত্রে ৯ টা ১০ টার সময় দুই মাইল দূরবর্তী একটা গোলাবাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছিল। সেখানে যাইয়া বলে যে, আমাকে রাত্রে একটু আশ্রয় দাও। সেখানে স্থান না থাকায় তাহাকে বলা হয়, এখানে স্থানাভাবে; এই ক্ষেত্রটার ওধারে খুব নিকটে একটা গোলাবাড়ী আছে, সেখানে যাও. অনুসন্ধানে দেখা গেল যে, বরফের উপর তাহার পায়ের দাগ বহিযাছে। দাগ ধবিয়া কিছু দুর গেলেই দেখা গেল, একখানা কাঠেব জুতা পড়িয়া রহিযাছে। আর একটু গেলেই দেখা গেল, লোকটা মবিযা পড়িয়া আছে, বরফেব মধ্যে দেহটার প্রায় অর্ধেক ডুবিয়া গিয়াছে। মডাটাকে টানিয়া বাহির করিলে দেখা গেল, একটা

বরফের চাংড়া তাহাব বাঁ বুকের উপর জমিয়া আঁটিযা রহিয়াছে, আর একটি চাংডা ঐরূপ ভাবে বাঁ হাঁটুতে লাগিয়া রহিয়াছে। প্রেতমূর্তি ঘরের মধ্যে বেডাইবার সময় ঠিক ঐ দুইটি স্থানেই সাদা উচু কি একটা দেখা গিয়াছিল। আমি যে সময এই ব্যাপার দেখি, তখন আমি নিতান্ত বালক। তবুও এই ঘটনাটি আমার মনে খুব স্পষ্টই অঙ্কিত আছে। এরূপ ঘটনা সচবাচবই ঘটে। কিছুই অসাধাবণ নহে। অসাধারণেব মধ্যে এই যে, এই প্রেতমূর্তি একই সময়ে অনেকগুলি লোককে দেখা দিযাছিল। ঘটনাটি ভাবিলে মনে হযে যে, এই ভূতযোনি কতকটা স্থূল শরীর ধারণ কবিয়াছিল। নচেৎ একই সময়ে এতগুলি লোককে দেখা দেওযা সম্ভব হইত না। তাহার পর দেবাজ খোলা ও বন্ধ করা প্রভৃতি কার্য ও স্থূল শরীরেবই ব্যাপার। উহাব মনে একটু আশ্রয় পাইবাব তীব্র ইচ্ছা হইয়াছিল। ঘরগুলি পাঁতি পাঁতি কবিয়া খুঁজিয়াছিল। ইহাতে মনে হয, যেন তাহার স্ত্রীর টাকা কডি লইবে, এইরূপ মতলব ছিল। আগুনে হাত সেকা দেখিয়া মনে হয যে, সে নিজেও নিজের মবণেব কথাটা টেব পায় নাই। যে সময় ঐ প্রেতমূর্তি ঘবের মধ্যে ঐ রকম কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছিল, তখন বাস্তবিকই সে মরিযাছে কি মরণের পূর্বকালীন অজ্ঞান অবস্থায় পডিয়া ছিল, তাহাব কোন ভালরূপ প্রামণ নাই। লক্ষ্য করিতে হইবে—অন্যান্য ভূতের মত ইহারও কার্যকলাপ। স্থূল-শরীবের অনুরূপ দেহে অন্যান্য ভূতেরা যেমন দেখা দেয়, এও সেইরূপ দেখা দিয়াছিল। স্থূল শরীরে যে বব ফ লাগিয়াছিল, প্রেতমূর্তিতে পর্যন্ত সেই ববফের কামড়িযা ধরা চাংডা। ববফের উপব বেডাইবাব শব্দ পর্যন্ত প্রেতের পাযের তলায শুনা গিযাছিল।

এই প্রেতযোনি নিজেব মবণেব কথা ছেলেদিগকে বলিবাব জন্য আসিযাছিল, এমনটি আমাদেব মনে হয না। ছেলেগুলিব দিকে একদৃষ্টে চাহিযা থাকায় আমাদেব মনে হয যে, হয তো উহার কৌতূহল হইযাছিল যে, ইহাবা কে? কিম্বা ভাবিতেছিল, ইহাদের দ্বারা কোন উপকাব হইতে পারে কিনা। মরিবাব সময কোন মানুষের যদি কোন বিষযে তীব্র ইচ্ছা থাকে, তবে ভূতযোনি সেই ইচ্ছা প্রকাশ করিযা থাকে। এরূপ ঘটনা ভূরি-ভূরি দেখা গিয়াছে এই লোকটা যখন বরফেব মধ্যে পডিয়া মারা যাইতেছিল, তখন নিশ্চযই উহাব মনে একটু আশ্রয় পাইবার ইচ্ছা তীব্রভাবে দেখা দিযাছিল। সেই জন্যই ভূতযোনিকে আশ্রয় খুঁজিতে ও আগুনে হাত সেঁকিতে দেখা গিয়াছিল।

সপ্তদশ অধ্যায়

মরা মানুষ সাহায্য করিতে আইসে—মায়ের স্নেহ

মরিয়া যাইবার পবও কোন কোন ব্যক্তি পৃথিবীবাসী আত্মীয়দিগের উপর খুব নজর রাখেন ; যাহাতে তাহাদের উপকাব হয়, যাহাতে তাহাদের কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, সে বিষয়ে তাঁহার খুব দৃষ্টি থাকে। ডাক্তার জন্ নীল এ সম্বন্ধে একটা সুন্দর গল্প বলিযাছিলেন। লেড্‌বিটার সাহেব "অদৃশ্য সহায়" নামক পুস্তকে সেই গল্পটি উদ্‌ধৃত করিয়াছেন। গল্পটি অতি চমৎকাব। গল্পটি এই ঃ—কিছু দিন আগে জনৈক ভদ্রলোকেব স্ত্রী মারা যায়। ভদ্রলোক ছেলেপুলেগুলি লইয়া পল্লীগ্রামে কোন একটি বন্ধুর সহিত দেখা কবিতে গিয়াছিলেন। বাডীটির নীচের তলাব পথগুলি এঁধো। ছেলেগুলি যাইয়াই মহা আনন্দে নীচে খেলিতে লাগিল। কিছু পরেই তাহাবা মুখ ভাব করিয়া তাহাদের পিতাকে বলিল—"বাবা, এইমাত্র মা'র সঙ্গে দেখা হইযাছে, মা বলিল, তোমারা এ দিকে আসিও না। এই বলিযাই মা মিলাইয়া গেল।" পবে অনুসন্ধান কবিযা দেখা গেল যে, ছেলেদেব মা যে দিকে যাইতে ছেলেগুলিকে নিষেধ করিযাছিলেন, সেই দিকে একটা পাতকুয়া আছে। কূপটি অনাবৃত, খেলিতে খেলিতে তাহাদেব তাহাব মধ্যে পডিযা যাওযা খুব সম্ভব। তাই মায়েব প্রেতমূর্ত্তি আসিযা এই দারুণ দুর্ঘটনা হইতে তাহাদিগকে বক্ষা করিলেন।

এই গল্পে দেখা যাইতেছে যে, মা মবিয়া গেলেও সূক্ষ্মজগৎ হইতে ছেলেগুলিব উপব স্নেহদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। এরূপ ঘটনা আবও অনেক ঘটিযাছে। ছেলেগুলিকে বিপদ হইতে বক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ একটা তীব্র বাসনা সূক্ষ্ম-জগতেও মাযেব মনে উদয হইযাছিল। তাই তিনি মূর্ত্তি ধরিযা ছেলেপুলেব সম্মুখে দেখা দিতে ও কথা বলিতে সমর্থ হইযাছিলেন। আবাব ঐ মাযের মূর্ত্তি মা না হইযা অপব কোন অদৃশ্য সহাযও হইতে পাবেন। সূক্ষ্ম-জগতে পরোপকারী মহাত্মাব অভাব নাই। হয তো ঐরূপ কোন মহাত্মা মাযেব মূর্ত্তি ধবিয়া ছেলেগুলিকে সাবধান কবিয়া দিয়া গিযাছিলেন। মায়েব মূর্ত্তি ধবিয়া দেখা দিলে তাহাদেব ভয হইবে না, তাই ঐরূপ মূর্ত্তি ধবিয়া আসিয়াছিলেন। মা বা মহাত্মা দুই-ই হইতে পাবেন। কিন্তু আমাদেব মনে হয, এটি মাযেবই মূর্ত্তি , কাবণ, মবণেব পব মাযেব স্নেহ কিছুমাত্র কমে না!

সূক্ষ্ম-জগদ্বাসী পরোপকাবী মহাত্মারা ইচ্ছা কবিলে যে কোন মূর্ত্তি ধবিতে পাবেন। আবাব যাঁহাবা মবিযা গিযা ভুবর্লোকে অবস্থান কবিতেছেন, তাঁহাবাও ইচ্ছামত মূর্ত্তি ধবিযা পৃথিবীব আত্মীয-স্বজনকে দেখা দিতে পাবেন। সঙ্কটসময়ে তাঁহাবা এরূপ কবিযাও থাকেন।

ভূতে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল

"সূক্ষ্ম-জগতেব সংবাদ" নামক গ্রন্থে এইরূপ একট গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে। পিযার্স ফিল্ডবাসী কর্ণেল স্মিথের কুমারী কন্যা এলিজাবেথ স্মিথেব জীবনে উইব নদীব উপরে এই ব্যাপাবটি

ঘটে। এই রমণী নিজেই গল্পটি লিখিয়াছেন। গল্পটি এইরূপ ঃ—"পাহাড়ের উপর উঠিয়া নক্‌সা তুলিয়া লইবার নিমিত্ত এক দিন এই রমণী পাহাড়ের উপরে উঠেন। কাছে 'আয়রা ফোর্স' নামক একটা অতলস্পর্শ ভয়ানক গহ্বর ছিল। পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে এমন একটা স্থানে গিয়া উঠিলেন যে, সেখান হইতে উঠিবারও যো নাই, আবার নামিবারও উপায় নাই। ভয়ানক সঙ্কট। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—এখনই পড়িয়া যাইব। পড়িলেই মহা বিপদ ; ভয়চকিত হইয়া তিনি চারি দিক্‌টা একবার দেখিলেন। নিজের বিপদ বুঝিয়া বড়ই ভীতা হইলেন। এমন সময়ে দেখিলেন, তাঁহার কাছ হইতে দুই শত গজ দূরে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরণে সাদা মছলিন কাপড়ের পোশাক। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা তখন প্রাতঃকালে এইরূপ পোশাক পরিতেন। সেই সাদা পোশাক-পরা মেয়েটি হাতছানি দিয়া ইঁহাকে ডাকিতেছিল। ঐ ডাক শুনিয়া ইঁহারও যাইতে ইচ্ছা হইল। আগে ইনি মহা চেষ্টা করিয়াও নামিতে পারিতেছিলেন না, নামিবার পথও দেখিতে পাইতেছিলেন না, আশ্চর্যের বিষয়, এখন একটি ছোট পথ ইঁহাব চক্ষুতে পড়িল। ইনি নামিয়া সেই স্ত্রীলোকটির দিকে চলিলেন। মুহূর্তমধ্যে তিনি গহ্বরেব অন্য পার্শ্বে আসিয়া পড়িলেন। তখন দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি তাঁহার নিজেব ভগিনী। এই কুমারী যখন নক্‌সা তুলিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিলেন, তখন ইঁহার ভগিনী বাড়ীতে পডাশুনা করিতেছিল। এখন কেন এইরূপভাবে সে ইঁহার অনুসরণ করিয়া একপ ভয়ানক স্থানে আসিয়াছে, এই ভাবিয়া ইনি বিস্মিত হইলেন। কিন্তু এখন যেরূপ বিপদ, তাহাতে উহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কবা ইনি আবশ্যক মনে কবিলেন না। তাহার পর সেই ভগিনী-রূপী-মূর্তি হাতছানি দিযা তাঁহাকে আবও নীচে একটা প্রস্তরখণ্ডের উপর লইয়া গেল। সেখান হইতে যে কোন ব্যক্তি খুব সহজেই নামিতে পাবে। সেখানে যাইযা কুমাবী স্মিথ একটু দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন—একটু দম লই, পরে ভগিনীকে গুটিকতক কথা জিজ্ঞাসা কবিব। কিন্তু কোথায সে ভগিনী! আর সে মূর্তি নাই। সে মূর্তি মিলাইয়া গিয়াছে। তাহাব পব তিনি বাড়ী আসিলেন। বাড়ী ফিরিতে দুই ঘণ্টা লাগিল। আসিযা দেখিলেন, তাঁহাব ভগিনী তখনও পডাশুনা কবিতেছে। সকলেব মুখে শুনিলেন যে, সেই ভগিনী একটিবারও উঠে নাই।"

কোন জীবিত লোকেব আত্মা যাইযা কুমাবী স্মিথকে সাহায্য করিয়াছিলেন কি সূক্ষ্ম-জগতেব কোন মহাত্মা আসিযা ঐরূপ কাণ্ড কবিলেন, তাহা গল্পটি পড়িয়া বুঝা যায় না। বাড়ীর ভগিনী যদি ঐ সময নিদ্রিতা হইযা পড়িত, তবে আমবা ধরিযা লইতাম যে, তাহার প্রেতাত্মা যাইয়া বিপন্না কুমাবীকে সাহায্য কবিয়াছিল। কিন্তু সে ধারণা কবিবার যো নাই ; কারণ, সে তখন ঘুমায নাই, বেশ জাগিযা পডা কবিতেছিল। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, অন্য কেহ ভগিনীর মূর্তি ধবিয়া দেখা দিযাছে। কিন্তু সেটা যে কোন মবা লোকেরই প্রেতমূর্তি, তাহাব কোন প্রমাণ নাই। এক ব্যক্তি অপবেব মূর্তি ধবে, একপ ঘটনা বিরল নহে। একপ মূর্তি ধবিয়া উপকাব অপকাব দুই-ই কবা যায। মূর্তি ধবিযা অপকার করিয়াছে, এরূপ ঘটনাও আমবা অনেক জানি। অনেকে আজকাল জানেন যে, চক্র বা বৈঠক কবিয়া মরা মানুষেব আত্মাকে হাজিব কবা যায। তাহাকে প্রেত-বৈঠক বলা যাউক। এইরূপ প্রেত-বৈঠকে এক জন অপরের মূর্তি ধরিযা আইসে। সাধাবণে সে মূর্তি দেখিযা কিছুই বুঝিতে পাবে না। সাধনা দ্বাবা যাঁহারা দৃষ্টিব উন্মেষ কবিযা লইযাছেন, কেবল তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, এটি আসল মূর্তি, আর ওটি নকল মূর্তি।

ভূতে এক জন পুরোহিতকে ডাকিয়া আনিয়াছিল

ডাক্তার লী "ছায়ারাজ্য" নামক গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠায় দুইটি অতি চমৎকার গল্পের অবতারণা কবিযাছেন। পার্থিব আত্মীয়েব পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিয়া মবা মানুষের জীবাত্মা পুরোহিতকে ডাকা প্রভৃতি কার্য করিয়াছিল। প্রথম গল্পটি এই ঃ—এক জন বৃদ্ধা প্রায় দশ বৎসর হইল মারা গিয়াছিল। হঠাৎ এক দিন যে সশরীরে জনৈক পুরোহিতের কাছে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, 'এক জন ভদ্রলোক অমুক স্থানে মর-মর হইয়াছেন। পারলৌকিক কার্যেব নিমিত্ত আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া সেখানে যান।' এই কথা শুনিয়া পুরোহিত সেখানে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন, কাহারও অসুক-বিসুখ নাই ; কেবল এক জন কাথলিক ধর্মের লোক সেখানে আছেন , তিনি ধর্মকর্ম বড় একটা করেন না, লোকটার যেন নাস্তিক ভাব। তাহার সঙ্গে পুরোহিতের গল্প-স্বল্প দেখা সাক্ষাৎ হইল। পুরোহিত তাহাব মতি-গতি দেখিয়া অনেক উপদেশ দিয়া তাহাকে অনেকটা ধর্মপথে আনিলেন। ঠিক এই ঘটনার পবদিনই রাত্রে লোকটা হৃদরোগে মারা গেল। তাহাকে সমাধিস্থ করিবার সময় পুরোহিত আসিলেন ; আসিয়া দেখিলেন, সেই বৃদ্ধার একখানি চেহারা বাঁধান রহিয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, বৃদ্ধা মৃত ব্যক্তির মা। আরও শুনিলেন, বৃদ্ধা দশ বৎসর হইল মারা গিয়াছেন। আর একটি গল্প এই—দুইটি ছেলে এক দিন এক পুবোহিতের কাছে যাইয়া বলিল, 'অমুক ঠিকানায় আমাদের পিতা মর মব হইযাছেন, আপনি অন্তিম কার্য্যেব জন্য সেখানে চলুন।' পুবোহিত সেখানে যাইয়া দেখিলেন যে, লোকটি মর-মব বটে, কেবল এই বলিযা দুঃখ কবিতেছে—"হায হায, জগতে আমাব কেহই নাই, আমি একা একা মবিতেছি, পাবলৌকিক কার্য করিবার নিমিত্ত পুবোহিতকে ডাকিযা দেয, এমন লোকটাও নাই।" পুবোহিত বলিলেন, "কেন, তোমাব এই বকম চেহারার দুইটি পুত্র আমাকে ডাকিতে গিয়াছিল। তাহারা কোথায় গেল?" মুমূর্ষু লোকটি বলিল,—"আমার সেই দুইটি ছেলে কিছুদিন হইল মাবা গিযাছে।" ব্যাপাবটা যে কোন্ সনেব কোন্ দিন ঘটিযাছিল, ডাঃ লী তাহা বলেন নাই।

গল্প দুইট আলোচনা কবিলে দেখা যায়, পার্থিব আত্মীযেব বিশেষ বিপদ হওয়ায় মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা সাহায্য কবিতে আসিযাছিল। ইহাবা খুব অল্পসময়েব জন্য মাত্র একটিবাব সাহায্য করিয়াই চলিযা গিয়াছিল , বাব বাব আইসে নাই। কিন্তু মবা মানুষেব প্রেতযোনি অনেক দিন ধবিয়া আসিতেছে ও পার্থিব লোকের পুনঃ পুনঃ উপকাব করিতেছে, এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে। এরূপ ঘটনা খুব বেশী দেখা যায না। কেন না, যাঁহাবা পবোপকাবী সাধুপ্রকৃতি, মবণেব পব তাঁহাদেব প্রেতাত্মা ভুবর্লোকে অনেক দিন বড থাকে না। শীঘ্রই তাঁহাদেব উর্দ্ধগতি হয়। তাই তাঁহারা খুব বেশী আসিতে পাবেন না। বিশেষ কোন একটা কার্য সম্পাদন করিবাব জন্য ভুবর্লোকে কেহ কেহ কোন কোন সময একটু দীর্ঘকাল থাকেন সত্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, এক জন স্বামীব প্রেতাত্মা স্নেহ-মায়ায আবদ্ধ হইযা স্ত্রীব কাছে কাছে অনেক দিন ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন।

ডাঃ মিনট্ জে স্যাভেজ ১৯০২ খৃস্টাব্দেব মার্চ মাসের "আইনস্লীস্ ম্যাগাজিন" নামক পত্রিকায় একটি বিবরণ দিযাছেন। উহা পডিযা দেখা যায যে, এক জন সাধুপ্রকৃতিব লোক মবণের পবও সেবাধর্মে নিরত ছিলেন। গল্পটি নবম খণ্ডেব ১১৭ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইযাছে। খুব সংক্ষেপে গল্পটি বলিতেছি। ব্যাপাবটি এই ,—

ভূবর্লোকে থাকিয়া একটি ভূত পরোপকার করিত

কয়েক বৎসর হইল, বোস্টন শহরে এক জন সুবিখ্যাত ধর্মপ্রচাবক দরিদ্র লোকদিগকে ধর্মোপদেশ দিতেন। দরিদ্রের জগতে বড় একটা বন্ধু-বান্ধব থাকে না। কিন্তু ইনি ও ইঁহার স্ত্রী দুই জনেই গরীব লোকদিগেব প্রতি বিশেষ অনুকূল ছিলেন। প্রচারক যখন বৃদ্ধ হইলেন, তখন আর এক জন সহযোগী জুটিয়া গেল। সহযোগী, প্রচারক ও তাঁহার স্ত্রী, এই তিন জন তখন গরীব লোকগুলিকে ধর্ম উপদেশ দিতে লাগিলেন। কালক্রমে এই তিন জনই মারা গেলেন। কেবল সহযোগীর পত্নী জীবিতা রহিলেন। ইনি অনেক সময় ভূতপ্রেত দেখিতে পাইতেন। ধর্মপ্রচারক ও তাঁহার স্ত্রী মারা গেলেও গরীব লোকগুলিব উপর তাঁহাদের আগেকার মত ভালবাসা ও প্রাণের টানই ছিল। উঁহারা মারা গেলে গরীব লোকদের মধ্যে অনেকে অন্য গ্রামে উঠিয়া গেলেও প্রচাবক ও তাঁহার স্ত্রী সূক্ষ্ম-জগৎ হইতেই তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেন। তাঁহারা সহযোগীর জীবিত সেই পত্নীকে সেই গ্রামে যাইয়া সেই সকল স্নেহাস্পদ গরীব লোকগুলিকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্তি দিতেন। সেই সব লোকগুলির অভাব-অভিযোগ তাঁহারা সূক্ষ্ম-জগৎ হইতেই জানিতে পাবিতেন।

এইরূপ ভাবে তাঁহাবা অনেক দিন ধরিয়া পরোপকাবব্রত পালন করিয়াছিলেন। সেই জন্য যশেব আশা, খ্যাতির আশা কোনরূপ আশাই তাঁহাদের প্রাণে কোন দিন জাগে নাই। বরং তাঁহাদেব সেবাধর্ম কেহ না জানিতে পারে, এইটিই তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল। সেই জন্য তাঁহাদিগকে অনেক সময় দিতে হইত, বিস্তর অর্থ-ব্যয়ও করিতে হইত। তাঁহাদের এই সেবা-ধর্মের কথা দুই তিনটি প্রাণের বন্ধু ছাড়া আর কেহই টের পায় নাই। * * * সহযোগীর বিধবা পত্নী বোস্টন শহরের কাছেই বাস করিতেন। অদৃশ্যভাবে প্রচারকের ও তাঁহার স্ত্রীর প্রেতাত্মা তাঁহাকে বলিয়া দিতেন—"তুমি শহরের অমুক স্ট্রীটের এত নম্বব বাড়ীতে যাইয়া অমুক অমুক লোকেব সঙ্গে দেখা কর ; তাহারা এইরূপ এইরূপ অবস্থায় আছে ; তুমি যাইয়া এইরূপ উপকার কর।"

এইরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে পুনঃ পুনঃ ঘটিয়াছে। মৃত প্রচারক ও তাঁহার স্ত্রীর এইরূপ আদেশ পাইলেই সেই বিধবাটি তদনুসারে সেই সেই স্থানে স্থানে যাইয়া, সেই সেই লোকের সঙ্গে দেখা করিয়া সেই সেই কার্য করিতেন। প্রেতাত্মার কাছে যেমন যেমন শুনিতেন, যাইয়া দেখিতেন, ঘটনাও বাস্তবিক সেই সেইরূপই বটে। একদিনও এদিক ওদিক হয় নাই। এক দিন এইরূপ আদেশ পাইয়া শহরে গেলেন। প্রেতাত্মার কাছ হইতে যেমনটি শুনিয়া গিয়াছিলেন, যাইয়া তাহাই দেখিলেন। তাহার পরে নিজের কর্তব্য করিলেন। তাঁহাকে সব সময় একরূপ কাজই করিতে হইত না। কোন কোন সময় উপদেশ দিয়া তাঁহাকে অসৎপথ হইতে অনেককে সুপথেও আনিতে হইত। সে অসৎ পথ এখনই বিশ্রী যে, তাহার বিবরণ পড়িলে গা শিহরিয়া উঠে।

এই ধর্ম-প্রচারক সম্বন্ধে আর একটি অদ্ভুদ ব্যাপার আছে। সেটাও বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। এক দিন ধর্মপ্রচারকের প্রেতাত্মা সহযোগীর বিধবা পত্নীর ঘাড়ে চাপিয়া নিজের মেয়েকে আদেশ করিলেন যে, অমুক শহরের অমুক লোকের নামে কুড়িটা টাকার নোট একখানা খামে পুরিয়া পাঠাও। সে লোকটির নাম ও ঠিকানা ভূতাবিষ্ট বিধবার মুখে প্রকাশ পাইল, তাহা তিনি পূর্বে কখনও শুনেন নাই। কন্যা এইরূপ ভাবে টাকা পাঠাইবেন কি না,

ভাবিতেছিলেন। তাঁহাব মনে হইতেছিল, টাকাটা মারা না যায়, এমন ভাবেই পাঠান যাইবে। তখন প্রেতাত্মা আবার জিদ্ করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। প্রচারক কন্যাকে বিধবার মুখ দিয়া জানাইলেন—টাকা পাঠান নিতান্ত আবশ্যক, বিলম্ব করিলে বিশেষ দুর্ঘটনা ঘটিবে। কন্যা তখনই টাকা পাঠাইলেন ; দশ টাকার করিয়া দুইখানি নোট খামে পাঠাইয়া দিলেন। যিনি টাকা পাইলেন, তিনি অবশ্যই প্রাপ্তিস্বীকার কবিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। লেড্‌বিটার সাহেব নিজে সে পত্রখানিও দেখিয়াছেন। পত্রখানি পেন্সিল দিয়া লেখা ; দেখিলে মনে হয়, যেন কেহ খুব কষ্টের সঙ্গেই লিখিয়াছেন ; বাকরণশুদ্ধও নহে ; আবার রাশি রাশি বানান ভুল। পত্রখানা পড়িয়া জানা যায়, এক জন স্ত্রীলোকেব স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্রী কু-ব্যবহার করিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, কোথায চলিয়া গিযাছে। স্ত্রীলোকটি ছেলেপুলে লইযা খুব কষ্টে পড়িয়াছেন। ঘরের জিনিসপত্র সব বাঁধা দিয়া খাইয়াছেন। আর এক দিনও চলিবার উপায় নাই। শেষে মনে করিয়াছেন যে, ছেলেপুলে সব শুদ্ধ বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমন সময় ঐ টাকা তাঁহাব হাতে গিয়ে পৌছিল।

এই ঘটনাটি খুব অল্পদিন হইল ঘটিয়াছিল। গল্পটি বেশ চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এরূপ ব্যাপার খুব বিরল। তথাচ ইহা ঠিক যে, মৃত আত্মীয় বা বন্ধু অনেক সময় এরূপ সাহায্য কবিয়া থাকে। উপকারী প্রেতাত্মা আমাদেব কাছে নানা রকমে আইসে—কখন প্ল্যানচেট্ নামক যন্ত্রে আইসে, কখন ঠক্‌ঠক্ কবিয়া শব্দ নিজের আসা ব্যক্ত করে, আবার কখন বা স্বপ্নের মধ্যে আইসে। কিন্তু খুব বেশী সময়ই মনের মধ্যে একটা তীব্র ইচ্ছা বা ভাব জাগাইয়া দেয়।

গ্যাস্‌পার নামক একটা ভূতের কথা

অনেক সময় ভূতটাকে দেখা যায় না। অথচ তাহাব কথা বেশ শুনা যায়: অবশ্য এরূপ ঘটনা খুবই কম ঘটে। আমরা এরূপ ঘটনার দুই একটা গল্প বলিব। "সূক্ষ্ম-জগতে পদসঞ্চাব" নামক গ্রন্থের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় এই রকম একটা গল্প বলা হইয়াছে। একটা ভূত দেখা দিত না, অথচ কথা বলিয়া এক গৃহস্থকে তিন বৎসর যাবৎ সদুপদেশ দিত; অহরহঃ তাহাদেব সঙ্গী হইয়া থাকিত। তাহাকে কেহ কখন দেখিতে না পাইলেও তাহার গলার স্বর বাড়ীর চাকর-চাকরাণীবা পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট শুনিয়াছে। ভূতটির নাম—গ্যাস্‌পার। তাহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হইত—"তোমার বাড়ীটা কোথায় ছিল, তোমার আত্মীয়-স্বজন কে আছে, তুমি কি করিতে, কেমন করিয়া কোন্ সময় মবিয়াছ", এ সব কথায় সে কোন উত্তর করিত না। সে এতই হিতৈষী ছিল যে, তাহার কথা শুনিলেই গৃহস্থ বড়ই আনন্দিত হইয়া উঠিত। তাহার উপদেশে সেই গৃহস্থের বরাবরই ভাল হইয়া আসিয়াছে। মাত্র দুইবার তাহাকে দেখা গিয়াছিল। দেখা দিবার সময় কখনও বাড়ীর মধ্যে দেখা দেয় নাই। বাড়ীর বাহিরে মূর্তি ধরিয়া চক্ষুগোচর হইয়াছিল। সে সময় দেখা গেল, তাহাব গাযে খুব ঝুলওয়ালা বড় জামা, আর মাথাব টুপীটাও একটু অন্যপ্রকার। সেরূপ জামা ও টুপী প্রাযই ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণাংশের লোকেরাই বেশী বেশী পরে। গ্যাস্‌পার কখনই ধর্মবিষয়ের আলাপ-পরিচয় করিত না। তবে শান্তি ও সদ্‌গুণ ভালবাসিত।

এই ব্যক্তি ঐ গৃহস্থের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ নহে। হঠাৎ গৃহস্থের উপর ইহার ভালবাসা আসিয়া পডিয়াছিল। তাই ইহাদের কাছে কাছেই ভালবাসার টানে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু একটা বিষয় বলা উচিত। এই গৃহস্থের বাড়ীর মধ্যে এমন একটা লোক ছিল, যাহার ঘাড়ে সহজেই ভূতাবেশ হইতে পারিত। গ্যাস্‌পার সেই লোকটার দেহ হইতে স্থূল জড়াংশ আকর্ষণ

করিয়া লইয়া মানুষের গলার মত স্বর বাহির করিত। যে দুইবার দেখা গিয়াছিল, সে দুইবারও তাহার দেহ হইতেঐরূপ জড়াংশ গ্রহণ করে। কিছু দিন পরে ঐ গৃহস্থ অন্য স্থানে যাইয়া বাস করিতে থাকে। গ্যাসপা৷ তখন তাহাদেব সঙ্গে গেল না। হয় ত তখন উর্ধ্বলোকে গিযা উঠিয়াছিল। তাই আর দেখা দিতে পারিল না।

কখন কখন শুধু উপদেশ দিবার নিমিত্ত মরা মানুষের আত্মা আসিয়া হাজির হয়। সেইরূপ একটা গল্প নীচে দেওয়া হইল। গল্পটি খুব চমৎকার।

জনতাপূর্ণ বড় রাস্তার উপর ভূত আসিয়া দেখা দিল

৯৮ নং শচীহল স্ট্রীটেব মিঃ ডেভিড ডিক্ এইরূপ একটি ভূত দেখিয়াছিলেন। ডিকের বয়স ৩৫ বৎসর, বেশ বলিষ্ঠ বিবাহিত যুবক। ইনি গ্লাসগো রস্কিন্-সমিতির এক জন সদস্য। তাঁহাব সঙ্গে স্টেড্ সাহেবের নিম্নলিখিত প্রকার কথাবার্তা হইয়াছিল।

ডিক্। আমি ভূতটিকে দেখিয়াছি। সেটা ভূও ছাড়া আব কিছু হইতেই পারে না।

স্টেড্। সেটা জীবিত মানুষের ছাযাদেহ না মরা মানুষের?

ডিক্। মরা মানুষের।

স্টেড্। লোকটা কত দিন হইল মাবা গিযাছে?

ডিক্। ছয বৎসব।

স্টেড্। কোথায দেখিয়াছিলেন?

ডিক্। গ্লাসগো শহবে।

স্টেড্। দিনে না বাত্রে?

ডিক্। দিনেব বেলায বৈকাল সাড়ে তিনটার সময।

স্টেড্। কিরূপ ব্যাপার হইল, বলুন।

ডিক্। আমি বৈকালে সাড়ে তিনটার সময় শচীহল্ স্ট্রীট হইতে বাহির হইলাম। বিশেষ কোন কার্যে আমি সেণ্ট ভিনসেণ্ট স্ট্রীটে যাইতেছিলাম। যে কাজে যাইতেছিলাম, তখন সেই চিন্তাতেই বিভোর। শচীহল্ স্ট্রীট বাহিয়া শেষে বেন্‌ফিল্ড স্ট্রীটে যাইযা উপস্থিত হইলাম। ঠিক তখনই ভূতটি আসিয়া উপস্থিত হইল।

স্টেড্। তাহাকে ভূত বলিয়া জানিতে পারিলেন?

ডিক্। খুব ভাল করিয়াই পারিলাম।

স্টেড্। ভূত, তাহা কি করিয়া বুঝিলেন?

ডিক্। কাবণ, তখনই তাহাকে চিনিয়া ফেলিলাম।

স্টেড্। ভূত আপনাব সঙ্গে কথা বলিল?

ডিক্। হাঁ, বলিল।

স্টেড্। কি কথা বলিল?

ডিক্। সেটি বলিব না। একটা গোপন কথা ; আমি ছাড়া আর কেহই তাহা জানে না।

স্টেড্। আপনি তাহার কথায় জবাব দিয়াছিলেন?

ডিক্। দিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া স্বাভাবিক মানুষের মত সে আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর চলিল। আমরা একসঙ্গে কথা বলিতে বলিতে ববাবর রেন্‌ফিল্ড স্ট্রীট দিয়া দক্ষিণদিকে

চলিলাম। ঠিক সাধারণ মানুষের মত। কেহই তাহাকে ভূত বলিয়া চিনিতে পাবে নাই। তাহার গায়ে কালো বঙের একটা কোট ছিল। মাথায় চ্যাপ্টা রকমের পশমী টুপী। লোকটা যখন বাঁচিয়া ছিল, তখন আমি তাহাকে ঐ টুপীটা আব এক দিন পরিতে দেখিয়াছিলাম। আমরা একসঙ্গে প্রায় ২৫০ গজ পথ গিয়াছিলাম। এ পথটা গ্লাস্‌গো শহরেব মধ্যে একটা খুব জনপূর্ণ পথ। যখন ভিন্‌সেন্ট স্ট্রীটেব কাছে যাইযা পৌছিলাম, তখন ভূতটা অদৃশ্য হইল। ভূতের আসা বা যাওযার ভঙ্গীটা আমি দেখি নাই।

স্টেড্। আপনার ভয় হইল না?

ডিক্। কিছুমাত্র নয়।

স্টেড্। ভূতকে আপনি কোন প্রশ্ন করিয়াছিলেন?

ডিক্। না, প্রশ্ন করি নাই। কেবল সে যে কথা তুলিয়াছিল, তাহাই বলাবলি কবিয়াছিলাম।

স্টেড্। ভূতটি হঠাৎ গেল ভাবিয়া আপনার বিস্ময় হইয়াছিল কি?

ডিক্। না ; আসিবার সমযও সে জাঁক করিয়া আইসে নাই, যাইবার সময়ও নীববেই গেল। মিলাইয়া যাওয়াটা আমি দেখি নাই। কেবল দেখিলাম, আব নাই।

স্টেড্। আপনি ভূতটিকে চিনিতে পারিয়াছিলেন?

ডিক্। ভাল কবিযাছিলাম।

স্টেড্। আচ্ছা, ভূতটি কে?

ডিক্। সেটি আমাব পিতার প্রেতাত্মা।

স্টেড্। আপনি কি আপনার পিতাব ভাবনা ভাবিতেছিলেন?

ডিক্। আদৌ না।

স্টেড্। যখন সেই ভূতযোনিটি কথা বলিল, তখন আপনি বোধ হয বিস্মিত হইলেন?

ডিক্। একটুও নহে।

স্টেড্। কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও ইচ্ছা হইল না?

ডিক্। না। সেটা যেন স্বাভাবিক ঘটনার মতই মনে হইল। আমি যেখানে যাইতেছিলাম সেখানকার কথাই ভাবিতেছিলাম। পবের দিন যখন মনে হইল যে, কা'ল বাবাব সঙ্গে দেখা হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিযাছি, তখন মনে হইল, বাবা আজ ছয় বৎসব হইল মাবা গিয়াছেন। এত দিন পরে জনপূর্ণ বড বাস্তাব উপবে তাঁহাকে দেখিলাম। এই সব ভাবিতে ভাবিতে একটু বিস্মিত হইয়া উঠিলাম। সেই বাবারই প্রেতাত্মা, সে বিযযে আমাব কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ও-রূপ ব্যাপার আমাব জীবনে আব কখনও হয নাই। বাবা মবিযা গেলে ছয বৎসব পরে আমি তাঁহার সঙ্গে রেনফিল্ড রাস্তার উপরে বেডাইয়াছি। এই অদ্ভুত কথা চিরদিনই আমার মনে থাকিবে।

ডিক্ আবও বলিলেন—"ভূতযোনি আমাকে একটু ইসাবায় জানাইলেন যে, 'তুমি একটা তুচ্ছ বিষযে এত ভাবিতেছ কেন? অত ভাবিবাব প্রযোজন নাই। যা হইবে তা হইবেই। সে বিষয়ে অন্যরূপ করা তোমার সাধ্য নহে। নিরর্থক দুশ্চিন্তা কেন?' ভূতযোনির মুখে কোনরূপ আশা-ভরসাব প্রতিশ্রুতি বাহির হয় নাই। তাহা যদি হইত, তবে সেটিকে আমি কোন জুয়াচোরের প্রেতাত্মা মনে করতাম ; কেন না, আমার পিতা কাহাকেও আশ্বাস-বাণী দিতেন না। তিনি খুব গম্ভীর প্রকৃতিব লোক ছিলেন। বিখ্যাত মৌনী উইলিযম দি স'ইলেণ্টও বাবাব তুলনায বাচাল।"

১৮৯১ খৃস্টাব্দে ডিকের সঙ্গে স্টেডের এইরূপ কথাবার্তা হইয়াছিল। তিনি "প্রকৃত ভূতের গল্প" নামক পুস্তকের ১৮৪ পৃষ্ঠায় এই গল্পটি লিখিয়াছেন। জনপূর্ণ শহরে রাস্তার উপরে দিনের বেলায় ভূত-যোনি আসিয়া দেখা দিল, এইটুকুই গল্পটির নূতনত্ব। কিন্তু রাস্তার অন্য লোকেও সেটাকে দেখিয়াছিল ও ভূত বলিয়া বুঝিয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। তাই মনে হয়, ঐটি ঠিক ভূত-যোনি নহে, হয় তো পিতার চিন্তা-রাশি ডিকের কাছে ঐরূপ মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল। গল্পটির মধ্যে আর একটু বিশেষত্ব এই যে, ডিক নিজের কাজের চিন্তায় এতই বিভোর হইয়াছিলেন যে, তিনি যে পিতার সঙ্গে গল্প করিতেছেন, তাহাও প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। অথচ সেই পিতা ছয় বৎসর পূর্বে মারা গিয়াছেন। এ স্থলে পুত্রকে একটু উপদেশ দিবার ইচ্ছা মৃত পিতার মনে জাগিয়াছিল। তাই তিনি চিন্তামূর্তিটি পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু যে বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন, সে বিষয়টি এত গুরুতর নহে—যাহাতে সূক্ষ্ম-জগতের সাহায্য আবশ্যক হয়।

এরূপ তুচ্ছ বিষয়ের নিমিত্ত মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রায়ই ব্যাকুল হয় না। গুরুতর বিষয়েই—পার্থিব আত্মীয়ের সঙ্কট-সময়েই—মৃত আত্মীয়গুলি আসিয়া সাহায্য করে। বৃটনদিগের বিশ্বাস এই যে, আমরা যদি সংসারের তুচ্ছ খুঁটি-নাটি লইয়া বিভোর না থাকি, তবে অনেক সময়েই মরা মানুষের দেখা পাই। সংসার লইয়া ব্যস্ত থাকি বলিয়াই তাহারা যখন তখন আসিয়া সাহায্য করে না; যখন খুব বিপদে পড়ি, কেবল তখনই আইসে। খুব ভালবাসার লোক শীঘ্রই মারা যাইবে বুঝিলে তাহারা আসিয়া তাহাকে সে কথা জানাইয়া দেয়। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে। এরূপভাবে জানাইবার দুইটি উদ্দেশ্য আছে। প্রথমতঃ, যদি আমরা আমাদের মরণের কথা জানিতে পারি, তবে পারলৌকিক কার্যের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হই। দ্বিতীয়তঃ, তাহা হইলে সংসারের একটা বিলিব্যবস্থাও করিতে পারি। তাহা ছাড়া আত্মীয়-স্বজনকে আগে হইতে প্রবোধ দিয়া এমনটি করিতে পারি যে, মরণ হইলে তাহারা শোক সহ্য করিতে অনেকটা পারগ হয়। ঠিক এই রকম একটি প্রেতের কথা ডাঃ মিন্ট জে স্যাভেজ পূর্ব্বকথিত পরোপকারী ধর্ম-প্রচারকের গল্পের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গল্পটি এই ঃ—

মরা পিতা আসিয়া মরণের কথা বলিয়া গেল

নিউ ইয়র্ক শহরের কাছে প্রায় দুই বৎসর হইল, এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। এক জন যুবক অন্যত্র থাকিয়া পড়াশুনা করিত। হিড্‌লবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পড়িত। যুবক দেখিতে বেশ লম্বা ও বলিষ্ঠ। খুব বলিষ্ঠ বলিয়া তাহার একটা খ্যাতিও ছিল। তাড়িৎ, গণিত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি পড়িতে ভালবাসিত। এক দিন অবকাশে বেশ সুস্থ-দেহে বাড়ীতে মায়ের কাছে আসিল। দুপুরে খাইবার পর যুবক চুরুট খাইতে খাইতে বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইত। বরাবরই তাহার এই অভ্যাসটা ছিল। এক দিন সন্ধ্যাকালে সে কাহারও সহিত কথাবার্তা না কহিয়া নীরবে বাড়ীতে শুইতে গেল। রাত্রি প্রভাত হইলে, খুব সকালে মায়ের শুইবার ঘরে প্রবেশ করিল। তখনও মা ঘুমাইতেছে। সেখানে যাইয়া মাকে জাগাইবার জন্য খুব আস্তে আস্তে তাঁহার গালে হাত বুলাইতে লাগিল। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল। তখন সে বলিল—"আমি তোমাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে আসিয়াছি। তুমি প্রাণটাকে একটু কঠিন করিয়া শুন।" মা এইটুকু শুনিয়াই চমকিতা হইলেন। বলিলেন—"কি ভয়ানক কথা বলিবে?" যুবক বলিল—"মা, আমি বলিতে আসিয়াছি যে, আমি খুব শীঘ্রই মারা যাইব।"

মা এই কথা শুনিয়াই চমকাইয়া উঠিলেন। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিলেন—"এরূপ বলিতেছ কেন?" যুবক বলিল—"গত রাত্রে আহারের পর যখন আমি ঘোরান বারান্দায় চুরুট খাইতে

খাইতে বেড়াইতেছিলাম, তখন একটা ভূত আমার কাছে আসিয়া আমার সঙ্গে বেড়াইতে লাগিল। তাহার কাছে আমার মরণের আর দেরী নাই শুনিলাম। মা, আমি তবে শীঘ্রই মরিব।" মায়ের প্রাণ সহজেই আকুল হইয়া উঠিল। মা মনে করিলেন,—হয় তো পুত্রের মাথা খারাপ হইয়াছে। তাই তিনি ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডাক্তার আসিলে ছেলের কথাগুলি তাঁহাকে সমস্তই বলিলেন। ডাক্তার যুবকের শরীর বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। বলিলেন—"ওটা কিছুই নহে ; হয় তো একটা খারাপ স্বপ্ন দেখিয়াছে; আপনি কিছুই মনে করিবেন না চিন্তা দূর করুন। দুদিন পরে যখন বুঝিবেন যে, মিথ্যা বিষয় লইয়া ব্যস্ত হইযাছিলেন, তখন আর হাসি সংবরণ করিতে পারিবেন না।" এই বলিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

প্রাতে দেখা গেল, যুবক একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। আবার ডাক্তারকে আনা হইল। এবারও ডাক্তার বলিলেন—অসুখ-বিসুখ কিছুই নাই। তিনি যুবকের মরণের চেষ্টা করিলেন। পরের দিন প্রাতেও যুবকের শরীর অসুস্থ হইল , এ দিন আরও বেশী খারাপ বোধ হইতে লাগিল। ঐ ডাক্তারকে আবার আনা হইল। এবার তিনি দেখিলেন, যুবক অন্ত্র প্রদাহ-রোগে আক্রান্ত। অস্ত্র করিলেন। কিন্তু রোগী দুই দিনের দিন মারা গেল। প্রেত আসিয়া মরণের কথা বলিবার পাঁচ দিনের মধ্যেই যুবক মারা পড়িল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে যুবকের মা নিউ ইয়র্ক শহরে জনৈক সূক্ষ্মদর্শীর কাছে গেলেন। যাইবেন বলিযা আগে হইতে কোন পত্র লেখালেখি করেন নাই। দেখা করিবার কোন বন্দোবস্তই আগে ছিল না। হঠাৎই যাইযা উঠিলেন। সেই সূক্ষ্মদর্শীর ঘাড়ে মৃত যুবকের আত্মা আসিয়া চাপিয়া বসিল। পরে তাহার মুখ দিযা অনেক কথা মাকে বলিল। এমন সব কথা বলিল, যাহা সেই সূক্ষ্মদর্শী কিছুমাত্র জানিতেন না। তখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, —"সে দিন কোন প্রেত তোমাকে তোমার মরণের কথা বলিয়া গিয়াছিল? তুমি কাহাকে দেখিয়াছিলে।" প্রেতত্মা উত্তর করিল—"বাবার জীবাত্মা আমাকে মরণের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন।" যুবকের পিতা কয়েক বৎসর আগে মারা গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যুবকের মা আবার বিবাহ করিযাছেন।

অনেক পরিবারের মধ্যেই শুনা যায় যে, তাহাদের মৃত আত্মীয়েরা বরাবরই মরণের কথা জানাইয়া আসিতেছে। মরা মানুষের এরূপভাবে সংবাদ দিতে আসিবার অনেকগুলি কারণ থাকিতে পারে। হয়, অভিজাত বংশের লোক বলিয়া তাহাদের একটা অপরিমিত গর্ব আছে; নয়, জীবিতকালে ঐ সকল লোক অনেক পাপ করিয়াছিল, এখন কতকটা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ; কিংবা নিজেদের বংশের প্রতি খুব স্নেহ আছে, বংশমর্য্যাদার দিকে খুব লক্ষ্য আছে, তাই মরণের কথা বলিতে আইসে। খুব বড় বড় বংশেই এইরূপ কাহিনী বেশী বেশী শুনা যায়।

বংশগত ভূতের কাহিনী

যতগুলি বংশগত ভূতের গল্প জানা আছে, তাহার মধ্যে নিউহজ নামক স্থানের শ্বেত-বসনা রমণীর গল্পটিই খুব বিশ্বাসযোগ্য। রমণীর পিতার নাম—অল্‌রিচ ভন্ রোজেন্‌বার্গ ; মায়ের নাম—ক্যাথেরাইন্ অব্ ওয়ারটেন্‌বার্গ। রমণী পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় এ পৃথিবীতে ছিল। তাহার বিবাহটা বড়ই অসুখকর হয়। বিধবা হইবার পর সে এক দিনও সুখী হয় নাই, বড়ই কষ্টে ছিল। তাই মৃত্যুর পরে ভুবর্লোকে যাইয়া তাহাকে অনেক দিন থাকিতে হইল। বিবাহিত জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা যদি আমারা না জানিতাম, তবে রমণী কেন এত দিন

ভুবর্লোকে আছে, এ কথার কোন উত্তর করিতে পারিতাম না। কারণ, তাহার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আমরা আর বড় একটা জানি না। যাহা হউক, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মাঝে মাঝে আমরা তাহাকে দেখিতে পাইতেছি। আব, তাহাব কাজই হইতেছে বড় বড় বংশের জীবিত লোকগুলিকে মরণেব পূর্ব্বে আসিয়া সংবাদ দেওয়া। অবশ্য সে সব বংশের সহিত তাহার সম্পর্ক আছে। ঐ সকল বংশের লোকগুলিব বিশ্বাস যে, রমণীর উদ্দেশ্য খুব ভাল আব যথাসময়ে মৃত্যু-সংবাদ জানাইয়া বমণী বিশেষ উপকারই করিয়া আসিতেছে।

এইরূপ আর একটি গল্প বলিব। ডার্মাস্ট্রীট শহরের কৃষ্ণবসনা রমণীর কথাও অদ্ভুত। "ছায়ারাজ্য" নামক পুস্তকেব ৭৩ পৃষ্ঠায় ডাক্তার লী ঐ গল্পটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই রমণী তিনবাব দেখা দিয়াছিল ; তিনবারই একটি করিয়া লোক মাবা যায়। ইহাকে যে উড়োতাড়া করিয়াছে, সেই হঠাৎ মারা পড়িয়াছে। এইটুকুই বিশেষত্ব। একবার জনৈক যুবক ইহাকে ধবিবার চেষ্টা করে, না ধরিতে পারিয়া ইহাকে গুলি করে। দেখা গেল হঠাৎই যুবক মারা পড়িল অথচ মরিবার মত ব্যারাম-স্যারাম বা অন্য কোন কারণ কিছুই ছিল না। আর দেখা গেল যে, বন্দুকটি ভাঙ্গা পড়িয়া রহিয়াছে, বন্দুকেব নলটি স্ক্রুপের মত মুচড়াইয়া পাকান অবস্থায় আর এক স্থানে পড়িয়া আছে।

বংশের মৃত ব্যক্তিরা জীবিত লোকের আসন্ন মৃত্যুর কথা কখন অন্য উপায়ে জানাইয়া দেয। সেই উপায়টি তাহার কাছে খুব সহজ বলিয়া মনে হয ; কেন না, তাহাতে বারে বাবে মূর্তি ধবিয়া দেখা দিতে হয না। সকল দেশেই দুর্লক্ষণ বলিযা ব্যাপার আছে। তাহাবা জীবিত ব্যক্তির সম্মুখে ঐ দুর্লক্ষণ উপস্থিত তাহাকে জানাইয়া দেয় যে, তাহার মরিবার আর দেরী নাই। আমাদেব মনে হয়, দুর্লক্ষণ দেখিলেই যে মবণ হয়, তাহা সকল সময় হয় না। দুর্লক্ষণ দেখিলে কি হয় না হয়, সে সব বিষয় আমবা স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

যে আগে মরিবে, সে অপবকে দেখা দিয়া সূক্ষ্ম-জগতেব অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত অনেক সময় অনেকে করিয়াছে। এরূপ গল্প আমাদেব অনেকগুলি জানা আছে। কিন্তু মরিয়া গিয়াও অনেকে দেখা দিতে পাবে নাই। না পারিবার অনেক হেতু আছে। আবার কেহ কেহ ঠিক বন্দোবস্ত অনুসারে দেখা দিয়াছে, এমন গল্পও আমরা জানি। সেরূপ দুই তিনটি গল্প বলিতেছি। মিঃ অ্যাণ্ড ল্যাং "স্বপ্ন ও ভূত" নামক পুস্তকের ৯৭ পৃষ্ঠায় লর্ড ব্রাউহ্যামেব একটা বিখ্যাত গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। গল্পটি অদ্ভুত বলিয়া যে বিখ্যাত বলিতেছি, তাহা নহে। কেন না, লেখক এক জন খুব সুবিখ্যাত লেখক ও গ্রন্থকার। গল্পটি আমরা খুব সংক্ষেপেই বলিব।

লর্ড ব্রাউহ্যামের কাহিনী

সুইডেন দেশে আমরা এক দিন রাত্রি ১ টার সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি হোটেলে প্রবেশ করিলাম। ভাবিলাম, এখানে রাত্রিটা কাটাইব। বেশ সুন্দর দুইটি ঘর লইলাম। পূর্ব্বদিন খুব ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল, তাই ভাবিলাম, গরম জলে স্নান করিয়া একটু সুস্থ হওয়া যাউক। নাইতে যাইয়াই একটি অদ্ভুত ব্যপার ঘটিল। এতই অদ্ভুত যে, আমি গল্পটি আগাগোড়া বলিতে ইচ্ছা কবি।

"হাই স্কুলের পড়া শেষ হইলে আমি কলেজে ঢুকি। জি, আমাব প্রাণের বন্ধু। সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে কলেজে প্রবেশ করিল। দুই জনে বেশ একসঙ্গেই পড়াশুনা করিতে লাগিলাম। * * * এক দিন আমবা একটা পাগলামি কবিয়া বসিলাম। পরামর্শ করিলাম—আমাদের মধ্যে যে আগে মরিবে, সে আসিয়া অপবকে দেখা দিবে। শুধু পরামর্শ নহে, আমাদেব দেহের রক্ত

দিয়া সেই বন্দোবস্তটি কাগজে লিখিয়া রাখিলাম। আমরা ভাবিলাম, এইরূপভাবে দেখা দিলে মরণেব পবও যে আমাদেব আত্মা থাকে, সে বিষয়ে আব কোন সন্দেহই থাকিবে না। তাহার পব পড়া-শুনা শেষ করিয়া আমবা সংসারে লিপ্ত হইলাম। বন্ধু জি, ভাবতবর্ষে কাজের চেষ্টায় গেল। সেখানে অনেক দিন থাকিল। বহু দিন তাহাব কোন চিঠিপত্রও পাইলাম না। মোটের উপর তাহাকে একরূপ ভুলিয়াই গেলাম। আগেই বলিয়াছি, গরম জলে নাইবার জন্য স্নানের ঘরে গিয়াছিলাম। বেশ আবাম করিয়া নাইতে নাইতে চেয়ারখানির দিকে চাহিলাম। সেই চেযারের উপর কাপড়-চোপড ছিল। যেই চেয়ারের দিকে চাহিয়াছি, অমনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার চক্ষুতে পড়িল। দেখিলাম—তাহার উপর জি বসিয়া আছে, আব আমার দিকে শান্তভাবে চাহিতেছে। কেমন এক রকম বিহ্বল হইয়া আমি ঘর হইতে বাহিব হইয়া আসিলাম। কেমন কবিযা আসিলাম, তাহাও মনে পড়ে না। যখন আমার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা গেল, যখন মাথাটা ঠাণ্ডা হইল, তখন দেখি যে, আমি মেঝের উপর আলুথালুভাবে পড়িয়া আছি। জির প্রেতমূর্তি আব নাই; অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। আমি ব্যপাবটা দেখিয়া বড়ই স্তম্ভিত হইলাম। তাই ঘটনাটা আগাগোড়া লিখিয়া বাখিলাম। এই ব্যপারটা ডিসেম্বর মাসেব ১৯শে তাবিখে ঘটে, তাহাও লিখিলাম। ঘটনাটা এত চমৎকার যে, আমার টাটকা মনে রহিয়াছে।"

১৮৬২ খৃস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তাবিখে নিজেব জীবনচবিত লিখিবার সময় লর্ড ব্রাউহ্যাম ঐ কাহিনীটির নকল করিয়া সেই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন যে, এডিনবার্গ শহরে গিয়া একখানা পত্র পাইয়াছিলেন। পত্রখানা ভারতবর্ষ হইতে যায়। তাহাতে ছিল যে, ১৯শে ডিসেম্বর তাবিখে জি মারা গিয়াছে।

আব এক জন লোকও পর্ব-বন্দোবস্ত অনুসারে মবাব পর আসিযা দেখ দিযাছিল। ঐ গল্পটি খুব বিশ্বাসযোগ্য। অক্সফোর্ড শহরের এক জন বড় দরের পুরোহিতের নাম বেভাবেণ্ড থিওডার বাক্‌লী। মরণের তিন দিন পরে তিনি তাঁহার বন্ধু মিঃ কেনেথ ম্যাকেঞ্জীকে দেখা দেন। গল্পটি 'গোধুলি আভাস' গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠায় বিবৃত আছে।

মরণের পর আসিয়া দেখা দিবার জন্য আর একটা বন্দোবস্তের কথাও বলিব। মেজর সিডেন্‌হ্যাম্ ও কাপ্তেন ডাইকেব মধ্যেও এইরূপ বন্দোবস্ত হয়। কথা হয, যে আগে মরিবে, তাহাকে মৃত্যুব পর ঠিক তিন দিনের দিন সিডেন্‌হ্যামের বাগানবাড়ীতে দুপুর রাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। মেজরই আগে মরিলেন। তখন কাপ্তেন ডাইক্ সঙ্কেতস্থানে গেলেন—দেখিতে হইবে, মেজরের ভূত-যোনি আইসে কি না! কাপ্তেন রাত্রি সাড়ে এগার হইতে দুইটা পর্যন্ত বসিয়া রহিলেন; কিন্তু মেজরের খোঁজ নাই। মেজর ভূত হইয়া আসিয়া দেখা দিতে পাবিলেন না। তাহার পর দেড় মাস পরে মেজরের ভূতযোনি কাপ্তেনের শয়নঘরে স্পষ্টভাবে যাইয়া হাজির। মেজর বলিল—"ভাই, আমি ঠিক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারি নাই; বন্ধু, মরণের পরও মানুষ বাঁচিয়া থাকে, এখন হইতে মনের সঙ্গেই বিশ্বাস কবিও।" নির্দিষ্ট দিনে মেজব কেন আসিতে পারে নাই, সে সব কথা তিনি কিছুই বলিলেন না। কিন্তু আমবা সেটা অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমাদেব মনে হয়—মরিতে মরিতেই মেজর মরণের কথাটা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। জ্ঞানেব অবস্থাটা তখন হয় তো ঠিক আইসে নাই. কিংবা জ্ঞানের অবস্থা আসিলেও হয় তো স্থুল-শরীরে দেখা দিবাব শক্তি তখনও হয় না। অনেক কারণেই এই শক্তি হয় না। এই গল্পটি গ্লানভিল্ প্রণীত 'সাদ্দসিস্ মস্ ট্রাইমফেটস' পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভূতেরাও অনেক সময় মানুষের কাছে সাহায্য চায়

ভূতেবা সূক্ষ্মজগৎ হইতে আসিয়া আত্মীয-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতিব উপকাব কবিয়া থাকে, তাহা এ পর্যন্ত আমবা বলিলাম। এখন অন্য রকমের কথা বলিব। ভূতেবাও মানুষেব কাছে, আত্মীয-বন্ধুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কবে—এখন সেই ব্যাপার বলিব। জীবিত মানুষেবাও ইচ্ছা করিলে ভূতেব বিস্তব উপকার করিতে পারে। বস্তুতঃ ভূতেব কোন অভাবই থাকিতে পারে না। কিন্তু তা বলিলে কি হয়? তাহাবা তুচ্ছ অভাবকেও বড় বকমেব অভাব বলিয়া মনে করে। তাহাদেব সকল অভাবই মনগড়া, প্রথাজনিত, অতি তুচ্ছ খুটিনাটি লইয়া। মনে কব, কেহ ভাবিল—আমার দেহটার যথারীতি কবর হইল না , কেহ ভাবিল, আমাব মবা দেহটা পড়িযা বহিল, এখনও পোড়ান হইল না, কেহ ভাবিল—আমার দেনাগুলি শোধ হইল না, কেহ ভাবিল—বিস্তব টাকা গুপ্ত স্থানে বাখিযা আসিলাম, কাহাকেও দেওযা হইল না, হয তো চোরে লইবে; কেহ ভাবিল—মোটেই টাকাকড়ি বাখিয়া আসিলাম না, ছেলেপুলে কি খাইযা বাঁচিবে? কেহ ভাবিল—জীবিতকালে গুরুতব অপবাধ করিযা আসিযাছি, কাহাবও কাছে ব্যক্ত কবি নাই. ব্যক্ত কবিযা আসিলেও ভাল হইত. প্রাযশ্চিত্ত করাই কর্তব্য ছিল , কেহ ভাবিল—হায়! হায! কেনই অমুক পাপ করিযাছিলাম! কেহ ভাবিল—অমুকের উপব প্রতিশোধ লইতেই হইবে। ভূতের অভাবগুলো এই প্রকাব। উহাদেব যেগুলি উদ্বেগেব কাবণ, সেগুলি আমাদেব কাছে কিছুই নয়। আবাব দুই একটি স্থলে বেশ ভাল কাবণেই উহাবা আসিয়া হাজির হয়। তখন মনে হয়, এ সম্বন্ধে ভূতেব আসাবই প্রযোজন। কয়েকটা গল্প বলিব, যাহাতে দেখা যায় যে, ভূত হাবানো উইলেব কথা বলিযা গেল. বা নিরুপায ছেলেপুলেগুলিব একটা ব্যবস্থা কবিল।

সেনাপতি ব্রুমবার্গের ভূত-যোনি

সেনাপতি ব্রুম্‌বার্গেব গল্পটি অতীব চমৎকার। সসৈন্যে "মাটিনিক্" নামক স্থানে অবস্থানকালে বিশেষ কার্যাবশতঃ তিনি এক দিন খানিক দূরে গিয়াছিলেন। পথের মাঝে হঠাৎ তাঁহাব মৃত্যু হয়। মাটিনিকস্থ বাড়ীতে তাঁহাব সঙ্গে আব দুই জন কর্মচারীও থাকিতেন। ব্রুমবার্গ মাবা পড়িলে তাঁহার প্রেতযোনি ঐ দুই কর্মচারীর কাছে আসিযা হাজিব। হাজিব হইয়াই বলিল—"এই বাত্রেই আমাব মৃত্যু হইযাছে , বন্ধুগণ! অনুগ্রহ কবিযা আমাব পিতৃহীন ছেলেটির ভার গ্রহণ কর।" আব বলিল—"লণ্ডনে অমুক ব্যক্তি ছেলেব আত্মীয়, তাঁহারা অমুক অমুক ঠিকানায থাকেন, উহাকে তাঁহাদের কাছে পাঠাইয়া দিও।" আবাব বলিল, "অমুক দেরাজের মধ্যে দলিল আছে, তাহার বলে আমার ছেলে কতকগুলি সম্পত্তিব উত্তরাধিকারী হইতে পাবিবে, সেই দলিল যাহাতে ও পায়, তাহাও করিও।" পরে কর্মচাবীবা দেখিলেন যে, ঠিক সেই ঠিকানায় সেই সেই আত্মীযকে পাওযা গেল, দলিলখানিও ঠিক সেই স্থানে মিলিল। এই ঘটনাটি শনৈঃ শনৈঃ দেশময ছড়াইযা পড়িল, সকলেই শুনিল, পবে রাণী সালটীব কানেও গেল। বাণী

শুনিবামাত্র ছেলেটির ভার লইয়া নিজের বাড়ীতে তাহাকে মানুষ কবিতে লাগিলেন। রাণী তাহাকে স্কুলকলেজে পড়াইলেন। পবিশেষে এই বালকই একজন সুবিখ্যাত উচ্চশ্রেণীর ধর্মপ্রচারক হইয়াছিলেন। জন্ এইচ ইন্‌গ্রাম প্রণীত "ভূতের বাড়ী ও ভূতের গল্প" নামক পুস্তকের ৬৩৭ পৃষ্ঠায় এই গল্পটিব খুব ভাল বর্ণনা আছে।

আচ্ছা, ভূতেরা সর্বদা দেখা দেয় না কেন?

সাধারণ মানুষেরা চিন্তার ধরণটা যেন একই রকমের। সকলেই যেন একই ভাবের কথা বলে। উপরের ঐ গল্পটি শুনিলে সাধারণ শ্রেণীর একটা মানুষ জিজ্ঞাসা করিয়া বসে,—"আচ্ছা, ঐ রকম ব্যাপারই যদি হবে, তবে খুব বেশী বেশী ঐরূপ ঘটনা হয় না কেন? কত লোক তা হঠাৎ মরিয়া যায়, তাহারা সকলেই ছেলে-পুলের ভাবনা ভাবিয়া একটা ব্যবস্থা করিতে আইসে না কেন? কত দলীলপত্র গুপ্তস্থানে থাকিয়া যায়, সেগুলিকে না পাওয়ায় কত লোকের কত স্বত্ব নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তবে কেন মরা আত্মীয় ঐ রকম ভাবে আসিয়া ঐ সব দলীলেব কথা বলিয়া যায় না?"

যে সকল সত্য ঘটনা ঘটে, সেগুলিকে সংগ্রহ, লিপিবদ্ধ ও পবীক্ষা কবাই আমাদেব কার্য। ঘটনাগুলির ঐরূপ না হইয়া অন্যরূপ হইল না কেন, বোজই ঐরূপ ঘটনা হয় না কেন, সে সব চিন্তা করিয়া বাহিব করা আমাদের কাজ নহে। অদ্ভুত ঘটনা খুব বেশী ঘটে না বলিযাই যেগুলি ঘটে, সেগুলিকেও বিশ্বাস করিতে হইবে না, তাহাব কোন হেতু নাই। যাঁহাবা সূক্ষ্ম-জগতেব আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাবা ঐ প্রশ্নেব একটা জবাবও দিতে পাবেন। সর্বদাই ভূত কেন দেখা দেয না, এ প্রশ্নেব উত্তর দেওযা তাঁহাদের খুব কঠিন নহে।

আমরা ভাবি, ভূত-প্রেত খুব কমই দেখা দেয, বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। ভূতযোনি আমাদের কাছে খুব বেশী সময়ই আসিযা থাকে, অথচ আমবা সেটা বড একটা লক্ষ্য করি না। তবে সকল সময়ই যে তাহারা মূর্তি ধরিযা দেখা দেয, তাহা নহে। তাহাবা তীব্র বাসনা কবিয়া সেই বাসনাগুলিকে জীবিত আত্মীযেব মনেব ভিতর চালাইযা দেয। সেই ইচ্ছাব প্রভাবেই জীবিত আত্মীযেবা কার্য কবিযা অনেক সময় উপকৃত হয। এইরূপ ভাবে হাবানো দলীলও অনেক সময় মিলিযা যায। মোটেব উপব এই কার্যগুলি ভূত-প্রেতেবই কার্য। ভূতপ্রেতবা যখন দেখে যে, বাসনা চালাইযা বিশেষ কোনরূপ সুফল হইল না, তখন আসিযা দেখ দেওয়া, কথা বলা এই সব ব্যাপার আরম্ভ কবে। আব একটি কথা—ভূতেব ব্যাপার জানিলেও লোকে তাহা প্রকাশ কবে না, গোপন কবিযা রাখিবাবই চেষ্টা করে। জগতেব লোকে এই কাবণে অনেক সত্য কথাও জানিতে পাবে না।

এটি সকলেব মনে রাখা আবশ্যক যে, মানুষ মবিয়া অনেকটা সময অজ্ঞানাবস্থায থাকে, বেশখানিকটা সময তাহাব জ্ঞান থাকে না, এ কথা আমবা পূর্বেও বলিযাছি। জ্ঞান হইলেই তাহাবা দেখে যে, তাহাবা নূতন অবস্থাব মধ্যে যাইযা পডিযাছে। তখন সেখানে কেমন কবিযা চলিতে হইবে, এ অবস্থা কেন হইল,—এই সব লইয়াই, এই সব ভাবনাতেই তাহাবা মহা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। সূক্ষ্ম-জগতেব অবস্থা সকলেবই জানা উচিত , ইহা সকলেবই পক্ষে বডই আবশ্যক বিযয। অথচ অধিকাংশ লোকেই তাহা জানে না। তাই সূক্ষ্ম-জগৎ হইতে কিরূপ করিযা পৃথিবীতে আসিযা দেখা দেওযা যায, কিরূপ কবিযা পৃথিবীব শোকসন্তপ্ত আত্মীযগুলিকে

প্রবোধ দেওয়া যায়—সে কথা সে মরিতে মবিতে ভাবিয়াই স্থির করিতে পারে না। সূক্ষ্মজগৎ হইতেও যে নিজের চিন্তা তাহার প্রাণের কথা জীবিত আত্মীয়ের মনের মধ্যে চালাইযা দেওয়া যায়—সে ধারণাই অহার তখন থাকে না। সে ইচ্ছা কবিলে যে স্থূলদেহ ধারণ করিয়া শোকাকুল আত্মীয়কে দেখা দিতে পারে, সে জ্ঞানও তখন তাহাব ফোটে না।

আবার জীবিত আত্মীয়গুলিও কাঁদাকাটাই করে সত্য, কিন্তু মরা আত্মীযগুলির আশাটা যেরূপ সূক্ষ্মভাবে লওয়া আবশ্যক, সেরূপ ভাবে লইতে প্রস্তুত থাকে না। শোকাকুল আত্মীয়েরা কেবল স্থূলবিষয় লইযা বিভোর থাকে, কেবলই ভাবে—হায়! হায়! আমাদেব অমুক আত্মীয় চিবদিনের মত আমাদের ছাড়িয়া গেল! কিন্তু মরা আত্মীয়টি যে আসিয়া আমাদের উপকার করিতে পারে, কিংবা আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে পারে, অথবা অনেক কথা ইসাবা-ইঙ্গিতে আমাদিগকে জানাইতে পাবে, তাহা আমরা একবারও ভাবি না। কেবল হা-হুতাশ করিয়াই মরি। অতএব সরল কথা এই যে—সাধারণ মানুষ মরিয়া গেলে, তাহার ভূতযোনি আত্মীয-বন্ধুকে দেখা দিবার ইচ্ছা থাকিলেও কেমন কবিয়া দেখা দিতে হয়, তাহা না জানাব দরুণই দেখা দেয না। ভূতেবা যে খুব বেশী আসিতে পাবে না, সেটা তত আশ্চর্যেব বিষয় নহে। দেখা দিবার পক্ষে তিনটা খুব বড বাধা আছে। সেই বাধা তিনটি না থাকিলে সকলেই আসিয়া দেখা দিতে পারিত। ঐ বাধা ঠেলিয়া আসিতে পারে না, এইটুকুই আশ্চর্যেব বিষয়।

প্রথম বাধা—ঘোব অজ্ঞান।

দ্বিতীয বাধা—অহঙ্কাব মিশানো অবিশ্বাস।

তৃতীয বাধা—কঠিন কুসংস্কাব।

অতএব দেখা যাইতেছে—সূক্ষ্ম-জগতেব বিষয কিছু কিছু জানা আবশ্যক, নতুবা আসিয়া দেখা দেওযা যায না। ইহা মানি না, তাহা মানি না, এইরূপ নাস্তিক ভাবটাও বড দোষেব। যাহাদেব প্রাণে কথায় কথায এইরূপ সন্দেহ-সংশয লাগিয়া থাকে, তাহারা মরিয়া যাইবার পরও আসিয়া দেখা দিতে পাবে না। আর, যে সকল লোক ভযানক কুসংস্কাবে আচ্ছন্ন—শত শত উপদেশ পাইতেছে, কিন্তু সেই ভুল বিশ্বাসটি কিছুতেই যাইতেছে না—এমন লোকও দেখা দিতে পারে না। যদি একটু জ্ঞানী ও বিনীত হইতে পাবি, তবে আমাদের জীবন কতই সুন্দব হইতে পারে। মবা মানুষবা জীবিত আত্মীযদের সঙ্গে দেখা কবিবাব ইচ্ছা কবিযাও দেখা করিতে পারে না। সব সমযেই যে নিজেব দোযে পাবে না, তাহাও নহে। না পাবিবাব কাবণও থাকে। আমরা স্থূলদেহী, তাহা ছাডা নিজেব কাজকর্ম লইযাই ঘোব ব্যস্ত থাকি। তাই সূক্ষ্ম-জগতেব খুব ভাল জিনিসও আমাদের চক্ষুতে পড়ে না। বুনয়ান্ সাহেব "তীর্থযাত্রীর অগ্রগতি" নামক পুস্তকে একটি লোকেব কথা বলিযাছেন। লোকটি কাদামাটীব মধ্যে টাকা খুঁজিয়া বেডাইতেছে; আব এক জন দেবদূত মাথাব উপবে শূন্যে থাকিয়া বলিতেছে,—'টাকা খুঁজিও না, এই সোনার মুকুট দিচ্ছি লও।' লোকটা তবুও উপরের দিকে চাহিতেছে না। অন্ধেব মত একমনে কাদাব মধ্যে হাতড়াইযা টাকাই খুঁজি[illegible] [illegible]স্থাও অনেকটা ঐরূপ। কেবল তুচ্ছ জডজগৎ লইযা ব্যস্ত। সুন্দব সূক্ষ্ম-জগতেব দিকে [illegible]টিবাবও চোখ ফিবাইতে চাই না।

এক এক দেশে এক এক রীতি আছে। আমবা জীবিতকালে সেই বীতি লইযাই ঘোব ব্যস্ত থাকি। আবাব মরিয়া গেলেও সেই বীতিব কথা ভুলিতে পাবি না। মানুষ মবিযা গেলেও, ভূতযোনি 'বীতি বীতি' কবিযা পাগল হয, এমন বিস্তব ঘটনা দেখা গিযাছে। মবিতে মরিতেই অনেকের ভূতযোনি বলিযা থাকে যে, তাহাদেব শ্রাদ্ধ-শান্তিটায যেন অনেক লোকজন খাওয়ান

হয়, যেন ভাল কবিয়া দুঃখের সাজসজ্জাটার আয়োজন হয়। দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেব বিশ্বাস যে, শ্রাদ্ধ-শান্তিটা ভাল করিয়া করা হইলে মরা মানুষটাব খুব তৃপ্তি হয়। শুধু যে এখনকার লোকই শ্রাদ্ধটা ভাল করিয়া কবিবার জন্য ব্যস্ত, তাহা নহে। পুরাকালেও লোকে এরূপ ব্যস্ত হইত। তখন আবার আবও কুসংস্কার ছিল। তখনকাব লোকের ধারণা এই ছিল যে, মরা দেহটাকে ভাল করিযা না পুড়াইলে, বা ভাল করিয়া কবর না দিলে আত্মার গতি হয় না।

ভূতে খড়াং খড়াং করিয়া শিকলের শব্দ করিল

প্লীনি সাহেব একটা ভূতের বাড়ীর গল্প লিখিয়াছেন। বাড়ীটি এথেন্স শহরে। ভূতের উপদ্রবে কেহই সে বাড়ীতে তিষ্ঠিতে পারিত না। অনেক দিন বাডীটি পডিযা বহিল। পরে এক দিন অ্যাথেনে ভোরাম্ নামক জনৈক পণ্ডিত ভূতেব বাডীটা ভাড়া লইলেন। ভাডা লইয়া বাস কবিতে লাগিলেন। প্রথম রাত্রে তিনি খুব সাহস করিয়া ঘরে ঢুকিলেন। চাকবগুলিকে বলিলেন, 'তোমরা তোমাদের ঘবে যাইযা শোও, আমি একাই এই ভূতেব ঘরে থাকিব।' এই বলিযা তাহাদিগকে বিদায় দিযা তিনি নিজে সেই ঘবে বসিযা খুব মন দিয়া আপন কাজ করিতে লাগিলেন। চুপ কবিযা বসিযা থাকিলে পাছে ভূতের কথা মনে আইসে, এই জন্য লেখায় মন দিলেন। খানিকটা সময় বেশ কাটিল। ভূতেব কোন সাড়াশব্দ নাই। মনটাও বেশ লেখাব মধ্যে বসিযা গেল। তিনি বেশ একমনে লিখিতেছেন, এমন সময় শিকলেব খডাং খডাং শব্দ তাঁহাব কানে গেল। ঠিক এই শব্দ শুনিযাই বহু লোক এ ঘব হইতে পলাইযাছিল। তিনি শব্দ শুনিবেন না মনে করিযা কান বন্ধ কবিলেন। তাহাব পর মনটাকে স্থিব করিযা আবাব লিখিতে লাগিলেন। লিখিবাব সময় মাথা তুলিয়া কোন দিকে চাহিলেন না।

খড়াং খড়াং শব্দটা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। শব্দ ক্রমে দরওয়াজাব কাছে আসিল। তাহাব পরে ঘবের মধ্যে আসিল। তখন তিনি মাথা তুলিযা একটিবাব চাবিদিকে দেখিলেন। আশ্চার্য একটি বৃদ্ধ রোগা চেহারা, ময়লা পোশাক-পরা, চুলগুলি আলুথালু, লম্বা-লম্বা দাড়ি—এই রকম একটি বিকট মূর্তি চোখে পডিল। দেখিলেন—হাত উঁচু করিযা তাঁহাকে সে ইসাবায ডাকিতেছে। তিনি ঐ মূর্তিকে ইঙ্গিত করিযা বলিলেন যে, একটু অপেক্ষা কর। এইরূপ কবিযা আবাব লিখিতে লাগিলেন। তখন ঐ মূর্তিটি আস্তে আস্তে তাঁহাব কাছে আসিযা উপস্থিত হইল। তাহাব পব তাঁহার মাথার উপবে শিকলেব শব্দ করিতে লাগিল। পণ্ডিত আবার মুখ তুলিলেন। দেখিলেন—ভূতটা তাঁহাকে আবাব হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। তখন তিনি উঠিলেন। উঠিযা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ভূত ধীরপাদবিক্ষেপে চলিতে লাগিল—যেন শিকলে বাঁধা পডিয়াছে বলিযাই চলিতে পারিতেছে না। এইরূপ চলিতে চলিতে শেষে উঠানেব মধ্যে একটা স্থানে যাইয়া দাঁডাইল। স্থানটা দুইটি ঘবের মাঝামাঝি জায়গায়। ঐ রকম ভাবেব বাডী করা তখন গ্রীস দেশেব প্রথা ছিল। সেই স্থানটিতে যাইয়াই ভূতটি মিলাইয়া গেল। স্থানটি চিনিযা রাখিবার জন্য পণ্ডিত সেখান হইতে কতকগুলি ঘাস-পাতা ছিঁড়িয়া আনিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে বাডীর মালিককে বলিয়া সেই জায়গাটা খুঁডিলেই দেখা গেল—মাটির নীচে একটি শিকল-জড়ানো মানুষের কঙ্কাল রহিয়াছে। তখন সেই কঙ্কালটিকে তুলিযা যথারীতি পুরোহিত আনিয়া কবব দেওযা হইল। সেই অবধি ঐ বাড়ীব ভূতের উপদ্রব দুব হইল।

এখানে একটু লক্ষ্য কবিতে হইবে যে, জীবিত অবস্থায এই হতভাগা ব্যক্তির অঙ্গে শিকল ছিল। শিকল শুদ্ধহ তাহাকে মরণের পর পুঁতিযা রাখা হয। তাই উহার প্রেতাত্মা তখনও মনে করিতেছিল যে, শিকল বাঁধাই রহিযাছে। ভূতযোনির এই মিথ্যা অথচ তীব্র ধারণা হওযায তাহাব মুক্তিও হয় নাই ; অধিকন্তু অপবেব কানে পর্যন্ত শিকলেব শব্দ আনিযা ফেলিযাছিল। তীব্র চিন্তাব কি অদ্ভুত ব্যাপাব!

নিম্নে আমবা একটি গল্প দিতেছি। পডিলে জানা যায যে, ভূতযোনি তাহাব মবা দেহটাকে ভাল কবিযা কবব দেওযাইবার জন্য বডই ব্যস্ত। কিন্তু শুধুই এইটুকুই নহে। ভূতযোনিব প্রাণে আবও অন্য বকম বাসনা ছিল। "সূক্ষ্ম জগতেব আভাস" নামক গ্রন্থেব দ্বিতীয খণ্ডে, ৬১ পৃষ্ঠায ডাক্তাব লী গল্পটি বিবৃত কবিযাছেন। তিনি বলেন যে, এই গল্পটি অনেকে অনেক রকম কবিযা কহিযাছেন, কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত বিববণই খাঁটি সত্য, কেন না, যাঁহাবা এই ব্যাপাবটি খুব ভালরূপ জানেন, তিনি তাঁহাদের কাছ হইতেই উহা সংগ্রহ কবিযাছেন। তাই এ গল্পটি খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। গল্পটি এই ঃ—

অস্ট্রেলিযাবাসী জনৈক পশুপালকেব ভূতযোনি

"প্রায ২৫ বৎসব হইল, দুই জন পশুপালক অস্ট্রেলিযায আসিযা বাস কবিতে থাকে। তাহাবা দুই জনে একত্র কাজ-কাববাব কবিত, দুইজনে খুব বন্ধুত্ব ছিল। কালক্রমে তাহাদেব অনেক বিষয সম্পত্তি হইল। দুই জনে বেশ সুখস্বচ্ছন্দে আছে, এমন সময হঠাৎ এক জন নিরুদ্দেশ। কোথায যে গেল, কেহ বলিতে পাবিল না। একেবাবে নিরুদ্দেশ।

এই নিরুদ্দেশেব তিন সপ্তাহ পবে অপব ব্যক্তি এক দিন সন্ধ্যাকালে একটি ছোট গলিপথ দিযা বাডী আসিতেছিল। পথেব কাছে একটা গভীব বড বকমেব জলাশয। গোধূলিব অল্প অল্প অন্ধকাব ক্রমেই গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। জলেব ধাবে লম্বা গাছ, ঘাস ও জঙ্গল। ঐ সব গাছগাছালির জন্য অস্তগামী সূর্য আডালে পডিযাছিল। মুহূর্তেব মধ্যেই সে দেখিতে পাইল যে, তাহাব সেই নিরুদ্দিষ্ট সঙ্গীটি জলেব ধাবে বসিযা আছে। একেবাবে যেন জীবন্ত মানুষটা বসিযা বহিযাছে। বাম হাতখানি বাম হাঁটুর উপব বক্রভাবে ন্যস্ত। সে সঙ্গীটিব সঙ্গে কথা বলিবার জন্য যেমন যাইতে চেষ্টা কবিল, অমনই মূর্তিটি অস্পষ্ট হইযা পডিল। মুখশ্রী যেন ম্লান হইযা গেল। ইহা দেখিযা সে থমকাইযা দাঁড়াইল। আব গেল না। আবাব মূর্তিটি একটু স্পষ্ট হইযা উঠিল , ডান হাতখানি উঁচু কবিযা তর্জনী আঙ্গুলটা দিয়া একটা আঁধাব গভীব গর্ত দেখাইযা দিল। সেখানে তখনও জল ছিল। জলটা স্থিব ও কালো। আব ঠিক তাহার ধাবে একটা গাছ , গাছেব ডালপালাগুলি জলেব উপর ঝুলিযা বহিযাছে। ভূতযোনিটা দুইবাব অঙ্গুলি দিয়া ঐরূপভাবে জলের মধ্যে দেখাইযা দিল। তাহার পবই আস্তে আস্তে মিলাইয়া গেল।

পরদিন প্রাতেই সেইটা অনুসন্ধান করা হইল। অদ্ভুত ব্যাপাব। খুঁজিতে খুঁজিতে সেই নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিব দেহটা বাহির হইয়া পডিল। ভূতযোনি যে স্থানটি অঙ্গুলী দিযা দেখাইয়া দিয়াছিল, ঠিক সেইখানেই একটা ঘড়া পাওযা গেল। শুধু ঘডাটা নহে, একখানা কুঠাবও সেখান হইতে উঠিল। দেখা গেল, এক খণ্ড খুব বড পাথব ঘডাটার গায়ে বাঁধিযা ডুবাইয়া দেওযা হইযাছিল। কুঠার দেখিয়া মনে হইল— কে যেন উহা দ্বাবা লোকটাকে নৃশংসভাবে হত্যা কবিয়াছে। মৃত ব্যক্তির খানকতক দলিলপত্র একটা অপবিচিত লোকেব কাছে পাওয়া যায। সন্দেহ কবিয়া তাহাকেই

আসামী বলিয়া ধরিয়া তাহার উপরে খুনের অপরাধ চাপান হয়। মোকর্দমায় পড়িয়া সেই লোকটা শেষে খুনের অপরাধ স্বীকার করে। বিচারশেষে লোকটার ফাঁসি হয়।"

এখন যদি আমরা মনে করি—নিরুদ্দিষ্ট লোকটার ভূতযোনি তাহার জীবিত বন্ধুকে কেন দেখা দিয়াছিল, তাহা হইলে আমরা তাহার দুইটি উদ্দেশ্য অনুমান করিতে পারি। এক উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহতে দেহটার যথারীতি কবর হয়, বন্ধু দ্বারা তাহা করিতে হইবে। অপর উদ্দেশ্য—তাহার মৃত্যুর কথাটি তাহার বন্ধুকে জানান। বন্ধু যাহাতে খুনের প্রতিশোধ লইতে পারে, এ ভয়ানক ইচ্ছাও তাহার ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। যাঁহারা খুব উন্নত শ্রেণীর লোক, তাঁহাদেব এরূপ প্রতিহিংসার ইচ্ছা থাকে না। কিন্তু নিহত ব্যক্তি তত উন্নত ছিল না। সুতরাং প্রতিহিংসার ইচ্ছা তাহার থাকাই সম্ভব। বিস্তর ভূতের প্রাণে প্রতিহিংসার ইচ্ছা দেখা গিয়াছে। প্রতিহিংসার কথা উঠিলেই আমাদের চেষ্টার-লী স্ট্রীটের সেই বিখ্যাত গল্পটি মনে পড়ে। উহাতে আমরা দেখি যে, জনৈক রমণীকে কে হত্যা করিয়াছিল। রমণী প্রেত হইয়া এক জন কলওয়ালাকে তিনবার দেখা দেয়। দেখা দিয়া বলে—'তুমি যদি হত্যাকারীকে উপযুক্ত শাস্তি না দেওয়াও তবে আমি এইরূপ ভাবে আসিয়া প্রত্যহ তোমাকে জ্বালাতন করিব।' গত্যন্তর না দেখিয়া কলওয়ালা তখন হত্যাকারীকে ধরাইয়া উপযুক্ত শাস্তি দেওয়াইলেন।

মানুষ মরিযা গেলে তাহার দেখিবার শক্তিটা আরও বাড়ে। তাই মরিবার পর অনেকের প্রেতাত্মা তখন বুঝিতে পাবে যে, পৃথিবীতে জীবিতকালে তাহাবা কত অন্যায় কাজই করিয়াছিল । তাই তাহারা অনেক সময় ক্ষমা-ক্ষান্তি চাহিতেও আইসে। মিসেস্ ক্রো-নাম্নী একজন রমণী "প্রেতদ্রস্ট্রী" ও "প্রকৃতিব সূক্ষ্মদিক" নামক পুস্তকে এইরূপ অনেকগুলি গল্পের অবতাবণা করিযাছেন। একটা গল্পের বেশ বিশদ বর্ণনাই কবিযাছেন। উইনবার্গ নামক স্থানের কারাগারে ব্যাপাব ঘটিয়াছিল। আর একটা কাণ্ড নেকারস্ট্রীনা নামক স্থানে ঘটে। একজন কাঠের সওদাগর মরিয়া ভূত হইয়াছিল। সওদাগব খুব ধনী। জীবিতকালে সে আত্মীয়ের প্রতি যে অন্যায় করিয়াছিল, মরণান্তে তাহার জন্য ক্ষমা চাইতে আসে। লোকে জানিতে পাবিয়া একটা কুৎসা পর্যন্ত বটাইয়া দেয়। শেষে আত্মীয়েরা কুৎসারটনাকারীব নামে মানহানির নালিশ করে। ভূত ক্ষমা চাহিতে আসায় এতটা কাণ্ড পর্যন্ত ঘটিযাছিল।

"অনুসন্ধান সমিতিব কার্য-বিররণ" নামক পত্রিকার ৯৩ পৃষ্ঠায অল্পদিন হইল একটা ঘটনা বাহির হইযাছে। ঘটনাটি পডিযা জানা যায় যে, এক ব্যক্তি জনৈক পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করিতে বড়ই ইচ্ছুক হয, অনেক চেষ্টাতেও দেখা হইল না। শেষে মরণেব পর ভূত হইযা পুরোহিতকে দেখা দিযাছিল। কিন্তু দেখা করিবাব উদ্দেশ্যটা বলিয়া উঠিতে পাবিল না।

দিনের বেলায় একটা ভূত আসিয়া হাজির

এইরূপ গল্প সেন্টপাল পল্লীর রেভারেণ্ড জিরালড লুই বলিযাছেন। তিনি বলিতেছেন—

"গ্রীষ্ম-কালে এক দিন বৈকালে একটা ঘটনা ঘটে। ঘটনাটা যেন কা'ল ঘটিযাছে বলিয়া মনে হইতেছে। গল্পটা এতই টাট্‌কা মনে বহিয়াছে। বৈকাল-বেলা। রৌদ্র ঝক্-ঝক্ করিতেছে। সেই সময খুব বড় রাস্তার উপবে আমি বেড়াইতেছিলাম। "পি" নামক এক ব্যক্তির বাড়ীর কাছ দিয়া যাইতেছিলাম। যাইতে যাইতে দেখিলাম, বাড়ীটার জানালাগুলি বন্ধ। বৈকালের রৌদ্র ঘরের মধ্যে পড়ায় পাছে জিনিসপত্রগুলি নষ্ট হয়, এই জন্যই যেন জানালাগুলি আটকানো রহিয়াছে

বলিয়া মনে হইল। আমি জানিতাম, ঐ বাড়ীর গৃহস্বামিনীর একটা অহঙ্কার ছিল যে, তাহার মত জিনিসপত্র আর কাহারও নাই। সুতরাং সেগুলিকে রৌদ্রবাতাসের হাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা অসম্ভব নহে, মনে করিলাম। গৃহ-স্বামিনীর এ সব গর্ব ও খেয়াল মনে করিয়া আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। তাহার পর আর একটু যাইয়াই রাস্তা ত্যাগ করিয়া পাশের ফুটপাতে উঠিলাম। সেখান হইতে মুখ উঁচু করিয়া বাড়ীটির সম্মুখস্থ ঘেরা উঠানটার দিকে চাহিলাম। উঠানের কাছেই ঘরে ঢুকিতে যে দরজাটা আছে, ঠিক সেই স্থানে দেখি, একটা লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। লোকটা যুবা; গায়ে কালো পোশাক, মাথায় টুপী নাই; বয়স ২০ বৎসর বলিয়া বোধ হইল। লোকটার চেহারা অনেকটা আমার বন্ধু "পি" মত; তাই মনে করিলাম, যুবক বোধ হয় বন্ধুর পুত্র। আমি বেশ করিয়া যুবককে দেখিলাম, যুবকও আমার দিকে চাহিয়া রহিল। দুই জনই দুই জনকে বেশ ভাল করিয়া দেখিলাম। তাঁহার পর হঠাৎ যুবক আমার দিকে খানিকটা সরিয়া আসিয়া অনিমেষভাবে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমার দিকে চোখ বিস্ফারিত করিয়া চাহিতে লাগিল। আমার বেশ মনে হইল, যেন সে আমার সঙ্গে কথা বলিতে ইচ্ছুক। তাহাব মুখ দেখিয়া সে ইচ্ছাটা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। মুখ দিয়া কথা বাহির না হইলেও আমরা চোখ দেখিয়া অনেক সময় মনের ভাব বুঝিতে পারি। প্রাণের কথা অনেক সময় চোখে বাহির হয। তাই যুবকের চোখ দেখিয়া বুঝিলাম যে, তাহার মনে যাতনা ও ভর্ৎসনা করিবাব একটা ইচ্ছা যেন জড়াজড়ি করিতেছে। ঐরূপ চাহনি দেখিয়া আমি প্রথমে স্তম্ভিত হইলাম , তাহাব পর একটু বিরক্তও হইলাম। আমাব মনে হইতে লাগিল, "কেন রে বাপু! আমার দিকে ঐরূপ কবিয়া চাহিতেছে কেন?" আমি আব দাঁড়াইলাম না। ও কথা আর মনে স্থান না দিয়া আমি সেখান হইতে চলিযা গেলাম।

বুধবাবে সেখানকাব গোরস্থানে যাইযা আমাকে কিছু পারলৌকিক কাজ করিতে হইয়াছিল। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, বন্ধু "পি"-র সেই পুত্রটিকে সমাধিস্থ করিবার জন্য আনা হইয়াছে। আমি খুব শীঘ্রই বন্ধু ও বন্ধুপত্নীব সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। বন্ধুপত্নী বাড়ীতেই ছিলেন। তাঁহাব মুখে যে সব কথা শুনিলাম, তাহাতে আরও অবাক্ হইলাম। শুনিলাম, যুবক ছট্‌ফট করিয়া মরিয়াছে; মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমাকে দেখিতে চাহিযাছে, বৃহস্পতিবারে মাবা গিয়াছে, আরও শুনিলাম, যুবক উঠানেব সম্মুখে নীচের ঘবে মাবা গিয়াছে। মড়াটা ঘরেই ছিল। পরে আজ বুধবারে সমাধিস্থ কবা হইল। বৃহস্পতিবাবের পরের রবিবাবে আমি তাহার প্রেত-মূর্তিটিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম।

যুবক মবিযা ঘবে পড়িযাছিল। যাহাতে ভালরূপে যথাবীতি দেহটাকে কবর দেওয়া হয, সেই জন্য যুবকের প্রেতযোনি ব্যস্ত হইযাছিল। তাহাব চেহারা দেখিযা, আমার মনে হইয়াছিল, সে যেন কোন গুপ্ত কথা—প্রাণের কোণে লুকানো পাপ ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক। এখন তাহার প্রাযশ্চিত্ত করিবার বাসনা হইযাছিল। পুবোহিতেব সঙ্গে দেখা কবিতে একটা তীব্র বাসনা প্রথমে তাহাব মনে জন্মে। আব সেই জন্যই প্রেতমূর্তিতে দেখ. পর্যন্ত দিতে পারিল। কিন্তু দেখা দিতে হইলে অনেকটা শক্তি ব্যয় হইয়া যায়। যুবকেরও দেখা দিতে আসিযা তাহার সমস্ত শক্তি ব্যয হইয়া গেল। তখন আর সে কথা বলিতে পাবিল না। অথবা পুবোহিত যদি আব একটু থাকিতেন, তাহাব কথা বুঝিবাব চেষ্টা করিতেন, তাহাব কাছে তাহাব কথাগুলি শুনিবাব চেষ্টা কবিতেন, তবে হয তো সে কথা বলিত। পুরোহিত চলিয়া যাওয়ায যুবকের কথা শুনিবাব আব কোনই উপায় রহিল না।

ঊনবিংশ অধ্যায়

ভূতের অনুতাপ

ভূতেরা অনেক সময় মানুষের কাছে উপকার পাইবার আশায় আইসে। হয় ত তাদের মুক্তি হইতেছে না—গতি হইতেছে না। যেই মানুষের কাছে মনের মত উপকারটা পাইল, অমনই তাহাদের উদ্ধার হইল। এরূপ ঘটনা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি।

মানুষ মরিয়া গেলেও অনেক সময় তাহার বাসনা থাকিয়া যায়। পৃথিবীতে জীবিতকালে সে যে সকল অন্যায় কাজ করিয়াছিল, সে সব কথা তাহার মনে থাকে। তখন মনে হয়—"যাই, যাহাদের প্রতি অন্যায় করিয়াছি, তাহাদের কাছে যাইয়া ক্ষমা চাহিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি গে।" এই ভাবিয়া তাহাদের মরণের পরও ভূতযোনি হইয়া দেখা দেয়। দেখা দিয়া প্রাণের পাপের কথা স্বীকার করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করে। যত দিন অনুতাপের আগুন জ্বলিতে থাকে, যত দিন দোষ-ঘাট স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাওয়া না হয়, তত দিন পৃথিবীর কাছে কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। তত দিন স্বর্গে যাইতে পারে না, গতি হয় না, মুক্তি হয় না। অনেক ভূত এই জন্য শত শত বৎসরও পৃথিবীতে আসা-যাওয়া করে। এখন আমরা একটা গল্প বলিব। গল্পটিতে জানা যায় যে, সামান্য একটু চুরি করিয়া মরণের পর এক জনের অনুতাপ হয়, আর সেই জন্য লোকটাকে ভূত হইয়া ৩০ বৎসর পৃথিবীতে আসিতে হইয়াছিল।

চুরি করিবার ফলে ভূত হইয়া অনুতাপ

"ভী" নাম্নী একটি কুমারী তাহার কাকার বাড়ীতে যাইয়া কিছু দিন ছিল। এক দিন রাত্রিতে সে দেখিল, এক জন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকের মূর্তি তাহার বিছানার কাছে আসিয়া কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে। অথচ তাহার মুখ দিয়া কোন স্বর বাহির হইতেছে না। পরণে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড়-চোপড়। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন পদস্থা চাকরাণী। "ভী" দেখিল যে, ঐ মূর্তিটি অল্পসময়ের মধ্যেই শূন্যে মিলাইয়া গেল। দেখিয়া তাহার খুবই ভয় হইল।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে "ভী" একজন বন্ধুর বাড়ীতে গিয়া সেখানে কিছু দিন ধরিয়া বাস করিতেছিল। ভূত-প্রেত সম্বন্ধে তত্ত্ব-তল্লাস করা বন্ধুটির ভাবী স্ফূর্তির কাজ। তিনি ভূত নামাইতেন, ভূতের সঙ্গে গল্প করিয়া অনেক ব্যাপার শুনিতেন, কিছু দিন ধরিয়া এই আমোদেই ছিলেন। "ভী"ও তাঁহার কাছে বসিয়া ঐ সব কাণ্ড দেখিত। এক দিন একটি প্রেতিনী আসিয়া বলিল যে, তাহার নাম সারা ক্লার্ক। "ভী"-র বন্ধু কখন এই প্রেতিনীটাকে চিনিতেন না, "সারা" এই নামটাও আর কখন শুনেন নাই। প্রেতিনীটা বলিল—"আমি কুমারী 'ভী'-র কাকার বাড়ীতে অনেক দিন আগে প্রধানা পরিচারিকা ছিলাম, কুমারী এক দিন তাহার কাকার বাড়ীতে ছিল, আমি রাত্রিতে তাহাকে দেখা দিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিবারও চেষ্টা করিয়া কথা বলিতে পারি নাই। আমার প্রাণে একটা পাপের কথা আছে, তাই স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিব, এইটুকুই আমার ইচ্ছা, পাপের ক্ষালন না হই [illegible], ক্ষমা না পাইলে, দোষ বলিয়া ফেলিতে না পারিলে আমার গতি

হইবে না ; এই জন্যই আমার আজ পর্যন্ত গতি হয নাই, আব এই জন্যই আমি মাঝে মাঝে যাইযা সেই বাড়ীতে দেখা দিই। জীবিতকালে যে ঘবটিতে আমি থাকিতাম, এখনও সেই ঘরেব মধ্যে প্রেতিনী হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই ; আমার পাপটা শুন—আমি খানকতক বাসন চুবি কবিযাছিলাম, তাহার মধ্যে একটা রূপার বাটিও ছিল। কুমাবী "ভী" যদি এই কথাগুলি তাহাব কাকীমাকে বলিযা দেয, আব যদি তিনি আমাকে ক্ষমা কবেন, তবে আমাব বিশেষ উপকার হয, আমার মুক্তি হয়, আমাব মনে সেই চুবিব জন্য বড়ই অনুতাপ হইতেছে।"

কিছুদিন পরে "ভী" যখন কাকাব বাডীতে আবার গিযাছিল, তখন তাহার কাকীমাকে জিজ্ঞাসা কবিল,—"আচ্ছা কাকীমা, আপনি সারা ক্লার্ক নাম্নী কোন স্ত্রীলোকেব কথা কি জানেন?" তিনি বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চযই তাহাকে চিনি। ৩০/৪০ বৎসব আগে সে আমাদের বাড়ীতে প্রধানা চাকবাণী ছিল । ঘব-গৃহস্থালী দেখাশুনাব ভাব তাহাব উপরেই দিযাছিলাম।"

"সে লোকটা কেমন ছিল? স্বভাব-চবিত্র কেমন?"

"সে বেশ সৎস্বভাবা, খুব হুঁশিযাব, বেশ পবিষ্কাব-পবিচ্ছন্ন ছিল।"

"আচ্ছা, কাকীমা। যখন সেই চাকবাণীটা ছিল, তখন কি আপনাব কোন রূপাব জিনিস চুবি গিযাছিল?" এই কথা শুনিয়া ভীব কাকীমা একটু ভাবিযা বলিলেন—"হাঁ, আমার মনে হইতেছে, চুবি গিযাছিল বটে। চিনি বাখিবাব একটা বাটি, আবও কতকগুলি জিনিস তখন চুরি যায। চুবিও অদ্ভুত চুবি, কেমন কবিযা কে নিল, কিছুই জানা গেল না। আচ্ছা, তুমি একথা জিজ্ঞাসা কবিতেছ কেন?"

"আপনি কি সাবাকে সন্দেহ কবিয়াছিলেন?"

"না, না, বাসনগুলি যদিও তাবই হেপাজতে থাকিত, তাহা হইলেও তাহার উপব সন্দেহ হয নাই। তাহাকে খুব বিশ্বাসী বলিয়াই আমাদেব ধাবণা ছিল।"

তখন কুমাবী "ভী" বন্ধুব বাড়ীতে সাবাব প্রেতিনী মূর্তিব কাছে যে সকল কথা শুনিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে বলিল। কাকীমা দেখিলেন যে, প্রেতিনী যে সকল জিনিস চুরি কবা স্বীকার কবিযাছে, বাস্তবিক সেইগুলিই হাবাইয়াছিল। তিনি বলিলেন—"সারা যদি সত্যই চুবি কবিয়া থাকে, তবে আমি তাহাকে ক্ষমা কবিলাম।" এই গল্পটিব মধ্যে একটি কথা একটু ভাবিবার আছে। পরে কথাটি বলিতেছি। ইহাব পর হইতে ঐ বাড়ীতে আব প্রেতিনীর উপদ্রব হয় নাই, আব কখনও কেহ সাবাব প্রেত-মূর্তিটি দেখিতে পায নাই।

মিঃ আব, ভী আউয়েন "বিতর্কভূমি" নামক পুস্তকেব ২২৬পৃষ্ঠায় এই গল্প লিখিয়া প্রকাশ কবিযাছেন। আমবা সেখান হইতে গল্পটি জানিয়াছি। তিনি বলেন, যাঁহাদেব বাড়ীতে এই কাণ্ড ঘটিযাছিল, তাঁহাব খুব পরিচিত ও সম্ভ্রান্ত। এ গল্পটি না কি খুব খাঁটী সত্য। গল্পটিতে আমাদের একটু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সাবা ক্লার্কেব প্রেতিনী মূর্তি চোবা জিনিসগুলি ফিবাইযা দিল না। হয তো অনেক দিন হইযা যাওয়ায ফিবাইবাব কোন উপায ছিল না। চুবি কবাটা স্বীকার কবিল, আব ক্ষমা পাইল। ইহাতেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইযা গেল।

আমবা আব একটা গল্প বলিব। সেটি কিন্তু আব এক বকমের ব্যাপার। একটা লোক বিশ্বাসঘাতকতার কাজ কবিয়া ভূত হয়। সেই কাজেব ফলে খুব একটা গুরুতব কু-ফল ফলিবাব সম্ভাবনা ছিল। সেইটি যাহাতে না ফলিতে পাবে, এই জন্য তাহাকে ভূত হইয়া প্রায় ৮০ বৎসবকাল পাহাবা দিয়া বেড়াইতে হইযাছিল। গল্পটি কিছু দিন আগে আমরা এক বিশ্বস্ত লোকেব মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলেন, ব্যাপারটি খুব সত্য। গল্পটি নিম্নে দিলাম।

পাপ-স্বীকার

যে সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এই গল্পটি বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের মুখের কথা এই :— "পল্লীগ্রামে এক জন ভদ্রমহিলার বাড়ীতে আমরা নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলাম। যে সময় যাইবার কথা, তাহার একটু আগেই উপস্থিত হই। গেলে পরে চাকররা আমাকে বৈঠকখানা-ঘরে বসিতে বলে। আমি সেই ঘরে যাইয়া বসিলাম। যিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সে রমণী তখনও নীচে আইসেন নাই। আমি ঘরের মধ্যে বসিতে যাইয়াই দেখি, এক জন ক্যাথলিক্ পুরোহিত বসিয়া খুব মনোযোগের সহিত একখানা বড় বই পড়িতেছেন। লোকটি আমার কাছে একেবারেই অপরিচিত, একটুও চিনিতে পারিলাম না। আমি ঘরে গেলেই তিনি একটিবার চোখ তুলিয়া আমাকে মাথা নাড়িয়া নীরবে অভিবাদন করিলেন, আবার কিছুই না বলিয়া পড়িতে লাগিলেন। দেখিলাম, পুরোহিত মহাশয়ের বেশ বলিষ্ঠ দেহ, চেহারা বেশ খরখরে কাজের লোকের মত, বেশ হৃষ্টপুষ্ট; কিন্তু মুখে যেন কেমন একরকম উদ্বেগ ও অশান্তি প্রকাশ পাইতেছিল। আমি সেটুকু বেশই লক্ষ্য করিলাম। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম, তাই ত, লোকটি কে, আর ইহার নিমন্ত্রণই বা কেন হইয়াছে? অল্পসময়ের মধ্যে আরও অনেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়া জুটিলেন। তখন গৃহ-কর্ত্রীও নামিয়া আসিলেন। আমাকে যথাসময়ে আসিয়া আদর-আপ্যায়ন কবিতে পারেন নাই, আমি একাকী বসিয়া আছি, এই জন্য ত্রুটি স্বীকার করিলেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, তাঁহার কাছে এই পুরোহিতের কথা জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু তিনি আসিলে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গেলাম। তাহার পর খাওয়া-দাওয়া হইল। আমি গৃহকর্ত্রীর কাছেই বসিয়াছিলাম। হঠাৎ পুরোহিতের কথাটা আমার মনে পড়িয়া গেল। তখন তাঁহার দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ভাল কথা। বৈঠকখানায় এক জন পুরোহিতকে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম, কৈ, তাঁহার সঙ্গে ত আপনি আমাকে পরিচিত করাইয়া দিলেন না?"

তাহার পর আমি সমবেত লোকগুলিকে একবার চাহিয়া দেখিলাম; কিন্তু পুরোহিতকে না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"কৈ, সেই পুরোহিত ত খাইতে আসেন নাই!"

আমার কথা শুনিয়া গৃহ-কর্ত্রীর মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। তিনি আমাকে অনুচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অ্যাঁ, তবে কি আপনিও তাঁহাকে দেখিয়াছেন?"

আমি বলিলাম—'নিশ্চয়ই দেখিয়াছি। হয় তো কথাটা তুলিয়া অন্যায় করিয়াছি; কারণ আপনাকে যেন কেমন একটু বিরক্ত দেখিতেছি। আমি অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়াই কথাটি জিজ্ঞাসা করিয়া অন্যায় করিয়াছি, ত্রুটি লইবেন না। আমি ভাবিয়াছিলাম, তিনি আমাদেরই মত একজন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক, তাই তাঁহার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। অধিকন্তু তাঁহার চেহারাটা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতেও ইচ্ছা হইয়াছিল। তাঁহার কথা যদি গোপন রাখা আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আর আমি এ বিষয়ে বাঙ্ নিষ্পত্তি করিব না। আর আমার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইবে না।"

গৃহ-কর্ত্রী গলার স্বর আরও ছোট করিয়া বলিলেন,—"না, আমি বিরক্ত হই নাই। আমার ভাবটা আপনি উল্টা বুঝিয়াছেন। আমার গোপন করিবার কিছুই নাই। এ ব্যাপারটার আলোচনা হয়, ইহা আমার স্বামীর ইচ্ছা নয়। পুরোহিত যে আপনাকেও দেখে দিয়াছেন, ইহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি ; কেন না, আমাদের বাড়ীর লোক ভিন্ন ইহার পূর্বে তিনি আর কাহাকেও দেখা দেন নাই। আপনি যাঁহাকে দেখিয়াছেন, তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি নহেন ; তিনি ভূতযোনি!"

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম,—"ভূতযোনি!" গৃহ-কর্ত্রী আবার বলিতে লাগিলেন—"হ্যাঁ, ভূতযোনি ; সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমরা দুই বৎসর যাবৎ এই বাড়ীতে বাস করিতেছি। ইহাব মধ্যে আমি ও আমার স্বামী আমরা দুই জনে ১২ বাব উঁহাকে দেখিয়াছি। আমরা যে অবস্থায় দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের ভ্রম হওয়া একেবারেই সম্ভব নহে। এই ভূতযোনির কথা আমরা কাহাকেও বলিব না ভাবিয়াছিলাম ; কিন্তু আপনি যখন দেখিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আপনাকে একটা অনুগ্রহ করিতে হইবে।"

আমি বলিলাম—"সাধ্য হইলে নিশ্চয়ই করিব।" তিনি আবার বলিতে লাগিলেন-- "বরাবরই আমার একটা সঙ্কল্প আছে যে, যদি কোন সাহসী লোক পাই, তবে তাঁহাকে ঐ ভূতযোনির কাছে পাঠাইয়া দিয়া উঁহার দেখা দিবার কারণটা জিজ্ঞাসা করাইব। আপনি কি উঁহার কাছে সাহস করিয়া যাইয়া সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন? জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যাহাতে আব না আসেন, এমনটি করিতে পারেন কি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আমি শেষে গৃহকর্ত্রীর কথায় স্বীকার করিলাম। আমি এতক্ষণ তাঁহার সঙ্গে খুব মৃদু মৃদু স্বরে ভূতযোনিব বিষয়ে কথাবার্তা বলিতেছিলাম। কেহই আমাদের কথা শুনিতে পায় নাই। এখন একটু উচ্চস্বরে সকলকে শুনাইয়া বলিলাম, "নীচে আমার একটু দরকার আছে, শীঘ্রই আসিতেছি।" এই কথা বলিয়া আমি নীচে সেই বসিবার ঘরে আসিলাম। আমার চাকরটিও আসিতেছিল ; তাহাকে হাতের ইসারায় ফিরাইয়া দিলাম। ঘরে যাইয়াই দেখি, ভূতযোনিটা ঠিক সেই ভাবেই বসিয়া আছেন, সেই রকম করিয়াই পড়িতেছেন। দেখিয়া ভয় ও বিস্ময়ে গা-টা কাঁপিয়া উঠিল। তথাপি সাহসে ভর করিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ভূতটি তখন আগেকার মত আমাকে আর একবার অভিবাদন করিলেন। আগে অভিবাদন করিয়াই বইতে মন দিয়াছিলেন , এবাব কিন্তু তাহা নহে। এবার বই-র দিকে না তাকাইয়া আমার দিকে চাহিয়া বহিলেন। চোখ দুইটিতে খুব একটা অবসাদের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। শুধু অবসাদও নহে, একটা চাপা উৎকণ্ঠার ভাবও ছিল।

অল্প একটু পরেই আমি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে, আর কেনই বা এখানে আসিয়া থাকেন? ঈশ্ববের দোহাই, মিথ্যা বলিবেন না।"

আমার কথা শুনিয়া ভূতযোনি বইখানি বন্ধ করিয়া আমাব দিকে মুখ ফিবাইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু স্বরে অথচ খুব সুস্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন ঃ—

"সত্য কথা বলিবার নিমিত্ত আমাকে ইহাব পূর্বে এ বকম ভাবে আর কেহ কখন দিব্য দেয় নাই। আমি কে, আর কেন আসি, তাহা বলিতেছি। আমাকে দেখিয়া আপনি অবশ্যই বুঝিতে পাবিতেছেন যে, আমি ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের এক জন পুরোহিত। ৮০ বৎসর আগে আমিই এই বাড়ীর মালিক ছিলাম। আমি খুব ভাল ঘোড়-সোয়ার ছিলাম। সুবিধা পাইলেই ঘোড়ায় চড়িয়া শীকাব করিতাম ; কারণ, শীকারের দিকে আমার বিশ্রী ঝোঁক ছিল। এক দিন শীকারে বাহির হইব, ঠিক এমন সময় খুব একটা বড ঘরের যুবতী মহিলা আসিয়া বলিল, 'আমি ভয়ানক পাপ করিয়া ফেলিয়াছি। যাহাতে প্রায়শ্চিত্ত হয় করুন।' মহিলা যাহা যাহা বলিল, আমি তাহা বলিব না। তবে এটুকু বলিতে পারি যে, সে অতি ভয়ানক পাপ। শুনিয়া আমি এতই ব্যথিত হইলাম যে, কথাগুলি একখানি কাগজে লিখিয়া লইলাম। লেখাটা ভয়ানক অন্যায় কাজ হইল ; ওরূপ পাপের স্বীকার-উক্তি লিখিয়া লওয়া আমাদের ধর্মবিরুদ্ধ কার্য। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়াই লিখিয়া বসিলাম। মহিলার কথাটা লিখিয়া লইতে আমাব শীকারে যাইবার নির্দিষ্ট সময় প্রায় যায় যায়

হইয়া উঠিল। খুব তাড়াতাড়ি তাহাকে বিদায় দিয়া আমি ছুটিলাম। কিন্তু অত ব্যস্ততার মধ্যেও তাহার পাপের কথাগুলি মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। কি বিশ্রী পাপ। অত ব্যস্ততার মধ্যেও সেই পাপের বিবরণওয়ালা কাগজখানিকে সাবধান করিয়া রাখিয়া যাইতে ভুলিলাম না। এই বাড়ীর কোন একটা স্থানের ৩ খানি ইট আল্গা করিয়া রাখিয়াছিলাম। সেরূপ করার উদ্দেশ্য ছিল। আমি এখন তাহা প্রকাশ করিব না। ইট সরাইলে একটা বেশ কুলুঙ্গী দেখা দিত। আমি ভাবিলাম, সেই কুলঙ্গীতেই ঐ কাগজখানি রাখাই ব্যবস্থা। তাহা হইলে বেশ গোপনে থাকিবে। আর ভাবিলাম, শীকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেশ ভাল করিয়া পড়িয়া ব্যাপারটা জানিয়া লইব। তাহার পর এই সাংঘাতিক কাগজখানি পুড়াইয়া ফেলিব। তাই শীকারে যাইবার আগেই সেখানিকে তাড়াতাড়ি একখানি পুস্তকের পাতার মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া বইখানি কুলুঙ্গীর মধ্যে রাখিলাম। তাহার পর ইট কয়খানা বেশ করিয়া তাহার উপরে সাজাইয়া দিলাম। কুলুঙ্গীটা আর তখন দেখা গেল না , বেমালুম ঢাকা পড়িয়া গেল। তাহার পর ঘোড়ায় চড়িয়া পূর্ণবেগে ছুটিলাম।

"শীকার করিতে করিতে মাঠে ঐ দিনই ঘোড়া হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িলাম। তৎক্ষণাৎ সেই মাঠেই আমার মৃত্যু হইল। তখন হইতেই আমার এই দশা—আমার এই দারুণ অদৃষ্ট। আমি পুরোহিত হইয়া ধর্মের নিষেধ পায়ে ঠেলিয়াছিলাম, পাপের কাহিনী লিখিয়া লইয়াছিলাম, তাহারই ফল হাতে হাতে পাইতেছি। পাছে সেই মহিলার গুপ্ত পাপের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাই কাগজখানিকে পাহারা দিবার জন্য ভূত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আপনি যেমন সাহস করিয়া আমার সমক্ষে আসিয়া আমার সঙ্গে কথাবার্তা কহিলেন, ইহার আগে এমনটি আর কেহ করে নাই। এর পূর্বে আর কেহই আমাকে সাহায্য করিতে আসে নাই। কেহই, আমার গতির বিষয়, মুক্তির বিষয় ভাবে নাই বা আশাভরসাও দেয় নাই। এখন আপনি আসিয়াছেন। আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া আমার গতি করিবেন? আপনি যদি গুরুতর শপথ করিতে পারেন যে এক বর্ণও না পড়িয়া বা কাহাকেও না বলিয়া কাগজখানি পুড়াইয়া ফেলিবেন, তাহা হইলে আমি সেখানি আপনাকে দেখাইতে পারি। দিব্য করিবেন কি?"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম—"আমি দিব্য করিতেছি, আমি আপনার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিব।"

আমার কথা শুনিয়া ভূতযোনি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বাপ রে! সে চাহিদাটা কি ভীষণ—কি অন্তর্ভেদিনী! মনে হইতে লাগিল, যেন আমার অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখিয়া লইতেছেন। তাহার পর আমার কথায় যেন বিশ্বাস হইল, যেন প্রাণের একটা বোঝা নামিয়া গেল, এইরূপ আশ্বস্তভাবের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তবে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসুন।"

ক্রমে ভূত-যোনি অলি-গলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা সরুপথে চলিলেন। সেই পথটি ধরিয়া একটা চোর-কুঠারীর মত স্থানে গিয়া উঠিলেন। সেখানে যাইয়া হঠাৎ দাঁড়াইলেন, আর আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'এই স্থানটিতে সেই বই ও কাগজখানি আছে। এই যে এই স্থানটি ; এখানকার ইট খুলিয়া ফেলিলেই আপনি তাহা দেখিতে পাইবেন। এই জায়গাটা খুব ভাল করিয়া ঠিক করিয়া রাখুন আর দিব্য করার কথাটা স্মরণ রাখিবেন।"

ভূত-যোনিও যেমন স্থানটি দেখাইয়া দিলেন, আমিও সরিয়া গিয়া সেটা চিনিয়া লইলাম। তাহার পর দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত তাঁহার দিকে চাহিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য!

দেখিলাম, ভূত-যোনিও নাই, কেহই নাই,—আমি সেই আলো-আঁধারি স্থানটিতে এমনভাবেই একা রহিয়াছি। ভূত-যোনি মিলাইয়া যাইবেন, তাহা আমি জানিতাম—সে নিমিত্ত পাছে ভয় পাই, তাহার জন্য সাহসও করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু বলিলে কি হয়, আমার প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। আমি তাড়াতাড়ি সেখান হইতে ফিরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে সেই খাবার ঘরে গিয়া উঠিলাম। ভয়ে তখনও আমার নিশ্বাস পড়িতেছে না। বিস্ময় ও ভয়ে কেমন একরূপ জড়-ভরত হইয়া পড়িলাম।

খাবার ঘর হইতে আমি হঠাৎ গিয়াছিলাম কেন, কেনই বা এত দেরি হইতেছে, এই সব দেখিয়া ভাবিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে অনেক রকম টীকা-টিপ্পনী করিতেছিলেন। তাহার পর আমি এইরূপ ব্যস্তসমস্ত হইয়া বিস্ময়-বিহ্বল ও ভয় চকিত-ভাবে যাইয়া উঠিলে আমার দিকে সকলেরই নজরটা যেন আসিয়া পড়িল। গৃহ-কর্তা আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারি, তখন আমার তেমন অবস্থা নহে। তাই ইসারা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, আমার কথা আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন। উনিই সব বলিবেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া গৃহকর্ত্রী আমাকে যে কার্যের জন্য বাহিরে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে বলিলেন। শুনিয়া ঘরের সমস্ত লোকগুলিই কেমন এক রকম কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। ভূতের কথা শুনিলে সকলেই উৎসুক হইয়া উঠে। তাহার পর একটু সামলাইয়া লইয়া আমি ব্যাপারটা আগাগোড়া সবই বলিলাম, বলিতে বাধ্যই হইলাম। সকলে এত উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে, আমি কোন কথা গোপন করিতে পারিলাম না। সেরূপ ক্ষেত্রে গোপন অসম্ভব।

বক্তা বলিয়া আমার একটা খ্যাতি ছিল। একে সত্য, তাহার উপর আমার একটা সত্য ভূতের কথা বলিতেছি। কথাটা যে সকলে কিরূপ মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কথা বলা শেষ হইলে সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—এখনই—এই মুহূর্তেই রাজমিস্ত্রী আনিয়া ভূতের দেখান দেওয়ালের সেই জায়গাটা ভাঙ্গিয়া দেখা যাক্। দেখা যাক্, এই অদ্ভুত ব্যাপারটা সত্য কি না। মিস্ত্রী আনিতে পাঠান হইল। মিস্ত্রীও শীঘ্রই আসিয়া পড়িল। তখন আমরা সকলেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া সেই জায়গাটার কাছে যাইয়া উঠিলাম। সে স্থানে যাইয়া আমরা প্রাণটা আর একবার কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিলাম—বাপ্ রে! এখানেই সেই ভূতটা হঠাৎ মিলাইয়া গিয়াছিল। আমি মিস্ত্রীকে দেওয়ালের সেই স্থানটা ঠিক ঠিক দেখাইয়া দিলাম। সেও ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল।

আমাদের মধ্যে এক জন বলিয়া উঠিলেন—গাঁথুনিটা খুব শক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।" গৃহকর্তা বলিলেন—"হাঁ, শক্ত বই কি। আর বেশী দিনের গাঁথুনিও নহে। শুনিয়াছি, এ স্থানগুলি অনেক দিন অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর আমার আগে যিনি এখানে ছিলেন, তিনি না কি এই সব স্থান আবার চূণ-সুরকী দিয়া নূতন করিয়া মেরামত করাইয়াছেন। আর সে ও বেশী দিনের কথা নহে।"

এই সকল কথা হইতে হইতে মিস্ত্রী চূণ-বালি ভাঙ্গিয়া ইট খুলিয়া ফেলিল। আর বলিল—"এই যে এখানে কুলুঙ্গীর মত কি একটা দেখা যাইতেছে।" শুনিয়া সকলেই যেন বিস্ময়ে একটু কাঁপিয়া উঠিল। দেখা গেল, কুলুঙ্গীটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দুই ফিট, আর গভীরতাটা ১৮ ইঞ্চি। গৃহস্বামী ঝুঁকিয়া পড়িয়া কুলুঙ্গীটি দেখিলেন, তাহার পর ভূতের নিষেধের কথাটা মনে হওয়ায় পিছনে সরিয়া আসিলেন। তখন আমি নিজেই সেখানে গেলাম। গৃহ-স্বামী বলিলেন ঃ

—'কেমন এক রকম উৎসুক হইয়া আমি দেখিতে গিয়াছিলাম। তাহার পর ভূতের নিষেধের কথাটা মনে পড়িল। তাই ফিরিয়া আসিলাম। আপনারই যাইবার অধিকার। আপনিই যাইয়া দেখুন।'

আমি ভয়ে যেন সাদা হইয়া গেলাম। কিন্তু সাহস ভর করিয়া কুলুঙ্গীটির কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। ভিতরের দিকে একটিবাব চাহিয়াই হাত ঢুকাইয়া দিলাম। একখানি সেকেলে ধরণের বই পাইলাম, সেখানিব গায় রাশীকৃত ধূলা-মাটী। বইখানি দেখিয়া সকলেরই প্রাণটা যেন কেমন দুরু দুরু করিয়া উঠিল। কিন্তু সকলেই চুপ করিযা রহিল। আমি ভক্তির সঙ্গে বইখানি খুলিয়া ২/১টা পাতা উল্টাইবার পবই একখানা হাতের লেখা কাগজ পাইলাম। অনেক দিনের বলিযা কাগজখানি হল্‌দে হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম, খানিকটা লেখা। লেখাগুলি এলোমেলো ভাবের। দেখিয়া মনে হয় যেন কেহ খুব তাডাতাড়ি ঐগুলি লিখিয়াছিল। যেমন বুঝিলাম, এইগুলি ভূতযোনিব গুপ্ত লেখা, অমনই চোখ ফিবাইলাম, আব পড়িবার চেষ্টাও করিলাম না। তখন আমরা সকলেই সেখান হইতে কাছের একটা ঘবেব মধ্যে আসিলাম। আসিযাই যজ্ঞে আহুতি দিবার মত করিয়া উনানের মধ্যে সেই পত্রখানিকে নিক্ষেপ করিলাম। পত্রখানি যতক্ষণ পুড়িতে লাগিল, ততক্ষণ কাহাবও মুখে একটি টুঁশব্দও নাই, সকলেই একদৃষ্টিতে পুড়িয়া যাওয়াটা দাঁডাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কাগজখানি ভস্মীভূত হইয়া যাইবার পর অনেকে বলিয়া উঠিলেন—"আশ্চর্য ব্যাপার! অদ্ভুত কাণ্ড!। না দেখিলে কে ইহা বিশ্বাস করিত?" সকলেই বিস্মিত হইলেন। আমাব মনে হইল, আজ এই ব্যাপার যাঁহারা স্ব-চক্ষে দেখিলেন, তাঁহারা কেহই কখন ইহা ভুলিবেন না। আমি ত ভুলিবই না। ব্যাপারটা অনেক দিনের হইলেও আমি যখনই এইটি কাহাকেও বলিতে যাই, অমনই প্রাণটা যেন ভয় ও বিস্ময়ে আলোড়িত হইয়া উঠে। আর একটি কথা। ঐ কাগজখানি পুড়াইয়া ফেলাব পর আর কখনও ঐ পুরোহিতের প্রেত-মূর্তিকে দেখা যায় নাই।

হঠাৎ মরিয়া যাইবার পব পুরোহিতের মনের ভাবটা যে কিরূপ হইযাছিল, তাহা আমবা সহজেই বুঝিয়া উঠিতে পাবি। তাঁহার জীবাত্মা বেশ বুঝিলেন যে, অন্যায় কাজ করা হইয়াছে, তাহার আর সংশোধনের উপায় নাই। তাহা ছাড়া পাপেব ব্যাপারটা এমনই গুরুতর যে, আর কাহাকেও বলিবার উপায় ছিল না। পুবোহিতের প্রেতাত্মাব কেবলই ভাবনা হইত, পাছে বুঝি পাপটা কেহ টের পায়। যাহা দ্বাবা কাগজখানি পুড়ান হইতে পারে, এমন লোকই তিনি খুঁজিতেছিলেন। কাগজখানি লইয়া—গুপ্ত পাপের ঘটনাটি লইয়া ভূতযোনি বাস্তবিকই একটু মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন।

আমরা আর এক জন পুবোহিতেব কাহিনী বলিব। তাঁহাব পাপটা অন্য প্রকারের। সেটা—স্বার্থতাড়িত হইয়া কর্তব্যের ত্রুটি। সে ত্রুটির জন্য পৃথিবীতে যে খুব বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা নহে বা সে জন্য ভূত হইযা তাঁহার আসাও আবশ্যক হয় নাই। তবে মরণের পর নিজের অন্যায়টা তিনি বুঝিয়াছিলেন বা অন্য কোন মৃত পুবোহিতের প্রেতাত্মা তাঁহাকে তাঁহার অন্যায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাই তাঁহার অনুতাপ হইযাছিল, নিজের পাপ প্রকাশ করিয়া একটা প্রায়শ্চিত্তের ইচ্ছাও প্রাণে জাগিয়াছিল। এ জগতেই হউক, আর সূক্ষ্ম-জগতেই হউক, পাপের জন্য অনুতাপ এক সময়ে হইবেই হইবে। "পেন্‌ভেনু" নামক স্থানের চার্লস্ করী ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে এই গল্পটি মিসেস্ এই হোয়াইট হেড় প্রণীত "প্রেতালোচনা" নামক পুস্তকের ১১৭ পৃষ্ঠা হইতে উদ্‌ধৃত করিয়াছেন।

পুরোহিতের ভূতের উপাসনা

আমার ঠাকুরদাদার নাম চ্যাটন। তিনি কিছু টাকা আদায়ের জন্য পেম্পল নামক গ্রামে গিযাছিলেন। এক দিন সন্ধ্যাকালে সেখান হইতে বাড়ী আসিতেছিলেন। সে দিনটা বড়দিনের পর্ব। সারাটা দিন ববফ পড়ায় পথ-ঘাট সাদা ধপধপে হইয়া উঠিযাছিল। মাঠের পথগুলিও চিনিবার উপায় ছিল না। ববফে সব স্থান সাদা। বরফে পাছে পদস্খলন হয, সে জন্য তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছিলেন।

বাড়ী আসিতে হইলে একটা গির্জার কাছ দিয়া আসিতে হইত। গির্জাটি আব নাই। তবে ভাঙ্গা, জঙ্গলপূর্ণ ঘরদোবগুলি ছিল মাত্র। ঠাকুরদাদা যখন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ঢং ঢং কবিয়া ১২টা বাজিল। দুপুর রাত্রি, উপাসনার সময় ঘণ্টা বাজে। তিনি অত বাত্রিতে সেই ঘণ্টাব ধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

ঘণ্টার ধ্বনি শুনিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—তাই ত, সেণ্ট ক্রাইস্টোফাব গির্জাটা কি আবাব মেরামত করিয়া লওয়া হইয়াছে? প্রাতঃকালে যখন এই পথ দিয়া গিয়াছি, কৈ, তখন তো গির্জাটার দিকে লক্ষ্য হয নাই! হয় তো ও দিকে মন ছিল না বলিয়াই দেখিতে পাই নাই।

আবাব শুনিলেন, ক্রমাগত ঘণ্টা বাজিতেছে। তখন ভাবিলেন—যাই, গির্জায় যাইয়া দেখি, ব্যাপারটা কি হইতেছে। চন্দ্র-কিরণে দেখিলেন, সে গির্জাটা নূতন, আব অতি সুন্দর। আর দেখিলেন—বিস্তব আলো জ্বলিতেছে, জানালাব মধ্য দিয়া আলোব উজ্জ্বল রশ্মিগুলি বাহিরে আসিযা পড়িতেছে। তিনি বাহির-দবজার গায়ে ঘোড়াটা বাঁধিলেন। তাহাব পর গির্জার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে যাইযা দেখিলেন—ঘরেব মধ্যে লোকে লোকারণ্য। লোকগুলি সকলেই একমনে উপাসনায় বিভোব। এতটা তন্ময়ভাব সচরাচব বড একটা দেখা যায় না। গির্জার মধ্যে অন্য শব্দ না হইলেও দুই এক জন কখন কখন আসিযা থাকে। কিন্তু এখানে কাসির শব্দটা পর্যন্ত নাই—একেবারে ঘোর নীববতা। ঠাকুর-দাদা ঘবে ঢুকিয়াই দরজার কাছে জানু পাতিয়া উপাসনা করিতে বসিযা গেলেন।

গির্জাব মধ্যে বেদীর কাছে পুরোহিত ছিলেন। ঠাকুরদাদা ভাবিতে লাগিলেন—"যাই হউক, রাত দুপুবেও উপাসনাটা করা ভাল।" উপাসনা করিবার সময় তিনি মৃত আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গল কামনা করিতেন। আজও তাই করিতে লাগিলেন। খানিক পবে সমবেত লোকগুলিকে আশীর্বাদ দিবার জন্য পুরোহিত সকলের দিকে চাহিলেন। সে চাহনিটার মধ্যে কেমন-যেন একটু অস্বাভাবিক দীপ্তি। সেটা ঠাকুরদাদা বেশ লক্ষ্য করিলেন। আরও আশ্চর্যের বিষয়, তাঁহার বোধ হইল, পুরোহিত যেন তাঁহাকেই খুঁজিতেছেন। তাঁহার দিকেই পুরোহিত চাহিয়া রহিলেন। ইহাতে ঠাকুর-দাদার যেন একটু কেমন কেমন ঠেকিতে লাগিল।

পুরোহিত একটি পাত্র হইতে একখানি মন্ত্রপূত রুটী লইয়া উহাকে দুই আঙ্গুলের মধ্যে ধরিয়া চাপা-স্বরে বলিলেন—"এইখানি শ্রদ্ধার সঙ্গে লইতে পারে, এমন কি কেহই নাই?" কেহই উত্তর দিল না। তিনি পর-পর তিনবার জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাইলেন না। তখন ঠাকুরদাদা উঠিলেন। পুরোহিতের কথায কেহ উত্তর দিল না বলিয়া ঠাকুরদাদা তাহাদের দিকে একটু ঘৃণার সঙ্গে চাহিলেন।

ঠাকুর-দাদা বলিলেন—"পূজ্যপাদ মহাত্মন্! আমি ভাবিয়াছিলাম, আগামী কল্য বড়দিন, সুতরাং অন্তিম উপদেশ ও আশীর্বাদ গ্রহণ প্রভৃতি কার্য কল্যই করিব। আপনি যদি ঐগুলি

আজই করিতে বলেন তাহাতেও আমার দ্বিধা নাই।" এই কথা শুনিয়া পুরোহিত বেদী হইতে নামিলেন। ঠাকুরদাদাও লোকগুলির ভিতর দিয়া বেদীর কাছে যাইয়া জানু পাতিয়া বসিলেন।

পরে পুরোহিতের নিকট হইতে ভক্তির সঙ্গে সেই পবিত্র বস্তু গ্রহণ করিলেন। পুরোহিত তখন বলিলেন—"তোমাকে আমি আশীর্বাদ করি। সে আজ তিন শত বছরের কথা, এইরূপ বড়দিনের পূর্বরাত্রে এইরূপ সারারাত দিন ধরিয়া বরফ পড়িয়াছিল। আমি শুনিলাম, একটা লোক মর-মর অবস্থায় আছে। তাহাকে অন্তিম উপদেশ দেওয়া আমার কর্তব্য ছিল। কিন্তু আমি লোকটার কাছে যাই নাই। এই পাপে আজ তিনশ বছর ধরিয়া আমি দুঃসহ নরকে কষ্ট পাইতেছি। যদি কোন জীবিত ব্যক্তি আমার নিকট অন্তিম উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তবে আমার মুক্তি হইবার কথা। আজ তোমাকে পাইয়া আমার যাহা দিবার ছিল, তাহা দিলাম। এখন আমার মুক্তি হইল।"

পুরোহিতের কথাগুলি শেষ হইবামাত্র সমস্ত আলো নিভিয়া গেল। ঠাকুর-দাদা তখন দেখিলেন যে, তিনি একটা ভাঙ্গা, ছাদশূন্য, জঙ্গলপূর্ণ গির্জার মধ্যে দাঁড়াইয়া আছেন। তখন অতি কষ্টে সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাহার পর ঘোড়ায় চড়িয়া বাড়ী আসিতে লাগিলেন।

এই ঘটনাটিতে আমরা দুইটি বিষয় বুঝিতে পারি। জীবিতকালে কর্তব্যের ত্রুটি করিলে পরলোকে যাইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যক হয় ও ইচ্ছা জন্মে। তাহা ছাড়া ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভূতযোনিরা বিস্তর কাণ্ড ঘটাইয়া থাকে ও ঘটাইতে পারে। যে গির্জার কথা বলা হইল, হইতে পারে, পুরোহিত জীবিতকালে ঐ স্থানেই কাজ করিতেন। আর এখন যে গির্জা, সমবেত লোক, আলোক প্রভৃতি দেখা গেল, হয় তো এগুলি আসল জিনিস নহে। পুরোহিত বহুদিন ধরিয়া এই সকল চরিত্রের যে চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই চিন্তাই এখন দৃশ্যমান হইয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিল। ঠাকুর-দাদা কেন, যে কেহই হয় তো উহা দেখিতে পাইতেন। ব্যাপারগুলি সবই মৃত পুরোহিতের চিন্তাগঠিত দৃশ্য, এরূপ ভাবিবারই বা প্রয়োজন কি? এগুলি অন্যরূপও হইতে পারে। ভুবর্লোক হইতে পুরোহিত ইচ্ছাশক্তি প্রেরণ করিয়া চ্যাটনকে হয় তো অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাই খানিকটা সময়ের জন্য চ্যাটনের সূক্ষ্ম-দৃষ্টি খুলিয়া যাওয়ায় ঐরূপ কাণ্ড দেখিতেছেন বলিয়া মনে করিলেন। বাস্তবিক পক্ষে স্থূল-জগতে হয় তো কিছুই দেখেন নাই। ব্যাপারটিতে এইরূপ নানা প্রকার ব্যাখ্যাই আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, ঐ সব ব্যাখ্যা ঠিক নহে। খুব সম্ভবতঃ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের যে সকল মহাত্মা মারা গিয়াছেন, তাঁহারা ঐ পুরোহিতের ত্রুটি জানিয়া প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহার উপকার করিবার নিমিত্ত ঐরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পুরোহিতের উপকার করিব স্থির করিয়া সকলে মিলিয়া শুভকামনা করিতেছিলেন। সেই কামনাগুলি স্থূল মূর্তিতে চ্যাটনের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। এইটিই বোধ হয় ঠিক ব্যাপার নচেৎ অত লোক, অত আলো এমন সুন্দর গির্জা এতগুলি ব্যাপার এক জনের চিন্তাশক্তির বলে হইল, এরূপ ভাবিয়া উঠা যায় না। অনেকের চিন্তাশক্তির ফলে এমনটি হওয়া বেশ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

আর একটু ভাবিবার আছে। পুরোহিত-ভূতের ধাঁ করিয়া গতি হইয়া গেল। যেই প্রায়শ্চিত্ত, অমনই মুক্তি। ইহাতে মনে হয়, তিনি আদৌ বদ্ধ ছিলেন না, প্রত্যুত মুক্তই ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই এরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারিতেন। সে জন্য এত দীর্ঘকাল ভূত হইয়া থাকারও তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। ইচ্ছামাত্রই এরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উর্দ্ধদিকে অগ্রসর হইতে

পারিতেন। তিন শত বৎসর কাহকেও ভূবর্লোকে সাধারণতঃ থাকিতে হয না। অতটা সময নরকভোগ করা নিতান্ত অসঙ্গত ব্যাপার। প্রতি বৎসরে একবার বড়দিনের পর্ব্ব হয় , আর সেই দিনেই যদি প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যক হইয়া উঠে, তাহা হইলে পুরোহিত ভূতের এত দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিবার আবশ্যক কি ছিল?

মরণের পর ভূত হইয়া অনেকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে আইসে। তাহাদের কাহিনীগুলি বড়ই চমৎকার দেখা যাইতেছে। কিন্তু স্যার্ বাল্‌ফ ফার্ণলের কাহিনীর মত অদ্ভুত কাহিনী শোনা যায না। ১৮৮৬ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের সংখ্যা "থিওসফিস্ট" নামক পত্রিকায় ঐ কাহিনী বাহির হইয়াছিল। গল্পটি খুব বড , তাই এখানে আমরা সমস্তটা বলিতে পারিব না। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই ঃ—একটা লোক জীবিতকালে অন্যের অপকার করিয়াছিল। তাহার পরে মরণকালে এই জন্য খুব একটা অনুতাপ আইসে। ভযানক অপরাধের জন্য লোকটির কয়েদ হয। কয়েদীরা পেট ভরিয়া খাইতে পায না, এক রকম অনশনেই মারা যায। মারবার সময একখানি কাগজে এইরূপ লিখিয়া যায—"আমি অমুক স্থানে প্রচুর টাকা রাখিযা গেলাম, আর অমুক লোকটার বড ক্ষতি করিয়াছি, এখন খুব অনুতাপ হইতেছে, আমার টাকাটা লইয়া যদি কেহ সেই লোকটাকে তাহার অর্ধেক দেয, তবে আমার পাপের কতকটা শান্তি হইবে, আর অর্দ্ধেকটা সে নিজে যেন লয।" মরণের পর বহু বৎসর ধরিয়া লোকটা ভূত হইযা টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইযাছিল। কেহ তাহার ইচ্ছামত কাজ করে কি না, কেবল পাহারা দিয়া তাই দেখিতেছিল। যে বংশে এই ব্যাপার ঘটে, সেই বংশের ভদ্রলোকেরা এখনও বাঁচিয়া আছেন নাম প্রকাশ হইলে পাছে অখ্যাতি রটে, তাই তাঁদের নাম না দিযা মন-গড়া নাম দিযা আসল ঘটনাটি প্রকাশিত করা হইযাছে। লেড্‌বিটার সাহেব বিশেষ অনুসন্ধান করিযা জানিয়াছেন যে, গল্পটি খাঁটী সত্য।

বিংশ অধ্যায়

অনেকে ভূত হইয়া পৃথিবীর উপর ঘুরিয়া বেড়ায়

মানুষ জীবিতকালে পাপ করিলে তাহার জন্য মরণের পর অনুতাপ হয়। আর প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ভূত হইয়া মানুষের সঙ্গে দেখা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করে, এই সব কথা আমরা পূর্ব-অধ্যায়ে বলিয়াছি।

অনেক ভূত পৃথিবীর উপর ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদিগকে "পৃথিবীবদ্ধ" বলা চলে। পূর্ব-অধ্যায়ে আমরা এ রকম অনেক ভূতের কথা বলিয়াছি। এ সব ভূতগুলো এক রকমের নহে। অনেকে অনেক উদ্দেশ্যে "পৃথিবীবদ্ধ" থাকে। সেন্ট মার্টিন্ বলেন—অনেকগুলি ভূত ভুবর্লোক হইতে আসিয়া হাজির হয়, আবার চলিয়া যায়। কিন্তু আর কতকগুলি এমন ভূত আছে, যাহারা চলিয়া যায না, মানুষের কাছে সারা দিন-রাতই থাকিয়া যায়, চলিয়া যাইবার শক্তি তাহাদের নাই, যাইতে পারে না। তবে, মুক্তির বিশেষরূপ ব্যবস্থা ঘটিলে যাইতে পারে। ঠিক এইরূপ একটা গল্প "অদৃশ্য সহায়" নামক পুস্তকের ৮৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। গল্পটি এই ঃ—এক ব্যক্তি দুইটি ছোট ছেলে রাখিযা মারা যায়। তাহাদের খাওয়া-পরার কোন ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারে নাই। সেই জন্য লোকটি কেবলই ছেলে দুইটির ভাবনা ভাবিতে থাকে। সূক্ষ্ম-জগতে বিস্তর অদৃশ্য সহায় আছেন। ঐরূপ একজন সহায় লোকটার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বুঝিতে পারিয়া তাহাব উপকারের জন্য ছেলে দুইটির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। তখন সেই মৃত পিতার মনে শান্তি হাওয়ায় সে স্বর্গে যাইতে পারিল। আবার এমন অনেক ভূত দেখা যায় যে, যাহাদের দেখা দেওয়ার উদ্দেশ্যটা খুব ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না।

ওয়ের নাম্নী একটি পেত্নীর কথা

ইংলণ্ডের নর্দ্দামটন জেলায় বার্বী নামে একটা ছোট পল্লী আছে। এই পল্লীর একটি বাড়ীতে অনেক দিন ধবিয়া একটা প্রেতিনীর উপদ্রব ছিল। জীবিতকালে ইহার নাম ছিল ওয়ের। এই ওয়েব ভয়ানক কৃপণ ছিল। লোকে ভাবিল, কৃপণ লোকের গুপ্তধন থাকার খুব সম্ভবনা ; বোধ হয়, উহারও কোন স্থানে টাকা লুকানো আছে, তাই প্রেতিনী হইয়া সেই টাকা পাহারা দিতে আইসে। লোকেব মনে এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় সকলেই উহাব টাকা খুঁজিতে লাগিল। আশ্চর্য। সত্য সত্যই লুকানো টাকা বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু তবুও প্রেতিনীর আসা বন্ধ হইল না। তখন তাহার বন্ধুবা ভাবিতে লাগিলেন, হয় তো উহার দেনা আছে, সেগুলিব পরিশোধ না হইলে উহার মুক্তি হইবে না। দেনা আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য বন্ধুরা তখন অনুসন্ধান আরম্ভ করিযা দিলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, সত্য সত্যই কিছু দেনা আছে। তখন তাঁহারা দেনা শোধ করিয়া দিযাছিলেন। আর সেই অবধি প্রেতিনীব আসাও বন্ধ হইযা গেল। ঋণ-শোধেব সঙ্গে তাহার মুক্তি হইল।

তিন শিলিং দশ পেন্স দেনার জন্য একজন ভূত হইয়াছিল

মরণের পর এক জনের মনে হইল—আমি পৃথিবীতে তিন শিলিং দশ পেন্স দেনা করিয়া আসিয়াছি, শোধ দিতে পারি নাই। তখন শোধ দিবার নিমিত্ত সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশ্য এ কথায় বেশ বুঝা যায়, সে লোকটা খুব সাঁচ্চা ছিল। উহার কাহিনী ডাঃ এড্ওয়ার্ড বীণস তাঁহার "নিদ্রাতত্ত্ব" নামক পুস্তকের ৪৬২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন। দেনা শোধ হইয়া গেলে উহার মুক্তি হইয়াছিল। বীণস বলিতেছেন—"ইহা অপেক্ষা সত্য ঘটনা পৃথিবীতে আর হইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না।" গল্পটি এই—'পার্থ' নগরের এক জন স্ত্রীলোক ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের জনৈক পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করিয়া বলেন, "মহাশয়, একটি প্রেতিনী প্রত্যহ আমাকে জ্বালাতন করিতেছে। সে আমাকে বলে, তুমি কোন এক জন পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করিয়া বল যে, আমার কিছু দেনা আছে, তিনি যেন দয়া করিয়া দেনাটা শোধ দিয়া দেন, নচেৎ আমার মুক্তি হইতেছে না। তাই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। যাহা ভাল হয় করুন ; আমি প্রেতিনীর উপদ্রবে আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।" দেনাটা না কি তিন শিলিং দশ পেন্স ; আর এই দেনার জন্য ভুবর্লোকে সে আদৌ শান্তি পাইতেছে না ; কাহার কাছে যে সেই দেনা, তাহা স্ত্রীলোকটি পুরোহিতকে বলিলেন না। না বলিলেও, তিনি অল্প একটু বেগ পাইয়াই জানিতে পারিলেন যে, "মালয়" নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের সত্য সত্যই এক মুদীর দোকানে তিন শিলিং দশ পেন্স দেনা ছিল। আর প্রেতিনীর নামটা যে "মালয়," তাহা সে নিজেই প্রকাশ করিয়াছিল। মুদী মালয়ের মৃত্যুসংবাদ জানিত না , তাহার দেনার কথাও মনে ছিল না। পুরোহিতের কাছে সবিশেষ শুনিয়া দোকানের হিসাব-বই খুলিয়া দেখিল যে, বাস্তবিক তিনি শিলিং দশ পেন্স মালয়ের নামে দেনা লেখা আছে। পুরোহিত ঐ দেনাটা শোধ দিয়াছিলেন। তখন থেকে সেই মালয় প্রেতিনীকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। ঋণশোধের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুক্তি হইয়া গেল।

দেনা যত সামান্যই হউক না কেন, উহা শোধ দিবার চেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসার কথা। কিন্তু আমাদের একটা কথা মনে হয়, যে স্ত্রীলোকটা পুরোহিতকে প্রেতিনীর সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন, তিনি এত কথা বলিলেন অথচ কাহার কাছে দেনা, তাহা বলিলেন না কেন? আর কেনই বা তিনি এক জন ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পুরোহিতকে দেনা শোধ দিতে অনুরোধ করিলেন, অথচ মালয় পুরোহিতের নিকটে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিতা। আবার ইহাও মনে হয় যে, হয়তো এ সব ব্যাপারের মধ্যে কোন বিশেষ অভিসন্ধি ছিল না। লোকে খুব বেশী সময় যুক্তি-অযুক্তি দেখিয়া চলে না, কিছু একটা করিতে হইবে, তাই করে, সেটা ঠিক হইতেছে কি না, তাহা বড় একটা ভাবে না। এটা গেল দেনা শোধ দিতে আসিবার কথা। আবার ভূতেরা কখন কখন দেনা আদায় করিতেও আইসে। ভূতের টাকার দরকার নাই। তবে দেনা আদায় করিতে আইসে কেন? দেনা আদায় করিয়া সেই টাকা আত্মীয়স্বজনকে দিয়া যায়।

লণ্ডন শহরের মরগ্যান্ নাম্নী ভদ্র মহিলা ১৮২৯ খৃস্টাব্দে "প্রেত-তত্ত্ব" নামক একখানি পুস্তকের প্রথম খণ্ডের ১২১-২৩ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত গল্পটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গল্পটি তিনি লর্ড আস্কিনের কাছে শুনিয়াছিলেন। ব্যাপারটি এই ঃ—

আর্‌ল্ অব্ বুকানের খানসামা

আমার যৌবনকালে আমি এক সময় কিছু দিন স্কট্‌লণ্ডে অনুপস্থিত ছিলাম। যে দিন এডিনবার্গ শহরে ফিরিলাম, সেই দিন প্রাতে যেমন আমি এক জন পুস্তক-বিক্রেতার দোকান হইতে বাহির হইতেছি, অমনই দেখি, আমাদের বাড়ীর পুরাতন খানসামা আমার সম্মুখে হাজির। দেখিলাম, তাহার চোহারাটা খুব বদলাইয়া গিয়াছে, রুগ্ন, গায়ে যেন রক্ত নাই, পাতলা যেন ভূত। আমি বলিলাম—"অ্যাঁ, তুমি এখানে কেন?" সে বলিল—"আপনার সঙ্গে দেখা করিতেই আসিযাছি। কর্তার কাছে আমার কিছু পাওনা আছে, যদি তাঁহাকে বলিয়া অনুগ্রহ করিয়া আমার পাওনাটা লইয়া দেন, তবে বিশেষ উপকার হয়। আমার হিসাব না করিয়াই দেওয়ান মারা গিয়াছেন, তাই এ পর্যন্ত পাওনাটা পাই নাই।"

আমি তাহার দুর্দশাগ্রস্ত চেহারা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। তাহাকে বলিলাম, "আমার সঙ্গে আইস।" এই বলিয়া আমি পুস্তক বিক্রেতার দোকানে প্রবেশ করিলাম। পরে পিছনে চাহিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিতে গিয়া দেখি, সে আর নাই।

সেই লোকটার স্ত্রী শহরে সামান্য একটু ব্যবসায় করে, সে কথা আমার মনে ছিল, এমন কি, তাহার বাড়ীটাও আমি চিনিতাম, কেন না, বাল্যকালে তাহার বাড়ীতে প্রায়ই বেড়াইতে যাইতাম। খুঁজিতে খুঁজিতে এখন আবার তাহার বাড়ীতে গেলাম। যাইয়া দেখি, তাহার স্ত্রীর বিধবার বেশ। শুনিলাম, কয়েক মাস হইল, লোকটি না কি মরিয়া গিয়াছে। আরও শুনিলাম, মরিবার সময় সে বলিয়া গিয়াছে, আমার পিতার দেওয়ান অন্যায় করিয়া তাহার কিছু টাকা দেন নাই। আমি বাড়ী আসিলে দেওয়ানের এই অবিচারের না কি প্রতিকার হইবে। এই সব কথা বলিয়া সে মারা গিয়াছে।

"অবিচারের প্রতিকার করিব" বলিয়া আমিও অঙ্গীকার করিলাম। তাহার অল্প দিনের মধ্যেই খানসামার স্ত্রীকে পাওনা টাকা কয়টি দিয়াছিলাম।

খানসামার এই ভূত হওয়া ব্যাপারটাতে আমাদের মনে হয় যে, সে সামান্য টাকা কয়টির জন্য খুব বেশী ব্যস্ত হয় নাই, স্ত্রীর মায়া, স্ত্রীর ভাবনাই তাহাকে বেশী কাতর করিয়াছিল। স্ত্রী অর্থাভাবে কষ্ট পাইবে, এই ভাবনা ভাবিয়াই সে কাতর হইয়াছিল। তাই তাহাকে টাকা কয়টি দিয়া সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ভূতেরা অনেক সময় আত্মীয়-স্বজনের উপকার করিতে আসে। অর্থই অনর্থের মূল। টাকাকড়িওয়ালা মানুষ মরিয়া গেলে মরণের পর সেই টাকার ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া অস্থির হয়। আর যদি কোন স্থানে টাকা লুকাইয়া মারা যায়, তবে তাহার দুর্গতির শেষ থাকে না, সেরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই তাহাকে ভূত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। ওয়েব নাম্নী প্রেতিনীর কথা আমরা আগেই বলিয়াছি। এবার আর একটা ঐরূপ গল্প বলিতেছি ঃ—

একজন কৃপণ রমণী মরিয়া প্রেতিনী হইয়াছিল

"লম্ব" নামক স্থানের কাছে একটা বড় রাস্তা আছে। রাস্তাটিতে বেশী আলো না থাকায় কতকটা আঁধার থাকিত। সন্ধ্যাকালের অল্প অল্প আঁধার যখন ধরণীর উপর ছড়াইয়া পড়ে, ঠিক সেই সময় দেখা যাইত, এক জন জীর্ণ-শীর্ণ স্ত্রীলোক, পরণে সেকেলে রকমের পোশাক, ঐ রাস্তার উপর বেড়াইতেছে। রাস্তার নিকটবর্তী স্থানের অনেকে কৃষক ঐ স্ত্রীলোকের মূর্তিটা দেখিয়াছিল।

কিন্তু কেহই ভয়ে তাহার সঙ্গে কথা বলে নাই। দেখা যাইত, সেই প্রেতিনীটা একখানা বাঁকা লাঠিব উপর ভর দিয়া মুখখানি নীচু কবিয়া নীববে পথ বাহিয়া চলিয়া যাইতেছে। লাঠিখানিও অদ্ভুত রকমেব। সেরূপ লাঠিও না কি কেহ কখন দেখে নাই। মাঝে মাঝে গোলাঘরেব মধ্যে, কখনও বা কাহাবও ঘরেব ভিতব তাহাকে দেখা যাইত। কিন্তু বেশী সময়ই দেখা যাইত যে, সে বাগানে আতা গাছেব নীচে দাঁড়াইয়া আছে। আতা গাছটা বেশ ঝাঁকড়া ছিল। তাহাব নীচে ঐ প্রেতিনীর টাকা পোতা ছিল, মাটী খুঁড়িয়া না কি শেষে লোকে ঐ টাকা পায়। এই প্রেতিনী বহুকাল ধবিয়া ঐ রকমভাবে আতা গাছেব কাছে ঘুবিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। প্রেতিনীব দেহটা একেবাবে বুড়ীব মত লোল, ঘাগ্‌রার ছাঁট-কাটও অদ্ভুত বকমেব, গাযেব জামাটায় ডোরা ডোবা দাগ, লাঠিখানিও সৃষ্টিছাড়া। একটা লোক বেশ একটু লক্ষ্য কবিয়া ঐ সব দেখিতেছিল। দেখিযা, তাহাব খুব ভয হয , ভয হইবামাত্র ভোঁ কবিয়া দৌড় দিয়া সে পলাইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে লোকটি আসিয়া বলিল—"বাপ্ বে! আমি একটা আতা আনিতে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে তাহাকে দেখিনি, সে প্রেতিনীটা তখন সেখানে ছিল না। কিন্তু যাই আতা ছিঁড়িবাব জন্য হাতখানি উঁচু কবিযাছি, আব অমনই প্রেতিনীটা আসিয়া একেবাবে আমাব সাম্‌নে হাজিব।" তাহাব পবে একটি লোক মদ খাইযা মদেব নেশায একটু সাহস হওযায মনে কবিল, "কুচ পবোয়া নেই, আমি প্রেতিনীব কাছে যাইযা জিজ্ঞাসা কবিব, কেন, বাবা, তুমি কি জন্য এমন কবিযা ঘুবিযা ঘুরিযা বেড়াইতেছ?" সে তাই কবিল , মদ খাইযা বেশ একটু নেশা জমকাইযা তুলিযা প্রেতিনীকে জিজ্ঞাসা কবিল—"তুমি কে, কি জন্য আসিযা লোককে দেখা দাও?" প্রেতিনী একটি কথাও না বলিযা বাগানেব একটা স্থান সঙ্কেতে দেখাইযা দিল, স্থানটি একটা অনেককেলে আতা গাছেব কাছে। পবে অনুসন্ধান কবায সেইখানে অনেকটা মাটিব নীচে কতকগুলি টাকা পোঁতা পাওযা গেল। যখন গর্ত কবিযা টাকা তোলা হইযাছিল, তখনও সেই প্রেতিনীব মূর্তি সেইখানেই দাঁড়াইযাছিল। অনেকগুলি ভাঁড়ে টাকা পুরা ছিল। যখন শেষ ভাঁড়টা তোলা হইল, তখন প্রেতিনীর শীর্ণ মুখখানিতে একটা অস্বাভাবিক হাসি দেখা গেল, আব তখনই প্রেতিনীব মূর্তিটা আস্তে আস্তে মিলাইযা গেল। সেই অবধি আব কেহ কখন তাহাকে দেখে নাই।

জন্ এইচ্ ইনগ্রাম "বিলাতী ভূতেব বাড়ী ও ভূতেব গল্প" নামক পুস্তকেব ৫৭৮ পৃষ্ঠায ঐ গল্পটি সন্নিবেশিত কবিয়াছেন। গল্পটি একটু অদ্ভুত বকমেব , কেন না, প্রেতিনীটার দেনা ছিল না, আবাব টাকাগুলি কাহাকেও দিবাব কথাও সে বলিল না। তবে কি জন্য শুধু শুধু প্রেতিনী হইযা ঘুবিযা বেড়াইতেছিল, এ কথা ভাল কবিয়া বুঝিযা ওঠা যায না। তবে এইটুকু মনে হয, তাহারই বুদ্ধিব দোষে এতটা টাকা অকেজো হইয়া মাটিব নীচে থাকিল ভাবিয়া সে একটা অশান্তি বোধ কবিতেছিল। তাই তাহাব একটা ইচ্ছা হইযাছিল যে, টাকাটা লোকেব চোখে পড়ুক আর তাহাতে সংসাবেব কাজ হউক। সে ইচ্ছা সে লউক, তাহাতে প্রেতিনীর আপত্তি ছিল না।

প্রেতিনী একটা বদ্‌মায়েসকে উপযুক্ত প্রতিফল দিয়াছিল

দেনা শোধ দেওযা হয নাই ভাবিযা মরণেব পব অনেক ব্যক্তি ভূত হইযা অশান্তি ভোগ করে সত্য, আর এটা তাহাদেব প্রশংসাবও কথা। কিন্তু অন্য কাবণেও ভূতেব অশান্তি ঘটে। প্রতি-হিংসা চরিতার্থ কবিবাব নিমিত্তও মানুষ মবণেব পব দৃঢ়সংকল্প হইয়া থাকে। যত দিন পবিশোধ

না নিতে পারে, তত দিন সে ছট্‌ফট্‌ করে। মরণের পরও মানুষের রাগ যায় না। "সূক্ষ্ম-জগতে পদসঞ্চার" গ্রন্থেব ৩২৬ পৃষ্ঠায় এই রকম একটা গল্প আছে। এক জন ইংরাজ কর্মচারী একটি যুবতীকে ফুসলাইয়া পাপের পথে লয় ; আবার কিছুদিন পরে তাহাকে পরিত্যাগ করে। ঘটনাটা "কানাডা" নামক দেশে ঘটে। ইহাতে যুবতী বাগান্ধ হইয়া উঠিল। কিছু দিন পরে যুবতী মারা গেল। কিন্তু বাগ কিছুমাত্র কমিল না। সে দশ বৎসর ধরিয়া ঐ কর্মচারীকে জ্বালাতন করিতে লাগিল। সর্বদা তাহার ঘরের মধ্যে আসিয়া ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ করিত, কখন কখন জানালা-দরজায় ধাক্কা দিত। সেই শব্দ ও সেই ধাক্কা এত জোরে ও এত ঘন ঘন দিত যে, তাহাতে ভীষণ শব্দ হওয়ায় এক রাত্রিও সেই কর্মচারী ঘুমাইতে পাবিত না। কর্মচারী বাড়ীতেই থাকুক আর বাহিরেই থাকুক, যেখানেই থাকুক না কেন, তাহার ঘরে আলো জ্বালিবার যো ছিল না। আলো জ্বালিলেই প্রেতিনীটা আসিয়া নিবাইয়া দিত। কর্মচারী যদি পাখী পুষিত, প্রেতিনীটা আসিয়া ঘাড় মটকাইয়া পাখীটি মাবিযা ফেলিত। প্রাতে ঘুম হইতে উঠিয়া কর্মচারী দেখিত, তাহার সাধের পাখীটি খাঁচার মধ্যে মরিযা পড়িয়া আছে। কর্মচাবী শুইবার ঘরে কুকুর রাখিত। অনেক সময় কুকুব যেন কাহাকেও দেখিয়া ছুটিযা আক্রমণ কবিতে গেল, আর ফিরিল না। প্রেতিনীটা নিবন্তব এইরূপ ভাবে জ্বালাতন কবায় কর্মচারী বাধ্য হইয়া চাকবি ছাড়িয়া দিল। অর্ধেক বেতন স্বীকার কবিযা অন্যত্র চলিযা গেল। কিন্তু তখনও প্রেতিনীর বাগ গেল না। তখনও ঘোর জ্বালাতন কবিতে লাগিল। তখন কর্মচাবী আব তিলার্ধ বিলম্ব না কবিযা সে অঞ্চল ত্যাগ করিয়া খুব দুবদেশে চলিযা গেল। না যাইযা উপায কি?

প্রেতিনী দ্বারা এরূপ ভাবে জ্বালাতন হওয়া কর্মফল ভিন্ন আব কিছুই নহে। প্রেতিনী উপলক্ষ ; বস্তুতঃ কর্মফলটাই প্রেতিনীর বিদ্বেষেব মধ্য দিযা ফলিযা গেল বলিতে হইবে। আবাব কর্মচারীও বেশ ভালরূপ একটু শিক্ষা পাইল। সে আব কখনও ঐরূপ কাজ নিশ্চযই কবে নাই। পবাবিদ্যাব লোকেরা এ ঘটনাটিকে অন্য ভাবে দেখেন। তাঁহাব মনে কবেন, কর্মচাবীকে, ঐরূপ ভাবে জ্বালাতন করায প্রেতিনীব পক্ষেও অন্যায হইল। সে জন্য তাহাকে ভাবী কালে অশেষ কষ্ট পাইতে হইবে।

হতাশ প্রেমিকের কাহিনী

ঐ পুস্তকে ৩১৮ পৃষ্ঠায কতকটা এই ভাবেব আর একটি গল্প আছে। এক জন ফরাসী অভিনেত্রীর প্রতি অনেক লোক অনুরক্ত হয। জনৈক যুবকেব উপব তাহার কৃপা-কটাক্ষ পড়ে। একটু মেশামেশিব পর যুবকের কতকগুলি দোষ তাহাব চোখে পড়িল। অভিনেত্রী তখন তাহাব উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিল। কিছু দিন পরে মর্মাহত যুবকের মৃত্যু হয। মরিবাব সময সে বলিযা গেল—যত কাল আমি এই অভিনেত্রীকে জানিযাছি, তত দিন ধবিযা মরণের পবও আমি ভূত হইয়া উহাকে জ্বালাতন কবিব। অভিনেত্রী নিজে নিজেব জীবনী লিখিয়া গিযাছে। তাহা পড়িলে জানা যায, যুবককে পবিত্যাগ কবিলেও সে তাহাব সঙ্গে নিষ্ঠুব ব্যবহাব কবে নাই। কিন্তু তাহা কবিলে কি হইবে? যুবক তাহাব উপব খুব চটিযাছিল।

যুবক ত মরিল। মরিল আবাব বাত্রি ঠিক ১১টার সময়। মবণেব পব প্রত্যহ ঠিক এই ১১টার সময় সে ভূত হইয়া আসিযা ভযানক চীৎকার করিতে আবম্ভ করিত, এত চীৎকার যে, শুনিলে লোকে পাগল হইয়া ওঠে। যেখানেই অভিনেত্রী থাকুক না, চীৎকাব সমানভাবে হইতে

লাগিল, ইহাতে অভিনেত্রী ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। কযেক মাস ধরিয়া এইরূপ চলিল, তাহাব পর উপদ্রবটা আর এক রকম হইয়া উঠিল। ঠিক ১১টাব সময খুব কাছে বন্দুকের শব্দ হইতে লাগিল। এ উৎপাতটা যেন আরও অসহনীয়। তিন মাস ধরিয়া এ উৎপাত খুব চলিল। প্যারিস শহরের পুলিস এই উৎপাত বন্ধ করিবার নিমিত্ত খুব চেষ্টা কবিল, কিন্তু পারিল না। কেন শব্দ হয, কোথা হইতে হয়, তাহা কেহ ঠিক করিতে পাবিল না। তাহার পব আবাব অন্য বকমেব উৎপাত দেখা দিল। এইরূপ আড়াই বৎসর ধরিয়া ভূতটা উৎপাত কবিয়াছিল। অভিনেত্রীব সঙ্গেও যুবকের জীবিতকালে ঠিক আড়াই বৎসরই সদ্ভাব ছিল।

উপরের দুইট গল্পেই আমরা দেখিতে পাই যে, ভূত হইযা এক ব্যক্তি অনেক দিন ধবিয়া উপদ্রব কবিতেছে। দুই বকম ভাবে আমবা এইরূপ ব্যাপাব বুঝিতে পারি। ভূতগুলি সত্যই ভূত, এইরূপ ভাবিলে বলিতে হইবে যে, ঐ ভূতের প্রাণে খুবই বিদ্বেষ ছিল। সেই বিদ্বেষ এতই ভযানক যে, সচরাচর মানুষের ঐরূপ ভাব দেখা যায না বা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয না। কিন্তু জগতে এরূপ বিদ্বেষ যে একেবারেই দেখা যায না, তাহা আমবা বলি না। কদাচিৎ দেখাও যায। কর্মচাবী ও প্রেতিনীটাব গল্পে ঐ বিদ্বেষের পরিচয় পাওযা যায।

আবাব অন্য বকম ব্যাখ্যাও দেওয়া যায। ঐ উপদ্রবগুলি হয় তো আদৌ ভূতকৃত নহে। ঐগুলি হয তো কোন চিন্তামূর্তি বা অস্থাযী মূর্তিব কাণ্ডকাবখানা। উহাবা আপনা-আপনি ঐরূপ উৎপাত কবিয়াছিল। অভিনেত্রীব উপব যে প্রকাবেব উপদ্রব হইযাছিল, সেরূপ করা চিন্তামূর্তিব পক্ষে খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। কোন লোক যদি একমনে একটা চিন্তা করে, তবে সেই চিন্তাব দিব্য একটি মূর্তি তৈযাবী হয। শুভ অশুভ দুই রকম চিন্তাবই মূর্তি হইতে পারে। চিন্তাব একটি মূর্তি গডিযা তুলিতে হইলে ভাসা ভাসা, আল্‌গা আল্‌গা পাতলা চিন্তা করিলে হইবে না। খুব গাঢ, খুব একাগ্র, খুব গভীব চিন্তা কবা চাই, তদ্‌গত হইয়া তন্ময়ভাবে চিন্তা কবিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা মূর্তি ধবিযা দাঁড়ায। ঘডিব যন্ত্রের মধ্যে যেমন নড়া-চডাব শক্তি পুরা আছে, সেই শক্তিতে ঠিক ঠিক সময়ে ঘডি চলে ও বাজে , আবাব তড়িৎ তৈযাব কবিবার ভাণ্ডগুলিতে যেমন অদৃশ্যভাবে বিপুল শক্তি নিহিত থাকে, সেখান হইতে তাড়িৎ নিঃসৃত হয, ঠিক সেইরূপ ভাবে ঐ চিন্তা-মূর্তিতেও একটা কার্য করিবার ক্ষমতা নিহিত থাকে। তাহাবই বলে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময বা বৎসবেব মধ্যে একটা নির্দিষ্ট দিনে, বা কোন একটা ঘটনাব সহযোগে ঐ মূর্তি কাজ কবিয়া থাকে। "ভুবর্লোক" নামক গ্রন্থের ৯৪ পৃষ্ঠায ঐরূপ চিন্তা-মূর্তির একটা গল্প বলা হইয়াছে। মূর্তি আসিয়া মৃত্যুসংবাদ দিয়া যাইত। চিন্তা-মূর্তিব কি চমৎকাব কাণ্ড!

তাই বলিতেছি, তীব্র ইচ্ছা, প্রণয় বা বিদ্বেষেব কঠোব একাগ্র উদ্যোগ থাকিলে এইরূপ একটা মূর্তি তৈযার হয়। মূর্তি তৈযাব হইলে তখন কাজ কবিতে থাকে। যাহাব ইচ্ছা-শক্তিতে মূর্তি হইযাছে, তাহার আব সে মূর্তিব উপব কোন হাত থাকে না। আমাব চিন্তা-মূর্তি তোমার অনিষ্ট কবিতে লাগিল—তখন আমি যদি মনে কবি, আচ্ছা, তোমাব উপর যেন ও আর অত্যাচাব না কবে, তাহা হইলে আমাব সেরূপ মনে কবায় বিশেষ কিছু উপকাব হইবে না। তেমার উপব অত্যাচার বন্ধ কবা আমার সাধ্য হইবে না। বন্দুক ছুডিযা ফেলিলে সেই নিক্ষিপ্ত গুলির উপর যেমন আর কোন প্রভুত্ব থাকে না, ধনুক হইতে তীর ছুডিযা ফেলিলে সেই তীরেব উপব যেমন আব হাত থাকে না, চিন্তা-মূর্তি তৈযারী হইযা গেলে, তাহার উপরও তেমনই আর হাত থাকে না। চিন্তা-মূর্তি কাহাবও অনিষ্ট কবিতেছে, সে অবস্থায় তাহাব একটা প্রতিকারের ব্যাবস্থা আছে। যাহার বিদ্বেষফলে ঐ ভযঙ্কবী মূর্তি তৈযাব হইযাছিল, সেই যদি আবাব খুব

ভালবাসার ভাবনা ভাবিতে থাকে, তবে আস্তে আস্তে আগেকার মূর্তিটির কঠোরতা কমিয়া যায়।

কিন্তু ভালবাসার ভাবনা না ভাবিয়া সে যদি তখনও বিদ্বেষের চিন্তাই করিতে থাকে, তবে আগেকার মূর্তিটা আরও প্রচণ্ড, আরও ভয়ঙ্করী হইয়া ওঠে। সে মূর্তি আরও অনিষ্ট করিতে থাকে। চিন্তা-মূর্তির এই সকল কাণ্ড হইতে পারে, আর জগতে সত্য সত্যই হইতেছে। অথচ যাহার চিন্তা-মূর্তি এই সব করিতেছে, সে এ সব ব্যাপার কিছুই জানিতেছে না। কোন এক ব্যক্তি কঠোর, তীব্র, একাগ্র চিন্তা করিল। তাহার ফলে মূর্তি তৈয়ার হইল, জগৎ-যন্ত্রের নিয়মে নিয়মিত হইয়া মূর্তির কাজ চলিতে লাগিল। দেখিতে গেলে যে লোকটা এইরূপ একটি কল চালাইয়া দিল অথচ এত বড় একটা কাজের বিন্দুবিসর্গও সে জানিতে পারিল না। কিন্তু এতটা না জানিলেও মানুষমাত্রেই জানে যে, বিদ্বেষের চিন্তা করা ভাল নহে। অতএব ঐরূপ চিন্তা করা অকর্তব্য। যে ব্যক্তি অসচ্চিন্তা করিয়া জগতের অহিত করে, তাহাকেও তাহার জন্য দায়ী হইতে হয়। ভগবানের কাছে সেজন্য সে নিশ্চয়ই অপরাধী।

লেড্‌বিটার সাহেব ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের "থিওসফি" নামক মাসিক পত্রিকায় নভেম্বর সংখ্যায় একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষ মরিয়া গেলেও কখন কখন ভয়ানক বিদ্বেষ থাকে ; তাহার অতি ভয়ানক পরিচয় সেই গল্পটিতে পাওয়া যায়। গল্পটির নাম—'টম্-প্রাইচ্।' ব্যাপারটি এই ঃ—একটি যুবতীর প্রেমে দুই জন মজিয়াছিল। এক জন বেলগাড়ীর "ড্রাইভার" বা চালক। এই ড্রাইভার মারা গেল, মারা গেল বটে, কিন্তু অন্য প্রেমিকের উপর বেশী একটা বিদ্বেষ থাকিল। বিদ্বেষটা এত বিশ্রী, এত ভয়ানক ও মর্মান্তিক যে, তাহার চিন্তা মূর্তি ধারণ করিয়া একটা দুর্ঘটনার সৃষ্টি করিল। আর সেই দুর্ঘটনার পাকে পড়িয়া সেই অপর প্রেমিকটা নিহত হইল। মরণের পরও মানুষ এতটা অনিষ্ট করিয়া বসিতে পারে। এরূপ ভয়ানক বিদ্বেষ খুব বেশী দেখা যায় না। কিন্তু এমন ঘটনা অনেক দেখা গিয়াছে যে, নিহত ব্যক্তি ভূত হইয়া হত্যাকারীদের পিছনে পিছনে ফিরিয়া অবশেষে তাহাদিগকে সমূলে নির্মূল করিয়াছে।

আত্মীয়-স্বজন মরিয়া গেলে তাহাদের জন্য কান্নাকাটি করা খুব অন্যায়। তাহাদের মৃত আত্মীয়েরা প্রাণে ব্যথা পায়। এ সব কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কাঁদাকাটা করিলে মরা আত্মীয়েরা দুঃখিত হইয়া থাকে , দেখা দিয়া কাঁদাকাটা করিতে নিষেধ পর্য্যন্ত করিয়া যায়, এইরূপ ব্যাপারও আমরা কয়েকটা জানিয়াছি। নিম্নে আমরা এই রকম একটি অদ্ভুত গল্প বলিতেছি। অদ্ভুত—কেন না, মরা মানুষটা একটা অদ্ভুত রকমের উপায়ে নিজের প্রাণের ব্যথা জানাইয়া গিয়াছিল। গল্পটি এই ঃ—

মরা আত্মীয়ের জন্য শোক করিও না

এক সময়ে "করে" নামক স্থানে একটা ছোট মেয়ে ছিল। তাহার মা মরিয়া গেল। সে শোকে অধীরা হইয়া পড়িল। বিশ্রী কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। দিন-রাত্রি কান্না, কেহই প্রবোধ দিয়া সান্ত্বনা দিতে পারিল না। এক দিন সে উপাসনা-গৃহে জানু পাতিয়া দুই প্রহর রাত্রি পর্যন্ত মা'র জন্য প্রার্থনা করিতেছিল। দেখিল, তাহার সামনে দিয়া অনেকগুলি মরা মানব সারি বাঁধিয়া যাইতেছে। দেখিল, লোকগুলি নীরবে চলিয়াছে, পায়ের শব্দ পর্যন্ত হইতেছে না। আকাশের উপর দিয়া যেমন মেঘগুলি নীরবে চলিয়া যায়, ইহাদের যাওয়াটাও ঠিক যেন সেইরূপ।

"সে দেখিল, ঐ সারির শেষের লোকটা খুব যেন কষ্টে যাইতেছে, তাহার পিঠের উপর একটা মস্ত ভারি জলপাত্র, পাত্রটা জলে টাপ্-টুপ্ করিতেছে, তাহার ভাবে মানুষটা নীচু হইয়া পড়িয়া অতি কষ্টে চলিয়াছে। আর সেই জল কালো, দেখিতে বিশ্রী। বালিকা দেখিল—সে তাহাব মায়ের মূর্তি। মাকে দেখিয়াই সে চিনিল। মা'র কষ্ট দেখিযা তাহাব প্রাণ কেমন করিযা উঠিল।

পরলোকে মা'র কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া বালিকা ঘরে আসিযা আরও কাঁদিতে লাগিল। মা'র পিঠে ঐরূপ বিশ্রী জলেব ভাব কেন, সে তাই ভাবিতে লাগিল। প্রভাত হইবামাত্র সে বৃদ্ধ পুরোহিতের কাছে যাইযা এই সব ব্যাপার বলিল।

পুবোহিত এই সব শুনিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আজও আবাব উপাসনা গৃহে যাইও, তাহা হইলে আবও অনেক তথ্য জানিতে পারিবে।"

বালিকা দেখিল—আবার ঠিক দুই প্রহব বাত্রিতে সেই লোকগুলি সেইরূপ নীরব সাবি বাঁধিয়া চলিযাছে। বালিকা জানু পাতিয়া বসিয়া দেখিতেছিল। দেখিল, তাহার মা সারিব একেবাবে শেষে আসিতেছে। দেখিল, মা'র কষ্ট আজ আরও বাড়িয়াছে, আজ পিঠে দুইটা জলপাত্র, তাহাব ভারে মা একেবারেই চলিতে পারিতেছে না, মাথাটা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ভযানক ভাবে মা'ব পা দুটা যেন ঠক্-ঠক্ কবিয়া কাঁপিতেছে, যাতনায মুখখানি কালি হইয়া গিযাছে।

ইহা দেখিযা বালিকা আব স্থির থাকিতে পাবিল না। সে জিজ্ঞাসা কবিল—"মা, তোমার এত কষ্ট কেন? তোমার দশা এমন হইল কেন?"

বালিকা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র মা বেগে তাহাব কাছে আসিয়া বলিল—"আমাব দশা এমন হইল কেন, তাই আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? বাছা! আমার জন্য আর কাঁদিও না। তোমার কান্না বন্ধ হইলে আমি বাঁচিতাম। এই যে পিঠেব উপর দুটো জলের ভার দেখিতেছ, এ তোমার চোখেব জল। তোমার কাঁদা-কাটা বন্ধ না হইলে চিবকালই এই বোঝা আমাকে টানিয়া মরিতে হইবে। মনে রাখিও—মবা মানুষের জন্য কাঁদাকাটা করা ভাল নহে। আত্মার দুঃখ নাই—আত্মা সকল সময়েই সুখী ; কেবল আত্মীয়-স্বজনের হা-হুতাশে তাহার সুখ নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ছাড়া স্বর্গে যাইবাবও ব্যাঘাত ঘটে, বিলম্ব ঘটে। আত্মীয়েরা চোখের জল ফেলিলে সেগুলি যেন মরা মানুষের গায়ে আগুনের বৃষ্টির মত বোধ হয়, তাহাতে মরা মানুষটার খুব যাতনা হয়।"

আবাব পরদিন বালিকা পুরোহিতকে যাইয়া ঐ সকল বলিল। তিনি শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এইরূপ দেখার পর কি তুমি আর কাঁদিয়াছ?"

বালিকা বলিল—"না, না ; আর কাঁদি নাই ; আর কখনই কাঁদিব না।" পুরোহিত তখন বলিলেন—"আচ্ছা, আজ আবার উপাসনা-গৃহে যাইযা দেখ। বোধ হয, আজ তোমার মায়ের অবস্থা দেখিয়া সুখী হইবে।"

বালিকা বাস্তবিকই সে দিন বাত্রিতে মায়ের অবস্থা ভাল দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। আজ দেখিল—মা লোকগুলির আগে আগে আসিতেছে, তাহাব মুখ আজ স্বর্গীয় আনন্দে প্রফুল্ল উদ্ভাসিত।

১৮৮৯ খৃস্টাব্দে কুইমপাব নামক স্থানের স্টন্-নাম্নী রমণী এই গল্পটি প্রচার করেন। এ ই হোয়াইট্‌হেড লিখিত "মৃত ব্যক্তিব সহিত ব্যবহার" নামক পুস্তকের ১৫৮ পৃষ্ঠায় এই বিবরণটি বিবৃত হইয়াছে।

এই গল্পটিতে মায়ের পিঠের উপরে জলের ভার ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত দৃশ্য। বিলাতের সেকেলে লোকগুলির এইরূপ বিশ্বাস ছিল। গল্পটিতে সেই সেকেলে লোকের বিশ্বাসের মত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। মরা মানুষ রোজ রোজ রাত্রিকালে উপাসনা-গৃহে আসিতেছে কেন, ইহা ভাবিয়া সেই বালিকা বা সেই বৃদ্ধ পুরোহিত কেহই অবাক্ হইল না। আর মরা মানুষগুলোকে বালিকা চর্মচক্ষুতেই দেখিতে পাইল, সেটাও খুব অদ্ভুত কথা। সার কথা, এই মানুষ মরণের পর কিছুদিন আমাদের খুব কাছেই থাকে, আর আমাদের শোকপ্রকাশে তাহারা খুব কাতর হয়। হোয়াইট্-হেড গল্পটি সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন—"আমাদের শোকপ্রকাশে মৃত আত্মীয়েরা ব্যথিত হয়, বিলাতের লোকগুলি বরাবরই এ কথা বিশ্বাস করে। বিস্তর গল্পে ঐ বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়।" (উক্ত পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠা)। সে কালের সরলহৃদয় লোকগুলি কত প্রকৃত তথ্য, কত মহীয়ান্ সত্য জ্ঞাত ছিলেন। পরবর্তী লোকেরা আপনাদিগকে খুব বেশী জ্ঞানী বলিয়া অহঙ্কারে মত্ত আছেন, অথচ কোন খবরই রাখেন না।

একবিংশ অধ্যায়

পূর্ব-অধ্যায়ে আমরা ভূতের প্রতিশোধ লইবার কথা বলিয়াছি। টাকার মায়াতে মানুষ মরণের পর ভূত হইযা টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে কথাও বলিয়াছি।

জীবিতকালে কোন অপরাধ কবিলে বা কোন কর্তব্য বিষয়ে ত্রুটি হইলে, মরণেব পব ভূত হইয়া তাহার প্রাযশ্চিত্ত বা সংশোধন কবিতে হয। বিস্তর ভূতকে এরূপ করিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু যে সকল অন্যায় বা ত্রুটি বা দুর্ঘটনাব কোন রকমেই প্রতিকার হইবাব উপায় নাই, তাহাব জন্যও মরণের পর একটা ভয়ানক অনুতাপ আসিয়া দাঁড়ায়। সেই অনুতাপ ও আত্মগ্লানিব ফলেও মানুষকে ভূত হইয়া ঘটনাস্থলে আসিয়া ঘুরিয়া বেডাইতে হয়।

এক জন পুরোহিত ভূত হইয়াছিল

ঐ রকম ভয়ানক পাপ করিয়া একটা মানুষকে ভূত হইতে হইয়াছিল। গল্পটি স্যার নাথেনাল ব্যাক্‌স্ হল প্রণীত "আমার সময়ের ঐতিহাসিক ঘটনা" নামক পুস্তকের ২১৮-২২৬ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত আছে, তথায় উহাব বিশদ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। আমাদের স্থান অল্প, তাই সংক্ষেপে বলিব। এক জন পুরোহিত একটি নূতন স্থানে নিযুক্ত হইয়া গেলেন। বিলাতে পুরোহিতদের পৃথক্ বাড়ী থাকে ; সেখানে কেরাণী, চাকব, শোবাব ঘর প্রভৃতি সবই থাকে। ইনি যাইবার পূর্বে যে পুরোহিত সেখানে ছিলেন, তিনি মরিয়া ভূত হন। আমাদের এই নূতন পুরোহিত যাইয়া দেখিলেন, একটি ছায়া-মূর্তি শুইবার ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইনি এইরূপ লিখিয়াছেন— "আমি দেখিলাম, দিনে দুপুরে একটা মূর্তি হাজির ; তাহার গায়ে একটা ঢিলে পোশাক ; লোকটা একটি টেব্লিলেব কাছে দাঁড়াইয়া একখানি প্রকাণ্ড পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছে, দুই পার্শ্বে দুইটি ছোট ছেলে। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মাঝে মাঝে সেই ছেলে দুটির দিকে চাহিতেছে। সে দৃষ্টি বেশ স্নেহপূর্ণ। কিন্তু ছেলের দিকে চাহিয়াই লোকটি ফোঁস কবিয়া যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছে, ইহাও বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে বইখানা বন্ধ করিয়া দুই হাতে ছেলে দুইটির হাত ধরিয়া লোকটি আস্তে আস্তে ঘর হইতে চলিয়া গেল। আমি বিশেষ মনোযোগেব সঙ্গে উহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, উহারা ঐ ঘরের একটা কোণে একটা প্রকাণ্ড স্টোভের পিছনে চলিয়া গেল। যিনি আমাব আগে সেখানে পুবোহিতের কাজ করিতেন, তাঁহাব একটা চিত্র ছিল। চিত্রখানি দেখিয়া বুঝিলাম যে, ছায়া-মূর্তিটা অবিকল তাঁহাবই। অনুসন্ধানে জানিলাম, লোকে তাঁহাকে খুব ভালবাসিলেও তাঁহাব একটা বিশ্রী চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছিল। এক জন যুবতীর প্রেমে তিনি পড়িয়াছিলেন, তাহারই ফলে দুইটি সন্তান জন্মে। ছেলে দুইটি ৪/৫ বৎসরের হইল, এমন সময় তাহারা যে কোথায় গেল, তাহা কেহ বলিতে পারিল না। হঠাৎ ছেলে দুইটি যেন গুম্ হইয়া গেল। সেই শোকে তাহাদের পিতা অর্থাৎ সেই পুরোহিতও না কি ভগ্নহৃদয হইয়া মারা পড়িলেন। এ কথা আমার বেশ বিশ্বাস হইল, কেন না, আমিও দেখিলাম, পুরোহিতের মূর্তির কাছে দুইটি ছোট ছোট ছেলে বেড়াইতেছে। কিছুদিন ঐ ভূতের মূর্তি আর আসিল না। আমিও ক্রমে ক্রমে উহাদের কথা ভুলিয়া গেলাম। শীতকাল আসিল। স্টোভ জ্বালিবার প্রয়োজন হইল।

ষ্টোভে আগুন ভাল জ্বলিল না, ধূঁয়া হইতে লাগিল। তখন ষ্টোভ-মেরামতেব নিমিত্ত মিস্ত্রীকে ডাকাইলাম। মিস্ত্রী স্টোভটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল, উহার মধ্যে দুইটি মরা মানুষেব কঙ্কাল রহিয়াছে। কঙ্কাল দুইটি অল্পবয়স্ক মানুষের , ৪/৫ বৎসর বয়সের শিশুর কঙ্কাল। আব, কি আশ্চর্য। সেই কঙ্কালের কাছে একটা ভূতও বাহির হইল। পুরোহিত মরিয়া ভূত হইয়াছেন, এই কথা পূর্ব হইতেই রটিয়াছিল, তাহার পর এই কঙ্কাল বাহির হইল, তাহা ছাড়া সাক্ষাৎ ভূতও দেখা গেল। তবে ভূতের কথা খাঁটি সত্য ! এই ভাবিয়া সেখানকার কেবাণী সেই মুহূর্তেই চাকরী ছাড়িয়া দিযা সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পুরোহিত জীবিতকালে খুব শান্তপ্রকৃতি ছিলেন, তবে তাঁহার প্রেতমূর্তিকে কেন যে কেরাণী এত ভয করিয়া বসিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝা গেল না।"

এক জন পদস্থ ব্যক্তি ভূত হইয়া অস্থির হইয়া বেড়াইত

ডাক্তাব লী "ছায়ারাজ্য" নামক গ্রন্থের ৪৯ পৃষ্ঠায় একটি ঘটনার উল্লেখ কবিযাছেন। তিনি নিজে ঐ ঘটনার বিষয অবগত ছিলেন। তাঁহাব প্রদত্ত বিবরণ এই—"১৮৮০ খৃস্টাব্দে আমি পল্লীগ্রামের একটি পুবোহিত বাড়ীতে ছিলাম। দুই প্রহব বাত্রিতে একদিন আমাব ঘরে ভূতেব উপদ্রব হইতে লাগিল—হঠাৎ আমার সাম্‌নে একটা মানুষের মূর্তি ফুটিয়া উঠিল। মূর্তিটি খুব স্পষ্ট নহে, ছায়া-ছায়াভাব , আমার বিছানাব চারিদিকে কেমন একরকম হুটাপুটি কবিযা ছুটিয়া বেডাইতে লাগিল। মূর্তিটির গায়ের রঙ ধূসর , খুব লম্বা একটা পোশাক পবা, বিছানার এক প্রান্ত হইতে অতি বেগে ছুটিয়া আর এক প্রান্তে আসিয়া হাজির ! খানিকটা সময় আমি উহার দিকে একদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলাম। বিস্ফারিত চোখেই চাহিয়া রহিলাম। ভূতটি এক বকম ভাবেই ছুটাছুটি কবিতে লাগিল। আমি উহার মাথা, কাঁধ ও হাত দুখানা বেশ স্পষ্টই দেখিলাম , কিন্তু অন্যান্য অঙ্গ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। তখন একটা দেশলাইয়ের বাক্‌স লইয়া আলো জ্বালিলাম। ঘবেব বাতিটা জ্বালিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তখনও ভূতটি সেই রকম ভাবেই হুটাপুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। আমি বেশ ভাল করিয়া উহার রকম-সকম দেখিতেছিলাম। উহার গতিরও পরিবর্তন নাই, গায়ের বর্ণটাও বদলাইল না। দুই তিন মিনিট এইরূপ কাণ্ড করিয়া মিলাইয়া গেল।"

কিছু দিন পরে এই ভূতের বিবরণটি জানা গেল যে, ৩০ বৎসর আগে এক জন পদস্থ ভদ্রলোক ঠিক ঐ ঘরেই একটি লোককে হত্যা করিয়াছিল। সেই পর্যন্ত ভদ্রলোক ভূত হইয়া ঐ ঘরে আসা-যাওযা করিতেছে। ঐ ঘরে আরও অনেকে ঐ ভূতটাকে ইহার পূর্বে দেখিযাছে। তাহারাও দেখিয়াছে যে, ঠিক ঐ রকম করিয়া বিছানার চারিদিকে ভূতটা ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়।

হত্যা করিবার পর, ভূতটা একটা ঘোব অনুতাপ—একটা সার্বক্ষণিক দুঃখ অনুভব করিতেছিল। তাই এত চঞ্চলভাবে ছুটাছুটি। ঐ ছুটাছুটি দেখিয়াই তাহার মনেব অবস্থা বেশ বুঝা যায়। ৩০ বৎসর হইয়া গিয়াছে, তবুও মনের যাতনা, অনুতাপের বেগ যায় নাই।

এরূপ সত্য সত্য ভূত অনেক বাড়ীতে দেখিতে পাওয়া যায। এগুলি সত্যই ভূত। আবার অনেকগুলি ভূতের মত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভূত নহে। মবণের পর মানুষ হয় তো তীব্র চিন্তা করিয়া বসিল, সেই চিন্তা স্থূল মূর্তি ধরিয়া মানুষের চর্মচক্ষুব সম্মুখে আসিযা নানারূপ কাণ্ডকারখানা দেখাইতে থাকে। সেগুলিকে চিন্তা-মূর্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। কোন্‌গুলি আসল ভূত, আর কোন্‌গুলিই বা চিন্তা-মূর্তি, তাহা বুঝিয়া ওঠা বেশ একটা শক্ত ব্যাপার। আমরা

এমনই একটা গল্প বলিব, তাহাকে ভূত বলাও চলে, আবার চিন্তা-মূর্তি বলিলেও বলা যায়। গল্পটি হারল্যাণ্ডের "ল্যাঙ্কাশায়ার কিংবদন্তী" নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ব্যাপারটা এইরূপ ঃ—

"প্রতি বৎসর একটা নির্দিষ্ট সময়ে এক জন অশ্বারোহী 'উইকলার হল' নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত। ইংলণ্ডে ষ্টুয়ার্ট-বংশের রাজারা যে সময় রাজত্ব করিতেন, তখনকার প্রচলিত পোশাক এই ভূতটির গায়ে দেখা যাইত। তাহার ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জামও কেমন একরকম বিশ্রী গড়নের। লোক শুনিতে পাইত, ঐ ব্যক্তি খুব বেগে ঘোড়া দড়দড় শব্দ করিয়া একটা ছোট রকম সাঁকোর উপর দিয়া আসিয়া ঐ হল নামক স্থানে হাজির হইত। তাহার পর ঘোড়া হইতে নামিয়া একটা ওক্-কাঠের বড় সিঁড়ি বাহিয়া ঐ বাড়ীর একটি উপরের ঘরে যেন প্রবেশ করিল। তাহার পরই যেন সেই ঘরটা হইতে একটি স্ত্রীলোকের ভীষণ চীৎকার শুনা গেল। আবার মূহূর্তমধ্যেই ঐ চীৎকার কমিতে কমিতে শেষে যেন ফোঁপাইয়া কান্নার মত মৃদু হইয়া পড়িল। তাহার পরই অশ্বারোহী নীচে দরজার কাছে আসিয়া ঘোড়ায় চড়িল। চড়িয়াই খুব বেগে ঘোড়া ছাড়িয়া দিল। লোকে বলে, ঐ স্থানে এইরূপ ব্যাপার প্রতি বৎসরই না কি ঘটিয়া থাকে।

ঐ অঞ্চলে প্রকাশ, ঐ অশ্বারোহী ঠিক ঐ ঘরে তাহার স্ত্রীকে হত্যা করিয়াছিল। পরে অশ্বারোহী মরিয়া এই পাপের জন্য ভূত হইয়া প্রতি বৎসর একবার করিয়া এখানে আসিতেছে। এইরূপে না কি তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।"

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ঐ রকম ভূত হইয়া প্রতি বৎসর আসা অসম্ভব নহে ; বরঞ্চ খুবই সম্ভব। কিন্তু ইহার অপেক্ষা আমাদের আর একটা কথা বেশী সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। আমাদের মনে আসে যে, হত্যা করিবার সময় ঐ অশ্বারোহী ও তাহার স্ত্রী দুই জনের মনেই একটা ভয়ানক আবেগ-উদ্বেগ দেখা দিয়াছিল। সেই আবেগ-উদ্বেগটাই সূক্ষ্ম জগতের মূর্তি ধরিয়া বিচরণ করিতেছে। সেই মূর্তিই বৎসরে বৎসরে মানুষের স্থূল ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয়। মানুষরা অশ্বারোহীকেদেখে, ঘোড়ার দৌড়োদৌড়ি শোনে, আর স্ত্রীর মরণকালের কান্নার স্বরটাও যেন শুনিয়া ফেলে। এইরূপে কাণ্ডটা ঘটে। আবেগ-উদ্বেগের যে এইরূপ স্থূলমূর্তি হইয়া থাকে, সে সম্বন্ধে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিব। আরও এই রকম গল্প আমরা কয়েকটা বলিব। কিন্তু যে গল্পটি বলিলাম, তাহাতে এটা ভূত কি চিন্তা-মূর্তি, তাহা বুঝা যায় না।

জীবিতকালে পাপ করিলে মরণের পর অনুতাপ হয়। সেই অনুতাপফলে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত ঘটে। সকলেই যে বৎসরে একবার করিয়া দেখা দেয়, তাহা নহে। অনেক সময় পাপের স্থানটিতে ভূত ২৪ ঘণ্টাই হাজির থাকে। শুধু হাজির নহে, নানা প্রকার উপদ্রব করে। এইরূপ ক্ষেত্রেই লোকে বলিয়া থাকে, অমুক বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আছে। কিন্তু আবার ভূত না থাকিলেও অনেক কারণে ভূতের উপদ্রবের মত কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়া থাকে। এই উপদ্রবও নানা রকমের আছে। কোন কোন স্থানে অকারণে চীৎকার, গোলমাল, ধুপধাপ শব্দ শুনা যায় , কোন স্থানে দেখা যায়, জিনিসপত্র চলিয়া যাইতেছে, অথচ কে যে লইয়া যাইতেছে, তাহা দেখা যায় না, মনে হয়, জিনিসপত্রগুলা আপনা-আপনিই চলা-ফেরা করিতেছে ; কোন স্থলে স্থূলশরীর ধরিয়া দেখা দেয়, ২৪ ঘণ্টা ভয়ানক চীৎকার, ভয়ানক উৎপাত, ভয়ানক উপদ্রব করে। সে এমন ভায়নক বজ্জাতি যে, সেখানে কাহারও তিষ্ঠিবার যো থাকে না।

মানুষ মরিয়া গেলেও অনেক সময় পার্থিব জিনিসের মায়া ছাড়িতে পারে না। তাহার জিনিস অন্যে লইবে, এটা সে সহ্য করিতে পারে না। তাই ইচ্ছাপূর্বক ঐরূপ বজ্জাতি করিয়া নিজের

বাড়ী বা নিজের কোন জিনিস কখন কখন রক্ষা করে। আবার কখন কখন কাহারও কাহারও উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যও ঐরূপ কাণ্ড করিয়া থাকে। কিন্তু কখন কখন এমনও দেখা যায় যে, প্রতিশোধও নিচ্ছে না, নিজের জিনিসও রক্ষা করিতেছে না, অথচ বজ্জাতি। এইরূপ ক্ষেত্রে বজ্জাতিব কাবণ বুঝা যায় না। মরণের পর মানুষের মনটা চঞ্চল থাকে, কিছুই তাহাদের ভাল লাগে না, আপনাদিগকে তাহারা বডই কষ্টে আছি বলিয়া মনে করে। মনের এই অশান্তি—এই দুঃখের ভাব সবগুলি একত্র হইয়া একটা শক্তিতে পরিণত হয়। সেই শক্তিই অনেক সময় পৃথিবীতে নানরূপ উৎপাত উপদ্রব ঘটাইতে থাকে। অথচ মৃত ব্যক্তি হয় তো তাহা জানিতেও পারে না বা ঐ রকম উপদ্রব করা হয় তো তাহার আদৌ ইচ্ছা নহে। কখন কখন দেখা যায়, ভূতেরা কিছু চায় না। তাই না কি তাহারা মানুযের মনোযোগটা আকর্ষণ কবিবার মানসে উপদ্রব আরম্ভ করে। কিন্তু উপদ্রব করিয়া প্রাণের ব্যথা জানাইতে আসা কার্য্যটি বড়ই নিন্দনীয়। তাহারা ভুবর্লোক হইতে অতি সহজে অতি ভদ্র উপায়ে প্রাণের ব্যথা জানাইবার সুযোগ পাইতে পারে। তবে উপদ্রবের পথে যায় কেন? তাহার কারণ আছে। মবিতে মরিতেই ভুবর্লোকেব সঙ্গে পরিচিত হইতে পারে না, ঐ স্থানের সুযোগ-সুবিধা বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। তাই উৎপাত-উপদ্রব করিয়াই মানুষের চৈতন্য ফুটাইতে চায়। আবার এমন দেখা যায়, ভূতটা কিছু দিন উৎপাত-উপদ্রব করিয়া স্বর্লোকে চলিয়া গিয়াছে অথচ তাহাব একটা চিন্তা-মূর্তি বহুদিন যাবৎ পৃথিবীতে অল্প-বিস্তর উৎপাত করে। সেই স্বর্গবাসী ভূতটা হয় তো এই চিন্তা-মূর্তির কোন কথাই জানে না। আমরা কয়েকটি গল্প বলিব, তাহাতে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভূত ও চিন্তা-মূর্তিব পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মেজর মুর এক জন বিখ্যাত গ্রন্থকার। তিনি "হিন্দুর বহু দেবতার একেশ্বরবাদ" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহারই লেখা একটা ভূতের বিবরণ পাওয়া যায়। হ্যামপশায়রেব অন্তর্গত ক্রণ্ডল্ জেলায় ঈশট নামক বাড়ীতে বিলিংবেল নামক একটা বিশ্রী ভূতেব উপদ্রব হয়। ঐ উপদ্রবের কথা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখা হইতে আমরা নিম্নের গল্পটি বর্ণনা করিব। গল্পটি এই ঃ—

ঈশট বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব

"দুই প্রহর রাত্রি ; বাড়ীর সমস্ত লোক ঘুমুচ্ছে। এই অবস্থায় কেহ যে উঠিয়া ভয় দেখাইতে আসিবে, এটা কল্পনাও করা যায় না। ঠিক এই সময় ঐ বাড়ীটাতে শব্দ শুনা যাইত। শব্দ খুব স্পষ্ট স্পষ্ট ; শব্দ একটা নয়, পর পর অনেকগুলি হইত। মনে হইত, কে যেন খুব একটা ভারী জিনিস দিয়া কোন একটা ফাঁকা দেওয়াল বা মেঝের উপরে আঘাত করিতেছে। রাত্রি ১২টা হইতে ২টার মধ্যেই এইরূপ শব্দ হইত। এমন বিশ্রী যে, লোকে ঘুমাইয়া থাকিলেও উহাতে জাগিয়া উঠিত। আবাব কখন কখন এত আস্তে আস্তে হইত যে, ভাল করিয়া কানেই আসিত না। কখন কখন খুব দ্রুতভাবে হইত, আবার কখন বা অনেকক্ষণ পর পর শুনা যাইত, কিন্তু শব্দ যেরূপ ভাবেই হউক না কেন, সেটা যে একটা ভূতের কাণ্ড, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিত। এক দিন যে শব্দ করার ভঙ্গীটা শুনিয়াছে, পরদিন তাহাকে বুঝিবার জন্য বেগ পাইতে হইত না। শব্দ করার মধ্যে এমনই একটু বকমারী ছিল যে, উহাকে ভূতের কাণ্ড ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইত না। কিন্তু শব্দটা যে কোন্ স্থান হইতে আসে, তাহা কেহ স্থির করিতে পারিত না। আর ওটা যে ঘরের ভিতরেই হয়, এমন কথা নিশ্চিন্তভাবে বলা যাইত না।

"কোথা হইতে শব্দটা আসে, জানিবার জন্য মাঝে মাঝে লোকে খুব চেষ্টা করিয়াছে ; কিন্তু তাহারা কৃতকার্য হয়নি। প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ আমরাও ঐ শব্দ শুনিতেছি। এ পর্য্যন্ত আমরাও উহার তথ্য জানিতে পারি নি। অনেক দিন ধরিয়া শব্দটা হইতেছে। এত অনেক দিন যে ঐ বাড়ীর কত পরিবর্তন হইয়া গেল। আর লোকজন যখন ঘুমায়, সেই দুই প্রহর রাত্রিতে এই কাণ্ড হইয়া থাকে আর তথ্য জানিবার জন্য রীতিমত চেষ্টাও হইয়াছে, অথচ জানা যায় নাই। এই সমস্ত ব্যাপার একসঙ্গে করিয়া ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় যে, আমোদ করিয়া ভয় দেখাইবার জন্য কোন লোকের এরূপ করা সম্ভব হইতে পারে না। তাই বাড়ীর লোকগুলি স্থিব কবিয়া রাখিয়াছে যে, মানুষের বুদ্ধিতে এ ব্যাপারের মীমাংসা হইতে পাবে না।"

স্যামফোর্ড নামক স্থানে ভূতের উপদ্রব

"স্যামফোর্ড ভূতের কাহিনী" নামক পুস্তিকায় রেভারেণ্ড ক্যালেং সি কোল্টন্ একটি ভূতের ব্যাপার লিখিয়াছেন। এই ভূতটা আগেকার ভূতটির মত ভদ্রলোক নহে, এটা ভয়ানক দুশ্চরিত্র। এ ভূতটাও বিশ্রী চীৎকার করিত। শুধু তাহাই নহে। এ অনেককে মারিয়া বসিত। কে মারিতেছে, তাহা দেখা যাইত না, অথচ এক জনের গায়ে দুম্-দাম করিয়া কিল, ঘুসি, চপেটাঘাত পড়িতে লাগিল। এ প্রহাব বড় সহজ নহে, অনেকের হাত-পা ভাঙ্গিয়া যাইত ; গা ফুলিযা উঠিত। ডিভল্ জেলার অন্তর্গত টিভার্টন শহরের কাছে স্যাম্ফোর্ড পিতাবিল্ নামক পল্লীর একটা বাড়ীতে ভূতেব এই উপদ্রব ঘটিত।

২৪ ঘণ্টা ভূতের উপদ্রব হইতেছে, এমনও দেখা যায়

"প্রকৃত ভূতের গল্প" নামক পুস্তকের ২৬—৮৯ পৃষ্ঠায় দুইটি বিখ্যাত ভূতের গল্প আছে। একটি নর্দাম্বারল্যাণ্ডের উইলিংটন মিল্ নামক স্থানের ভূত, অপরটি ব্রোক্ হাউজ নামক স্থানের। দুইটি গল্পেই একটু বেশ মিল আছে। একটি প্রায় অপরটির মতই। শব্দ হইত, অথবা উহা কোথা হইতে আসিত, তাহা জানিবার যো ছিল না , ঘরের জিনিস-পত্রগুলি চলা-ফেরা করিয়া বেড়াইত, অথচ কোন লোককে দেখা যাইত না ; লোকের পিঠে ধুপ্ধাপ করিয়া কিল-চড় পড়িত, অথচ কে মারিত, তাহা কেহ দেখিতে পাইত না। দুইটি স্থলে এইরূপ ব্যাপার। আবার কখন কখন বা ভূত স্থূলমূর্তি ধরিয়াও আসিয়া দেখা দিত। এরূপ ব্যাপাব আমরা আগেও বলিয়াছি। ঠিক একই রকম ঘটনা। তবে একটু বিশেষত্ব এই যে, এখানকার উপদ্রবগুলি খুব সুস্পষ্ট আব খুব দীর্ঘকালব্যাপী। উইলিংটনের উপদ্রব এখন একটু কমিয়া আসিতেছে। অনেক প্রচলিত গল্প দ্বাবাই ভূতের অনেকটা তথ্য জানা যায়। কিন্তু ঐ দুইটি স্থানে এমন কোন গল্প প্রচলিত নাই, যাহা দ্বাবা আমরা ঐ দীর্ঘকালব্যাপী উপদ্রবের একটা মীমাংসা করিয়া লইতে পারি।

অনেক সময় রসিকতা করিয়াও ভূত মহাশয়রা উপদ্রব করিয়া থাকেন

আমরা এইরূপ একটা ব্যাপার বলিব। এ বড় অদ্ভুত কাণ্ড। ভূতেরা আমোদ করিয়া—রসিকতা করিয়া যখন উপদ্রব করে, তখন সেটা অনেক দিন ধরিয়া করে না। সেরূপ অত্যাচার অল্পদিন বা অল্পক্ষণ পরেই আর দেখা যায় না। কিন্তু যাহার উপর অত্যাচারটা হয়, সে বিশেষ কষ্ট পায়। তাহার প্রাণটা তখন ওষ্ঠাগতই হইয়া ওঠে। এরূপ ক্ষেত্রে ভূতেরা কখন ঘণ্টা বাজাইয়া শব্দ

করে ; আবার কখন কখন ইটপাটকেল মারিতে থাকে ; ঘরেব ও বাড়ীব জিনিসপত্র ভাঙ্গিয়া-চুবিয়া রসাতলে দেয়, এখানকার জিনিস সেখানে ফেলে, সেখানকার জিনিস ওখানে ফেলে—এইরূপ কাণ্ড। জিনিসপত্র ফেলা-ছড়ার সময় কেহ তাহাদিগকে দেখিতে না পাইলেও তাহারা নিশ্চয়ই একটা স্থূল-দেহ ধাবণ করে ; নচেৎ জিনিসপত্র কি কবিয়া নড়াইবে? সূক্ষ্ম-দেহে স্থূল জিনিস নড়ান যায় না। আব ভূতেবা যে স্থূল-শবীর ধরিয়া থাকে বা ধবিতে পাবে, সে কথা আমবা পরে বুঝাইয়া দিব।

খুব বেশী দেখা যায, ভূতেবা কাহারও ঘাড়ে চাপিয়া হাজির হয়। জিনিসপত্র ফেলা-ছড়া কবে, এরূপটা প্রায়ই দেখা যায় না। এরূপ হইতে দেখিলে অজ্ঞান লোকেবা ভাবে যে, ইহা হইতে পারে না , ইহা নিশ্চযই কোন বদমায়েস লোকের কাণ্ড। অবশ্য, এরূপ ব্যাপার বদ্মায়েসেবা যে অনেক সময না কবে, তাহা নহে। মানুষকে জ্বালাতন করিবাব জন্য বিদ্বেষ-বুদ্ধির প্রেবণায় ভূতেরা অনেক সময় এরূপ কাণ্ড কবে, আবাব কখন কখন আমোদ করিবার নিমিত্তও করে। জীবিত মানুষদের মধ্যেও দেখা যায়, অনেক সময় আমোদ করিয়া অপরের পিঠে হয় ত ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিল বা কেহ কাহাকেও ভয় দেখাইয়া বসিল, বা আমোদ কবিয়া একজন অপরের একটা দামী জিনিস নষ্ট করিয়া ফেলিল। মানুষেব মধ্যেও অনেকে অনেক সময় এরকম অবিবেচনার কাজ করিয়া বসে। এই সব অবিবেচক লোক মরিয়া গেলে হঠাৎ পণ্ডিত হইয়া যায় না। মরিল বলিযাই যে তাহাদের বিবেক-বুদ্ধি বুদ্ধ-চৈতন্যের মত ফুটিয়া উঠিবে, তাহাব কোন অর্থ নাই। মবণের পর ভূত হইয়া ঐ সকল পাষণ্ডেরাই মানুষেব উপর খামখেয়ালিভাবে অত্যাচাব কবিয়া থাকে।

দেবতা ছাড়া, ভূত ছাড়া আর এক বকম উপদেবতা আছে। তাহাবা হয় ত কোন বনে, নয় কোন পাহাড়ে, নয় কোন নদীতে, নয় কোন বিলে—এইরূপ সব স্থানে থাকে। তাহাবা একটু নিম্ন-শ্রেণীর জীব। তাহারা স্ফূর্তিবাজ। বানবেব মত নকল করিতে ওস্তাদ। তাহারাও সময় সময় মানুষকে জ্বালাতন কবিযা থাকে। কিন্তু ভাল লোক মবিয়া কখনই এরূপ অত্যাচার-উৎপীড়ন কবেন না। খামখেযালী ভূতের গল্প সংবাদ-পত্রেও অনেক বাহির হইয়াছে। আমরা খববেব কাগজ হইতে একটা গল্প বলিতেছি। লেখক বলিতেছেন যে, 'ঘটনাটি নেহাত সত্য আর এত অদ্ভুত যে আমিও যদি না দেখিতাম, তবে বিশ্বাস করিতাম না।' গল্পটি এই ঃ—

ওয়ার্কশপ নামক স্থানে ভূতের উপদ্রব

১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখ শনিবারে ওয়ার্কশপ নামক শহরটি একটা সংবাদে তোলপাড় হইযা উঠিল। শুনা গেল, জোসেপ হোযাইট নামক জনৈক ব্যবসায়ীব ঘরের জিনিস-পত্র ভূতে ভাঙ্গিয়া-চুবিয়া, ফেলিয়া ছড়াইযা, সর্বনাশ কবিয়া ফেলিয়াছে। জোসেপের বাড়ীর কাছে ঐ কাণ্ড দেখিবার জন্য লোকে লোকাবণ্য। সাবাদিন ধবিয়া মানুষ কৌতূহলী হইয়া সেখানে যাইয়া উঠিতেছে। আমিও দেখতে গেলাম। দেখিলাম, একখানি চেয়ার আপনা-আপনি ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে, তাহার পর এক এক টুকরা আপনা-আপনি ভাঙ্গিয়া সরিয়া যাইতেছে ; আমি একটা বালককে বলিলাম—'ঐ টুকুরাটি তুমি ধর গিয়া।' সে বললি—'ভয় করে, আমি পারিব না।' এই অদ্ভুত কাণ্ডের কথা আমি সকলের সঙ্গে বলাবলি করিতেছি, এমন সময় মাংস রাখার একখানি পাত্র আস্তে আস্তে আমাব মাথার কাছে উঠিয়া আসিল, তাহার পর আমার পায়ের

কাছে ধপাৎ করিয়া পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অমনি চুবমাব। পাত্র কেমন করিয়া আপনি উঠিয়া আসিল, আমি কিছুতেই তা বুঝিয়া উঠিতে পাবিলাম না।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, আলোটা কিন্তু মিট্‌মিটে। আমবা এই অদ্ভুত কাণ্ডেরই আলোচনা করিতেছিলাম। গৃহস্বামী একটা ময়দা রাখার পাত্রেব গায়ে হেলান দিয়া বলিতেছিলেন যে, "এ সব ঘটনা বড়ই বহস্যজড়িত।" তাঁহাব যেমন এই কথা বলা আব অমনই একটা পাত্র আপনা আপনি তাঁহার মাথাব উপর শূন্যে উঠিয়া পড়িল। উপবে লোহার শিকেব সঙ্গে মাংস টাঙ্গান ছিল। পাত্রটি সেই মাংসের কাছে উঠিল। তাহাব পর সেখান হইতে সটান সোজাভাবে নীচে ধপ্ করিয়া পড়িল। পড়িয়াই চূর্ণ-বিচূর্ণ। আমরা ছয জন ঘরে ছিলাম। ছয় জনই এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিযাছি। আমি বেশ করিয়া দেখিলাম যে, এই কাণ্ড কোন মানুষেব দ্বাবা হইতেছে না। গৃহস্বামী আমি দুই জনই ঘরের ভিতরে ঢুকিয়াছিলাম। তাঁহাদেব সঙ্গে সঙ্গে আমি সাম্‌নের ঘরেও গিযাছিলাম। তিনি আমাকে দেওয়ালের দিকে যাইতে বলিলেন আব কহিলেন—'দেখুন, ঐ ঘড়ি আব গ্লাসকেসের মধ্যস্থ পাযবাটি ছাড়া দেয়ালেব গাযে আব কোন জিনিসই নাই। সবই ভূতে চুবমার করিয়াছে। কেবল ঐ দুইটি জিনিস পেরে আবদ্ধ আছে।'

বাজা ঘড়িটি বিছানার উপব একটা কোণের দিকে দেওযালের গাযে আটকানো ছিল। হোয়াইট যখন আমাব সঙ্গে দেবাজটি ভূতেব হাতে পড়িযা উল্‌ট পালট হইযাছে বলিতেছিলেন, ঠিক সেই সময় একটা ভাঙ্গিয়া চুরমাব হইবার শব্দ আমাব কানে গেল। ফিবিয়া দেখিলাম, ঘড়িটিব দফা বফা হইযাছে। মেঝেব উপব পড়িযা খণ্ড খণ্ড হইয়া গিযাছে। ঘড়িটি ছিল বিছানাব দিকে এক প্রান্তে , কিন্তু উহা বিছানা ডিঙ্গাইযা ঘরেব আব এক প্রান্তে আগুন রাখিবাব স্থানটিব কাছে আসিযা পড়িয়াছে। ঘড়িটি পড়িবামাত্র চাকবাণী বালিকা দবজা খুলিযা ঘবেব মধ্যে প্রবেশ কবিল। হোযাইট বা ঐ বালিকা যদি কোন মতলবে ঘড়িটি ঐ বকম কবিযা ফেলিত, তাহা হইলে নিশ্চযই বুঝিতে পাবিতাম , কেন না, আমি একেবাবে ঘড়িটিব কাছেই দাঁড়াইয়া ছিলাম।

তাহাব পব আমবা বান্না-ঘবে গেলাম, আমি আগুনেব দিকে মুখ কবিয়া দাঁড়াইযা ছিলাম , বালিকা আমাব বাঁ পাশে থাকিয়া ঘবেব কাজকর্ম কবিতেছিল, হোযাইট আমার ডান দিকে ছিলেন। ঠিক সেই সময আর একটি দ্রব্য আমাব সমক্ষে কোথা হইতে আসিযা পড়িল আব খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সেই জিনিসটি একটি তাকেব উপব ছিল। কোন সময়ে যে উহা সেখান হইতে কেমন করিয়া ছিটকাইযা আসিল, তাহা আমি টেব পাইলাম না। জিনিসগুলি যেন বিদ্যুৎবেগে আমাব চোখের সম্মুখ দিয়া চলিযা গিযাছিল। যাওয়াটা আদৌ দেখিতে পাই নাই। যখন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল, তখনই বুঝিলাম যে, জিনিসগুলি ছিট্‌কাইয়া আসিযাছে। টেবিলের উপবে মাখন রাখিবার একটা পাত্র ছিল। সেটাও লাফাইযা আসিযা মেঝেয পড়িল ও চুবমাব হইযা গেল। কেন যে এরূপ কাণ্ড হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পাবিলাম না। আব এই সব কাণ্ড কাবখানা যদি আমি স্বচক্ষে না দেখিতাম, তাহা হইলে আমিও জিনিসপত্রেব এইরূপ চলা-ফেরার কথা বিশ্বাস কবিতাম না।

ঐ গল্পটি সংক্ষেপেই বলা হইল। ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের ১০ই মার্চ তাবিখেব "ওয়ার্কশপ ও গেন্‌সবরো নামক স্থানেব সংবাদ" প্রবন্ধে উহার বিশেষ বর্ণনা আছে। এরূপ ঘটনা আবও অনেক দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঘটিয়াছে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আরও কয়েকটা পূর্ব্ববৎ গল্প

১৭৮২ খৃস্টাব্দের স্টক্‌ওয়েল নামক স্থানে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। একখানি সংবাদপত্রে এই কাণ্ডের যথাযথ বিবরণ বিবৃত আছে। ইহার অনেক সাক্ষীসাবুদও ছিল। ব্যাপারটি ঠিক পূর্ব্বেরই মত। থালা, বাটি, গেলাস ধুপ-ধাপ করিয়া মেঝেয় পড়িতে লাগিল, আব সঙ্গে সঙ্গে ভাঙ্গিয়া চুরমার! রূপ-দস্তার রেকাবী ও পিতলেব পিলসুজগুলি ঘবেব মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল, কাচের থাম ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইল। শান্তিময় শহরতলীর স্থানটিতে প্রায় ২০ ঘন্টা যাবৎ নবকেব বীভৎস রঙ্গ চলিতে লাগিল। দর্শকদেব মধ্যে কেহই ঐ সকল জিনিস স্পর্শও করিল না। কিন্তু দেখা গেল যে, এক জন চাকরাণীর সম্মুখেই যে ঐ সব কাণ্ড বেশী ঘটিতে লাগিল; চাকরাণীকে ঐ বাড়ী হইতে সবাইযা দিবাব পবই উপদ্রব থামিযা গেল। আমাদের মনে হয়, ঐ চাকরাণীই হয় তো "মিড়িয়ম্" ছিল। উহার ঘাড়ে চাপিযা ভূতেবা সহজেই হয তো আসিতে পারিত। মস্কোবোড নামক স্থানে গত শতাব্দীব মাঝামাঝি সময়ে ঠিক ঐরূপ এক ঘটনা ঘটে। তাই বলিতেছি, এ বকম ঘটনা অনেক স্থানেই ঘটিযাছে।

ভূতেরা ঢিল ছুড়িয়া মারে

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্যাবিস নগরের "ৰু সেন্ট অনাব" নামক স্থানে ভূত ঢিল ছুড়িযাছিল। আবাব কেথনেভ নামক স্থানেও অনেক দিন আগে ইট্‌পাটকেল ছোড়া দেখা যায়। এমন কাণ্ড কেন ঘটে, কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। ঐ দুই স্থলে ভূতের কত অদ্ভুত কাণ্ডই ঘটিল। এমন ভাবে ঢিল ছুড়িতে লাগিল যে তাহাতে কেহই আঘাত পাইল না, অথচ সেগুলি দর্শকদের পায়ের কাছে আসিয়া পড়িল। ঘবেব মধ্যে এরূপ ব্যাপার হইতেছিল, অথচ ঘর চাবিদিক্ হইতে সুন্দরভাবে বন্ধ কবা ছিল। ঘর বন্ধ, অথচ ঢিল পড়িতেছে। বডই চমৎকাব কাণ্ড।

এক জন অধ্যাপকের উপর ভূতেব অত্যাচার

টেডওযার্থ নামক স্থানের এক জন বাদকের উপব ভূতের অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়া গল্প আছে। আর একটি গল্প আছে, জিসেন্ নামক স্থানেব অধ্যাপক স্কুপার্ট সম্বন্ধে। অত্যাচারটা না কি ছয বৎসব ধরিযা হইযাছিল, তবে নিবন্তর না হইয়া মাঝে মাঝে হইত। হয তো এক দিন রাত্রিতে দরজায ভয়ানক ধাক্কা মাবাব শব্দ হইতে লাগিল। পবদিন ঘব বন্ধ অথচ ঘবের মধ্যে বোঁ বোঁ শব্দে চারিদিকে ঢিল ছুটিতে লাগিল। ঢিল কাহারও গায়ে লাগিল না, কেহ আঘাতও পাইল না বটে, কিন্তু জানালাগুলি সবই ভাঙ্গিয়া চুরমার হইল। আবার সার্সি নূতন করিযা লাগান হইল। সেগুলিও চুরমার। দিনবাত্রি সমানভাবে অধ্যাপকের গালে ঠাস ঠাস শব্দে চড় আসিয়া পড়িতে লাগিল! তাঁহাব শান্তি নাই, প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল। সবকার বাহাদুব এই অত্যাচাবের প্রতিকার করিবাব নিমিত্ত অধ্যাপকের বক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে দুইটি লোক নিযুক্ত

করিয়া দিলেন। তাহারাও অধ্যাপকের ন্যায় চড় খাইতে লাগিল। ভূতের চড় তাহাদের গালেও আসিয়া পড়িতে লাগিল। অধ্যাপক পড়িতেছেন, এমন সময় আলোটা টেবিলের উপর হইতে দিব্য উপরে উঠিয়া গেল। তাহার পর যাইয়া ঘরের অন্য একটা স্থানে গিয়া রক্ষিত হইল। তিনি পড়িতেছেন, এমন সময় ফর্‌ফর্‌ করিয়া বইখানি ছিঁড়িয়া গেল, একেবারেই টুক্‌রা টুক্‌রা! তাহার পর ছেঁড়া টুকরাগুলি রাশীকৃত হইয়া তাঁহার পায়ের কাছে পড়িল। তিনি হয় তো কোন একটা পাতা খুলিয়া বক্তৃতা করিতেছেন—ব্যাখ্যা করিয়া দিতেছেন, সেই সময় ঐ অত্যাচারী ভূতটা তাঁর সেই পাতাখানি ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। অধ্যাপকের আর নিস্তার নাই; বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। তখন নিজে নিজে মাথার উপরে তরবারি ঘুরাইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন বা অন্য কেহ তাঁহার মাথার উপর তরবারি ঘুরাইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। টেডওয়ার্থবাসী ব্যক্তির উপরেও না কি অনেকটা এইরূপ অত্যাচারই হইয়াছিল। অধ্যাপক স্কুপার্ট বক্তৃতাপ্রসঙ্গে এই সব ব্যাপার বলিযাছিলেন। তাঁহার কথা সকলেই বিশ্বাস কবিয়াছিল। মিসেস ক্রো প্রণীত "প্রকৃতির নৈশ দিক" নামক গ্রন্থেব ৪২৯-৪৩০ পৃষ্ঠায় গল্পটি সন্নিবেশিত আছে।

ঐ শেষোক্ত গল্পগুলি পড়িলে মনে হয়, ভূতেরা বদমায়েসী করিয়াই লোককে কষ্ট দিয়াছিল। টেডওযার্থে বাদকের বেলায় শুনা গিয়াছে, একটা জীবিত লোক না কি সয়তানী কবিয়া ঐ সব কাণ্ড কবে। কিন্তু মম্পেসন নামধাবী সেই বাদক সে কথা স্বীকাব করে না। আমবা শুনিয়াছি সেটা ভূতের কাণ্ড নহে, অথচ মম্পেসন্‌ বলে, সেটা ভূতই। অধ্যাপকেব ঘটনায অত্যাচারীটা মানুষ কি ভূত, তাহা জানা যায় না, আব অত্যাচার-উৎপীড়নেব কাবণইবা কি, তাহাও বুঝা যায না। অধ্যাপক নিজে হয় তো অত্যাচারেব কারণ জানিতেন; কিন্তু তিনি তাহা প্রকাশ কবেন নাই। তাঁহার মাথার উপব তরবারি ঘুবাইবাব কথাটায় একটু তথ্য পাওয়া যায। মনে হয়, ভূতটা তাহা হইলে স্থূলদেহ ধাবণ করিয়া অত্যাচার কবিতে আসিত। তাই তরবাবি দ্বারা তাহাকে নিবারণ করা হইত। নচেৎ সূক্ষ্ম দেহে থাকিলে তাহাকে তববাবিব আঘাত-ভয কবিতে হইবে কেন? স্থূল অস্ত্রে সূক্ষ্ম-দেহেব কোন ক্ষতিই হইতে পারে না।

ভূতেরা কোন কোন সময় ঘন্টার ধ্বনি করিয়া থাকে

কখন কখন ভূতেরা ঘবের মধ্যে ঘন্টা বাজাইবাব শব্দ করিয়া থাকে। ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে সাফোক্‌ জেলায় উডব্রিজ শহবের কাছে "গ্রেট বিলিংস" পল্লীতে এই বকম একটা ঘটনা ঘটে। মেজর মুব বিবরণটি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি "বয়াল সোসাইটি" নামক সভার সভ্য ছিলেন। তিনি হিন্দুর "একেশ্বরবাদ" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহাব পুস্তকখানির কথা অনেকে না জানিলেও সেখানি খুব বিখ্যাত বই। বইখানির নাম—"বিলিংস গ্রামেব ঘন্টাধ্বনি।" তিনি বলিযাছেন, ঐ স্থানে একটা ঘরে ৫৩ দিন ধরিয়া মাঝে মাঝে ঘন্টার শব্দ হইতে থাকে, কে যে সেই শব্দ কবিতেছে, তাহা জানা যায় না। তিনি বিশেষ অনুসন্ধান কবিয়া দেখিলেন যে, ঐ ব্যাপারের মধ্যে কাহারও সয়তানী নাই, ওটা কোন দুষ্ট লোকেব কৃত নহে। তখন সংবাদ-পত্রে এই কথা লিখিলেন। এ সম্বন্ধে কেহ কিছু নূতন ব্যাখ্যা দিতে পারে কি না, এইটা জানাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সংবাদটি সংবাদপত্রে প্রচাবিত হইল বটে, কিন্তু কোন তথ্যই কেহ জানাইতে পারিল না। মাত্র এইটুকু জানা গেল যে, এরূপ ঘটনা আবও অনেক স্থলে অনেক সময় ঘটিয়াছে। ১৪ জন তাঁহাকে ১৪ খানি পত্র লিখিয়া জানাইল যে, এরূপ ঘটনা সম্প্রতি তাহাবাও জানিয়াছে। তাহারা লিখিল আমরা নিজেরাও এরূপ ব্যাপাব স্বচক্ষে দেখিয়াছি; আপনি

আমাদেব নাম প্রচার কবিতে পারেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। ঐ পত্র পড়িয়া জানা গেল—এক স্থানে ১৮ মাস ধরিয়া ঘন্টার শব্দ হয়; আর একটা জায়গায় মাত্র ২॥০ ঘন্টা শব্দ হইয়াছিল। “বিতর্কভূমি” নামক পুস্তকের ২৪১ পৃষ্ঠায় মিঃ আর. ডি. আউয়েন এরূপ একটা গল্প লিখিয়া গিয়াছেন। একটা ঘন্টা বাজিয়া বাজিয়া বড়ই বিবক্ত করিত। তাই কাপড় ও দড়ি দিয়া খুব শক্ত করিযা বাঁধিয়া রাখা হয়। যাহাতে বাজিতে না পাবে, এমন করিয়াই শক্ত কবিয়া বাখা হইয়াছিল। কিন্তু কবিলে কি হইবে? ভূতের কাণ্ডই অদ্ভুত। ঘন্টা আবও জোরে জোরে আগেকার অপেক্ষাও ভয়ানক শব্দে বাজিতে লাগিল। শেষে ভূতটা ঘন্টাটা ছিঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। মাটীতে পড়িয়াও ঘন্টা বাজিতে লাগিল। চমৎকার ব্যাপার! “প্রকৃত ভূতের গল্প” নামক পুস্তকেও ঠিক ঐ বকম একটা গল্প আছে। সেটা ১৮৯১ খৃস্টাব্দে ঘটে। এই ব্যাপারে শুধু ঘন্টা বাজা নহে, আরও কাণ্ড হইয়াছিল। আলোগুলি সব নিভিয়া যায়, তাহা ছাড়া ভূতটা সয়তানী করিয়া কতকগুলি কাপড-চোপড স্নান কবিবার ঘরেব মধ্যে ছিঁড়িযা ফেলিযাছিল।

* * * *

কোন মতলব নাই, অথচ অনেক ভূত দেখা দিয়া থাকে।

মহাত্মা বাকের বীণা-যন্ত্র

“বিতর্কভূমি” নামক পুস্তকেব ৩২৫ পৃষ্ঠায মিঃ আর ডি আউযেন মহাত্মা বাকেব বীণাযন্ত্র সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিযাছেন। গল্পটি বেশ একটু মজাব ধবনেব। বাকেব দাদামহাশযেব পিতা খুব ভাল গান বচনা কবিতে পাবিতেন। বাক্ ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে একটি ভাল বীণা কিনিলেন। ভাল হইলেও পুবাতন। তাহাতে সন লেখা ছিল—১৫৬৪। যে দিন কিনিলেন, ঠিক তাহাব পবদিনই তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে এক জন সুন্দব, সুশ্রী তাঁহাব কাছে আসিযা যেন বলিতেছে—“ওটি আমাব জিনিস, ফ্রান্সেব বাজা তৃতীয হেনবী আমাকে উহা দিযাছিলেন। বাজা একটা নূতন সুরেব গান বচনা কবিযাছিলেন, তিনি সেই গানটি যন্ত্রে বাজাইতেন, উহার সাহায্যে গানটি মনে কবা যায।” এই যন্ত্রটি সেকেলে জিনিস, চাবি দিযা আটকানো যাইত, এখন আব প্রচলিত নাই।

মিঃ বাকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখনও সেই করুণ বসের গানেব ভাবটা তাঁহাব মনে ছিল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বাত্রি দুইটা। তিনি আবার ঘুমাইযা পডিলেন। সে রাত্রিতে আব স্বপ্ন দেখিলেন না। কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে উঠিযাই যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়ে তাঁহার মুখে আর কথা সরিল না। কি অদ্ভুত কাণ্ড! তিনি দেখিলেন যে, তাঁহাব বিছানার উপরে গান-লেখা একখানা কাগজ পডিযা বহিযাছে। স্বপ্নে যে গানেব কথা, সুবেব কথা দেখিযাছিলেন, এটি সেই গান, সেই সুর। এখনকার দিনে যে সঙ্কেতে গান লেখা হয়, এ সে সঙ্কেত নহে। গানেব সঙ্কেত ও শব্দযোজনা সব সেই প্রাচীনকালেব মত। ঘুমেব ঘোবে তিনিই ঐ গানটি লিখিযা ফেলিলেন, কি সেই স্বপ্নেব ভূতটা লিখিযা দিযা গেল, তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির কবিতে পাবিলেন না। গানটি দেখিলে সেকালেব একটা ভাল নমুনা পাওযা যায়। যাঁহাবা খুব পুরাকালেব আলোচনা কবেন, গানটা তাঁহাদের কাছে খুব একটা মূল্যবান জিনিস।

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পবে তিনি একা পেন্সিল লইয়া বসিলেন। তাঁহার ঘাডে সেই ভূতটি আসিয়া চাপিল। ভূতটি তাঁহাব হাত দিযা কযেকটা কথা লিখাইল। লেখায় ব্যক্ত হইল যে, ‘ঐ পুবাতন যন্ত্রটিব মাঝে এক টুকবা কাগজে একটা গান আছে, গানটি রাজা নিজের হাতে লিখিযাছিলেন। গানটি এই বলি' গান যথাযথ লিখিযা দিল। জ্ঞান হইলে, বাক্ খুঁজিযা দেখিলেন

যে, বাস্তবিকই ঐ গান-লেখা একখানি কাগজ সেই যন্ত্রের মধ্যে রহিয়াছে। যে স্থানটিতে ঐ কাগজ-টুকরা ছিল , ভূতটা তাহা বলিয়া দেয়, আর ঠিক সেইখানেই উহা পাওয়া গেল।

অচেতন অবস্থায় ভূতের সাহায্যে পেন্সিল দিয়া গানটা আগেই তিনি লিখিয়াছিলেন। এখন বাজার নিজের লেখাও পাওয়া গেল। তাৎপর্য অংশটা এক, কিন্তু দেখা গেল, গানের কথাগুলা একরকম ভাবে সাজান নহে, তাহা হইলেও ভূতের কথাটার উপর খুব বিশ্বাস জন্মিল। এই ব্যাপার লইয়া প্যারিস শহরে তখন হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বাকের বন্ধুবান্ধবেরা যেখানে-সেখানে এই কথার গল্প-স্বল্প করিতে লাগিলেন। ক্রমে ব্যাপারটি সংবাদ-পত্রেও প্রচারিত হইয়া পড়িল। গানটি তখন খুব ছড়াইয়া গেল। অনেকে গানটি এক এক খণ্ড কিনিযাও রাখিল।

পৃথিবীতে দেখা যায়, যে, যে রকম-লোক, তাহার সঙ্গে সেইরূপ লোক দেখিয়া করিয়া থাকে। এটাও কতকটা সেই ভাবের দেখা করা। বাক্ নিজেও গান-বাজনা ভালবসিত, আবার ভূতটাও গান-বাজনা-জানা এক রকম স্বভাব, তাই দেখা দিযা বসিল। বাকের সঙ্গে ভূতের এই দেখা করা ব্যাপারটিতে ভূতের একটা উদ্দেশ্য বুঝা যায় না। তবে যাঁহারা ভূতের তত্ত্ব খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহাদের কাছে এই গল্পটি মূল্যবান; এটি ভূতের অস্তিত্ব বিষযে একটা খাঁটি প্রমাণ। ভূতটা যে বহুকাল ধরিয়া ভুবর্লোকে ছিল, ইহারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এত দিন ধরিয়া ভুবর্লোকে থাকা খুবই অস্বাভাবিক। সাধারণতঃ লোক এত দিন সেখানে থাকে না। তাই বলিয়া এত দিন থাকাটাও অসম্ভবও নহে। লোকটির খুব স্ফূর্তির প্রাণ ছিল , আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়াইতে ভালবাসিত, ধর্ম-কর্ম বড় বুঝিত না, খুব উচ্চ অঙ্গের আশা-আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। তাই বোধ হয, তাহাকে ভুবর্লোকে এত দিন থাকিতে হইযাছিল।

এ রকম গল্প পড়িয়া আমাদের মনে হয, ভূতের দেখা করিবার কি আবশ্যক ছিল? সূক্ষ্ম-জগৎ হইতে তো ঐ যন্ত্রের সকল কথাই সে জানিতে পারে! ইহার পূর্বে ঐ নূতন সুর— নূতন গান সবই তো বাকের মনের মধ্যে জাগাইযা দিতে পারিত! সে রকম জাগাইযা দেওয়া সূক্ষ্ম-জগদ্‌বাসী ভূতের পক্ষে খুবই সহজ কথা। সুরটি খুবই সুন্দর। উহা জগতে প্রচার করিলে কত লোক তৃপ্তি পাইতে পারে। যাহারা গান-প্রিয, অথচ ভূত হইযা ভুবর্লোকে গিয়াছে এই নূতন সুর লোকের প্রাণে জাগাইয়া দেওয়া তাহাদের খুবই প্রীতিকর কার্য্য। তাই মনে হয়, সেই ভূতটা আগে এরূপভাবে বাক্‌কে সুরটি জানায নাই কেন? কেহ কেহ বলেন, সেরূপ করা না কি ভাল নহে; তাই জানায় নাই। কিন্তু ভাল নহে কেন, তাহা আমরা বুঝিতে পরি না। যাহা হউক, ভূতটা দেখা করিয়াও যখন সুরটি জানাইয়া দিল, তখন যে তাহার হৃদযটা ভাল, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের মনে হয, আরও আগে সুরটি জানাইযা দিলে খুবই ভাল হইত।

আমরা আর একটা গল্প বলিব। এক জন বড় ঘরের যুবতী মরিযা যাইবার পর প্রেতিনী হইয়া দেখা দিয়াছিল। দেখা দিবার মধ্যে তাহার কোন মতলব ছিল না, শুধু শুধু দেখা দিয়াছিল, আগেকার ঘটনার নয় বৎসর পরে এটা ঘটে। গল্পটি আমরা অনুসন্ধান-সমিতির কাছে জানিতে পারিয়াছি। গল্পটি মিঃ এণ্ড্রুজ ল্যাঙ্গের "স্বপ্ন ও ভূত" নামক পুস্তকের ৭৪ পৃষ্ঠায সন্নিবেশিত আছে।

প্রেতিনীর মুখে একটা আঁচড়ের দাগ

"কুমারী 'জি' ১৮ বৎসর বযসে ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে সেন্ট লুই নামক স্থানে হঠাৎ কলেরায মারা যায়। তাহার এক জন ভাইয়ের নাম—এফ্ জি। এই ভাইটি তাহাকে খুব ভালবাসিত। এক দিন এফ্ জি সেন্ট জোসেফ্ নামক স্থানে খুব কাজ-কর্মে ব্যস্ত ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যই তাহার কাজ।

মনিবদিগের চিঠি-পত্র অনেকগুলি লিখিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া এক দিন একটু বিশ্রাম করিতেছে; মুখে চুরুট; হাতের কাজ তখনও ফুরায় নাই, হাতে কলম আছে। এমন সময় তাহার মনে হইল, যেন তাহার বাঁ দিকে কে বসিয়া আছে, আর টেবিলের উপর যেন তাহার একখানা হাতও রহিয়াছে। তাহার মনে হইল, যেন তাহার বোন্ সেই কুমারী "জি"ই আসিয়াছে। তখনই সে বোন্‌কে স্নেহালিঙ্গন করিবার নিমিত্ত লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু কোথায় কুমারী! দেখিল, সেখানে কেহই নাই। যুবকের হাতের কলমে তখনও কালি, মুখে তখনও আগুনসুদ্ধ চুরুট, তখনও বোনের কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু কৈ, সে বোন্ কোথায়? বোন্ সেখানে না থাকিলেও যুবক তাহার মুখের ভাব, তাহার পোষাক, তাহার চোখের কাতর চাউনি, তাহার গায়ের লাবণ্য সবই দেখিয়াছিল। আর একটি জিনিস দেখিয়া সে অবাক্ হইল। সে দেখিল, কুমারীর গালে একটা লাল দাগ।

কুমারীর মৃত্যুর কথা যুবক জানিত না। তাই তাহার মনটা এই রকম দেখিয়া কেমন একরূপ হইয়া গেল। সে তখনই ট্রেনে উঠিয়া বাড়ী পৌঁছিল। বাড়ী যাইয়া মাতাপিতাকে কুমারীর কথা বলিল। তাহাব মরণের সংবাদও পাইল। পিতা শুনিযা বিশ্বাস করিলেন। কিন্তু মা শুনিয়া শোকে যেন কাতর হইয়া পড়িলেন। মনের বেগ একটু সামলাইয়া বলিলেন যে, মরণের পর তাহার দেহটাকে জুত-বরাত করিয়া রাখিবার সময় তাহার পোশাকেব একটা আলপিনের খোঁচায় গালে ঐ দাগটা হইয়া গিয়াছে। মবা মেয়ের গালে দাগ হওয়ার কথা সেই মা ভিন্ন আর কেহ জানে না। মা বলিলেন, সে দাগটাকে ঢাকিয়া দিবার জন্য তিনি পাউডার দিযা সে জায়গাটি মালিস করিয়াও দিয়াছেন। মা যুবকের কথায় খুব বিশ্বাস কবিলেন। ইহাব কিছুদিন পরে মাও মাবা গেলেন।

এ গল্পটি সত্য বলিয়া পরে যুবকের পিতার কাছেও জানা গিয়াছিল। "এস, পি, আর কার্য্যাবলী" নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের ১৭ পৃষ্ঠায় ইহাব বিবৃতি আছে।

এণ্ড্রুজ ল্যাংএর ঠিক এই বইখানি হইতে আমবা আব একটি গল্প উদ্‌ধৃত করিব। সেটিও বেশ সত্য ঘটনা; অনেক প্রমাণ-প্রয়োগও পাওয়া গিয়াছে। গল্পটি বেশ সুন্দরও বটে। সেটিতেও দেখা যায়, কোন মতলব নাই, অথচ ভূত আসিয়া দেখা দিয়া গেল।

সেনানী বার্টারের গল্প

সেনানী বার্টার সি, বি, ১৮৫৪ খৃস্টাব্দে ৭৫ নং সেনাদলের নিম্ন কর্মচারী ছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে মুরী নামক পার্বত্য স্থানে তাঁহাকে কার্যোপলক্ষে থাকিতে হইযাছিল। তিনি যে ঘরটিতে বাস করিতেন, অল্পদিন হইল, লেপ্‌ট্‌ন্যান্ট্ "বি" সেটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই "বি" ১৮৫৪ খস্টাব্দের ২ রা জানুয়ারী তারিখে পেশোয়ারে মারা পড়েন। যুদ্ধ আফিসে সৈনিক সেনানী প্রভৃতির মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায়। ঐ আফিসে অনুসন্ধান-ফলে জানা যায় যে, "বি" ঠিক ঐ ২ রা তারিখেই মারা যান। যে বাড়ীটির কথা আমাবা বলিতেছি, সেটি পাহাড়ের পার্শ্বে; বাড়ীর কাছ হইতে পাহাড়ের খুব উঁচু চূড়া উঠিয়া গিয়াছে; সেই চূড়ার দিকে একটা বড় রাস্তাও ঘুরিয়া উঠিয়াছে; সেই রাস্তাটি এই বাড়ী অপেক্ষা ৩/৪ শত গজ উঁচু, বাড়ীটি ঐ রাস্তার ঠিক নীচে। ঐ রাস্তা ছাড়া উপরে যাইবাব আর রাস্তা ছিল না। এই বাড়ী হইতে ঐ বড় রাস্তায় যাইবার নিমিত্ত একটা অশ্বারোহীর রাস্তা ছিল। অশ্বারোহী ভিন্ন আর কাহারও পদব্রজে তথায় চলিবার উপায় ছিল না। এই অশ্বারোহীর রাস্তাটি বড়ই দুরারোহ, খাড়া ভাঙ্গনের মত বলিলেও হয়। মিঃ বার্টারের এই বাড়ীটি হইতে ঐ দুর্গম রাস্তাটিতে উঠিতে হইলে অল্প একটু বাঁধের উপর দিয়া যাইতে হয়।

একদিন সন্ধ্যাকালে মিঃ ডীন ও তাঁর স্ত্রী মিঃ বার্টারের গৃহে বেড়াইতে আসেন। তাঁহারা রাত্রি ১১ টা পর্য্যন্ত গল্প-স্বল্প করিলেন। রাত্রিটা পূর্ণিমার রাত্রি। উঁহারা গল্প-স্বল্প করিয়া বাড়ী যাইবার সময় মিঃ বার্টার অশ্বারোহীর রাস্তার কাছ পর্যন্ত উঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। তাহার পর ডীন ও তাঁহার স্ত্রী সেই দুর্গম রাস্তাটি ধরিয়া উপরের দিকে উঠিতে লাগিলেন। বড় রাস্তা ধবাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। বার্টার খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া চুরুট খাইতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইটি কুকুরও ছিল। তাহার পর বাড়ীর দিকে ফিরিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, যেন কে অশ্বারোহীর রাস্তা দিয়া নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে, ঘোড়ার খুরের শব্দও তাঁহার কানে গেল। চাহিয়া দেখিলেন—প্রথমে একটা লম্বা টুপী, তাহার পর টুপী-পরা লোকটাও তাঁহার চোখে পড়িল। দেখিলেন, লোকটা একটা টাট্টু ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছে, সঙ্গে দুই জন এই দেশের চাকর। বার্টার বলিয়াছেন—'ঠিক এই সময় কুকুর দুইটি ভয়ে আমার কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে ডাকিতে লাগিল। সে দিন পূর্ণিমা, এত সুন্দর জ্যোৎস্না যে, সেই আলোতে খবরের কাগজ পর্য্যন্ত পড়া যায়। একেবারে দিনদুপুরের মত পরিষ্কার আলো। আমি সেই লোক তিনটিকে খুব ভাল দেখিলাম। উহারা ৮/১০ ফুট উঁচুতে ছিল। * * * ভোজন করিবার সময় যেরূপ পোশাক পরা হয়, অশ্বারোহীর গায়ে সেই পোশাক ছিল। ওয়েস্ট কোটটি সাদা; টুপীটিও লম্বাকৃতি তাহার ঘোড়াটি পাহাড়ী ঘোড়া; রং ধূসর, ঘাড়ে কাল কাল কেশর, লেজের চুলগুলিও কাল। লোকটি যেন অন্যমনস্ক হইয়া ঘোড়ার উপরে বসিয়া আছে বলিয়া মনে হইল, লাগাম যেন হাত হইতে ঝুলিয়া পড়িতেছে। সহিস দুই জনই যেন ঘোড়টিকে চালাইয়া লইয়া আসিতেছে, আর অশ্বরোহীকেও যেন রক্ষা করিতে করিতে আসছে, এইভাবে তাহারা আসিতেছিল।" মিঃ বার্টার জানিতেন, নীচে তাঁহারই বাড়ী ছাড়া আর যাইবার স্থান নাই। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে যায়, তোমরা কি চাও?" শুনিয়া লোক তিন জন দাঁড়াইল। তখন অশ্বারোহী ব্যক্তি দুই হাত দিয়া লাগাম কষিয়া ধরিল, তাহার পর পিছন ফিরিল। ফিরিবার সময় বার্টার দেখিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁহারই আগেকার কর্মচারী, অর্থাৎ সেই লেপ্‌ট্‌ন্যান্ট "বি।" বার্টার দেখিলেন—গায়ে যেন রক্তের লেশ নাই, মুখখানি যেন মরা মানুষের মুখ, কিন্তু দেহটা বেশ মোটা-সোটা, মাথায় চুলের ঝাপ্‌টা।

দেখিয়া মিঃ বার্টার খুব তাড়াতাড়ি তাহাদের দিকে যাইতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি যাওয়ার পায়ের নীচে হইতে মাটি খসিয়া গেল। তখন বার্টার পড়িয়া গেলেন। তাহার পর হামাগুড়ি দিয়া কষ্টেসৃষ্টে সেই খাড়া অশ্বারোহীর রাস্তায় উঠিলেন। যেখানে তিন ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন, ঠিক সেইখানেই গেলেন। যাইয়া দেখেন—কেহই নাই। তখন তিনি দৌড়িয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন—এক শত গজ পরিমাণ পথ দৌড়িয়া গেলেন। কিন্তু কাহারও সাড়া শব্দ পর্যন্ত নাই। বার্টার যখন এরূপভাবে যাইতেছিলেন, তাঁহার কুকুর দুটি গেল না। কুকুর দুইটি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিল যে, উহারা ভূত।

পরদিন বার্টার তাঁহার বন্ধু ডীনের সঙ্গে গল্প-স্বল্প করিতে করিতে লেপ্‌ট্‌ন্যান্ট্ "বি'র কথা পাড়িলেন। কথাপ্রসঙ্গে ডীন বলিলেন—লেপ্‌ট্‌ন্যান্ট বি মরণের আগে বিশ্রী মোটা হইয়াছিল। আর ব্যারামে যখন ভুগিতেছিল, তখন চুলের ঝাপ্‌টা হইয়াছিল, আমরা কাটিতে বলিলেও কাটিত না, বোধ হয়, সেই চুলের ঝাপ্‌টা সুদ্ধই তাহাকে কবর দেওয়া হইয়াছে।"

বার্টার 'বি'র টাট্টু ঘোড়াটার অবিকল বর্ণনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা, বি এই ঘোড়াটা কোথায় পান?"

ডীন বলিলেন—"বি" ওটা পেশোয়ারে কেনেন। অবিবেচকের মত এক দিন পাহাড় ধরিয়া নীচে আসিবার সময় ঘোড়াটা মারা পড়ে।"

এই ঘটনার পব মিঃ বার্টার ও তাঁহার স্ত্রী ঐ অঞ্চলে প্রায় ঘোড়াব খুবের শব্দ শুনিতে পাইতেন। তিনি জানিতেন, এটা "বি"র কাণ্ড! "বি"ই ভূত হইয়া ঐরূপ করিতেছে।

সেনানী বার্টাব এই গল্পটি ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে ২৮শে এপ্রিল লিখিয়াছিলেন। বার্টারের স্ত্রী ও মিঃ স্টুয়ার্ট গল্পটি সত্য বলিয়া প্রমাণ দিয়াছেন ; কেন না, যে বাত্রিতে বার্টার সেই ভূতের পিছনেই সাহস কবিয়া গিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি স্টয়ার্ট প্রভৃতির কাছে নিজের দুঃসাহসের গল্পটাও করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারও এ সব ব্যাপার জানিতেন। ভূতটার মোটা-সোটা হইবার কথা, আর তাহাব ঘোড়াটাব কথা মূল্যবান্ , কেন না, বার্টাব ঘোড়াকে কখনই দেখেন নাই, আর ভূত হইবার আগে লোকটি যে মোটা হইয়াছিল, তাহাও তিনি জানিতেন না। ওটা যে বাস্তবিকই ভূত, অবশ্য তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। ওটাকে ভূত বলিয়াই আমাদের মনে হয় না। বার্টারের সঙ্গে ওরূপভাবে দেখা করার কোন কাবণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মরণের পর বোধ হয়, উহার মনে এরূপ একটা চিন্তা আসিয়াছিল যে, যেন ঐ অশ্বারোহীব পথ দিয়া ঘোড়ায চড়িয়া দুই জন সহিসের সঙ্গে সে বাডীর দিকে আসিতেছে। জীবিতকালে লোকটি ঐরূপভাবেই আসিত। মরণের পরও সে চিন্তা গেল না। তীব্রভাবে বাড়ী আসার ভাবনা ভাবিতে লাগিল। তাই তাব ঐ দশা। তা ছাড়া মবণের আগে লোকটির স্বভাবচবিত্র ভাল ছিল না, ধর্মের ভাবনা এক দিনও ভাবে নাই, তাই মবণের পর ভুবর্লোক তাহাব কাছে বড়ই কুস্থান বলিযা বোধ হইতে লাগিল। কাজে কাজেই বাড়ী আসিবার চিন্তাই তাহাব মনে আসিয়াছিল। আর বাড়ী আসিবার ভাবনাটা সে এতই ভাবিযাছিল যে, সেই ভাবনা হয় তো স্থূলমূর্তি ধবিযা দেখা দিয়াছিল। আগে যে গল্পটি বলা হইয়াছে, সেই সেন্ট জোসেফ্ নামক স্থানে যে প্রেতিনীটা মুখে আঁচড় দেওযা মূর্তিতে ভাইযের সঙ্গে আসিযা দেখা করিয়াছিল, সেটাও ঐরূপ তীব্র চিন্তার মূর্তি বলিযাই মনে হয়। সেও মবণের আগে তাহার ভাইয়ের কাছে ঐরূপ ভাবে প্রাযই বসিত, ভাইও তাহাকে খুব ভালবাসিত। তাই মরণের পরও সেইরূপ আদরে সোহাগে স্নেহে বসিবার কল্পনাটা তাহাব মনে আসিযাছিল, আব খুব তীব্রভাবেই সে ইচ্ছাটা হইয়াছিল। তাই সে ইচ্ছা স্থূল-মূর্তি ধরিযা তাহাব ভাইয়ের চোখে পড়িল।

বার্টারের গল্পে আরও লক্ষ্য কবিবার বিষয় আছে। ঘোড়ার সহিস প্রভৃতি আনুসঙ্গিক মূর্তিও ভূতের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। নিজে মূর্তি ধবিয়া দেখা দেওযাই শক্ত কথা, তাহাব পর দুইটি সহিসের মূর্তি, আর ঘোডার মূর্তি গডাইযা তোলা নিতান্ত সহজ কথা নহে। ভূতেবা এরূপ না করিতে পারে, এমন নহে। কিন্তু এ স্থলে ঐগুলি আদৌ ভূতের বলিয়াই মনে হয় না। আর যদি ভূতের কাণ্ডই হয়, তবে অতটা মূর্তি ধবিবাবই বা প্রয়োজন কি? একটা মূর্তি ধরিয়া আসিলেই ত যথেষ্ট হইত। তাই আমাদের মনে হয়, ওটা আদৌ ভূতেব কাণ্ড নহে। ওটা খাঁটি চিন্তামূর্তি। আবার মনে হয়, ঘোড়াটা মবিয়া গিয়াছিল, ঘোড়াটা যদিও ভূত হইয়া মনিবের কাছে থাকিতে পারে, সহিস দুই জনেব ভূত হইয়া মনিবের কাছে ঘুবিযা বেড়ান সম্ভব নহে; কেন না, যে মরিয়া গিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। জীবিতকালে এ দেশীয় সহিস সর্বদাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। তাই মরণের পব বাড়ী আসিবাব ভাবনা ভাবিতে সহিসেব কথাও মনে আসিয়াছিল। এইটিই যুক্তিসঙ্গত কথা। ভারতবর্ষে অনেক সহিস-ভূত আছে স্বীকার করি। কিন্তু মরণের পরও তাহারা মনিবেব চাকবী করিতে আসে, তাহাব কোন প্রমাণ বা সম্ভাবনা নাই।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

নূতন রকমের ভূত

ভূতেবা সব সময়েই যে পুরোপুরি দেহটা ধরিয়া থাকে, তাহা নহে। কোন সময় বা শুধু মাথাটা, কোন সময় বা শুধু একখানা হাত, এইরূপ শরীরের খানিক অংশ মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে। এই বকম খানিকটা মাত্র দেখা দেওযাব ব্যাপারও অনেক ঘটিয়াছে। রেভারেণ্ড এলীন্ টমাস্ এই বকম একটা বীভৎস গল্প লিখিয়াছেন। গ্রীষ্মকাল, এক দিন সন্ধ্যাবাত্রে তখন নযটা বাজিতে আব ২০ মিনিট আছে, এমন সময তিনি দক্ষিণ ওয়েল্‌স্ প্রদেশে ল্যাংনীর নামক স্থানের কাছে বেড়াইতেছিলেন। সেই সময় একটা ভূতেব মাথা তাঁহার চোখে পড়িল। সেটা একটা ভয়ানক কাণ্ড। তাহার নিজের কথাই আমরা নিম্নে লিখিতেছি ঃ—

"আমি বেড়াইতেছিলাম। একবার মুখ ফিবাইয়া দেখি যে, আমার মুখেব একেবারে কাছে শূন্যে আব একখানি মুখ ঝুলিতেছে। মুখখানি বুড়া মানুষের, তাহাতে একটি দাঁতও নাই, ঠোঁট দুখানা খুব পাতলা, অল্প একটু হাঁ কবিয়া আছে, মুখে রক্তেব লেশও নাই, সমস্ত মুখখানিব উপব কোঁচকান দাগ। গালদুইটি তুবড়িয়া গিয়াছে, চোখ দুইটি যেন একেবারে গর্তে পড়িয়াছে, কিন্তু খুব ঝক্‌ঝকে, তাহাতে যেন অন্তর্ভেদিনী দৃষ্টি! সেই বিশ্রী মুণ্ডটিতে আবার দুই টুকরা ছিটের কাপড় বাঁধা। টুকবা দুইখানা হলুদ রঙের। একখানি টুকরা থুতনীর নীচে দিয়া গালের উপর দিয়া মাথার উপরে বাঁধা। আর একখানি বেড়িয়া মাথার পিছনে বাঁধা।

"ঐ বকম ধড়াচূড়া-বাঁধা বিশ্রী মুখখানা দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। আমার ঠ্যাং-এ যত জোব ছিল, তত জোরে একটা ভোঁ দৌড় দিয়া আমি একেবারে প্রায় ৬০ গজ দূরে পালাইলাম। তাহার পর একটু দাঁড়াইলাম। ভাবিলাম, সেই ভয়ানক মুখখানাকে কতটা তফাতে ফেলিযা আসিয়াছি, একবার দেখি। এই ভাবিয়া ফিরিয়া চাহিলাম। চাহিবামাত্র দেখি—মুখখানা তখনও আমার মুখের কাছেই রহিয়াছে। এত ছুট দিয়া পালাইয়াছি, তবুও দেখিলাম, উহার কাছ হইতে এক আঙ্গুলও দূরে আসিতে পারি নাই। তখন আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম, আমার আর কথা সরিল না।'

মিঃ টমাস্ ত ঐরূপ দেখিলেন। তিনি আবার খানিকটা দৌড়িলেন। দৌড়িয়া আবার ফিরিয়া দেখিলেন। সেবার দেখিলেন, মুখখানা দ্রুতবেগে তাঁহাব কাছ হইতে গির্জার কাছে গেল, তারপর গির্জার বাড়ীর প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া একটা নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া পৌছিল। তাহার পর আর দেখা গেল না। যে স্থানটিতে উহা মিলাইয়া গেল, সেখানটা তিনি চিনিয়া রাখিলেন। তিনি যে বাডীতে থাকিতেন, সেখানে যাইয়া এই ব্যাপার বলিলেন। মুখের বর্ণনা শুনিয়া বাড়ীওলা ভূতটাকে চিনিয়া ফেলিল। বলিল—ও একটা বুড়ো সন্ন্যাসী ভূত, ১৫ বৎসর হইল ও মবিয়াছে। যে স্থানে টমাসের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, তার নিকটে একখানি কুঁড়ে ঘরে ও বাস করিত, আর যেখানে মিলাইয়া গেল, সেখানে উহার গোর হইয়াছে। "প্রকৃত ভূতের গল্প" নামক পুস্তকের ২০০ পৃষ্ঠায় এই ঘটনার আরও বিশদ বর্ণনা আছে।

বুড়ো মানুষের মুখ স্বভাবতঃই বিশ্রী হয়, আর ঐ ধড়াচূড়া-বাঁধা থাকায় আরও বিকট হইযা উঠিয়াছিল। নচেৎ টমাসের ভয় পাইবার মত কিছুই ছিল না। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

টমাস পুরোহিত ছিলেন। ভূতটা হয় তো মনে করিয়াছিল যে, তিনি তাহাকে উপদেশ দিতে বা কোন রকম সাহায্য করিতে পারিবেন। তাই মনে করিয়াই হয় তো সে ঐ রকম ভাবে দেখা দিল। কিংবা এমনও হইতে পারে যে, জীবিতকালে বহুদিন মানুষের কাছে থাকায় সে মানুষের সঙ্গটা বড়ই ভালবাসিয়াছিল, তাই মরণের পর আবার মানুষের কাছে একটু থাকার খেয়াল জাগিয়া উঠিল। সেই জন্যই সে খানিকটা সময় টমাসের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিল।

"প্রকৃত ভূতেব গল্প" পুস্তকে ১৫৩ পৃষ্ঠায় আব একটি ঐ রকম ভাবের গল্প দেখিতে পাওয়া যায়। সে-ও একটা শুধু মুণ্ডের কথা। কিন্তু সে মুণ্ডটা আরও ভয়ানক। আর সেই মুণ্ডটা যে কেন দেখা দিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। গল্পটা স্টেড সাহেব ব্রোক্লি নিবাসিনী জনৈক ভদ্রমহিলার কাছে শুনিয়াছিলেন। ব্যাপারটা এই ঃ—

একটা রাক্ষস ভূত

"গ্রীষ্মকাল। একদিন শনিবাব সন্ধ্যা আটটার সময় আমি বাড়ীতে একাই ছিলাম। আমার দুটি ছেলেও বাড়ীতে ছিল বটে, কিন্তু তাহারা সে সময় স্নানের ঘরে গিযাছিল। তাহাদের বয়স ৮/৯ বৎসর। স্নানের ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিয়া আমি সিঁড়ির উপরে ছোট ঘরটিতে গিযা ভাবিতেছি—যাই, নীচে যাইয়া অমুক জিনিসটি আনি গে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আমি একবার উপরের দিকে চাহিয়াছি। চাইয়াই যাহা দেখিলাম, তাহাতে হতবুদ্ধি হইযা গেলাম। কি ভযানক! সিঁড়ির কোণ হইতে প্রায় ৪ হাত তফাতে আমাব মাথার উপরে ৫/৬ ইঞ্চি দূবে একটি অদ্ভুত রকমের আলো। আলোটা আমার সম্মুখ দিকে। আমি ভাবিলাম, হয তো কোন দিক্ হইতে অন্য একটা আলোর প্রতিবিম্ব ওখানে আসিয়া পড়িয়াছে। তাই চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম—কোন দিকেই আর আলো নাই। সিঁড়ির ছাদটা খুব উঁচু বলিয়া সিঁড়িতে স্বভাবতই অন্ধকার হইত না, আলো জ্বালিযা দিবাবও প্রয়োজন ছিল না।

"আমি আবার আলোটার দিকে চাহিয়া খুব ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কথাগুলি বলিতে আমার যে সময় লাগিতেছে, তদপেক্ষা খুব কম সময়ের মধ্যেই দেখিলাম যে, ঐ আলোটা আস্তে আস্তে একটা মুখ ও মাথা হইযা উঠিল; মুখের রংটা হলুদ ও সবুজে মিশানো; মাথাটায় বিপুল জটার রাশি। দেখিলাম—মুখখানি খুব চৌড়া, সাধারণ মানুষের মুখের অপেক্ষা অনেক বড়, চোখ দুটি খুব ড্যাপা ড্যাপা, চোখের মণি সবুজবর্ণ, গালের রং হলুদবর্ণ ; মুখে দাড়ি-গোঁপ নাই। এইরূপ একখানা মুখ—শুধু মুখ দেখা গেল। শরীরেব আর কোন অবযব নাই, শুধু ঐ বিশ্রী বীভৎস একখানা মুখ! মুখখানা বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম—মুখে বিশ্রী একটা সয়তানী ভাব প্রকাশ পাইতেছে। মুখখানা একদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়াছিল। তখন আমার খুব ভয় ও বিস্ময় দুই-ই হইল। ভয় হইল বটে, কিন্তু আমি বুদ্ধি হারাইলাম না। মূর্তিটার দিকে চাহিয়াই আমি বলিলাম—'খৃস্টেব দোহাই দিয়া আমি বলিতেছি, তুমি চলিয়া যাও।' এই কথা বলিবামাত্র সেই সয়তানী মাখান মুখখানা মিলাইয়া গেল। তাহার পর ওটা আমার চোখে আর পড়েনি।

যে মহিলা এই বিবরণটি স্টেড্ সাহেবকে দিয়াছিলেন, তিনি নিজেই বেশ একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। যাহারা কিছু মানিতে চাহে না, তাহারা ঐ কৈফিয়ৎটা শুনিলে কতকটা নিরুত্তর হইয়া থাকিবে। সেই ভূত-দেখা মহিলা এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—"যাহাদের যকৃতের দোষ আছে বা যাহারা পিত্তপ্রধান লোক, তাহাদের ভয় বেশী; তাহাদের দৃষ্টিভ্রমও ঘটিতে পারে। আমার কখন

পিত্ত-দুষ্টি ঘটে নাই বা যকৃতের দোষও নাই! আমি সংযমসমিতির লোক, সকলেই জানে, আমার মনের বল খুব বেশী।" মিঃ টমাস অপেক্ষা এই স্ত্রীলোকটি যে সাহসী, তাহাতে সন্দেহ নাই। টমাস যে মুখখানা দেখিয়াছিলেন, সেখানার অপেক্ষা এ মুখখানা সর্বাংশেই খুব বেশী ভয়ানক। টমাস ভোঁ দৌড় দিয়া পালাইয়াছিলেন, আর এই স্ত্রীলোকটি শান্তভাবে মুখখানার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিলেন। ইনি নিশ্চয়ই বেশী সাহসী।

এই ব্যাপারের দুইটি ব্যাখ্যা আমাদের মনে আইসে। এটা হয় তো আদৌ কোন মানুষের মুখ নহে। বোধ হয়, এটা একটা চিন্তা-মূর্তি। অনেক কবি, অনেক লেখক তাঁহাদের পুস্তকের মধ্যে কত রকম বীভৎস মূর্তি কল্পনা করিয়া চরিত্র আঁকেন, অনেকে সেই সব লেখা পড়িয়া সেই সব মূর্তির চিন্তা করেন। সেই সব চিন্তা মূর্তি ধরিয়া সূক্ষ্ম-জগতে বাস্তবিকই বিচরণ করিয়া বেড়ায়। হয় তো ঐ মহিলাটি ঐ রকম কোন একটা মূর্তির বিষয় পড়িয়াছিলেন, পড়িবার পর তিনি মূর্তিটা হয় তো ভাবিয়াছিলেন, এখন তাই দেখিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ঐ স্থানেই বা ঐ মূর্তি আসিল কেন, কেমন করিয়াই বা আসিল, আর দেখা দিবার মত স্থূলরূপই বা কেমন করিয়া ধরিল, স্থূলরূপ ধরিবার শক্তি কোথা হইতে পাইল, আর ঐ মহিলাই বা সূক্ষ্ম-জগতের দেখিবার শক্তি কেমন করিয়া লাভ করিল। এ সকল কথার উত্তর দেওয়া যায় না। গল্পটা আমরা যতটুকু জানি, তাহাতে ঐ সকল কথার উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সকল কথার উত্তর দিতে না পারিলেও আমাদের দৃঢ় ধারণা এই যে, ঐ মুখখানি চিন্তামূর্তি ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। আবার আর এক রকমের ব্যাখ্যাও আছে। হইতে পারে, মূর্তিটা কোন রাক্ষস-শ্রেণীর জীবের। হয় তো ঐ সব জীব বিশেষ কারণ ব্যতীত মানুষের চোখে পড়ে না। আর চোখে পড়াও যেন ভগবানের ইচ্ছা নহে। এখন যেখানে আট্‌লান্টিক মহাসমুদ্র রহিয়াছে, বহুকাল পূর্বে সেখানে আট্‌লান্টিস্ নামক একটা মহাদেশ ছিল। দেশটা কালক্রমে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেই আট্‌লান্টিস্ মহাদেশে অনেক তথ্য এখনও জানিবার উপায় আছে। সেই দেশে, তখনকার লোকের মধ্যে নাকি এই রকম ভয়ঙ্কর জীব দেখা যাইত। ইহাদের দ্বারা নাকি বিস্তর অনিষ্টও তখন হইয়া গিয়াছে। তাহার পর প্রাচীন কালের পুস্তকাদিতেও এই রকম জীবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ রকম জীবের অনেক গল্পসল্পও প্রচলিত আছে, দৈত্য-দানবের কথা আজও চলিয়া আসিতেছে। অনেকে না কি অনেক দৈত্য-দানব দেখিয়াছেন। এইরূপ জীবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল। ইহদের সঙ্গে দেখা হইলে তাহার ফলে অনিষ্টই হইয়া থাকে। ঐ মুখখানির যেরূপ বর্ণনা শুনা গেল, তাহাতে উহাকে ঐ দৈত্যদানব রাক্ষস-শ্রেণীর জীব বলিয়াই ধারণা জন্মে। দৈত্যদানব ভাবিয়া লইলেও আমাদের একটা কথা মনে আসে। মনে হয়, সহরতলীর শান্তিময় কুটীরে হঠাৎ ঐ রকম একটা রাক্ষস আসিয়া হাজির হইল কেন? এ রকম ভাবে আসার কারণটা বুঝিয়া ওঠা খুব কঠিন। তাই মনে হয়, ওটা সম্ভবতঃ চিন্তা-মূর্তি। চিন্তা-মূর্তি হইলেও একটু অদ্ভুত রকমের মূর্তি। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, স্ত্রীলোকটি একটু ধৈর্য্য না ধরিয়াই খৃষ্টের দোহাই দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ঐরূপ না করিলে হয় তো আরও তথ্য জানা যাইত। অনুসন্ধান-সমিতির লোকেরা ঐরূপ মূর্তি দেখিলে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করিতে পারেন।

কখন কখন ভূত সর্বদাই দেখা দিয়া বিরক্ত করিয়া তোলে

যাহারা একটু সহজ-বিকারী লোক, যাহারা সহজেই উৎফুল্ল হয়, সহজেই দুঃখিত হয়, কাতর হয়, এই রকম লোকের ঘাড়েই বেশী ভূত আসিয়া চাপিয়া বসে। ভূতে তাহাদিগকেই বেশী

ধরে। মবণের পর স্থূল জগতের সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার জন্য অনেকে ঐরূপ লোকের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকে। যার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, সে বিবক্ত ও জ্বালাতন হইয়া উঠে। সাধারণতঃ ভূতেরা আসিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করে, কখন কখন দরজা প্রভৃতির গায়ে খুব ভয়ানক ধাক্কা মারে, কখন কখন সড় সড় শব্দ করে, কখন কখন বা ফুস ফুস করিয়া কথা বলে। খুব বেশী সময় ভূতেরা এতটাই করিতে পারে। ইহার অপেক্ষা বেশী জানাইবার ক্ষমতা তাহাদের.হয না। কিন্তু কখন কখন তাহারা একখানা হাত প্রকাশ কবিযা বসে; হাতখানা স্থূল করিয়া শক্তিশালী কবিযা তোলে। সেই হাতে বেশ শক্ত করিযা কোন কিছু ধরিতেও পারে। যাঁহাবা ভূতের বৈঠকে যাওযা-আসা করেন, তাঁহাদের অনেকেরই সঙ্গে ভূত ফিরিযা থাকে। বৈঠকে অনেক ভূত আসে। তাহারা বৈঠকী-ভূত। মরণের পর যে সকল ব্যক্তিকে স্বার্থপর বলিযা মনে হয, আব যাহাবা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই আবার পৃথিবীতে জন্মাইতে চায়, তাহাদিগকে বৈঠকী-ভূতেরা বৈঠকে আসিতে দেয় না। বৈঠকের লোকের মধ্যে যাহাব ঘাড়ে ভূত আসে, বৈঠকী-ভূত তাহাকে খুব পাহারা দিয়া রক্ষা করে, কিন্তু অন্যান্য লোকগুলিব উপর সব সময ততটা চোখ রাখিতে পারে না। তাই অপর স্বার্থপর ভূত বৈঠকের অন্যান্য সহজ-বিকারী লোকের পিছন লয়। মনে করে, তাঁহাদের দ্বারা ইচ্ছামত কাজ সাধন করিয়া লইবে। এইরূপ ভাবের একটা গল্প "ভূত ও স্বপ্ন" পুস্তকের ২৬৬ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি ঐ ঘটনাটি দেখিযাছিলেন, তাঁহাব কথাগুলি যথাযথ আমরা তুলিযা দিলাম। তাঁহার কথাগুলি এই ঃ—

ভূত কুকুর হইয়া আসিয়া আবার স্থূল হাতে বিছানা টানিল

"ভূতের বৈঠকে ৩/৪ দিন বসিবাব পবই আমাব বন্ধু বোল্টাব কেমন এবকম হইযা উঠিল। সে আর ঘবে একা শুইতে চায় না। দুইজনে একই বিছানায শুইলাম, অনেক বাত্রিতে আমাব ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গায় দেখিলাম, যে, ঘবেব মধ্যে বিশ্রী গোলমাল হইতেছে, আব কে যেন হুটাপুটি কবিযা বেডাইতেছে। দেখিলাম ঘরেব দরজাটাও খোলা। পূর্ণচন্দ্রেব কিবণ ভিতবে আসিয়া পড়িতেছে। ঘবেব মধ্যে ঠিক যেন দিন হইযা উঠিযাছে। চাহিয়া দেখি, ঘবেব মধ্যে ৪/৫ টা বড় বড় কাল কুকুব! কুকুরগুলিব লম্ফঝম্প দিযা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। একটা আমার বিছানাব উপরে চড়িয়া বসিল, আব একটা আমার নাকেব সঙ্গে তাহার নাকটা ঘষিয়া দিল। দেখ কাণ্ড! আমি কুকুর বড ভালবাসিতাম। যেখানে ভালবাসা, সেখানে ভয়ও কম। তাই অতগুলি কুকুব দেখিয়া আমার ভয হইল না। আমি উঠিয়া, কুকুবগুলিকে তাডাইয়া দিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। তাহার পব আবার শুইযা পডিলাম। আমি ভাবিযাছিলাম যে, ঐগুলি সত্য সত্যই কুকুব। উহারা যে ভূত, তাহা কখনই ভাবি নাই।

"শুইবামাত্র আমি আবাব ঘুমাইয়া পডিলাম। খানিক পবে আবার ঘুম ভঙ্গিয়া গেল। দেখি—কে যেন বিছানার কম্বলখানা ধবিয়া টানিতেছে। আমাব মনে হইল, আমাব পিঠেব নীচে থেকে কম্বলখানা শুড়শুড় করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আইম কম্বলখানা টানিযা উপবের দিকে আনিলাম। কিন্তু, কম্বল আবার নীচেব দিকে আস্তে আস্তে চলিল।

"আশ্চর্যান্বিত হইযা আমি আবাব উহা টানিয়া লইয়া ধবিযা বাখিলাম। ধরিয়া রাখিতে রাখিতে আমাব আবার ঘুমেব ঝোঁক আসিল। একটু পরেই আবার জাগিয়া দেখি যে, কম্বল চলিতেছে, শুড়-শুড—শুড়-শুড় করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহার পর জোবে একটা হেঁচকা টানে কে যেন উহা মেঝেব উপর লইয়া ফেলিল। যখন এই সব কাণ্ড হইতেছিল, তখন আমি

কয়েকবার বোল্টারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সে খুব ঘুমাইতেছিল। কিন্তু যখন হেঁচকা টানে কম্বল চলিয়া গেল, তখন আমাব ভয় হইল, তখন আমি তাহাকে জাগাইবাব চেষ্টা করিলাম। জাগাইতে পারিলাম না। সে ঘুম যেন মবা মানুযেব ঘুম! কিছুতেই সে জাগিল না, বন্ধুব মুখখানি স্বভাবতঃ খুব সাদা, এখন আবার তাহাব উপর জ্যোৎস্না পডায় উহা মার্বেল পাথরের মত দেখাইতেছিল। একটু ভাবিযা চিন্তিয়া আমি মেঝে হইতে কম্বলখানি আবার বিছানার উপবে আনিলাম এবং খুব শক্ত কবিযা ধরিয়া বাখিলাম। আবাব কম্বলে টান পড়িল—টানেব জোব ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। তখন আমার বিশ্রী ভয হইল। আমাব গাযে যত জোব আছে আমি তত জোরে উহা চাপিয়া ধরিলাম। ভয়ে মড়ার মত হইয়া গেলাম।

"পিঠের দিকে কিছু ধরিবাব মত আছে কি না দেখিবার জন্য আমি যেই ঘাড ফিবাইয়াছি, অমনই বোধ হইল, আমাব গাযে কে হাত দিল। কে যেন আঙ্গুল দিযা আমাব গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে মাথাব দিকে যাইতেছে। ভযে তখন আমি পাগলেব মত হইযা উঠিলাম। আমি মহা ভযে কম্বল ছুডিযা মেঝেয ফেলিযা দিলাম , তাহাব পব যে হাতখানা আমাব গাযেব উপর পডিযাছিল, সেখানা চাপিযা ধবিলাম, মহা ভযে হাতখানা চাহিযা দেখিলাম, তাহাব পব ছুডিযা ফেলিযা দিলাম। হাত ছুডিযা দেওযা অদ্ভুত কথা নহে , কেন না, উহা শুধুই একখানা হাত, দেহেব সঙ্গে উহা জোডা নহে। হাতখানার গাযে খুব লোম, আব দেখিতে কাল। আঙ্গুলগুলা ছোট ছোট, আঙ্গুলেব মাথা চ্যাপা চ্যাপা, আঙ্গুলেব মাথায খুব বড বড নখ, যেন বাঘ-ভালুকেব নখ। আশ্চর্য, দেখিলাম বুডা আঙ্গুলটা নাই! আমাব বিশ্রী ভয় হইল, আমি আব উঠিতে পারিলাম না। শুইযা থাকিলাম, তাহাব পব আবাব একটু ঘুম আসিযা পডিল। ঘুমাইবাব আগে বোল্টাবকে আব একবাব জাগাইবাব চেষ্টা কবিযাও জাগাইতে পাবি নাই। রাত্রি প্রভাত হইলে আমি উঠিযা তাহাকে সমস্ত ঘটনা বলিলাম। বন্ধু বলিল, আবও কযেক জন তাহার কাছে আগে শুইযাছিল, তাহাবও ঐ হাতখানা দেখিযাছে। বন্ধু বলিল—"তোমাব সৌভাগ্য যে, বড বড কাল কাল কুকুবগুলা দেখ নাই , একটা দুটো নহে, একটা পাল!"

মনে হয়, এ ব্যাপারটা ভূতেবই কাণ্ড। ইচ্ছা কবিযাই যেন কোন ভূত বোল্টারকে জ্বালাতন কবিত। ইহাতে আবও মনে হয, বোল্টার বোধ হয কোন অসভ্য লোকের উপর কোন দিন একটু আধটু অন্যায় করিযাছিল, তাই বোল্টাবেব উপব তাহাব একটা বিদ্বেষ রহিযা গিয়াছিল। ঐ বকম কাল, আঙ্গুল কাটা, বিশ্রী হাত কখনই শ্বেতাঙ্গ জাতিব হইতে পাবে না। ওটা নিশ্চয়ই কোন অসভ্য লোকের হাত। কাল কাল কুকুবগুলিব কথা বডই অদ্ভুত। যেন ভোজবাজি। কোথা হইতে আসিল, আর গেলই বা কোথায়। কুকুবগুলা যেন পোষা। চমৎকাব ব্যাপার। কুকুরগুলার কথা আমবা বুঝিযা উঠিতে পাবি না।

"আমাদিগেব মধ্যে অদ্ভুত কাণ্ড" নামক পুস্তকেব ১০০ ১০২ পৃষ্ঠায ১৮৬৪ খৃস্টাব্দে মিঃ হেন্‌বী স্পাইসার কাপ্তেন মরগানেব একটা কাহিনী লিখিযাছেন। সে গল্পটাব সিদ্ধান্ত কবাও যার পব-নাই কঠিন।

পাখী ভূত

"কাপ্তেন মরগ্যান এক দিন সন্ধ্যাকালে জনৈক বন্ধুর সঙ্গে লণ্ডনে গিয়াছিলেন। একটা সেকেলে ধরনের বড় বাড়ীতে বাসা লইলেন। শুইবার ঘরটি খুব বড, বিছানাটাও খুব প্রশস্ত।

"যথাসময়ে আহারাদির পর কাপ্তেন শুইলেন ও ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিলেন, তাঁহার কাছে একটা পাখীর পাখার শব্দ হইতেছে। সেই পত্-পত্ শব্দেই কাপ্তেনেব ঘুম ভাঙ্গিয়া গিযাছিল। আব সেই পাখার হাওয়ায তাঁহার হাড়ের মধ্যে পর্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছিল। তিনি জীবনে না কি কখন ওরূপ বোধ করেন নাই। তিনি ধাঁ করিয়া উঠিয়াছিলেন। উঠিয়া বসা যেমন, আর অমনই একটা প্রকাণ্ড কাল বঙের পাখী ডানা বিস্তাব করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিযা হাজিব। পাখীর চোখ দুটি লাল, যেন আগুনের ফুলকী।

"পাখীটা ঠিক সম্মুখে আসিযা রাগান্ধ হইয়া তাঁহাব মুখে ঠোকর মারিতে আসিল। তিনি হাত দিয়া, বালিস দিযা তাহার আক্রমণ হইতে বাঁচিবার চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। আর পাখীটার কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে অবাক্‌ও হইলেন। প্রথমে তিনি ভাবিলেন—পাখীটা হয় তো এই বাড়ীওয়ালার, কোন বকমে ছাড়া পাইয়া এই ঘরেব মধ্যে আসিযা পডিযাছে।

"পাখীটা বার বাব বিশ্রী রাগান্ধ হইযা কাপ্তেনকে জ্বালাতন কবিতে লাগিল। সে এমন বিশ্রী আক্রমণ যে, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। তিনি তাহার আক্রমণ ব্যর্থ কবিলেন বটে, কিন্তু একটিবারও পাখীটাকে ছুঁইতে পাবিলেন না। কয়েক মিনিট্ ধবিযা এই যুদ্ধ চলিল। তাহাব পব কাপ্তেনেব সত্য সত্যই বাগ হইযা উঠিল। তখন বিছানা হইতে লম্ফ দিযা তিনি পাখীটাকে তাডাইতে গেলেন। পাখীও পালাইতে লাগিল। কাপ্তেন বেগে ধাইয়া গেলেন। পাখীটা পত্-পত্ শব্দ কবিতে করিতে ঘরেব কোণে একখানি সোফাব কাছে যাইযা উঠিল। ঘরেব মধ্যে চাঁদের আলো আসিযা পডিতেছিল। মবগ্যান স্পষ্ট আলোকে দেখিলেন, পাখীটা যেন ভযে জড়সড হইয়া সেই সুন্দব আস্তবণে ঢাকা সোফাখানিব উপবে গিযা বসিযা পড়িল।

"দুই এক সেকেণ্ড থমিয়াই মরগ্যান্ সেই প্রকাণ্ড কাল পাখীটাকে বেগে ধবিতে গেলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য' তাঁহাব হাতেব মধ্যেই পাখীটা মিলাইযা গেল। কাপ্তেন যেন বাতাস চাপিয়া ধরিযাছেন বলিযা মনে হইল। তখন তিনি আলো হাতে করিযা ঘবটিব সব জাযগাব সব কোণে, সব কুলুঙ্গী তন্ন তন্ন কবিয়া খুঁজিলেন। পাখী কোথাও নাই। অনেকক্ষণ খুঁজিয়া না পাইযা শেষে যাইযা শুইলেন। বাত্রিতে আর কোন উপদ্রব হয় নাই।

রাত্রি প্রভাত হইলে কাপ্তেন নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া পোশাক পরিতে পরিতে মনে করিলেন, 'রাত্রির পাখী-ভূতেব কথাটা কাহাকেও বলিব না, কিন্তু আজ রাত্রে আমি বন্ধুর ঘরে শুইব আব বন্ধুকে এই ঘরে শুইতে দিব। দেখা যাক্, বন্ধুই বা কি রকম দেখিয়া বসে। রাত্রি হইলে কাপ্তেন তাহাই কবিলেন। বন্ধুর সঙ্গে শোবার ঘর বদলা-বদলি করিয়া লইলেন। বন্ধু পরদিন নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া বলিলেন—'কি বিশ্রী ঘব! মস্ত বড একটা কাল পাখী সারাটা রাত আমাকে বিবক্ত কবিযাছে, ধবিতে গেলাম, ধবিতে পাবিলাম না, কোথা দিয়া যে পালাইল, তাহাও টের পাইলাম না। একটা অদ্ভুত পাখী!"

গল্পটিতে যে পাখীর বর্ণনা পডা যায়, সে রকম পাখী এখন পৃথিবীর কোন স্থানেই দেখা যায় না। মনে হয়, পাখীটা অত বড় নাও হইতে পাবে, হয় তো একটু বাড়াইয়া বলা হইয়াছে। অনেক ইচ্ছা করিয়া ঈগল পাখী পোষে, অনেকে বা শকুনিও পোষে। যদি স্বীকাব করাও যায় যে, গল্পের পাখীটা ঐরূপ একটা পোষা পাখীর প্রেতাত্মা, তাহা হইলেও মনে হয়, সে অকাবণে এক ব্যক্তিকে ঐরূপভাবে আক্রমণ করিতে আসিল কেন? আক্রমণ করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয়, ওটা আদৌ ভূত নহে। হয় তো কোন লোক ঐ ঘরটিতে থাকিত, তাহার ইচ্ছা নয় যে, ঐ ঘরে আর কেহ শোয়। তাই অপরকে তাড়াইবার জন্য

ঐ রকম একটা বিকট চিন্তা-মূর্তি সৃষ্টি করিয়াছিল। ঐ পাখীর মূর্তিটাকে সেই জন্য একটা চিন্তা-মূর্তি বলিয়াই আমাদের মনে হয়। যে লোকটার এই চিন্তা-মূর্তি সে জীবিতও থাকিতে পাবে, হয় তো মরিয়াই গিয়াছে। সূক্ষ্ম-জগতে অনেক নিম্ন-শ্রেণীর দেব-যোনি আছে। তাহাদিগকে উপ-দেবতা বলিলেও অন্যায় হয় না। ঐ পাখী-মূর্তিটা সেই বকম উপদেবতাও হইতে পারে। যদি উপদেবতাই হয়, তবে উহার ঐরূপ কাণ্ড করিতে ঘরের মধ্যে আসিবার প্রয়োজন কি, তাহাও বুঝিয়া ওঠা যায় না। আমরা নিজে যদি ঐরূপ ব্যাপাব দেখিবার সুযোগ পাই, তবেই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, ওটা ভূত, কি চিন্তা-মূর্তি, কি উপদেবতা, কি আর কিছু। অন্যের বিবরণ পড়িয়া, অন্যের মুখে শুনিয়া, একটা স্থিব সিদ্ধান্ত করিয়া উঠা যায় না। ভূতের যতটা কাণ্ডকাখানা আমাদেব জানা আছে, তাহাব কোনটাতেই উহা মিল খায না। ওটা একটা নেহাত নূতন বকমের ব্যাপাব। এই পৃথিবীতে যেমন কত রকম অদ্ভুত ব্যাপার আছে, সেই বকম সূক্ষ্ম জগতেও কত রকম সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড ঘটে। আমরা যদি নিজেবা একবার সেখানে যাইয়া স্ব-চক্ষে দেখিতে পারি, তবেই প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিতে সমর্থ হই।

একটা প্রেতিনীর সঙ্গে গুপ্ত প্রণয়

"প্রকৃতিব নিশা-ভাগ" নামক পুস্তকেব ৩৬৯ পৃষ্ঠায় মিসেস ক্রো একটা গল্প লিখিযাছেন। গল্পটি খুব বিখ্যাত, প্রায় সকলেই জানেন। ক্রো বলিতেছেন—দুনিয়ায কিছুই অসম্ভব নহে। তাই তিনি ঐ গল্পটা বলিতেছেন। ব্যাপাবটা এই; —কলেজেব এক জন অধ্যাপক একটি যুবতীকে ফুসলাইযা পাপেব পথে আনেন। তাহাকে কিছুদিন উপভোগেব পর, অন্য একটি কুমারীকে বিবাহ কবেন। প্রথমা স্ত্রীলোকটি ইহাতে বড়ই ঝগডাঝাটি আবম্ভ করিল। কিছুদিন পবে সে হঠাৎ মারা গেল। তাহাব হঠাৎ মৃত্যু হওযায লোকে মনে করিল, অধ্যাপকই তাহাকে হত্যা কবিযাছে। লোকেব একপ সন্দেহ হওযা বাস্তবিকই অন্যায নহে। এরূপ ধাবণা লোকেব হইতে পাবে। খুনেব অপরাধে তাঁহাকে অপরাধীও কবা হইল। কিন্তু প্রমাণেব অভাবে অধ্যাপক মুক্তি পাইলেন। এই ঘটনাব পব হইতে দেখা যাইত ঐ অধ্যাপক প্রত্যহ সন্ধাব পব অনেকটা বাত্রি পর্যন্ত কোন একটা নির্দিষ্ট ঘবে একাকী থাকিতেন। তাঁহাব কোন মানুষ সঙ্গী থাকিত না। কিন্তু অনেকেই ভয়-চকিত গলায বলিতে আরম্ভ করিল যে, উনি একা থাকেন না, যে স্ত্রীলোকটি খুন হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট কথা আমবা শুনিয়াছি, সে প্রেতিনী হইয়াছে, উনি সেই প্রেতিনী লইযা বাত্রি কাটান।

করিন্থ সহরের কুমারী

মিসেস্ ক্রো ৩৭২ পৃষ্ঠায় একটা অদ্ভুত ব্যাপার লিখিযাছেন। সেটা গ্রীস দেশের একটি কুমাবীর কথা। ব্যাপারটি এই; —একটি যুবতীব পিতাব বাড়ীতে এক ভদ্রলোক আসিতেন। যুবতী মবিয়া যাইবাব ছয় মাস পবে প্রেতিনী হইয়া ঐ ভদ্রলোকের ঘরে এক দিন আসিযা হাজিব। প্রেতিনী তাঁহাকে দুই একটি উপহাব দিল, তাঁহাব সঙ্গে একটু খাওয়াদাওয়া করিল। কাজে কাজেই সে ভদ্রলোক তাহাকে সাধারণ ভদ্র মহিলাই ভাবিলেন, প্রেতিনী বলিয়া কিছুই বুঝিতে পাবিলেন না। কিন্তু ঐ বাড়ীর ধাত্রী প্রেতিনীটাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। সে দৌড়িয়া গিয়া তাহার মা ও বাবাকে বলিল—"আপনাদের সেই মরা মেয়েটি আবার বাঁচিযা উঠিয়াছে।" তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না। এরূপ কথা কেই বা বিশ্বাস করে? ধাত্রী তখনও সত্য বলিয়া জিদ্ করিতে লাগিল। তখন প্রেতিনীর মা দেখিবার জন্য ধাত্রীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তিনি আসিয়া

দেখিলেন যে, ঘর অন্ধকার, আর সেই আগন্তুক ভদ্রলোকও ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। পরদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ, একটি যুবতী রাত্রিতে দেখা করিতে আসিয়া আমার সঙ্গে আঙুটি বদলা-বদলি করিয়াছিলেন।" এই বলিয়া যুবতীর দেওয়া সেই আঙটিটি দেখাইলেন। মাতা পিতা দুজনেই আঙটিটা দেখিয়া চিনিলেন। এটা তাঁহাদেরই মেয়ের আঙটি। এই আঙটিটার সহিতই তাঁহারা মেয়েকে কবর দিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা স্থির করিলেন যে, নিশ্চয়ই বদমায়েসরা মরা মেয়েটার শব কবর হইতে উঠাইয়া এই আঙটি খুলিয়া লইয়াছে।

আগন্তুক ভদ্রলোক বলিলেন—"আপনারা অত ব্যস্ত হইবেন না। সেই যুবতী আজ রাত্রিতেও আসিতে চাহিয়াছে। আসিলেই আপনারা দেখিতে পাইবেন—সে আপনাদের মেয়ে কি অপর কেহ।" তখন যুবতীর মা ও বাবা তাহাই দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। রাত্রিকালে ঠিক সেই প্রেতিনী আসিয়া হাজির। তাহার মা-বাবাকে গোপনে সংবাদ দেওয়া হইল যে, যুবতী আসিয়াছে। তাঁহারা মেয়েকে দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিলেন। মরা মেয়েকে দেখিয়া বাবা-মা মহা আনন্দিত হইলেন। কিন্তু মেয়ে তত আনন্দিত হইল না। মেয়ে বলিল—"আপনারা এমন ভাবে হঠাৎ আসিয়া ভাল করেন নাই, এই লোকটির সঙ্গে দেখা করিবার অনুমতি মাত্র তিন দিনের জন্য আমি পাইয়াছি। এখন আমাকে অন্য একটা স্থানে যাইতে হইবে।" এই কথা বলিয়াই সে মরিয়া পড়িল—তাহার দেহটা সত্য সত্যই সেখানে পড়িয়া রহিল, সকলেই সে দেহ দেখিল। অল্পসময় পরে দেখা গেল যে, ঘরে আর জন-মানব নাই। একটা মড়ার বাক্স পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহার উপরে সেই ভদ্রলোকের দেওয়া আঙটিটাও আছে। তখন মড়াটাকে পিশাচীর দেহ মনে করিয়া সহরের বাহিরে কবর দেওয়া হইল। দান-ধ্যান, জাঁক-জমক যতদূর করা উচিত, তাহার ত্রুটি হইল না।

যে দুইটি গল্প বলা হইল, তাহার প্রমাণ-প্রয়োগ দেওয়া এখন অসম্ভব। যদি গল্প দুইটি সত্যই হয়, তবে দেখা যায় যে, প্রেতিনী দুইটি আধা-প্রেতিনী আধা-মানুষ হইয়া উঠিয়াছিল। এ অবস্থাটা মোটেই ভাল নহে। আগেকার গল্পটিতে দেখা যায় যে, প্রেতিনীটির সঙ্গে অধ্যাপকের যেন একটা কিছু বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে, প্রত্যহ রাত্রিতে অধ্যাপককে আসিয়া দেখা করিতে হইবে। হয় তো প্রেতিনী তাঁহাকে বলিয়াছিল—"যদি তুমি না আস, তবে তোমাকে আর তোমার নূতন বিবাহিতা স্ত্রীকে আমি ভয়ানক জ্বালাতন করিয়া মারিব।" তাই বোধ হয়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ অধ্যাপক প্রত্যহই প্রেতিনীর সঙ্গে খানিকটা করিয়া রাত্রি কাটাইতেন। আর প্রেতিনী যখন কথা কহিতে পারিয়াছিল, তখন স্থূল শরীর ধরিয়া অনিষ্ট করা তাহার পক্ষে খুবই সহজ হইত। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রেতিনী ও অধ্যাপক উভয়েরই ক্ষতি হইতেছিল। প্রেতিনীর মুক্তির পথ বন্ধ হইয়া উঠিল, অধ্যাপকও একটা বিশ্রী লোকের সঙ্গে থাকিয়া জীবনের পবিত্রতা হারাইতে লাগিলেন। তাঁহার পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় গল্পটি আরও অদ্ভুত। এ রকম ঘটনা দেখা যায় না। ইউরোপ মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে রক্ত-শোষক পিশাচীর অনেক গল্প প্রচলিত আছে। ঐ যুবতীর দেহটাকে কেন যে ঐরূপ পিশাচীর দেহ মনে করিয়া তফাতে গোর দেওয়া হইল, তাহা আমরা বুঝি না। সেই সকল পিশাচীর মত তো কোন ব্যাপারই দেখা যায় না। জীবনটাকে যদি সৎপথে চালান যায়, তবে বাঁচিয়া থাকা ভাল; মরিয়া যাওয়া আরও ভাল। কিন্তু জীবন ও মৃত্যু এই দুইটির মাঝা-মাঝি অবস্থা কখনই ভাল নহে। সে অবস্থাটা বড়ই অস্বাভাবিক। কখন কখন এরূপ অবস্থা ঘটিলেও এরূপ খুব কমই ঘটিয়া থাকে। যাহারা ধর্ম-কর্ম বিসর্জন দিয়া কেবলই নিজের লাভ খুঁজিয়া থাকে, তাহদেরই ঐরূপ ভয়ানক অবস্থাটা ঘটে। যে ব্যক্তি সাধারণ ভদ্রলোকের মত জীবন

কাটান, তাঁহার ঐ দুর্দশা হয় না। এ পৃথিবীতে রক্ত-শোষক পিশাচ-মূর্তি অনেক আছে। সুখের বিষয়, তাহাদের সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।

আমরা অনেক আগেই বলিয়াছি যে, মানুষ মরণের পর অনেক দিন নিজের মৃত্যুর কথাটা বুঝিতেই পারে না। তাহারা জীবিত মানুষের মতই কাজ-কর্মও করিতে যায়, অথচ পারিয়া উঠে না। তখন আস্তে আস্তে টের পায় যে মরিয়াছে। কেহ বা শীঘ্রই মরণের কথা বুঝিতে পারে, আবার কেহ বা বহু বৎসরেও নিজের মরণটা জানিতে পারে না। এ সম্বন্ধে একটা চমৎকার গল্প বলিতেছি। মিসেস্ ক্রো "প্রকৃতির নিশা-বাগ" পুস্তকের ৩৬৭ পৃষ্ঠায় গল্পটি সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গল্পটি এই ঃ—

মরিয়াও অনেকে মরণের কথা টের পায় না

"আয়র্ল্যাণ্ডের এক জন পদস্থ ধনী ব্যক্তি এক দিন বড় রাস্তায় বেড়াইতেছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন সেই রাস্তায় একটি বৃদ্ধ যাইতেছে, বৃদ্ধকে দেখিয়া মনে হইল—লোকটি কৃষক-শ্রেণীর, কিন্তু তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ মন্দ নহে। রবিবারে যেরূপ পোশাক সে দেশের লোকে পরে, বৃদ্ধের গায়ে সেইরূপ পোশাক। ভদ্রলোকটি দেখিলেন—বৃদ্ধ বহুদিনের প্রাচীন লোক, বয়স বিস্তর হইয়াছে, কিন্তু ঠিক যুবকের মত তর-তর করিয়া পাহাড়ী রাস্তায় উঠিয়া যাইতেছে। দেখিয়া ভদ্রলোক অবাক্ হইলেন। তখন তিনি বৃদ্ধের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার নাম কি? আর বাড়ীই বা কোথায়?' শুনিয়া বৃদ্ধ বলিল—'আমার নাম কার্ক প্যাট্রিক আইম, ঐখানে একটা কুড়ে ঘরে থাকি।' এই বলিয়া বৃদ্ধ আঙ্গুল দিয়া তার কুড়ে ঘরখানি দেখাইয়া দিল। ভদ্রলোকটি তখন বলিলেন—'সে কি? তুমি ওখানে থাক, অথচ আমি এ পর্যন্ত তোমার নাম শুনি নাই। আমি তো ওখানকার সকল লোকের নামই জানি। ও স্থানটা আমারই সম্পত্তি।' বৃদ্ধ বলিল—'আপনি এত দিন আমাকে দেখেন নাই? তাই ত, বড়ই অদ্ভুত কথা। আমি প্রত্যহই ত এখানে বেড়াই।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার বয়স কত?' বৃদ্ধ বলিল—'আমার বয়স একশ পাঁচ; আমি বরাবরই এখানে আছি।'

তাহার পর দুই একটা কথা বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। ভদ্রলোকটি তখন নিকটবর্তী একটা ক্ষেত্রে গিয়া কয়েক জন কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার কার্ক প্যাট্রিক নামে কোন বৃদ্ধকে কি চেন?' তাহারা বলিল—'না, আমরা কৈ তাহাকে চিনি না।' তিনি তখন কতকগুলির প্রবীণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল,—'হ্যাঁ মহাশয়, তাহার নাম জানি, তাহার শ্রাদ্ধের সময় আমারা খাইয়াছিলাম, ঐ যে পাহাড়টার উপরে একখানা কুড়ে ঘর, সেইখানে বুড়া থাকিত। আজ ২০ বৎসর হইল সে মরিয়া গিয়াছে।' এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোক অবাক্ হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তখন তাহার বয়স কত হইয়াছিল?' কৃষকেরা বলিল—'তখন তাহার বয়স ৮৫ বৎসর হইবে।' ভদ্রলোক দেখিলেন, ৮৫ আর ২০ তে একশ পাঁচই হয়। বৃদ্ধ বাঁচিয়া থাকিলে সত্যই ১০৫ ই হইত। বৃদ্ধ ঠিকই বলিয়াছে। এই গল্পটা সেই ভদ্রলোকের কাছেই পাওয়া গিয়াছিল! আর তিনি বলিয়াছেন, এটা সত্য ঘটনা। তিনি বলিয়াছেন—'আমি এই রহস্য বুঝিতে পারিলাম না, বৃদ্ধের নামও আমি কখন জানিতাম না। বৃদ্ধ মরিয়া যাইবার কয়েক বৎসর পরে আমি ঐ সম্পত্তি কিনিয়াছিলাম'।"

মানুষ মরিয়া গেলে ২০ বৎসরের মধ্যেও মৃত্যুর কথা বুঝিতে পারে না, একরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে না। কিন্তু যে গল্পটা বলা হইল, তাহাতে দেখা যায়, বৃদ্ধ যুবকের মত বেড়াইতে পারে

বলিয়া যেন তাহার একটা অহঙ্কারের ভাব ছিল। খুব সম্ভবতঃ জীবনে তাহাকে একাই অনেক দিন কাটাইতে হইয়াছিল। তাহার সমসাময়িক লোকেরা নিশ্চয়ই অনেক আগে মরিয়া গিয়াছিল। তাই গল্পস্বল্প করিবার মত বৃদ্ধের ইয়ার-বন্ধু কেহই ছিল না। আর বোধ হয়, বৃদ্ধ শেষ জীবনে কালা হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং অন্যেব কথাবার্তাও তাহার কানে বড় একটা যাইত না। কিন্তু মনে হয়, বৃদ্ধ হঠাৎ ঐ ভদ্রলোকের কাছে আসিয়া হাজির হইল কেন, আর একবার মাত্রই বা দেখা দিল কেন? যদি দেখাই দিল, তবে আব কাহাকেও কোন সময় ২/১ বারও দেখা দিল না কেন? শুধু দেখা দেওয়া নহে, ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলিয়া গেল। তবে কি বৃদ্ধ স্থূল দেহ ধরিয়া দেখা দিল ও কথা বলিল, না সেই ভদ্রলোকটার সেই সময়েব জন্য সূক্ষ্ম-জগৎ দেখিবার মত দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল? কোন্‌টা সত্য? আমাদের মনে হয় ভদ্রলোকটারই দিব্য-দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি-শক্তি বিকাশ কেন যে হইল, তাহা আমরা বুঝিতে পাবি না। আমরা জানি, কোন কোন সময়ে সাধারণ মানুষেরও দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়। কিন্তু সব সময় আমরা তাহার হেতু বুঝিয়া উঠিতে পারি না। ঐরূপ সাময়িক শক্তির কারণ কখন কখন স্পষ্টতই বুঝা যায়, আবাব কখন কখন আদৌ বুঝা যায় না। হয় তো সে শক্তিটা আরও উচ্চ লোক হইতে আসে। আমরা ততটা উচ্চ স্তরের কথা খুব বেশী জানি না। সে সব বুঝিযা উঠিবার শক্তি এখনও আমাদেব হয় নাই।

কখন কখন ভূতেবা আলো হইয়া দেখা দেয়। "প্রকৃতিব নিশাভাগ" পুস্তকের ১১৯ পৃষ্ঠায় এই রকম একটা গল্প দেওয়া হইয়াছে। গল্পটা এই ঃ—

"একজন পুরোহিত সন্ধ্যাকালে গির্জার প্রাচীরের উপর ঠেস দিয়া এদিক্-ওদিক্ দেখিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, একটা নির্দিষ্ট স্থানে আলো জ্বলিতেছে। মনে ভাবিলেন, হয় তো কেহ লণ্ঠন লইয়া আসিতেছে। লোকটা কে, দেখিবার নিমিত্ত তিনি দবজা খুলিয়া আলোর দিকে চলিলেন। কিন্তু দেখিলেন—কেহই নাই। আলোটা রাস্তা পার হইয়া দ্রুত চলিতে লাগিল, তাহাব পর বনের মধ্য দিয়া একটা পাহাড়ের উপব উঠিল। তাহার পর একটা গোলাবাড়ীর কাছে গিয়া নিবিয়া গেল। আলোটা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন কি না পুরোহিত মহাশয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, ঠিক এমন সময় আবাব উহা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মনে হইল, যেন ঐ গোলাবাড়ীর মধ্য হইতে উহা বাহির হইয়া আসিল। উহার সঙ্গে আর একটা আলো আসিল, তাঁহার কাছ দিয়া আবাব ঠিক আগেকার স্থানটিতে গেল। সেখানে যাইবার পর দুইটাই নিবিয়া গেল। যেখানে আলোটা নিবিয়া গেল, সেটা একটা গোর-স্থান, সে স্থানটি পুরোহিত বেশ কবিয়া চিনিযা বাখিলেন। পবদিন সেটি কার কবর, সন্ধান লইলেন। জানা গেল, পাহাড়ের উপরে যে বাড়ীব সম্মুখে গিযা প্রথম আলোটা নিবিযা গিয়াছিল, ঐ কবরটা সেই বাড়ীর একটা লোকেব। শুনা গেল, ঐ বংশের নাম—ম্যাকতী। বহুকাল না কি ঐ স্থানে গোর দেওয়া হয় নাই। পুরোহিত আবও শুনিলেন, ঐ বংশেব একটা ছেলে পূর্বরাত্রে হাম-জ্বরে মারা গিয়াছে।"

ঐ বংশেব একটা লোক হয তো আগে মাবা গিয়াছিল। তাহার জীবাত্মা আলো-রূপ ধরিয়া এই নূতন-মরা প্রাণটিকে আনিতে গেল। আলো আত্মার একটা নিদর্শন মূর্তি। আলো কখনই কবরের মধ্যে থাকে না। অজ্ঞান লোকেবা মনে করে, উহা মড়াটাব সঙ্গে বুঝি মাটির মধ্যেই থাকিয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপাব তাহা নহে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ভূতের সঙ্কেত

ভূতেরা অনেক সময় সঙ্কেত করিয়া থাকে। আমরা এখন সেই সব সঙ্কেতেব কথাই বলিব। এ সম্বন্ধে মিঃ ষ্টেড্ যাহা বলিযাছেন, আমবা প্রথমে তাহাই অবিকল উদ্ধৃত কবিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব, কেন না, তাঁহার কথাগুলি খুব সত্য। তিনি ভূতের সঙ্কেত সম্বন্ধে এইরূপ বলিযাছেন ঃ—

"ভূতের সঙ্কেতগুলি ঠিক যেন 'ফনোগ্রাফ' নামক গানের যন্ত্রের মত। ঐ যন্ত্রে মানুষের গলার স্বর শুনা যায়, তাহা সকলেই জানেন। মানুষটা মরিযা গেলেও বহুকাল বা ববাববই তাহার গলার স্বরটাকে রেকর্ডে পুরিয়া ফনোগ্রাফেব সাহায্যে ফুটাইয়া তোলা যায়। সেই রকম মানুষ মরিয়া গেলেও তাহার ইচ্ছা, তাহাব ভয় প্রভৃতি সূক্ষ-জগতের পবমাণুকে আশ্রয় করিয়া থাকে; আর মাঝে মাঝে ফুটিয়া ওঠে। মানুষ হয় তো স্বর্গে চলিযা গিয়াছে, কিংবা আবার হয় তো আসিয়া পৃথিবীতে জন্মিয়াছে, কিন্তু তবুও তাব ভয়, ইচ্ছা প্রভৃতি স্থানবিশেষে ফুটিয়া উঠিতেছে। শুধু যে বাযুমণ্ডলে মনের আবেগ প্রভৃতি ফুটিয়া উঠিবাব মত শব্দই হয়, তাহা নহে। অনেক সময় ঘটনাব মত ছবিও দেখা দেয়। লোকের স্থূল চোখে সেই ছবিও পড়িয়া থাকে।" —("প্রকৃত ভূতেব গল্প" ৩১০ পৃষ্ঠা।)

ষ্টেড্ সাহেবের ঐ কথাগুলি খুব সত্য। বাস্তবিকই ঐরূপ ঘটিয়া থাকে। "সাইকোমেট্রি" নামক বিজ্ঞান-তত্ত্বে আমরা জানিয়াছি যে, প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম জিনিসেব মধ্যেও তাহার চারি দিকের ঘটনাবলীর একটা ছাপ লাগিযা থাকে। ছাপটা চিরকালের জন্যই থাকে। একটা পদার্থের ভিতরে কোন্ কোন্ ঘটনার ছাপ পড়িয়া আছে, তাহা আমবা স্থুল চোখে দেখিতে পাই না। ঐ ছাপটা সাধারণতঃ খুব সূক্ষ্মভাবেই থাকে। একটু বিশেষভাবে দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেলে ঐ সকল ছাপ দেখা যায়, কিন্তু যে ঘটনার ছাপটা সূক্ষ্মভাবে থাকে, সেটা যদি খুব একটা ভয়ানক রকমের ঘটনা হয়, তবে সেটাকে জানিয়া ফেলিতে খুব বেগ পাইতে হয় না। যাহাদেব সূক্ষ্ম-শক্তির বিকাশ হয় নাই, তাহারাও সেটা অনেক সময় টের পায়। ভয়ানক ঘটনার ছাপ খুবই উপরে উপরে থাকে, সেটা ভূতের কাণ্ডের মত প্রায়ই প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কোন স্থানে কাহারও খুব বেশী রকম মনের উদ্বেগ-অশান্তি ঘটিলে, কাহারও খুব বেশী ভয়, কষ্ট, দুঃখ, ঘৃণা বা কোন বকম ভযানক চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দিলে, সূক্ষ্ম-জগতে সেই সব অশান্তির ভয়ানক স্পন্দন হইতে থাকে, সূক্ষ্ম-জগতে সেই দরুন একটা ভযানক আলোড়ন-বিলোড়ন হয়। আর সেই স্থানে সূক্ষ্ম-জগতের পরমাণুকে আশ্রয করিয়া ঐ সব দুর্ঘটনার একটা ছাপ তৈয়ারী হইয়া থাকে। যাহাব খুব সামান্য একটুও সূক্ষ্ম-দৃষ্টি আছে, সে-ই তাহা বুঝিতে পাবে। মানুষ একটু খিট্‌খিটে, একটু সহজবিকারী, একটু তরলচিত্ত হইলেই ঐ সূক্ষ্ম-জগতের ঘটনার ছাপ স্ব-চক্ষুতে দেখিতে পায়। তাহার মনে হয়, যেন তাহার চোখেব উপবই ঐ সব ঘটনা ঘটিতেছে। আবার সময় সময় ঐ ছাপগুলির এমনই স্থূলমূর্তিতে ফুটিয়া উঠে যে, তখন যে কোন লোকই তাহা দেখিতে ও শুনিতে পায়।

আবার কখন কখন ভয় প্রভৃতি ভাবগুলির বেশ শব্দ শুনা যায়, মনে হয়, যেন কেহ ভয় পাইয়া দৌড়াইতেছে বা কাঁদিতেছে, অথচ কাহাকেও দেখা যায় না, কোন মূর্তি বা দৃশ্য চোখে পড়ে না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখের "অনুসন্ধান ও মন্তব্য" নামক পত্রিকায় এইরূপ ভাবের একটি সুন্দর গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। টী ওয়েষ্টউড্ ঐ গল্পটি প্রচার করিয়াছেন। ব্যাপারটি এই ঃ—

একটা ভয়ের শব্দ

"এনফিল্ড্ চেজ নামক স্থানের কাছে একটা নির্জন জায়গায় একটি পুরাতন বাড়ী আছে। বাড়ীটা বহুকালের পুরাতন; মনে হয় যেন জখম হইয়া গিয়াছে। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দুইটি স্ত্রীলোক সেখানে বাস করিতেন। তাঁহারা সম্পর্কে ভগিনী; বয়সও অনেক হইয়াছিল, অথচ বিবাহ হয় নাই। তাঁহাদের সঙ্গে আমার কতকটা আলাপ-পরিচয় ছিল। একবার তাঁহাদের বাড়ীতে আরও কয়েক জনের সঙ্গে নিমন্ত্রণ খাইতেও গিয়াছিলাম।

"বেশ-ভূষা ঠিক-ঠাক করিয়া লইবার জন্য চাকরেরা ঐ বাড়ীতে আমাকে একটা ঘর দেখাইয়া দিল। ঘরটি উপরের তলায়। আমি ঘরে একাই ঢুকিলাম। চাকর চলিয়া আসিল। ঢুকিবামাত্র একটা অদ্ভুত স্বর আমার কানে গেল। মানুষ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যেমন একটা চাপা শব্দ করে, আমি ঠিক সেইরূপ একটা স্বর ঘরের মধ্যে শুনিতে পাইলাম। মনে হইল, যেন কেহ ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়া ঐ রকম শব্দ করিতেছে। আর মনে হইল, যেন ঐ স্বরটি একেবারেই আমার কাছে হইতেছে। প্রথমে আমি তত গ্রাহ্য করিলাম না, ভাবিলাম, হয় তো চিমনীতে বাতাস বাধিয়া ঐরূপ শব্দ হইতেছে। আবার ইহাও মনে হইল, দরজাটা অল্প একটু খোলা আছে, দমকা বাতাস ঐ দরজায় বাধিয়া এই রকম শব্দের সৃষ্টি করিতেছে। আমি ঘরটার মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, শব্দটি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। আমি যে দিকেই যাই, শব্দটাও সেই দিকে চলে। আমি একটি দূরস্থিত কোণে গেলাম, সেখানেও ঐ শব্দ। এমন কেন হইতেছে, ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া মনে শান্তি পাইলাম না। তখন তাড়াতাড়ি বেশ-ভূষা ঠিক করিয়া লইয়া নীচে বসিবার ঘরে নামিয়া আসিলাম। ভাবিলাম, এইবার ঐ উৎপাতজনক শব্দটা যাইবে। আশ্চর্য! তবুও শব্দটা আমাকে ছাড়িল না। সিঁড়ির উপর, উপরে, নীচে সর্বত্রই ঐ ভয়াবহ শব্দ! খেতে বসিয়াছি, আরও পাঁচ জনে আমার কাছে বসিয়া খাইতেছেন, তখনও ঐ শব্দ! আর আমার এত কাছে যেন কোন ভূত আমার গায়ে গায়ে বসিয়া ঐ শব্দটা করিতেছে। উহা আর কাহারও কানে পৌঁছিল না বটে, কিন্তু উহাতে বড়ই জ্বালাতন হইয়া উঠিলাম। সুখের বিষয়, ঐ ঘরটিতে আমাকে শুইতে হয় নাই।

খাওয়া-দাওয়ার পর শীঘ্রই সকলে চলিয়া গেলেন; কারণ, অনেককে দূরে যাইতে হইবে। আমিও বাড়ী গেলাম। আমি বাহিরে আসিয়া নৈশ সমীরণে একটু শান্তি পাইলাম। বাহিরে আসিলে ঐ উৎপাতজনক শব্দটাও আর থাকিল না।

এই ঘটনার পর ঐ বাড়ীতে আমি আর একবার গিয়াছিলাম। তখন আর একটা ঘরে ঐ ভগিনী দুইটির সঙ্গে আমার গল্পস্বল্প হইয়াছিল। আমি গল্প-প্রসঙ্গে তাঁহাদিকে ঐ শব্দটার কথা বলিলে, তাঁহার হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, ঠিকই, শব্দ হয় বটে। আমরা বরাবরই ঐ শব্দ শুনিতেছি, আমাদের ভয় হয় না, উহাতে কোন দিন কাহারও ক্ষতি হয় নাই। উহা সকল সময়

হয় না। কখন কখন হয় তো ২/৪ মাস হইল না, আবার কখন কখন ২৪ ঘন্টাই হইতে লাগিল। যখন হইতে থাকে, তখন বিরাম নাই, পিছনে লেগেই থাকে। কেন যে এমন হয়, জানি না, তবে এইটুকু জানি যে, ইহাতে কাহারও অনিষ্ট হয় না।"

আমি ভাবিলাম—ভগিনী দুইটি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও হইতে পারে। স্বীকার করিয়া লইলাম যে, উহাতে কাহারও অনিষ্ট ঘটে নাই; কিন্তু যে ব্যক্তি ঐরূপ ভয় দেখাইয়াছিল, সে মারা গেলেও তার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ভয়টা যায় নাই, ভয়টা সূক্ষ্ম-জগতে রহিয়াই গিয়াছে, আর কিসের দরুনই বা এই ভয়!

মানুষের পায়ের শব্দ

লেড্ বিটার সাহেব বলিতেছেন—"অনেক দিন হইল, আমি নিজেই মানুষের পায়ের শব্দের মত শব্দ শুনিয়াছিলাম। এটা খুব গুরুতর কাণ্ড না হইলেও, যাহারা ভূতের তত্ত্ব, সূক্ষ্ম-জগতের খোঁজ-খবর লইয়া থাকে, তাহাদের কাছে এ রকম ঘটনাও খুব আলোচনার বিষয়। লণ্ডন শহরের একটা শহরতলীতে তখন আমি ছিলাম। আমার বাসস্থানের নিকট হইতেই একটা রাস্তা বাহির করা হইতেছিল। একটা খোলা বড় জায়গা দিয়া রাস্তাটা যাইবে; তৈয়ারী করা তখনও শেষ হয় নাই; দুই ধাবে বাড়ী-ঘর -দোব তখনও হয় নাই। কেবল দুই পাশে পাথর বসান হইযাছে মাত্র। দুই ধারে বেড়া দিয়া ঘেবাও হইযাছে। যদি রাস্তাব উপব দিয়া যাইতে হয়, তবে ঐ বসান পাথরগুলির উপর দিযা চলিবার দবকার; কেন না, যেখানে পাথর বসান হয় নি, সেখানটা খুব অপরিষ্কার, বর্ষাকালে চলিবাব কোনই উপায় নাই, ভয়ানক কাদা হয়। রাস্তাটি প্রায এক মাইল দীর্ঘ। এই রাস্তাটি দিয়া গেলে খুব শীঘ্র রেল-স্টেশনে যাওয়া যায় বলিয়া, দিনের বেলায় অনেকেই উহার উপব দিয়া যাইত। রাত্রিতে তখনও আলোর বন্দোবস্ত হয় নাই। রাত্রিতে রাস্তাটার উপর অন্ধকার। অন্ধকার হইলেও আমি উহার উপর দিয়া যাইতাম। অন্ধকারে পাথরের উপর দিয়া যাওয়া আমার পক্ষে তত কষ্টকর বলিয়া মনে হইত না। অল্পদিনের মধ্যেই শুনা গেল—রাস্তাটিতে ভূতের উপদ্রব হইতেছে। কে কবে ভূত দেখিয়াছে জানিতে পারা গেল না, অথচ ভূতের কথাটা ছড়াইয়া পড়িল। ভূতের ভয়ে একাকী কেহ ঐ রাস্তায় যায় না, হয় তো অনেকে সাথীর আশায় দাঁড়াইয়া আছে; এমনটি অনেক সময় আমি নিজেও দেখিয়াছি।

এক দিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে প্রায় ৯ টার সময় আমি একাকী ঐ রাস্তায় যাইতেছিলাম। খুব একটু দ্রুতই চলিতে লাগিলাম। তখন চারিদিকে পাতলা কুয়াসা, কিন্তু তাহা হইলেও বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সামনে, পিছনে, দুই পাশের খোলা জায়গায়—সব দিকেই বেশ নজর চলিতেছিল। অর্দ্ধেক পথ গিয়াছি, এমন সময় সম্মুখে বা পিছনে কেহ কোথাও নাই, অথচ খুব বেগে একটা দৌড়িয়া আসার শব্দ আমার কানে আসিল। প্রাণরক্ষার জন্য যেমন বিশ্রী দৌড়ান আবশ্যক হয়, এ দৌড়ানটাও সেই রকম। মনে হইল, পাথরের উপর দিয়াই দৌড়টা আসিতেছে; কেন না, নরম মাটির উপর দিয়া দৌড়ালে অমন উচ্চ শব্দ পাওয়া যায় না। বাপ্‌রে! সে কি দৌড়! যে শুনিয়াছে, সে-ই সে দৌড়ের ভঙ্গীটা বুঝিয়াছে, কথা বলিয়া সেটা বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। দৌড়টাতে মনে হয় যেন কেহ খুব ভয় পাইয়া পালাইতেছে। ভাবিলাম—ভয় পাইয়া তো এক্ জন আসিতেছে, কিন্তু কি দেখিযা ভয় পাইল? কিন্তু কই,

কোন লোকই তো চোখে পড়িল না। শব্দটাই, সেই বিশ্রী হুটোপুটির শব্দটাই শুনা যাইতে লাগিল। শুধু শুনা যাওয়া নহে, মনে হইল, দৌড়িয়া আমার দিকেই যেন কে আসিতেছে। আমি দাঁড়াইলাম। দৌড়টা যেন আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। আমার পায়ের মধ্য দিয়া যেন দৌড়টা হুটোপুটি করিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু কিছুই আমার চোখে পড়িল না, কোন মূর্তিই আমি দেখিতে পাইলাম না। এই অদ্ভুত কাণ্ডে আমার গা শিহরিয়া উঠিল। খুব আশ্চর্যও হইলাম। স্পষ্ট দৌড়ের শব্দ, স্পষ্ট পায়ের শব্দ, শুধু স্পষ্ট নহে, খুব বড় বড় শব্দ শুনা গেল; চারিদিক্ নীরব, নিস্তব্ধ, অথচ ঐ শব্দ। ভাবিলাম, এটা মনের ভুল হইতেই পারে না। শব্দটা আমার গায়ের উপর দিয়া আমার পায়ের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। সেটা কোন বদমায়েস লোকের কাণ্ড নহে, তাহাও খুব ভাল করিয়াই বুঝিলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি, আলো ফুট ফুট করিতেছে, তখন একটা কুকুর লুকিয়ে থাকিতে পারে না, মানুষ কি করিয়া লুকাইয়া ঐরূপ করিবে? যে আসিবে, তাহাকেই আমার চোখে পড়িতে হইবে। অথচ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আশ্চর্য্য! আমি বিস্মিত হইয়া খানিকটা সময় সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার পর আবার চলিতে লাগিলাম। যাইবার সময় চারিদিকে খুব ভাল করিয়া চাহিতে গেলাম। আর কোন ব্যাপার ঘটিল না। ঐ কাণ্ডটার কথা আমি অনেক সময়ই ভাবিয়াছি, কিন্তু বহুদিন উহার কোন কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

এখন আমি পরা-বিদ্যার আলোচনা করি। এখন একটা কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু যে সময় ঐ ভূতের কাণ্ডটা ঘটিয়াছিল, তখন আমি পরাবিদ্যার দলে মিশি নাই, তখন কিছু বুঝিতেও পারি নাই। উহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও, আমি কতক কতক অনুমান করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি ঐ অনুমান অনেকটা ঠিক, ঠিকই করিয়াছিলাম। ভাবিয়া চিন্তিয়া যখন ভাল করিয়া কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না, তখন মনে করিলাম—দূর ছাই, ভুতুড়ে ব্যাপাবে আবার ভাবিব কি? পরাবিদ্যার কল্যাণে এখন দেখিতেছি, ঐটির কাবণ বুঝিয়া লওয়া খুবই সহজ। নিশ্চয়ই অনেক দিন আগে ঐ স্থানে কোন লোক ভয় পাইয়াছিল—সে ভয়টা একটা বিশ্রী রকমের। ভয় পাইয়া লোকালয়ের দিকে এইরূপ হুটাপুটি করিয়া আসিয়াছিল। ঐ বিশ্রী ভয়টাব একটা ছাপ ঐ স্থানে রহিয়া গিযাছে। ছাপটা ঐ স্থানের সূক্ষ্ম বায়ুমণ্ডলকে আশ্রয় করিযা আছে। আর ফনোগ্রাফের শব্দের মত থাকিয়া থাকিয়া এমন ভাবে শব্দ করিয়া ফুটিয়া ওঠে যে সকলেই তাহা শুনিতে পায়।

পরাবিদ্যার আলোচনা করিয়া সূক্ষ্ম-জগতেব অনেক কথা আমবা জানিতে পাবিলেও সকল তথ্য আজও পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। এক্ষণে শব্দটাও শুনিতে পাইলাম, অথচ যে পালাইয়া আসিয়াছিল, তাহার কোন মূর্তি দেখিতে পাইলাম না কেন. শব্দ ফুটিল, মূর্তি ফুটিল না কেন, এ সব কথা এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আবার স্থানবিশেষে শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিও দেখা দেয়। এখানে দেখা গেল না কেন, তাহা বুঝা যায় না। তবে আমাদের এইটুকু মনে আসে যে, হয় তো মূর্তি ফুটিয়া উঠিবার মত শক্তি ছাপটাব সঙ্গে ছিল না, তাই অতটা স্থূল হইয়া উঠিতে পারিল না। শব্দ কবা আর মূর্তি দেখান, দুইটি একসঙ্গে করিয়া তুলিতে বিলক্ষণ শক্তির আবশ্যক। ছাপটাতে নিশ্চযই ততটা শক্তি ছিল না বলিয়াই মনে হয়। কোন স্থলে শব্দটাকে ফুটাইয়া তোলা সহজ, আবার কোন স্থলে বা মূর্তি প্রকাশ করাই সহজ হইয়া ওঠে। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব এখনও আমরা জানি না। ভুতুড়ে কাণ্ডেব মধ্যে শব্দটাই খুব বেশী শুনা যায়, মূর্তি হইয়া দেখা দিল, এমনটা প্রায়ই ঘটে না। বাতাসের মধ্যে নিবন্তরই স্পন্দন হইতেছে। মন্থর

স্পন্দনগুলি শুনিবার বিষয় হইয়া উঠে, আর তীব্র স্পন্দনগুলি দেখিবার বিষয় হইয়া থাকে। যখন ভূতুড়ে কাণ্ডের মধ্যে শব্দই বেশী, তখন মনে হয়, মন্থর স্পন্দনগুলির ছা'্ইি সহজে রহিয়া যায়। পবাবিদ্যার আরও উন্নতি হইলে, আমাদের মনে হয়, সকল তথ্যই প্র ,শ হইয়া পড়িবে।"

দারুণ দুর্ঘটনার ছাপ

"সূক্ষ্ম-জগতের আভাস" নামক পুস্তকের ২য় খণ্ডে ১০০ পৃষ্ঠায় ডাক্তার লী আর একটা অদ্ভুত গল্প বলিয়াছেন। সেটাও এই গল্পেরই মত। গল্পটি তিনি "নর্থ স্টেনলী" নামক স্থানের পুরোহিত রেভারেন্ড জোশেফ জেফার্শনের কাছে শুনিয়াছিলেন। পুরোহিত ইয়র্কশাযার হইতে ১১ মাইল দুরে ঐ ব্যাপারটি ঘটিতে দেখিয়াছিলেন; তিনি একটি জায়গায় যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে ভয়ানক চীৎকার শব্দ শুনিতে পাইলেন। চীৎকার একবার আধবার নয়। অনববত হইতেছিল। বাত্রিকাল, লোকজন কেহ কোথাও নাই, অথচ চীৎকার শব্দ আসিতেছে! আশ্চর্য ব্যাপাব। তাঁহার খুবই ভয় হইল। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, ঐ স্থানে না কি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল। যে লোকটা খুন হয় সেই-ই না কি ঐ রকম ভাবে চীৎকারও করিয়াছিল। এই চীৎকারটা ঠিক সেই চীৎকাবেরই মত। এই ব্যপারের খুব একটা তীব্র ছাপ ঐ অঞ্চলেব বায়ুমণ্ডলে রহিয়া গিয়াছিল। তীব্র বলিতেছি এই কারণে যে, চীৎকার শব্দটা যেমন ফুটিয়া উঠিত, আবার কখন কখনও দৃশ্যটাও অনেকেব চোখে পড়িত। পুরোহিত খোঁজ-খবর লওয়ায় জানিতে পারেন, একটা লোক না কি দেখিয়াছিল যে, সেই খুন হওয়া লোকটার দেহটা সেইখানে পড়িয়া বহিয়াছে। বহু বৎসর আগে ঐ ব্যাপাবটি ঘটে, অথচ সেই ছবি তাহার কতকাল পরে ঐ স্থানে মাঝে মাঝে ফুটিয়া ওঠে। দারুণ ঘটনাব ছাপটা এমন করিয়াই থাকিয়া যায়।

"পিউরিট্যান" ব্যাপারের ছাপ

"পিউরিট্যার্ন" সম্প্রদায় এক সময়ে যেরূপ পাশব কাণ্ডকাবখানা করিযাছিল, জগতে সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। ইয়র্কশায়ারেব অন্তগত "ওযার্টন এবি" নামক স্থানে ঐরূপ ভুতুড়ে ছাপ আছে বলিয়া শুনা যায়। ঐ স্থানটা "বিভার্লী নামক স্থানের কাছে। ইংলণ্ডে যে সময খুব বিদ্রোহ হইয়াছিল, তখন এক দল সবকাবী সৈন্য "ওযার্টন এবি" দিযা গমন করে। ঐ অঞ্চলে সৈন্যগণ বিশ্রী পশুর মত আচবণ করিতে কবিতে যায়। ধর্মধ্বজী পিউরিট্যান সৈনিকেবাই না কি ঐরূপ অত্যাচার-উৎপীড়ন করিয়াছিল। "এবি"তে তখন এক জন ভদ্রলোক সপরিবারে সংসার পাতিয়া বাস করিতেছিলেন। ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন না, এমন সময দুবাত্মাবা বাড়ীর মধ্যে যাইয়া তাঁহার স্ত্রীর কোল হইতে ছোট সন্তানটিকে ছিনাইযা লইয়া একটা দেযালের গায়ে খুব জোরে আছাড় মাবিল। হতভাগ্য শি শুর নবম মাথাটা তখনই চূর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর শিশুর জননীকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিযা ফেলিল। ঘোব অসভ্য ভিন্ন এরূপ কাণ্ড আর কাহারা করিতে পারে? এ বকম ভয়ানক কাণ্ডের ছাপ সূক্ষ্ম-জগতে না থাকিযা যায না। এ সব ব্যাপারের এমন ছাপ পড়ে যে, তাহা সহজে মুছে না। পিউরিট্যান সৈনিকদেব এই পবিত্র কাজের ফল এখনও সেখানে দেখা যায়। এখনও একটা মাথাশূন্য প্রেতিনী ছেলে কোলে করিয়া ঐ অঞ্চলে ঘুবিযা বেড়ায। অনেকে ঐরূপ প্রেতিনীর ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়াছে। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে 'লীডস্ মার্কবী' নামক সংবাদপত্রে জুন মাসের সংখ্যায় ঐ প্রেতিনীব বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

আমরা পূর্বে যে "উইকলার হলের" গল্পটা বলিয়াছি, সেটাও এইরূপ একটা ব্যাপার হইতে পারে। আবার এইরূপ না হইয়া খুনী লোকটাও ভূত হইয়া আসিতেও পারে। অথবা শুধু চিন্তামূর্তি হওয়াও অসম্ভব নহে। চিন্তামূর্তির কথা বলিতেছি এই জন্য যে, যেখানে হত্যাকাণ্ড ঘটে, সেখানে মানুষে অনেক সময় ভূত দেখিয়া থাকে, সেটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভূত নহে; খুনী লোকটা ঐ হত্যার ভাবনা অনবরত ভাবিত বলিয়া তাহার সেই তীব্র ভাবনাই মূর্তি ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। খুনী বাঁচিয়াই থাকুক আর মরিয়াই যাউক, তার চিন্তা কখনই থামে না। চিন্তার হাত হইতে এড়াইবার উপায় নাই। সেই চিন্তাই ঐরূপ মূর্তি ধরে। কিন্তু মরা দুরাত্মার চিন্তাটাই বেশী বেশী দেখা যায়। যে মাসের যে তাবিখে ঐ ভয়ানক হত্যা হইয়াছিল, সেই মাসের সেই তারিখটা আসিলে খুনী লোকটার পাপের কথাটি আরও পরিস্ফুটভাবে মনে পড়িয়া যায়। তাই সেই দিনের সেই তীব্র চিন্তা স্থূল হইয়া সাধারণ মানুষেরও সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। এই জন্যই কোন কোন ঘটনার নির্দিষ্ট স্থানে ভূত-প্রেত দেখা যায় বলিয়া একটা কথা আছে। আবার পাপী ব্যক্তি যদি নিরন্তর তাহার পাপ-কার্য্যের চিন্তা করিয়া থাকে, তবে সে চিন্তা মূর্তি ধরিয়া সকল সময়ই সকলের চোখে পড়িতে পারে। ওয়ার্টন এরির হত্যাকাণ্ড ব্যাপারে যে প্রেতিনী-মূর্তি দেখা যায়, সেটা পাষণ্ডদের চিন্তামূর্তি বলিয়া বোধ হয় না। যাহাদের প্রাণে সামান্য একটুও মানুষ্যত্ব আছে, অন্যায় কাজ করিবার পরে তাহাদের একটা অনুতাপ আসিয়া পড়ে। তাই তাহারা নিজের নিজের পাপের চিন্তা করিতে থাকে। কিন্তু ঐ সকল পাষণ্ডদেব প্রাণে কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব ছিল না, অনুতাপ আসিতে পারে, উহাদেব প্রাণ এতটুকু উন্নতও নহে, উহারা রক্তপিপাসু ধর্মধ্বজী জানোয়ার-বিশেষ। উহারা মনুষ নামের কলঙ্ক। তাই উহাদের দ্বাবা চিন্তামূর্তি গড়িয়া ওঠা সম্ভবও নহে।

"প্রকৃত ভূতের গল্প" পুস্তকের ১৯২ পৃষ্ঠায় আর একটা ভূতুড়ে ছাপের কথা আছে। সে ক্ষেত্রে মূর্তি দেখা দিল, অথচ কোন রকম শব্দ হইল না, এইরূপ ব্যাপাবেব বর্ণনা আছে। যে ব্যক্তি ঐ কাণ্ড দেখিয়াছিল, তাহার নিজের কথাগুলি এই ঃ—

কটা রঙ্গের ঘোড়া

"এ রাস্তাটায় দিন নাই, রাত নাই, সন্ধ্যা নাই, আমি সব সময়ই আসা-যাওয়া করি। কুড়ি বৎসব ধরিয়াই এই রাস্তায় চলা ফেরা করিতেছি, কোন দিন কিছু দেখিয়া ডরাই নাই। কিন্তু গত সোমবার সন্ধ্যাকালে একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখিলাম। ব্যাপারটা ঠিক সন্ধ্যাকালে দেখা গেল। 'ফ্যান' নামে একটা মাদী ঘোড়ায় চড়িয়া আমি যাইতেছিলাম। রাস্তাটি চৌমহনী। দেখিলাম, আর একটি লোক একটা কটা রঙ্গের ঘোড়ায় চড়িয়া আমার খুব কাছে বাঁ দিকে আসিতেছে, আমি লাগামটা ঝাঁকি দিয়া তাহার আগে যাইব ভাবিলাম। লোকটি আমার কাছে আসিয়া পড়িল। আমি তাহাকে অভিবাদন করিলাম। অভিবাদনের কোনই উত্তর নাই! ভাবিলাম, উত্তর দিল না, তবে কি লোকটা ঘুমাইতে ঘুমাইতে যাইতেছে? এই ভাবিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু উঁচু হইয়া চাহিলাম। আশ্চর্য। লোকও নাই, ঘোড়াও নাই। নিজের চোখকে অবিশ্বাস করিতে পারি না ; স্পষ্ট মানুষ দেখিলাম, ঘোড়া দেখিলাম, কাছে পর্য্যন্ত আসিতে দেখিলাম, তবে কি এ সবই মিথ্যা? এত ভুল কি হইতে পারে? আমি তখন 'ফ্যান'কে ফিরাইলাম। ফিরাইয়া রাস্তার সব দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিলাম, কোন দিকেই কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। প্রায়

তিনশত গজ দূর পর্য্যন্ত রাস্তাগুলি আলোকিত ছিল। আলো থাকিলে কি হইবে, কোন দিকেই তাহাকে দেখিলাম না। তাহার পর নিকটে একটা মাঠের দিকে গেলাম। ভাবিলাম, এই দিকেই বোধ হয় লোকটি যাইয়া থাকিবে। তন্ন তন্ন করিয়া সে দিকেও খুঁজিলাম। কোথাও কেহ নাই। তখন মনে হইল, বোধ হয় এটা ভূত। যেমন ভূতের কথাটা মনে হইল, অমনই গা শিহরিয়া উঠিল। বেশ একটু ভয়ও হইল। তখন আর একটুও দেরী না করিয়া 'ফ্যান্‌কে' মহাবেগে ছুটাইয়া দিয়া পালাইলাম।

ব্যাপারটার মধ্যে আরও আশ্চর্য কাণ্ড আছে। সেটা বলা হয় নাই। গোলাবাড়ীতে যাইয়া আমার কাজ-কর্ম করা হইয়া গেলে সেখানকার বৃদ্ধ কৃষক ও তাহার স্ত্রীকে ঐ অদ্ভুত গল্পটি বলিলাম। বৃদ্ধ বলিল—"আপনি তো অনেক দিন এই রাস্তায় আসা-যাওয়া করিতেছেন, এ কাণ্ডটা কি ইহার আগে আর কখন দেখেন নি?' আমি বলিলাম—'কি দেখার কথা বলিতেছ?' বৃদ্ধ বলিল—'কেন, কটা রঙ্গের ঘোড়ায় চড়া, রঙ্গিন পোশাকপরা ভূতটার কথা বলিতেছি!' আমি বলিলাম—"ইহার আগে বাস্তবিকই তাহাকে আর কখন দেখি নাই; কেবল আজই সন্ধ্যাকালে দেখিলাম।' বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল—'৪০ বৎসর আগে ঐ কল-ওয়ালার কি ঘটনা ঘটে, তাহা কি আপনি শুনেন নাই?' আমি বলিলাম—'না, এক বর্ণও শুনি নি।' বৃদ্ধ বলিল—'প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে ঐ কল-ওয়ালা বাজার হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিল। পথে যে জায়গাটা আপনি উহাকে দেখিলেন, ঠিক ঐ স্থানে একজন দস্যু লুকাইয়া থাকে। কল-ওয়ালা যেমন আসিয়াছে, আর অমনি সেই দস্যু উহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। আপনি ঐ ভূতের গায়ে যে রঙ্গের পোশাক দেখিলেন, সে সময় সকল কল-ওয়ালারাই ঐ রঙ্গের পোশাক ব্যবহার করিত। আর তাহার একটা কটা রঙ্গের ঘোড়াও ছিল। ঐ দুর্ঘটনার অল্পদিন পরেই আমি এই জোতটি লইয়াছি। আমি ঐ স্থানে অনেকবাব গিয়াছি, কিন্তু নিজে কখন কিছু দেখি নাই। আপনি যেরূপ ব্যাপার বলিলেন, ঐরূপ আরও অনেক অনেক লোকের কাছে শুনিয়াছি। তাহারাও আপনার মত ঐ কট রঙ্গের ঘোড়া, আর ঐ লোকটাকে ঠিক ঐ স্থানে ঐ রকম ভাবে সেই ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে'।"

গল্পটি তো ঐরূপ। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ঐ ক্ষেত্রে ভূত-মূর্তিটা কোন রকম শব্দ করিল না, আর হত্যাকাণ্ডের একটা চিত্রও ফুটিয়া উঠিল না। মাত্র কলওয়ালার মূর্তিটা শান্তভাবে নীরবে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া হাজির হইল। আর ঐরকম আসাও সে সর্বদা আসিত না। কালে-ভদ্রে কোন সময় কাহারও হয় তো চোখে পড়িত। ঐ ক্ষেত্রে ভূতটাই স্থূল-শরীর ধারণ করিয়া আসিল কি যিনি দেখিলেন, তাঁহার মনে ঐ রকম একটা ছাপ আসিয়া পড়িল, তাহা বেশ বুঝা না গেলেও আমরা কয়েকটা বিষয় অনুমান করিয়া লইতে পারি। হত্যার সময় যে মারে আর যে মরে, এই দুই জনের মধ্যে একটা ধ্বস্তা-ধ্বস্তি হয়, তাহা ছাড়া প্রহারেরও একটা শব্দ হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রহারের শব্দ বা ধস্তা-ধস্তির শব্দ, কোন শব্দই ফুটিতে শুনিলাম না। তাই মনে হয়, কল-ওয়ালার চিন্তার কোনরূপ ছাপ ছাপ সে স্থানের উপর পড়ে নাই। কল-ওয়ালার চিন্তার ছাপ যদি পড়িত, তবে নিশ্চয়ই আক্রমণের মূর্তি উঠিত। সে নিশ্চিত মনে, নিরুদ্বেগে, স্বাভাবিকভাবে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতে ছিল। সেখানে যে একটা দুর্বৃত্ত লুকাইয়া আছে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। তাই আক্রমণের কথা, ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে, সে সব কথা সে কিছুই ভাবে নাই। আগে হইতে কেহই এমন ভাবনা ভাবে না। কিন্তু খুনীর মন আলোড়িত-বিলোড়িত হইয়াছিল। সে জানিত যে, সে খুন করিবে। সে ভীষণ সঙ্কল্প মনের মধ্যে পুষিয়া বসিয়াছিল।

তাই উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের সঙ্গে সে কলওয়ালার গতি-বিধি দেখিতেছিল ও ভাবিতেছিল। তাহার ঘোড়ায় চড়িয়া আসার মূর্তিটা খুনীর মনের মধ্যে খুব গভীরভাবে বসিয়া গিয়াছিল। তাই মনে হয়, খুনীর সেই চিন্তাটাই ঐ অঞ্চলে ছাপ রাখিয়া দিয়াছে। সেই ছাপেরই ঐরূপ ভাবে মাঝে মাঝে অভিনয় হইয়া থাকে।

দুই কারণে ঐ মূর্তি চোখে পড়িতে পারে। খুনী যদি তীব্র ভাবনা ভাবিয়া থাকে, তবে সেই চিন্তার ঐরূপ ছাপ ঐ অঞ্চলে পড়িতে পারে; আবার যে দেখে, লোকটি যদি সহজ-বিকারি-প্রকৃতির হয়, তবে ঐরূপ দেখিয়া বসা অসম্ভব নহে। মনের আবেগ-উদ্বেগ, শোক-হর্ষ প্রভৃতি যাহাদেব সহজেই জাগিয়া ওঠে, সেই সব চটুল-প্রকৃতি ব্যক্তিবা সূক্ষ্ম-জগতের ঐ সব কাণ্ড অতি শীঘ্রই দেখিয়া ফেলে। যিনি দেখিয়াছিলেন, তাঁহার মনের ভাব যদি পরেও ঐ রকমটিই থাকিত, তবে হয় তো তিনি আবার দেখিতে পাইতেন। তিনি পরে প্রায় ১০ বৎসর কাল ঐ পথে যাওয়া-আসা করিয়াছেন, অথচ কল-ওয়ালার সেই মূর্তিটাকে আর একবারও দেখিতে পান নাই। না দেখিতে পাইবার দুইটি কারণ থাকিতে পারে; হয় তো মূর্তিটা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া স্থূল-দেহ ধবিয়া আর দাঁড়ায় নাই; অথবা হয় তো তাঁহার মনের অবস্থাটা সূক্ষ্ম-জগতেব ব্যাপার বুঝিবার মত আর ছিল না।

খুন হইয়া মানুষ ভূত হইয়া বেড়াইতেছে, এমন বিস্তর গল্প শুনা যায়; কিন্তু সেগুলি প্রকৃত নহে। হত্যা-কাণ্ডে নিহত ব্যক্তিই যদি অপরাধী হয়, যদি তাহাবই কলহের ফলে ঐ হত্যাকাণ্ডটা ঘটিয়া থাকে, তবে হত্যার স্থলে ভূত হইযা ঘুবিয়া বেড়ান তাহার পক্ষে খুব স্বাভাবিক ব্যাপাব। কিন্তু যদি সে নির্দোষ হয়, তাহা হইলে সে কখনই ঐ স্থানে প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা ব্যতীত আসে না। তাই মনে হয়, ঐ সকল গল্পের ভূতগুলা সূক্ষ্ম-জগতেব ছাপ অথবা খুনী দুর্বৃত্তের ভীষণ চিন্তারই মূর্তিমাত্র।

আমরা সূক্ষ্ম-জগতেব যে সকল ছাপেব কথা বলিলাম, সে সকল ছাপও সময়ে লোপ পায়, ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। দুনিয়ায় যাহাই ঘটিযা থাকে, তাহাবই একটা ছাপ কিন্তু সূক্ষ্ম-জগতের উচ্চ স্তবে স্থায়ীভাবে থাকিযা যায়। যাঁহারা সিদ্ধ, দিব্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন, তাঁহারা তাহা দেখিতে পান। সেই সকল ছাপ অন্য প্রকার ভাবে গঠিত। তাহারা সূক্ষ্ম-জগতের নিম্নস্তবেব ছাপের মত ভূতুড়ে কাণ্ড করিয়া লোকের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে না। সে সকল ছাপে কাহারও আবেগ-উদ্বেগের গন্ধ নাই, তাহাতে কোন মানুষেব সংস্রব-সম্পর্কও নাই। সূক্ষ্ম-জগতের নিম্নস্তরের ছাপগুলিই কাল-বশে বিলীন হয়, উচ্চ-স্তবের ছাপগুলি অল্পদিনে লোপ পায় না। আমাদের পার্থিব জীবনেব তুলনায় ঐ সব ছাপ বহুকাল থাকে। আজও টাইবর্ণের মশানের নিকট দিয়া যাইবার সময় লোকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। এই স্থানেই সেই মশান ছিল, ইহা না জানিলেও সেখানে আসিলে ভয় জাগিয়া ওঠে। এমনই চমৎকার ব্যাপার!

আরও বিস্তর ছোট ছোট গল্প আছে। সেগুলি আমরা বলা আবশ্যক মনে করিলাম না। কারণ, তাহাতে পরলোকের সংবাদ খুব বেশী নাই। পরাবিদ্যার প্রথম সিরিজের বইগুলি পড়িলে ভুবর্লোকের অনেক তথ্য বিশদভাবে জানা যায়। আমরা এই প্রবন্ধে ভুবর্লোকের সংবাদ তত বিশদরূপে দিব না। আমরা পরলোকের সংবাদ অন্য দিক্ দিয়া আলোচনা করিতেছি ও করিব। পার্থিব ঘটনার মধ্যে পরলোকের তথ্য কতটা পাওয়া যাইতে পারে আর পরবিদ্যার ঘোষণা কতদূর সত্য, আমরা মাত্র সেইটুকুই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

ভূত দেখা

পরলোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা পাঠকগণকে একটু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি। বিস্তর ভূত দিন দিন আমাদের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইতেছে। এখানকার লোকগুলিও দিন দিন যেন একটু সূক্ষ্মদর্শী হইযা উঠিতেছে। আগে যেমন সংসাব লইয়া ঘোব ব্যতিব্যস্ত থাকিত, আত্মা, পরকাল এ সব ভাবনা মোটেই ভাবিত না, এখন আব তেমনটি নাই। এই অস্থাযী দুনিযাব ভাবনাটি যেন খানিকটা কমিয়া আসিয়াছে। মানুষের মতিগতি যেন অনেকটা সূক্ষ্ম-জগতেব দিকে গডাইযা পড়িতেছে। তাই মনে হয়, আমাদেব পাঠকদিগের মধ্যে হয় তো অনেকে সৌভাগ্যবশতঃ কবে কোন্ দিন ভূত দেখিয়া বসিবেন। ভূত দেখাটা দুর্ভাগ্য নহে। ওটা প্রকৃতই সৌভাগ্য। কেন না, যাহারা ভূত দেখিতে পায়, পরলোক সম্বন্ধে, সূক্ষ্মজগৎ সম্বন্ধে তাহাদের আর কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। তাহা ছাড়া আর একটা উপকাবও হয়। ভূতেরা প্রায়ই মানুষের কাছে সাহায্য লইতে আসে। কাহাকেও সাহর্মায্য করা খুব বড় একটা ধর্ম্ম। পরের উপকার কবার অপেক্ষা বেশী লাভ আর হইতে পাবে না। যে উপকার করে, সে নিজেই ধর্মের পথে, উন্নতির পথে, মুক্তির পথে বিস্তব উঠিয়া যায়। ভূতেব উপকাব করিতে পারিলেও আমাদের সেই লাভ। তাহাদের উপকাব করিলে আমাদেরই আত্মোন্নতি হইয় থাকে।

ভূতেব সঙ্গে দেখা হওযাটা সৌভাগ্যের বিষয, তাহা বলিয়াছি। যাহাদের অদৃষ্টে এই সৌভাগ্য ঘটে, ভূতর সম্মুখে পড়িলে তাহাদেব কিরূপ ভাবে চলা উচিত, সে বিষয়ে উপদেশ দিব। আমাদের মনে হয়, শুধু শুধু মানুষের কাছে আসিযা দেখা দেয় না। প্রাণের বড় দুঃখ জানাইতে তাহাবা আসে; কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, তাহারা আসিলেই সাধারণ মানুষগুলো ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া তাহাদেব কোন কথাই শুনে না। ইহাতে, তাহাদের মনে বড়ই আক্ষেপ হয়। স্থূল-দেহ ধবিয়া দেখা দেওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার। তাহারা সহজে স্থূল-দেহ ধরিতে পারে না। স্থূল হইয়া উঠিতে বিস্তব চেষ্টা করিতে হয। তাই বিশেষ কারণ না থাকিলে, প্রাণে বিশেষ দুঃখ না ঘটিলে, উহারা অতটা চেষ্টা করিতে, অতটা কষ্ট স্বীকার করিতে চাহে না। আবার খুব চেষ্টা করিয়া স্থূল-দেহ গড়িয়া তুলিতে পারিলেও বেশীক্ষণ থাকে না; কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মিলাইযা যায়। দেহটা যে সামান্য সমযটুকু থাকে, তাহাদেব কাছে উহা বড়ই মূল্যবান সময়। উহাদের প্রাণে কতই যাতনা, কত কথাই উহাদের বলিবার ইচ্ছা! কিন্তু স্থূল-মূর্তিটা শীঘ্র শীঘ্র মিলাইয়া যাওয়ায় তাহার অর্দ্ধেক কথাও বলা হয় না। স্থূলমূর্তি হইয়া দেখা দিলে সেই সময়টুকুর প্রতি সেকেণ্ডটা পর্য্যন্ত উহাদের কাছে মহামূল্য। কিন্তু সাধারণ মানুষেরা ঐ মূল্যবান্ সময়টা নষ্ট করিয়া দেয়। ভূত আসিবামাত্র সাধারণ মানুষেরা চীৎকার করিয়া ওঠে, নয় অজ্ঞান হইয়া পড়ে, নয় ভোঁদৌড় দিয়া পালাইয়া যায়। উহাদের কিছুই বলা হয় না। আমরা যদি ভূত হইয়া প্রাণের বেদনা জানাইতে আসে, আর অন্য লোক যদি ঐরূপ ভাবে হাউ মাউ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে বা পালায়, তবে আমাদের মনে কিরূপ কষ্ট হয়!

ভূতের কথা যাক, ইহজগতে যদি কোন জীবিত মানুষই মহাবিপদে পড়িয়া আমাদের কাছে উপকার পাইবার আশা করিয়া আসে, তবে অন্ততঃ তাহার প্রাণের কষ্টের কথাগুলি আমাদের শুনাও উচিত। আর মরণের পর দুঃখে পড়িয়া কেহ যাতনা জানাইতে আসিলে আমরা না শুনিব কেন? সে স্থলে অভদ্র হইয়া উঠিব কেন? স্থূল-শরীর দ্বারা সহজেই অনিষ্ট করা যায়; যে স্থূল শরীরধারী জীবিত মানুষকে আমরা ভয় করি না, সে মরিয়া ভূত হইয়া আসিলে তাহাকে ভয় করিব কেন? ভূতেরা আমাদের চেয়ে শক্তিসামর্থ্যে বরং হীন। তাহাদের স্থূলশরীর নাই, আমাদের বেশ একটা সুস্থ সবল স্থূলদেহ আছে। মারামারি করিতে হইলে আমাদেরই জিতিবার কথা। তবে আমরা ভয় করিব কেন? ভূত আগে জীবিতকালে আমাদের যেমন আত্মীয় বা বন্ধু ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। তাহা দ্বারা কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে ভয় কেন?

যাঁহার ভূত খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহাদের ব্যবহারও ভাল নহে

"ভূত আসিলে ভয় করিও না। সাহস করিয়া তাহার কথাগুলি শুনিও। ভয় করিতে হইবে না বলিয়া কি ভূত আছে বলিয়াও স্বীকার করিতে হইবে না? অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, অবশ্য ভূত মানিতে হইবে। ভূত নিশ্চয়ই আছে। ভূতের কথাটা বিকৃত-মস্তিষ্কের প্রলাপ নহে, পাগলের কথা নহে। খাঁটি সত্য। বিলাতের অনুসন্ধান-সমিতি ভূতের বিস্তর তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, বিস্তর কথা চেষ্টা করিয়া করিয়া জানিয়াছেন। সূক্ষ্ম-জগতের খোঁজ-খবর যাঁহারা লইয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ সমিতির কাছে খুবই ঋণী। কেন না, ঐ সমিতি অনেক সংবাদই দিয়াছেন ও দিতেছেন। আগে অনেকে সূক্ষ্ম-জগতের কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিত। এখন তাহারাই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, "উহার মধ্যে সত্য ব্যাপার আছে বলিয়াই বোধ হইতেছে।" অনুসন্ধান-সমিতির পরিশ্রম-ফলেই আজ সূক্ষ্ম-জগতের দিকে সাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আসিয়া পড়িয়াছে।

এই অনুসন্ধান-সমিতির চোখে এমন অনেক তথ্য আসিয়া পড়ে, যাহা অতি সহজেই ভূতের কাণ্ড বলিয়া বুঝা যায়। সমিতি কিন্তু সেগুলি ভূতের কাণ্ড বলিয়া স্বীকার করিতে যেন ভয় পান। বেশ সহজেই সেগুলি লোককে বুঝাইয়া দেওয়া যায়। অথচ সমিতি অনেক সময় বুঝাইয়া দিতে পারেন না। এই সব দেখিয়া আমাদের অনেক সময় হাসি পায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়া বুঝান খুবই ভাল। বুঝাইবার এই ধারাটা বড়ই চমৎকার। কিন্তু কিছুরই বাড়াবাড়িটা ভাল নহে। ভূতের কথাটাও যদি আমরা বাড়াবাড়ি করিয়া বিজ্ঞানের পথ দিয়া বুঝিতে যাই, তবে তাহা কুসংস্কারের মত হইয়া উঠিবে। যে ঘটনাগুলি অতি সহজেই বুঝা যায়, সমিতির পণ্ডিতগুলা তাহা মাথা ঘামাইয়া, ছাই-ভস্ম কল্পনা করিয়া, দূর অর্থ, বাঁকা অর্থ করিয়া, কত রকম জল্পনা-কল্পনা অনুমান করিয়া তবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই দুর্গতি দেখিয়া আমাদের কষ্ট হয়। এই ব্যাপারের দুই একটা উদাহরণ দিতেছি। মিস্ গুড় রিচ্ ফ্রী নাম্নী মহিলার "প্রেত-অনুসন্ধান" পুস্তকে নিম্নলিখিত গল্প আছে। গল্পগুলি এই ঃ—

একটা হারান আংটির কথা

এক জন ভদ্রলোকের একটি মূল্যবান্ আংটি হারাইয়া যায়। ভদ্রলোক স্বপ্ন দেখিলেন যে, সেটা তাঁহার বিছানার অমুক স্থানে আছে। আংটি হারানোর কথা তিনি জানিতেন না। ঘুম থেকে

উঠিয়া তাড়াতাড়ি সেটি যথাস্থানে আছে কি না দেখিতে গেলেন, যেখানে উহা থাকিত, সেখানে নাই। উহা হারাইয়া গিয়াছে ভাবিয়া বড়ই ব্যাকুল হইলেন। তাহার পর স্বপ্নে যেখানে থাকার কথা দেখিয়াছিলেন, বিছানার সেই জায়গাটা খুঁজিতেই আংটি পাওয়া গেল। আমরা বলিব, এ ব্যাপারটা বুঝিয়া ওঠা খুবই সহজ। ঘুমের সময় ভদ্রলোকটির দিব্য-দৃষ্টি অল্প একটু ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাই আংটির ব্যাপার জানিতে পারিলেন। কিন্তু সমিতিব কর্তারা ইহা বুঝিতে গলদঘর্ম হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ঐ ভদ্রলোকটি হয় তো আংটি আগে দেখিয়াছিলেন অথচ দেখার জ্ঞানটা তখন ফুটিয়া ওঠে নাই, পরে ঘুমাইলে আত্মার সঙ্গে ঐ জ্ঞানটা ফুটিয়া উঠিল ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রকম কষ্ট-কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? আবার আর একটা শোন ঃ—

অদ্ভুত রকমের কাগজের কথা

"এক জন বন্ধুর সঙ্গে আমি বাড়ী খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম। ১৯ টা বাড়ী দেখিবার পর আর একটা বাড়ীর উপর-তলায় গিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, ঘরের মধ্যে থালা-বাসন রাখিবার একটা তাক ঝুলান রহিয়াছে। আর দেখিলাম, ছাদ হইতে মেঝে পর্যন্ত একটা দরওয়াজা আটকান আছে। হঠাৎই আমার বোধ হইল, যেন দরওয়াজার ও-পিঠের সবই আমি দেখিতে পাইতেছি। তখন আমার বন্ধুটিকে বলিলাম, এই দরজা খোলা হইলে তুমি দেখিতে পাইবে যে, উহার মধ্যেকার দেওয়ালের গায়ে নীলবর্ণের কাগজ দিয়ে মোড়া। দরজা খোলা হইলে দেখা গেল, আমার কথাই ঠিক। হঠাৎই যে আমার দিব্য-দৃষ্টি খুলিয়া গেল, এ কথা বলা যায় না। ইহার পূর্বেও আমি ঐ অঞ্চলে অনেকগুলি বাড়ী আর একবার দেখিয়া বেড়াইয়াছিলাম। এ বাড়ীটা দেখার কথা আমার আদৌ মনে নাই। হইতে পারে, আমি দেখিয়াছিলাম, সেই জ্ঞানটা এখন ফুটিয়া উঠিল।"

সন্দিগ্ধচিত্ত লোকেরাও এখন আমাদের কথা মানিয়া লইতেছে

যাঁহারা আগে বিজ্ঞানের পথে যুক্তি খুঁজিয়া বেড়াইতেন, অথচ মনের গোল মিটিত না, এখন তাঁহারাও আমাদের কথা বিশ্বাস করিয়া লইতেছেন। একটা জিনিস দেখিলাম, অথচ দেখিলাম বলিয়া মনে থাকিল না, ইহা নিতান্তই অদ্ভুত ও অসম্ভব কল্পনা। এই অসম্ভব কল্পনা করিয়া উপরের ঘটনার মত অলৌকিক ব্যাপার বুঝিতে চেষ্টা করার অপেক্ষা আমাদের কথা ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করাই ভাল। আমরা বলি, সময়ে সময়ে মানুষের দিব্য-দৃষ্টি খুলিয়া যায়; তাই সে অনেক বিষয় জানিতে-শুনিতে পারে। এই কথাটি খুব সহজ আর খুব সত্য। এই দিব্য-দৃষ্টির শক্তিটা মানুষমাত্রেরই আছে, সকলেরই এটা জন্মগত স্বত্ব, সকলেই এ শক্তির অধিকারী, সকলেই সাধনা করিয়া ইহা ফুটাইয়া তুলিতে পারে।

সমিতির পণ্ডিতগুলা অলৌকিক ব্যাপারের আর একটা হেতুও দেখাইবার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টাও অদ্ভুত। তাঁহারা বলেন, মানুষের ভিতরে যে আত্মাটা আছে, সেই আত্মাটাই মাঝে মাঝে ঐ রকম ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন কিছু দেখিয়া বসা, কোন কিছু জানিয়া ফেলা না কি তাহারই কাজ। ডাক্তার আল্‌ফ্রেড রসেল্‌ ওয়ালেচ 'অলৌকিক ঘটনা ও বর্তমান যুগের প্রেততত্ত্ব" নামক পুস্তকে উহাদের ঐ কথাগুলির খুব তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। ঐ পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় তাঁহার এই কথাগুলি আছে ঃ—পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষের মধ্যে একটা সব-জান্তা

জীবাত্মা আছে, তাহার জ্ঞানের ভাণ্ডারটা না কি খুব বড় (কেমন করিয়া বড় হইল, তাহা কেহ জানে না)। সেই আত্মা যতই পাপ করুক, যতই মিথ্যা কথা বলুক, তাহার সব জানা-শুনার ক্ষমতাটা না কি নষ্ট হয় না। সেই আত্মাই সর্বজ্ঞ হইয়া সব অলৌকিক ব্যাপার ঘটাইয়া থাকে। তাঁহাবা বলেন, এইটিই খাঁটি মত, বিজ্ঞান-সম্মত কথা। ভূত-প্রেতের কথা উড়াইয়া দিয়া সব-জান্তা জীবাত্মার কথাটিকে বিজ্ঞান-সম্মত কথা বলাও যা, বিনা প্রমাণে একটা কথা মানিয়া লওয়াও তাই। কোন্‌টা বিজ্ঞান-সম্মত আর কোন্‌টা নহে, তাহা গবেষণা করিয়া বুঝিবার আবশ্যক; আবোল্-তাবোল্ বলিলে চলিবে না।

একটা হঠাৎ অসুখের দোহাই দেওয়া

ওয়ালেচ্ তাঁহার পুস্তকে আর একটি চমৎকার গল্প বলিয়াছেন। ঘটনাটি যে অদ্ভুত তাহা নহে। সমিতিব পণ্ডিত সেটাব একটা অদ্ভুত মীমাংসা করিযাছেন বলিয়াই অদ্ভুত বলিতেছি। একটা ঘরে ভূতের উপদ্রব হইত। তিনটা কুকুর ঐ ঘরে ঘুমাইযা ছিল। হঠাৎ রাত্রিতে ভয পাইয়া কুকুরগুলি ভয়ানক চীৎকার কবিযা উঠিল। সেই ভয়ের চীৎকার বিস্তব লোকের কানে গেল। ভয়ে তাহারাও জড়সড় হইয়া পড়িল, গাযেব বোমগুলি খাড়া হইয়া উঠিল। একটা ভয়ানক বড় কুকুব ভযে বিছানার নীচে পালাইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এই কাণ্ড! সমিতিব পণ্ডিতটি এই কথাগুলিব মীমাংসাটা চক্ষুব নিমেযে কবিযা ফেলিলেন। তিনি বলিলেন, "চীৎকাব করিবার কথাটি আদৌ মিথ্যা; যাহাবা শব্দ শুনিয়াছিল, তাহাদেব মাথা খাবাপ হইয়া উঠিযাছিল, ঐরূপ শুনা তাহাদেব মাথার বিকৃতি। কুকুবগুলা একসঙ্গে ভযে জড়সড হইয়া পড়িল, তাহা হইতে পারে, হয তো হঠাৎই কুকুবগুলি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল।" বাহবা ব্যাখ্যা!

পবা-বিদ্যা সম্প্রদায়টি ম্যাডাম্ ব্লাভাট্‌স্কী নাম্নী অসাধারণ শক্তিসম্পন্না মহিলা গড়িয়াছিলেন। অনুসন্ধান-সমিতি নিতান্ত অন্যায়পূর্বক তাঁহাব কুৎসা রটনা কবিয়াছেন। সমিতি যে সকল ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, তাহার অনেকগুলিই গাঁজাখুরী রকমের। সমিতি খুব আড়ম্বরপূর্ণ লম্বা লম্বা কথার ব্যবহারে মহাপটু। এ সব দোষ ও ত্রুটি সমিতির থাকিলেও আমরা বলিতে চাই যে উঁহাদের দ্বারা জগতের উপকারও অনেকটা হইয়াছে। আমরা সেই উপকারটুকুর জন্য উহাদেব কাছে কৃতজ্ঞ। চলিতে জানিলে অনুসন্ধানসমিতি জগতের আরও বিস্তর উপকার করিতে পারিতেন।

ভূতের কাছে ইঁহারা যেমনভাবে চলেন, সেইরূপ চলাটা হয় তো বিজ্ঞান-সম্মত হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ভূতেরা তাহাতে তৃপ্তি পায় না। তাহারা সেইরূপ ব্যবহার চায় না। সমিতি ভূতের সঙ্গে যেমন চলিতে বলেন, আমরা সাধারণকে সেইরূপ চলিবার উপদেশ দিতে পারি না। আমরা ভূতকে এরূপ একটা ভয়ের জিনিস মনে করিতে বলি না। তাহারাও মানুষ, আমাদেরই আত্মীয়-বন্ধু, আমরা তাহাদের অনেক উপকার করিতে পারি, তাহারা কষ্টে পড়িয়াই আমাদের কাছে আসে—এইরূপ ভাবাটাই ভাল। আমরা ভূতের সম্বন্ধে এইরূপ ভাবনাই ভাবি।

তোমরা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতে পার—ভূত দেখা গেলে তবে কি করিতে হইবে? আমরা বলি—ভূতটা যদি ভূত না হইয়া জীবিত মানুষ হইত, তবে তাহার সঙ্গে যেমন ব্যবহার করিতে, ভূতের সঙ্গেও সেইরূপ ভদ্রতা রক্ষা করিয়া কথাবার্তা বলিতে হইবে; কেবল মনে রাখিতে হইবে, উহার সময় বড় কম, অনেকক্ষণ থাকিতে পারিবে না, তাই খুব মন দিয়া অল্প সময়ের

মধ্যে উহার কথাগুলি শুনিয়া লইতে হইবে। কি উপকার ও চায়, শুনিয়া লইবে। ভূত আসিলে ভয় না করিয়া বেশ মিষ্ট হাসি হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে—"আমার কাছে তুমি কি উপকার চাও? আমি আনন্দের সঙ্গে তোমার সেই উপকার করিব।" তুমি এইরূপ বলিলে হয় তো সে তোমার কাছে তখনই তাহার প্রাণের কথাগুলির বলিবে। "হয় তো" বলিতেছি, কেন না, মানুষের মত একটা গলার স্বর গড়িয়া তোলা উহাদের সকল সময়ে শক্তিতে কুলায় না। তখন—তখনই যদি কথা বলিয়া উঠিতে না পারে, তবে অন্য প্রকারে তোমাকে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিবে। ভূতটা যদি কথা না বলিতেও পারে, আবার অন্য রকমেও ইচ্ছা জানাইতে অসমর্থ হয় দেখা দিয়াই যদি মিলাইয়া যায়, তবে মনে করিও না যে, সে চলিয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব সে তোমার কাছেই অদৃশ্যভাবে আছে। সে কাছে আছে ভাবিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিবে। তাহাকে বলিবে—'যদি ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করা' তোমার শক্তিতে কুলায়, তবে তাহাই কর।' যদি ভূতটা শব্দ করিয়া-বসে, তবে কয়টি ঠক্ ঠক্ শব্দে কি কথা বুঝিতে হইবে, একটা স্থির করিয়া তাহাকে জানাইবে। আর সেই সঙ্কেত দ্বারা তাহার সঙ্গে কথা বলাবলি করিবে। প্রেত-বৈঠকে এই উপায়েই সাধারণতঃ ভূতের সঙ্গে কথা বলাবলি হয়। ভূতটা যদি ঠক্ ঠক্ শব্দ না করিতে পারে, তবে তাহাকে বলিও—"আমি ঘুমাইয়া পড়িলে ভুবর্লোকে তো যাইয়া উঠিবই, তখন তুমি অতি সহজেই আমাকে তোমার কথা বলিতে পারিবে, তখনই বলিও।" আর তাহাকে বেশ সাহস-ভরসা দিয়া বলিবে—"তুমি ভয় পেও না, অস্থির হইও না।" বেশ শান্তভাবে মিষ্ট কথায় তাহার প্রাণে শান্তি আনিবার চেষ্টা করিবে; আর সে যেন বুঝিতে পারে যে, তুমি তাহার উপকার করিতে প্রস্তুতই আছ।

ভূতের সঙ্গে দেখা হইলে সাধারণতঃ মানুষ ভয় পায়। পূর্ব হইতে প্রস্তুত না হইলে সাহস আসে না। সাহসী হইয়া উঠিতে হইলে মরণ ব্যাপারটা কি, তাহা বেশ করিয়া প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া লইতে হইবে। আর মনে রাখিতে হইবে যে, মরণের পর মানুষটার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না। মরণের পূর্বেও যেমন থাকে, মরণের পরেও সেইরূপ। যে মরিয়া গেল, তাহাকে যদি আমরা ভালবাসিয়া থাকি, তবে মরণের পর তাহাকে দেখিলে ভয় হইবে কেন? যদি মনে হয়, ও আমাদেরই আশায় আসিয়াছে, তবে উহার জন্য দুঃখই হইবে, উহাকে দেখিয়া ভয় হইবে কেন? বিশেষ যেখানে ভালবাসা থাকে, সেখানে ভয় থাকিতে পারে না। আর একটি প্রয়োজনীয় কথা এই, ছোট ছোট ছেলে-পুলেদিগকেও ঐরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। তাহারাও যেন ভূতগুলিকে ভয়ের পাত্র না ভাবিয়া ভালবাসার পাত্র, সহানুভূতির পাত্র, সৌহৃদ্যের পাত্র মনে করে। নির্বোধ ধাইগুলা অনেক সময় অদ্ভুত অদ্ভুত জুজুর গল্প করিয়া, মিথ্যা মিথ্যা ভূতের অত্যাচারের গল্প করিয়া, ছোট ছোট ছেলে-পুলেগুলিকে ভয় দেখাইয়া থাকে। বাল্যকালে যদি ঐরূপ একটা ভয় মনের মধ্যে জন্মিয়া যায়, তবে বড় হইলে আর সে ভয় দূর করিয়া ওঠা যায় না। বাল্যকালে যদি ছেলেপুলেরা বুঝিয়া রাখে যে, মরণ ব্যাপারটা খুব ভয়ের ব্যাপার নহে, যদি তাহারা জানিয়া রাখে যে, তাহাদের যে সকল সাথী বা আত্মীয় মারা গিয়াছে, তাহারা খুব বেশী দূরে যাই নাই, একটা ভাল স্থানে অথচ কাছেই আছে, সেখানে যাইতে হইলে এই স্থূল-শরীরটা লইয়া যাওয়া যায় না, এটাকে রাখিয়া যাইতে হয়, যদি তাহারা জানিতে পারে যে, তাহারা আসিয়া আবার দেখাও দিতে পারে, আর যে তাহাদিগকে দেখিতে পায়, সে খুব ভাগ্যবান্, আর যদি ছেলেপুলেরা বুঝিতে পারে যে, তাহাদের সেই মরা সাথী বা আত্মীয়েরা আসিয়া আবার তাহাদের উপকারও করিতে পারে, তবে তাহাদের মনে অনর্থক কতকগুলি ভয়

ও কুসংস্কারের আবর্জনা আসিয়া জন্মিবে না। তাহা হইলে তাহারা ভূত দেখিলে বরং স্ফূর্তিই বোধ করিবে।

ভূতগুলিকে যদি আমরা ভয়ের চোখে না দেখিয়া সহানুভূতির পাত্র মনে করি, আর আমাদের ছেলেপুলেগুলিকে যদি সেইরূপ মনে করিতে শিক্ষা দিই, তাহা হইলে অদূর-ভবিষ্যতে আমাদের অবস্থা চমৎকারই হইয়া উঠিবে। তখন জীবিত মানুষ আর মরামানুষ একসঙ্গে বিচরণ করিবে; জীবিতেরা মরা মানুষগুলার উপকারে ব্যস্ত থাকিবে, মরা মানুষগুলিও আবার জীবিত মানুষগুলার উপকার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিবে; ভয় বলিয়া, ভ্রম বলিয়া কিছুই থাকিবে না; ঋষিদের মত সকল সময়েই জীবিত মানুষরা সূক্ষ্মজগতের জীবের সঙ্গে কথা বলাবলি করিবে। মানুষ মরে না, মরণের পরও বাঁচিয়া থাকে, এই মহান্ সত্যটা আজও লোকে ভাল করিয়া বিশ্বাস করিতে চাহে না, তখন প্রাণে প্রাণে সেটা খাঁটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকিবে। তখন বাঁচিয়া থাকিব বলিয়া আর একটা বিশেষ আগ্রহ জন্মিবে না; স্থূলদেহ থাকা আর না থাকা তাহার কাছে এক রকমই বোধ হইবে, তখন কেবল সেবা-ধর্মে মানুষ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া আত্মোন্নতির নিমিত্তই ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। যে অবস্থার কথা বলিলাম, এটা যে একটা কল্পনা, তাহা নহে। যাঁহারা পরা-বিদ্যার আলোচনা করেন, পরা-বিদ্যার উপদেশমত চলিয়া নিজের নিজের জীবনকে যোগীর জীবনের মত গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার এখনই এই স্থূল-শরীরেই ঐ অবস্থাটা বুঝিতে পারিতেছেন। যদি তুমি তোমার জীবন ঐরূপ ভাবে গড়িয়া তোল, তুমিও ঐ অবস্থা নিজেই দেখিতে পাইবে। পরা-বিদ্যার উপদেশ বেশ করিয়া শুন ও বুঝিয়া লও, তাহা হইলে তুমিও আমাদের মত সব জানিতে ও বুঝিতে পারিবে। পবিত্রতা, পরোপকার, আর প্রেম এই তিনটিই স্বর্গীয় গুণ। চরিত্রে এই তিনটি গুণ যতই ফুটাইয়া তোলা যায়, ততই যোগীর জীবন গড়িয়া ওঠে। আমরা ঐ তিনটি গুণকেই লক্ষ্য করিয়া চলি। তোমরাও আমাদের মত চল। তাহা হইলে আত্মার অ-মরত্ব তোমরাও বুঝিতে পারিবে।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

ভূত-নামান

বিলাত, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আজকাল বৈঠক করিয়া ভূত আনা হয়। ঐ বৈঠককে ভূতেব বৈঠক বলা যায়। এক দল লোক আছে, ভূত আনা, ভূতেব কাছে সংবাদ লওয়া প্রভৃতি কাজে তাঁহাদের ভারি স্ফূর্তি—ভারি আগ্রহ। উহাদিগকে প্রেতব্যবসায়ী বলা যাক। মরণেব পরও মানুষ বাঁচিয়া থাকে, আমরা আগে যে সকল গল্প বলিযাছি, এ কথার প্রমাণ তাহাতে পাওয়া যায়। আবার ভূতের বৈঠকে যে সকল কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহাতেও বেশ বুঝা যায় যে, মরিয়া গেলেও মানুষ সূক্ষ্মজগতে বাঁচিয়া থাকে। পরাবিদ্যাবিদগণ অলৌকিক ঘটনাগুলি দেখিয়া, বুঝিযা, পরীক্ষা করিয়া, তুলনা করিয়া, ভূতের বা পরলোকেব একটা স্থির সিদ্ধান্ত করেন। সেইরূপ ভূতের বৈঠকে যে সকল ঘটনা ঘটে, সেগুলিও যদি ভাল করিয়া পরীক্ষা ও তুলনা করিয়া দেখা যায়, তবে পবলোকেব অনেক খাঁটি খাঁটি তথ্য জানিতে পারা যায়। একটা বাহিবেব লোক খেযাল কবিয়া যদি এক দিন বৈঠকে বসে, তবে সে পরলোকেব তথ্যটা তত সহজে বুঝিতে পাবিবে না। যাহাবা বৈঠক লইয়া থাকে, সেই প্রেত-ব্যবসায়ীরাই ভিন্ন ভিন্ন বকমেব ঘটনাগুলিব মধ্যে একটা তুলনা কবিবার সুযোগ পায়। তাহারাই পরলোকের সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করিযা লইতে পাবে; কিন্তু এমন কাণ্ডও অনেক ঘটে যে, তাহাবাও তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিযা উঠিতে সমর্থ হয় না। পবা-বিদ্যাব কৃপায় আমবা জানিয়াছি, ভূত নানা শ্রেণীব আছে, নানা উদ্দেশ্যে আমাদেব সম্মুখে আসিয়া হাজিব হয়। পরাবিদ্যা-আলোচনার ফলে আমার ভূতের বিষয়টা বেশ শৃঙ্খলার সঙ্গে বুঝিয়া লইতে পারি। ভূতের বৈঠকে যে সকল দুর্বোধ্য ঘটনা ঘটে, তাহাও পরাবিদ্যাব জ্ঞান থাকিলে বেশ পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়।

প্রেত-ব্যবসায়ী বন্ধুরা যদি পরাবিদ্যার আলোচনা করেন, তবে বৈঠকেব কোন ঘটনাই তাঁহাদের পক্ষে বুঝিযা ওঠা কঠিন হয় না। তাঁহারা বৈঠকের অলৌকিক কাণ্ডগুলি দেখিয়া মনে করেন, এগুলি যুক্তির সহিত খাপ খায় না, এগুলির বুঝি বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী। এরূপ মনে করাই ভুল । এই ভুল ধারণা থাকার জন্যই তাঁহারা অনেক কথা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা এ ভুল ধারণাটি দূর করিবারও চেষ্টা করেন না। একটু চেষ্টা করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, বৈঠকের কোন কাণ্ডই সত্যের বিরোধী নহে, বিজ্ঞানের প্রতিকূলও নহে; পরন্তু বিজ্ঞানের সঙ্গে এক সুরেই বাঁধা। একটা অলৌকিক কাণ্ড ঘটিলেই প্রেতব্যবসায়ী বন্ধুরা মনের আবেগে চীৎকার করিয়া উঠেন—"কি অদ্ভুত! কি চমৎকার! কি সুন্দর!" তাঁহারা উহা দেখিয়া বিস্ময়ে ডুবিয়া যান, অবাক্ হইয়া থাকেন। কিন্তু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পাবেন, আশ্চর্য্য অদ্ভুত কিছুই নহে, সবই ষোল আনা স্বাভাবিক। আর স্বাভাবিক বলিয়াই অতি সুন্দর! যাহা বাস্তবিক, স্বাভাবিক তাহাই সুন্দর। আমরা জগতে খাঁটি সুন্দর কিছু দেখিতে পাই না; তাহার একমাত্র কারণ, আমাদেরই দোষ। আমরা প্রাকৃতির নিয়মের বিপরীতে চলিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছি। তাই খাঁটি সুন্দর কিছু আমাদের চোখে পড়ে না। আমরা সুন্দর দেখিতে পাই না বলিয়া

যে সুন্দর নহে, তাহা নহে। আমরা নিজেরা মন্দ হইয়া গিয়াছি, তাই মন্দ দিকটাই সম্মুখে পড়ে। কোন কিছু প্রকৃত সুন্দর দেখিয়া বসিলে, তখনই সন্দিগ্ধচিত্তে বলিতে থাকি—"তাই তো, এত সুন্দব কি হইতে পারে? ইহা নিতান্তই অস্বাভাবিক! এত সুন্দর যে, উহাকে সত্য বলিয়াই বিশ্বাস কবা চলে না।" প্রকৃতভাবে বুঝিলে দেখা যায় যে, খুব সুন্দর বলিয়াই উহা সত্য ও স্বাভাবিক। বুঝিলে তখন মনে হইবে— "উহা এতই ভাল যে, সত্য না হইযাই পারে না।" ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, আর তিনি ভালও। অতএব যাহা সত্য, তাহাই ভাল। যাহা ভাল, তাহাই সত্য।

পরা-বিদ্যার মতে বৈঠকি কাণ্ডের ব্যাখ্যা

প্রকৃতি বলিতে শুধু এই স্থূল-জগৎটা নহে। ইহা ছাড়া সূক্ষ্ম-জগৎ আছে। সূক্ষ্ম-জগতেরও আবাব সূক্ষ্মতর অনেকগুলি স্তব আছে। এক এক স্তবের মধ্যেও আবাব কতকগুলি করিয়া বিভাগ আছে। মানুষ মরিয়া যাইবার পর ঐ সূক্ষ্ম-জগতে যায়। তাহাব পর যতই ভিন্ন ভিন্ন স্তর অতিক্রম করে, ততই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি লাভ কবিযা থাকে, ততই তাহাব দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া যায়, ততই অসাধ্যসাধন করা তাহার পক্ষে খুবই সহজ হইযা আসে। এ সব কথা পরাবিদ্যা বেশ করিয়া বুঝাইযা দিয়াছে। যাঁহারা পবাবিদ্যাব আলোচনা করেন, তাঁহাদেব পক্ষে সেই জন্য বৈঠকি ভূতেব কোন কাণ্ডই দুর্বোধ্য বলিয়া মনে হয না। লেড্‌বিটাব সাহেব "দিব্যদৃষ্টি" নামক পুস্তকে সূক্ষ্ম-জগতেব স্তরগুলির সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ইচ্ছা হইলে, পাঠক সে বইখানি পড়িযা দেখিতে পারেন। মবণেব পব সূক্ষ্ম-জগতে নূতন শক্তি লাভ কবিলে মানুষ কত অদ্ভুত কাণ্ডই কবিতে পারে। একখানি বই বন্ধ বহিযাছে, অথচ তাহাব মধ্যস্থ যে কোন পাতার যে কোন লেখাটাই পডিযা দিতে পারে, বাক্‌সেব ভিতবে হয তো একখানি পত্র আটকানো আছে, অথচ বাহিব হইতে সে পত্রখানা পড়িযা দেয; খুব দূরে কি ঘটিতেছে, তাহা হয তো এখান হইতেই দেখিয়া বলিয়া দিতে পাবে; অথবা উপস্থিত বা অনুপস্থিত যে কোন লোকের মনের কথাও বলিযা দিতে পারে। মবণের পর মানুষেব এত শক্তি বাড়িযা যায়। জীবিতকালেও মানুষ সাধনা কবিয়া ঐ সূক্ষ্ম-দৃষ্টি-শক্তিব বিকাশ কবিযা লইতে পারে। ঐরূপ দৃষ্টি করিবাব শক্তিটা সব মানুষেব খুব অদৃশ্যভাবে, সূক্ষ্মভাবে আছে। চেষ্টা-যত্ন কবিযা, সদাচাব-সংযম প্রভৃতি দ্বাবা উহাকে একটু বর্ধিত কবিয়া তুলিতে পাবিলেই মানুষ ভূতের মত ক্ষমতাই লাভ কবিতে পাবে! যাঁহারা সাধনা-বলে ঐরূপ দৃষ্টি-শক্তিব অধিকারী হইযাছেন, তাঁহাবা বৈঠকি-কাণ্ডগুলিকে আব আশ্চর্য, অদ্ভুত বলিযা মনে কবেন না। তাঁহারা দেখেন, ঐ কাণ্ডগুলি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। উহাতে অস্বাভাবিক কিছুই নাই। যাঁহাবা সূক্ষ্ম-জগতেব খোঁজ-খবরই রাখেন না, তাঁহারা ভাবিযাই স্থির করিতে পাবেন না যে, ঐ সকল কাণ্ড কি কবিযা ঘটিতে পারে। অসভ্য বর্বরেবা আমাদেব ব্যবহৃত বিদ্যুতেব আলো, টেলিফোন-যন্ত্র দেখিলে যেমন অবাক্ হইযা থাকে, তাঁহাবাও সেই রকম বৈঠকি-কাণ্ড দেখিযা বিস্ময়বিস্ফাবিত-চোখে চাহিয়া থাকেন। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিবা বিদ্যুদালোক প্রভৃতির তথ্য জানেন বলিয়াই ঐগুলিকে যাদু-বিদ্যা বলিযা মনে কবেন না; পবন্তু ভাবেন যে, উহা নিতান্তই স্বাভাবিক। অসভ্যেরা টেলিফোন প্রভৃতিকে যে চোখে দেখিবে, শিক্ষিতেবা সে চোখে দেখিবে না। সূক্ষ্ম-জগতের বেলাও সেইরূপ। সিদ্ধ যোগীরা অলৌকিক ঘটনাগুলিকে এক চোখে দেখিবেন, আর সাধারণ লোকেরা অন্য চোখে দেখিবে।

পরা-বিদ্যার সাহায্যে আমরা বৈঠকি-কাণ্ডের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আনিতে পারি; কোন্‌টা কিরূপ শ্রেণীর কাণ্ড, তাহা বুঝিতে পারি। বৈঠকি ভূতের কাণ্ডগুলিকে আমরা পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। বৈঠকি ভূতের যত কাণ্ডই দেখা যাক, তাহা এই পাঁচটি ভাগের কোন না কোন ভাগে পড়িবেই। ভূতগুলির আত্ম-প্রকাশের শক্তি একরূপ নহে। কাহারও শক্তি বেশী, কাহারও কম। তাই এক এক জন এক এক রকমে আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদেব শক্তি অনুসারেই আমরা ভাগ স্থির করিলাম। সেইটিই শ্রেণী-বিভাগেব সহজ উপায় বলিয়া আমাদের মনে হয়। বৈঠকি ভূতের ভাগগুলি এই ঃ—

১। কোন কোন ভূত কাহারও ঘাড়ে চাপিয়া আসে। তাহার মুখ দিয়া কথা বলে। তাহার হাত দিয়া লেখে বা আঁকে। তাহার মুখেই বলে, আমি অমুক। কখন কখন এই শ্রেণীর ভূতেবাই "প্ল্যানচেট' নামক যন্ত্রের মধ্যেও আসে।

২। কখন কখন এক শ্রেণীর ভূত কাহারও ঘাড়ে চাপিয়া, তাহার সূক্ষ্ম-দৃষ্টি ফুটাইয়া দেয়; তখন সে ব্যক্তি কোন পুস্তকের কোন লেখা না দেখিযাই পড়িয়া বসে, বা কোন বাক্‌সের মধ্যে কাহাবও আটকানো পত্রের লেখা বাহির হইতে পড়িয়া দেয়, বা কাহারও মনেব কথা বলিযা বসে, বা কোন লোক কিংবা জিনিস খুঁজিয়া পাওযা না গেলে বলিয়া দেয় যে, অমুক স্থানে সে বা তাহা আছে।

৩। কোন কোন ভূত খানিকটা স্থূল হয়, কিন্তু দেখা দিবার মত অতটা স্থূল হইতে পারে না। ইহাবাও ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করে, টেবিল উলট-পালট কবিয়া বাখিযা দেয়, কোন জিনিস শূন্য দিযা ভাসাইযা লইয়া যায়, বা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সরাইযা বাখে, শ্লেটেব উপবে হয় তো কিছু লিখিয়া বা আঁকিয়া বসে। সে লেখাটা কোন জীবিত মানুষের হাত দিয়া লেখে না, সে নিজেই লেখে। ইহারা কখন কখন স্থূল হাতে হয় তো কাহারও গায়ে হাত দিয়া ছুঁইযা বসে, কিংবা হয তো একটা গলার স্বর শুনাইযা দেয়। "মরা মানুষের স্পর্শ ও স্বর পাইবাব জন্য কবিরা বড়ই আগ্রহ করিতেন।" তাঁহাদেব আশা এই সকল ভূতেব কাছে পূর্ণ হয়। ভূতেব বৈঠকে যে সকল ছোট ছোট কাণ্ড ঘটে, তাহার অধিকাংশই এই শ্রেণীর ভূতেব দ্বারা ঘটে। ইহারাই গান-বাজনার যন্ত্র বাজাইয়া থাকে। বাদ্য-যন্ত্রে চাবি দেওযা, যন্ত্রটিকে শূন্যে লইয়া বেড়ান প্রভৃতি কাণ্ড ইহারাই করে। বৈঠকে খুব একটা ঠাণ্ডা হাওয়া গায লাগে, সেটাও ইহাদেব কাণ্ড। বোর্ডে নাম লিখিয়া দেওয়া, প্ল্যানচেটে আসিযা কিছু লিখিযা বসা প্রভৃতি ব্যাপাব ইহারাই করে।

৪। আর এক শ্রেণী আছে, সে শ্রেণীব ভূতেবা কিছু উন্নত। খুব দ্রুত কিছু একটা লেখা বা কিছু একটা আঁকা ইহাদেবই কাণ্ড। ইহাবা ইচ্ছা কবিযা কখন কখন অনেক রকম আলোকেব সৃষ্টি করে, কখন বা অনেকগুলি এক রকম জিনিস তৈযারী করিয়া সম্মুখে হাজিব করে। দূবেব জিনিস আনিয়া ফেলে, আটকানো বাক্‌সেব জিনিস বাহিবে আনে, কখনও বা আগুনেব সৃষ্টি করে—এইরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ইহারা করিয়া থাকে। সূক্ষ্ম-জগতের বিধি-ব্যবস্থা ইহারা বেশ একটু ভালরূপই জানে।

৫। কোন কোন ভূত স্থূল-শরীর ধবিয়া দেখা পর্যন্ত দেয়।

আমরা ঐ পাঁচটি শ্রেণীব কথাই পরবর্তী অধ্যাযে যতদূব সাধ্য বিশদ করিয়া বুঝাইযা দিব। প্রত্যেক শ্রেণীবই ঘটনা এই জগতে ঘটিয়াছে। সে সব তথ্য পুস্তকেও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমরা পরে বিশদ করিযা বলিবার সময় সেই সব ব্যাপার উদ্ধৃত করিযা পাঠকগণকে উপহার

দিব। লেড্‌বিটার সাহেব নিজেও বহুকাল প্রেত-তত্ত্বের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা তাঁহার অভিজ্ঞতার কথাও বলিব, কেন না, প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কথার উপরেও আমরা খুব বেশী আস্থা স্থাপন করিতে পারি। আমরা ইহার পরের অধ্যায়ে প্রথমেই লেড্‌বিটারের নিজের প্রত্যক্ষ একটা ঘটনা বলিব।

ভূতের বৈঠক

লেড্‌বিটার সাহেব নিজে প্রেতের খোঁজ লইয়া এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—"আমার মনে হয়, আমি সর্বপ্রথমে মিঃ ডি, ডি, হোমের বৈঠকে প্রেত দেখিতে বসিয়াছিলাম। ঐ সভায় যে সকল তথ্য জানিলাম, সেগুলি শুনিয়া আমার মোটেই সত্য বলিয়া তখন বিশ্বাস হইল না। তথ্যগুলি কাগজে প্রচাবিতও হইল। আমি আমাব মা'কে এক দিন পড়িয়া শুনাইলাম, আর আমি যে তাহা বিশ্বাস করি নাই, তাহাও তাঁহাকে বলিলাম। ভূতের ঐ তথ্যগুলি একটা প্রবন্ধের মত করিয়া কাগজে ছাপান হইয়াছিল। প্রবন্ধটির শেষে লেখা ছিল—যদি এই সব ব্যাপার কাহারও বিশ্বাস না হয়, তবে তিনি ২/৪ জন বন্ধুকে লইয়া যেন একটা গোল টেবিলের চাবিধাবে বসিয়া দেখেন; সত্য কি মিথ্যা, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন। বসিবার উপদেশ এইরূপ ছিল যে, যে ঘরে বসিতে হইবে, সে ঘরটি যেন অন্ধকার হয় বা খুব মৃদু আলো থাকে, নীবব নিস্পন্দ হইয়া টেবিলের উপবে হাতেব পাতা উপুড়ভাবে খুব আলগোছে রাখিয়া বসিতে হইবে, হাত দুখানামাত্র ছোঁযাইযা রাখিতে হইবে, মোটেই যেন চাপ না পড়ে। আবাব ইহার অপেক্ষাও সহজ আর একটা উপায়ের কথাও ঐ প্রবন্ধে ছিল। একটা সাধারণ শ্রেণীব বেশমী কাজ-করা সোলার টুপী চিত কবিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দুই তিন জনে টুপীটার কানা ছুঁইয়া থাকিতে হইবে। তাহা হইলে টেবিলটা বা টুপীটা খানিক পরেই নড়িয়া-চড়িয়া উঠিবে। তখন বেশ বুঝা যাইবে যে, বাহির হইতে অন্য একটা শক্তি আসিয়া ঐরূপ কাণ্ড করিতেছে।

মা প্রবন্ধটি শুনিয়া বলিলেন, 'টুপী রাখিয়া পরীক্ষা করাটা খুবই সহজ। সন্ধ্যাও হইয়া আসিতেছে; বেশ, আজই দেখা যাক।' মা'র কথামত আমি একটা টেবিল বাছিয়া লইলাম। টেবিলটা গোল ও ছোট, ঠিক মাঝে মাত্র একটি পায়া। টেবিলটার উপর কচু-ফুল রাখা হইত, অন্য কাজে উহা বড় লাগিত না। টেবিল পাতিয়া আমি টুপীটা পাড়িয়া উহার উপরে রাখিলাম। তাহার পরে প্রবন্ধের উপদেশ মত আমরা টুপীর কানা আলগোছা ছুঁইয়া বসিলাম। আমি আর আমার মা ছাড়া সেই ঘরে আর একটি বালক ছিল। ছোট বালক। তাহাব বয়স ১২ বৎসর। পরে জানা গিয়াছিল, সেই বালকটি না কি ভূতের বেশ ভাল বাহন বা "মিডিয়ম্"। যাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া ভূতেরা আসে, তাহাদিগকে বাহন বা মিডিয়ম বলে। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন "মিডিয়ম্" শব্দটি বা মিডিয়মের কাজ-কর্ম কিছুই জানিতাম না, বুঝিতামও না। টুপী ছুঁইয়া বসিবার সময় আমরা কেহই ভাবি নাই যে, একটা কিছু ঘটিবে। কিন্তু আশ্চর্য্য! খানিক পরেই টুপীটা অর্দ্ধপাকে ঘুরিয়া পড়িল, আমি খুবই বিস্মিত হইলাম।

আমি ভাবিলাম, হয় তো মা টুপীটা নড়াইয়াছিলেন। মা ভাবিলেন, হয় তো আমি নড়াইয়াছি; কিন্তু একটু পরেই আমাদের সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। টুপীটা একটু পরেই মহাবেগে ঘর ঘর শব্দ করিয়া ঘুরিতে লাগিল। সে এমন ঘুর যে, তাহার উপর আমাদের হাত রাখাই কঠিন

হইয়া উঠিল। পরামর্শ করিয়া তখন আমরা হাত উঁচু করিলাম। টুপীটাও হাতের সঙ্গে ঝুলিতে লাগিল। তাহার পর পড়িয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি খুবই আশ্চর্য বোধ করিলাম। আমি আবার ঐ মজা দেখিবার নিমিত্ত টুপীটা ধরিয়া বসিলাম। অবশ্য মা ও সেই বালকটিও ধরিয়াছিল। সেবার খানিকটা সময় টুপীটা নড়িল না। কয়েক মিনিট আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইল। পরে টুপীর মধ্যে ভূতটা সত্য সত্যই আসিয়া পড়িল; আগেকার মত টুপী এবারও আমাদের হাতের সঙ্গে বাধিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু এবারও শুধু টুপী নহে। টুপীর সঙ্গে সঙ্গে উহার গায়ে বাধিয়া টেবিলও উঠিতে লাগিল। টেবিল ও টুপী বেশ শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। চমৎকার কাণ্ড! পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি পরাভব মানিল। আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। নীচে চাহিয়া দেখিলাম, টেবিলটা মেঝে হইতে প্রায় ছয় ইঞ্চি উঠিয়াছে। টেবিলের নীচে আমি পা চালাইয়া দেখিলাম, কেহ দুষ্টামী করিয়া ঐরূপ করিয়াছে কি না। দেখিলাম, নীচে বা কাছে কাহারও পা নাই। প্রথমবারে যখন টুপীটা উঠিয়াছিল, তখন ভাবিয়াছিলাম, ঐ ছেলেটা বোধ হয় বদমায়েসী করিয়া ঐরূপ করিয়াছে। যদিও বালকটিকে ঐরূপ করিতে দেখি নাই, তথাচ তাহার উপর যেন একটা কেমন সন্দেহ আসিতেছিল; কিন্তু এবার আর কোন সন্দেহই আসিল না। ঐরূপ টেবিলটাকে শূন্যে উঠাইয়া রাখা বড় সহজ নহে। বালক ঐরূপ করিতে গেলে নিশ্চয় ধরা পড়িত। প্রায় দুই মিনিট পরে টেবিলটা পড়িয়া গেল। তাহার একটু পরেই টুপীটাও পড়িয়া গেল। এই ব্যপার দেখিবার জন্য আমার কৌতুক বাড়িয়া গেল। আমি আবার টুপী ধরিয়া বসিলাম। শুধু আর একবার নহে। সেই রাত্রিতে কয়েক মিনিট পরে পবে অনেকবার ভূতটাকে আনিবার চেষ্টা করিলাম। ২/১ বারের পরই বিশ্রী নড়িতে লাগিল। সে এত জোরে নড়া যে, টুপীটি টেবিলের উপর হইতে ছিট্‌কাইয়া তফাতে গিয়া পড়িল। ভূতটা হয় তো আমাদের সঙ্গে কথা বলিতে আসিয়াছিল। আসিলে কি হয়? আমরা কথা বলিবার উপায়টা জানিতাম না। তাই তাহার সঙ্গে কথা বলিতে পারিলাম না। টেবিলটা বিশ্রী নড়িতেছে, একটা অদ্ভুত শক্তি উহার মধ্যে আসিয়াছে, ইহা দেখিয়াই আমরা খুব মজা বোধ করিতে লাগিলাম। একটা মরা মানুষ যে আসিয়াছে, সে কথা তখন আমি একটুও ভাবি নাই। আমি ভাবিলাম—বাঃ! একটা নূতন শক্তির আবিষ্কার হইল!

পরদিন এই ঘটনার গল্পটা কয়েক জন বন্ধুর কাছে বলিলাম। তাঁহাদের মধ্যে এক জন বলিলেন—"হ্যাঁ, এমন হইয়া থাকে, আমিও ২/১ বার বৈঠকে বসিয়া এই রকম ব্যাপার দেখিয়াছি।" সেই দিন সন্ধ্যাকালে আমি আবার ঐরূপ করিয়া ভূত আনিবার সঙ্কল্প করিলাম। সেই বন্ধুটিকে আমাদের সঙ্গে বসিবার অনুরোধ করায় তিনিও বসিতে রাজী হইলেন। সন্ধ্যাকালে তঁহাকে লইয়া আমরা যথারীতি টেবিলে বসিলাম। টেবিল দুলিতে লাগিল। বন্ধু তখন সঙ্কেত দ্বারা নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। টেবিলও সঙ্কেত অনুযায়ী চমৎকার নড়িয়া নড়িয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল; যে ভূতটি আসিয়াছিল, সে জ্ঞানী বুদ্ধিমান্ ভূত নহে; তাই তাহার কাছে খুব ভাল ভাল সংবাদ বড় বেশী পাইলাম না। সে ভূতটা যেন একটু অসভ্য গোছের। গায়ের জোর দেখানই যেন তাহার ইচ্ছা। ভূতটা ঘরের মধ্যে ভারী ভারী জিনিসপত্রগুলি সব জোরে মেঝের উপর আছড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, অনেকগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়াও গেল; কিন্তু মানুষগুলির গায়ে আঘাত লাগিল না। আমাদের দলে একজন বন্ধু একটু নাস্তিক রকমের ছিল। সে বড় কিছু বিশ্বাস করিতে চাহিত না। ভূতটা তাহার পায়ের উপর একটা পিতলের অগ্নি-নিবারক দ্রব্য ফেলিয়া দিল।

আরও উপদ্রব

আমরা দ্বিতীয়বার যখন টেবিলে বসিয়াছিলাম, তখন সেই সোলার টুপীটা চুরমার হইয়া গিয়াছিল। সেটি ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা তাহার পর হইতে টেবিলের উপর শুধু হাত রাখিয়াই বসিতাম। বসিলে কয়েক সেকেণ্ড পরেই টেবিল এত নড়িত চড়িত যে, তাহার উপর প্রায়ই হাত রাখিতে পারিতাম না। তৃতীয়বার বসিলে টেবিলটা ভয়ানক জখম হইল। উহা দুলিয়া দুলিয়া একটু ক্ষান্ত হইত; আবার দুলিত। এই কাণ্ড! যখন একটু স্থির হইত, তখন আমরা উহার উপর হাত রাখিয়া বসিতাম। আর সেই সময় উহার ভিতর হইতে কেমন এক রকম স্বন্ স্বন্ শব্দ হইত। টেবিল ধরিয়া বসিয়া আছি, একরূপ স্বন স্বন্ শব্দ হইতে লাগিল। তাহার পর মনে হইল, যেন কি একটা মেঝের উপর আসিয়া পড়িল। চাহিয়া দেখিলাম—সেটা একটা স্ক্রুপ্। ভাবিলাম, এটা ভূত কোথায় পাইল আর আনিলই বা কেন? আরও দুইবার ঐরূপ স্বন্ স্বন্ শব্দ টেবিলের তলা হইতে শুনা গেল, আরও দুইটা স্ক্রুপ আসিয়া মেঝেয় পড়িল। তখনও প্রকৃত ব্যাপারটা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

তাহার পরেই ভয়ানক কাণ্ড! ভীষণ একটা শব্দ হইল। টেবিলের তলা হইতে উপরের দিকে কে যেন হঠাৎ একটা বিশ্রী লাথি মারিয়া দিল। টেবিলটা উপরের দিকে লাফাইয়া উঠিল, আমরাও হুড়-মুড় করিয়া পড়িয়া গেলাম। শব্দটা আর ধাক্কাটা যেমন ভাবে হইল, তাহাতে বোধ হয়, ওটা যেন ভারি বুট-জুতা-পরা পায়ের লাথি! ধম্ ধম্ করিয়া পর পর তিন চারিবার লাথি আসিয়া টেবিলের গায়ে পড়িল। ফলে টেবিলের তক্তা পায়া হইতে ছিটকাইয়া গেল। তখন শুধু পায়াই ঠক্ ঠক্ করিয়া দুলিতে লাগিল। সবগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মেঝেয় আসিয়া পড়িল; পড়িয়াও স্থির থাকিল না; মেঝেয় পড়িয়াও হুটাপুটি করিতে লাগিল। খুব একটা মসৃণ জায়গায় একটি টাকাকে টোকা মারিয়া যদি ঘুরাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা খানিকটা খুব ঘোরে, তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া যায়; টেবিলটাও মেঝের উপর ঐরূপ ভাবে কাঁপিতে লাগিল। তখন দুই জন খুব বলবান্ লোক উহার উপর যাইয়া চাপিয়া বসিল। তাহাদের গায়ে যত জোর আছে, তত জোর দিয়া কাঁপুনি থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পারিল না। টেবিল একভাবেই কাঁপিতে লাগিল। তাহার পর উহাতে এমন এক ঝাঁকি আসিয়া লাগিল যে, ঐ দুইটা লোক ছিটকাইয়া তফাতে গিয়া পড়িল। দুইটা লোককে ঠিক্‌রাইয়া ফেলিতে ভূতের যেন একটু কষ্টও হইল না।

টেবিল ভাঙ্গিয়া গেলে সেই তক্তাখানা মেঝের কার্পেটের সঙ্গে চাপিয়া ধরিলাম। আশ্চর্য! তখনও উহার নীচে হইতে সেই আগেকার মতই লাথির ধাক্কা আসিয়া লাগিতেছিল। কার্পেট ও শক্ত মেঝে এ দুইটা থাকা সত্ত্বেও লাথি। ঐ দুইটাতে লাথি মারার পক্ষে যেন কোনই বাধা হইতেছিল না। এই সব উপদ্রব থামিয়া গেলে, আমরা টেবিলটা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। তখন বুঝিলাম যে, পায়া হইতে টেবিলটাকে খুলিয়া ফেলাই ভূতটার যেন ইচ্ছা। তাই তিনটা স্ক্রুপ্ ও খুলিয়া ফেলিয়াছিল। কেমন করিয়া খুলিয়া ফেলিল, আমরা বুঝিলাম না; কিন্তু স্ক্রুপ তুলিবার যন্ত্র দিয়া তুলিলে যেমন সুন্দরভাবে স্ক্রুপগুলি উঠিয়া যায়, এও সেইরূপ ভাবেই উঠিয়াছিল। আর একটা স্ক্রুপে মরিচা ধরিয়া গিয়াছিল, সেটাকে ভূতটা তুলিতে পারে নাই। তাই লাথি মারিয়া মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল।

ভূতের বৈঠকে এইরূপ কাণ্ড প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ১৮৭০ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে স্ট্যাটেন্ দ্বীপে এইরূপ একটা কাণ্ড ঘটে। মিঃ রবার্ট ডেল্ আউয়েন্ তাঁহার "বিতর্কভূমি" নামক পুস্তকের ১৮৫ পৃষ্ঠায় ঘটনাটি বর্ণনা করিতে করিতে এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

"তাহার পর আলো নিবিয়া গেলে অন্ধকারে যেন ভূতের জোরটা আরও বাড়িয়া গেল। তখন ভয়ানক উপদ্রব হইতে লাগিল। ভূতের অত জোর ইহার আগে আমি আর কখনও দেখি নাই। আমার মনে হইল, খুব বলিষ্ঠ লোকও ঐ রকম ভাবে টেবিলকে ধরিয়া ঝাঁকি দিতে পারে না। সে এমন জোরের ঝাঁকি যে, সে রকম ঝাঁকি গায়ে আসিয়া লাগিলে যে কোন লোকই মারা পড়িতে পারে।"

একটা অজ্ঞাত শক্তির প্রমাণ

"আমি বাড়ীতে বসিয়া বৈঠক করিয়া ঐ সব কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইলাম। যাঁহারা পাকা প্রেত-ব্যবসায়ী, তাঁহারা ঐগুলিকে তুচ্ছ মনে করিতে পারেন; কেন না, তাঁহারা আরও কত কি দেখিতে পান, কিন্তু আমি তুচ্ছ ভাবিতে পারিলাম না। আমি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম। যদি ঐ সব কাণ্ড পরের বাড়ীতে হইত, কোন ব্যবসাদার লোকের কাছে ঘটিত, তাহা হইলে ভাবিতাম, হয় তো উহার মধ্যে জুয়াচুরি আছে। তাহা হইলে একটা সন্দেহও আসিত; কিন্তু ঐ ব্যাপারগুলি আমার নিজের ঘরে, নিজের কাছে ঘটিল। তখন সন্দেহ থাকিতেই পারে না। তাই ভাবিলাম—এ বিষয়ের আরও তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এ প্রেত-ব্যাপার লইয়া বিস্তর পুস্তক আছে, সে খবর আমি জানিতাম না। ঐ সকল পুস্তক পড়িয়া যে পরলোকের একটা প্রমাণ পাইব, তাহাও কখন ভাবি নাই। বাড়ীতে বসিয়া ঐ সব কাণ্ড দেখিমাত্র তখন বুঝিলাম যে, সূক্ষ্মজগতে দেবতার মত প্রাণী আছে, তাহাদের বিশাল শক্তি। বিজ্ঞান সে শক্তির কথা আজও টের পায় নাই। ঐ শক্তি দেখিয়াই আমার মনে হইল আচ্ছা, উহাকে মানুষের উপকারে কি আনা যায় না? উহাকে আয়ত্ত করিবার কি কোন উপায় নাই?

বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া আর বেশী কিছু জানিতে পারিলাম না। বৈঠকে বসিতে গেলেই মা বারণ করিতেন। তিনি বলিতেন, 'উহাতে আর কাজ নাই, ভূতগুলা আসিয়া আমার জিনিসপত্র কেবল ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করে।' তাই মা'র কথামত খুব বাড়াবাড়ি করিতাম না। যখন দেখিতাম, ভূতটা বড়ই গোলমাল আরম্ভ করিয়া দিল, তখন একটু ক্ষান্ত হইতাম; তখন বন্ধ করিয়া দিতাম। ভূতটা একটু শান্ত হইলে আবার আরম্ভ করিতাম। ভূত ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করে, কখনও বা মানুষের মত গলার স্বর বাহির করিয়া থাকে। আমার বৈঠকে এ সব ব্যাপার কখনও হয় নাই। আমার ভাগ্যে ও সব কিছু হইল না। আমার বাড়ীতে আসিয়া ভূতটা টেবিল নাড়াইত, কখন বা সেটাকে শূন্যে তুলিয়া ধরিত। সে এইরূপ ভদ্র ব্যবহার করিত। আর উৎপাত করিত না। এক দিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে বলা হইল—আচ্ছা, আমরা টেবিলে হাত দিব না, তুমি উহাকে শূন্যে তোল দেখি! যেমন বলা, অমনই টেবিলটা দুই হাত পরিমাণ উঁচু হইয়া উঠিল। আমরা সকলেই তফাতে দাঁড়াইয়া ঐ কাণ্ড দেখিতে লাগিলাম। উহা এক মিনিটেরও বেশী সময় শূন্যে ঝুলিয়া থাকিল। তাহার পর আস্তে আস্তে কার্পেট-মোড়া মেঝের উপরে নামিয়া পড়িল।

ভূতের দ্বারা আলোর সৃষ্টি

বাড়ীতে যে সময় বৈঠক করিয়া বসিতাম, তখন নানা রকম আলোক চক্ষুতে পড়িত। ভূতেরা যে ইচ্ছা কবিয়া ঐ আলোক দেখাইত, তাহা নহে। বৈঠকে বসিলে নানারূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখা

যায়। আলোক দেখাও সেইরূপ একটা। তিন রকমের আলোক চোখে পড়িত—(১) জোনাকী পোকার মত ছোট ছোট আলোকের টুক্‌রা আমাদের হাতের মধ্যে খেলা করিয়া বেড়াইত; (২) কখন কখন খুব বড় রকম একটা আলোকময় দেহ দেখা দিত, কখন কখন সেটা আবার অর্দ্ধচন্দ্রের মত আকার ধরিয়া বসিত; (৩) কখন বা বিদ্যুতের মত খুব উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি প্রকাশ পাইত। আমার বৈঠকের সময় এক দিন এইরূপ একটা আলোক আমার ঘরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। অকটা টবে বড় একটা গাছ ছিল। আলোকটা উহার উপর দিয়া যাওয়ায় টব উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। আর দেখা গেল যে, ঐ গাছের পাতাগুলি ঝল্‌সাইয়া গিয়াছে। ঠিক যেন বিদ্যুতের তেজে ঝল্‌সানোর মত। প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর আলোক বিদ্যুতের আলোর মত। দ্বিতীয় আলোকটা দীপালোকের মত। আলোক চোখে পড়িত, কখন কখন কালো মূর্তিও দেখা যাইত, তথাচ এমন কথা বলিতে পারি না যে, বৈঠকে ভূত স্থূল-মূর্তি ধরিয়া আমাকে দেখা দিয়াছে। ঐ সব ব্যাপার রাত্রির বৈঠকেই দেখা যাইত। দিনের বেলাও বৈঠক করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতেও ২/১ টা অদ্ভুত ঘটনা দেখা গিয়াছে। যে ঘরে বৈঠক করিতাম সে ঘরটি যেন একটা বৈদ্যুতিক শক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল। বৈঠকের কাজ-কর্ম হইয়া গেলেও হয় তো এক ঘন্টা পরে দ্রব্য-সামগ্রীগুলি ক্যাঁচ-কুঁচ করিয়া একটা অদ্ভুত রকমের শব্দ করিতে লাগিল; কয়েক দিন দেখলাম, টেবিলটা ২/৩ ফিট আপনা আপনি সরিয়া গেল। টেবিলের উপর ফুলের টব বসান রহিয়াছে, বৈঠকের কাজ তাহার অনেক আগেই মিটিয়া গিয়াছিল তখনও টেবিল হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। এই কাণ্ড!

বৈঠকের ভূতগুলা সংবাদ দিতে বড় রাজী হয় না। তাহারা বড় স্ফূর্তি করিয়া লম্ফঝম্প করে—তাই সংযত হইয়া, ধৈর্য্য ধরিয়া, আস্তে আস্তে ভদ্রলোকের মত বসিয়া সংবাদ দেওয়া কাজটা আদৌ পছন্দ করে না। তাহা ছাড়া টেবিলে আসিয়া কথা বলা বা বানান করিয়া লেখা, এ সব কাজ তাহাদের পক্ষে বড়ই বিরক্তিকর। আমরা বানান করাইয়া সংবাদ লইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হই না। দেখিলাম, উহারা বড়ই চঞ্চল, ধৈর্য্য ধরিতে পারে না। সাধারণতঃ বৈঠকের ভূতেরা আসিয়া বিশ্রী জোরে, আর অনেকক্ষণ ধরিয়া নাচিতে আরম্ভ করে। কোন বাদ্য-যন্ত্র বাজাইলে উহারা বেশ তালে তালে নাচিতে থাকে। প্রেতের বৈঠকের জন্য একটা বেশ গান আছে; গানটির প্রথম সারিটা এই—"মিলিব কি আমরা তটিনী-তীরে।' যখনই ভূতটা আসিতে দেরী করে, তখনই আমরা ঐ গানটা গাহিয়া থাকি। গান শুনিবামাত্র ভূতেরা স্ফূর্তির সঙ্গে আসিয়া হাজির হয। বৈঠকে আমি যে সকল ভূত দেখিয়াছি, তাহার অনেকগুলিই ভয়ানক পাজী। উহাদের কাছে যে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই মিথ্যা ও অসঙ্গত। উহারা অনিষ্ট করিতে খুব মজবুত। একবাব আমি উহাদিগের প্রদত্ত সংবাদ মিথ্যা, এই কথা বলিবামাত্র টেবিলটা লাফাইয়া আমার দিকে বোঁ বোঁ করিয়া আসিতে লাগিল। আমি যদি টেবিলটাকে ধরিয়া না ফেলিতাম, তবে উহাতে নিশ্চয়ই গুরুতর আঘাতই পাইতাম। আমি শূন্য-পথে টেবিলটা ধরিয়া ফেলিলেও উহা আমার হাত ছাড়িয়া আমার মুখের উপর পড়িবার জন্য ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতে লাগিল। তখন আমার বন্ধুরা সকলে মিলিয়া উহাকে ধরিয়া তফাৎ করিল। তাই রক্ষা পাইলাম। বাঘ ভালুকে যেমন আক্রমণ করে, সেই ভূতুড়ে টেবিলটাও আমাকে সেইরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু শীঘ্রই উহার এত জোর, অত রাগ, যেন নিভিয়া গেল। যেমন টেবিল, আবার তেমনিটিই হইল।

ব্যবসায়ী "মিডিয়ম্"দের ব্যবহার

বাড়ীর বৈঠকে ঐ সকল কাণ্ড দেখিয়া প্রেততত্ত্বটা ভাল করিয়া জানিয়া শুনিয়া লইবার নিমিত্ত আমার প্রাণে খুব বলবতী একটা ইচ্ছা জন্মিল। অনুসন্ধানে জানিলাম, প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর পুস্তক ও সংবাদপত্র আছে। শুনিলাম, সেগুলি পড়িলে, আর মিডিয়মদের সঙ্গে মিশামিশি করিলে অনেক কথা, অনেক ব্যাপার, অনেক তথ্য জানা যায়। আমি তখন খুব বড় বড় বৈঠকে যাইতে লাগিলাম। সে সব স্থানে অনেক ভাল ভাল ব্যাপার অবগত হইলাম; কিন্তু দেখিলাম, যে বৈঠকে খুব কম লোক জমে, সেখানেই খুব বেশী, আর খুব সুন্দর সুন্দর তথ্য জানা যায়। তাই দেখিয়া আমি ছোট ছোট ও বে-সরকারী বৈঠকে যাইতে লাগিলাম। শুধু তাহাই নহে, আমি বাড়ীতে বৈঠক করিয়া মিডিয়ম্‌দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে লাগিলাম। আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে কোনরূপ জুয়াচুরি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই ভাবে আমি ঐ পথের অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, বৈঠকে বাস্তবিক মৃত্যুব্যক্তি আসিয়া থাকে—সব সময় না আসিলেও অনেক সময় আসে। প্রেততত্ত্ব আলোচনাকালে আমি সকল রকম "মিডিয়ম্"ই দেখিয়াছি। মিডিয়ম্‌দের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক দেখিয়াছিলাম। এক দল ভাল, এক দল মন্দ, আর এক দল ভালও নহে, মন্দও নহে, যেন উদাসীন। যাহারা ভাল, তাহারা বেশ আগ্রহের সঙ্গে যত্নপূর্বক অলৌকিক কাণ্ডগুলি অপরকে বুঝাইয়া দেয়। আর এক দল আছে, তাহারা ঘোর মূর্খ ও অশিক্ষিত। হয় তো মনটা তাহাদের ভাল, কিন্তু মূর্খ বলিয়া অপরের উপকার করিতে পারে না, বুঝাইয়া দিতেও সমর্থ হয় না। আর এক দলের সঙ্গে আমার বনিবনাও হইল না। তাহারা আমাকে ধর্মধ্বজী, তোষামোদকারী ও অবিশ্বাসী বলিয়া বুঝিয়া লইল। কোন্ দলের কাছে আমি তথ্য জানিতে পারিব, তাহা শীঘ্র বুঝিয়া লইয়াছিলাম। অন্যের কাছে না যাইয়া, আমি কেবল তাহাদের কাছে যাইতে লাগিলাম। বহু বৎসর তাদের সঙ্গে চলা-ফেরা করিয়া বিস্তর তথ্য জানিলাম। যাহা জানিলাম, তাহা খুবই অদ্ভুত; বলিলে হয় তো সাধারণে বিশ্বাসই করে না; যাহারা প্রেত-তত্ত্ব জানে, কেবল তাহারাই তাহা বিশ্বাস করিতে পারে। আর তাহা এত বেশী যে, সবগুলি বলিলে একখানা প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া ওঠে। পূর্বে প্রেততত্ত্বের যে কয়টা শ্রেণীর কথা বলিয়াছি, সেই শ্রেণী কয়টির ব্যাখ্যা করিতে যে কয়টা তথ্যের আবশ্যক হইবে, মাত্র সেই কয়টিই পরে প্রসঙ্গক্রমে বলিব। ইহার পরের অধ্যায়ে আমরা প্রেত-তত্ত্বের শ্রেণীবিষয়ে আলোচনা করিব।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

জীবিত মানুষের ঘাড়ে ভূত

ভূতেরা সব মানুষের ঘাড়ে চাপিয়া বসে না। কারণ, সকল মানুষ তাহাদেব চক্ষুতেও তাহাদেব পক্ষে উপযুক্ত নহে। যাহারা তরল-প্রকৃতি, তাহারাই না কি ভূতের উপযুক্ত মক্কেল। তাহাদিগকে আমরা "বাহন" বা "মিডিয়ম্" বলিয়া থাকি। যখন ভূতের ইচ্ছা হয়, কোন জীবিত মানুষের সঙ্গে কথা-বার্তা বলিবে, তখন সে ঐরূপ একটা বাহনের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসে। স্থূল-মূর্তি ধরিয়া মানুষেব সঙ্গে কথা বলা ব্যাপার খুব সহজ নহে, তাহাতে অনেক শক্তির প্রয়োজন; ঘাড়ে চাপিয়া কথাবার্তা বলাই সর্বাপেক্ষা সহজ উপায়। স্থূল-মূর্তি ধবিব ভাবিলেই ধরা যায় না। তাহারও নিয়মাদি শিখিতে হয়। আর সে নিয়মাদিও খুব দুঃসাধ্য। ভূত বাহনের দেহটাকে নিজের দেহ করিয়া বহন করে। ভূত যতক্ষণ বাহনের দেহ অধিকার করিয়া থাকে, ততক্ষণ বাহনের নিজের বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই প্রকাশ পায় না। নিজের দেহটা ও নিজের মস্তিষ্কটা সবই সে ভূতকে উৎসর্গ করিয়া দেয়। মিডিয়মরাই এইরূপ ভাবে উৎসর্গ করিয়া দিতে পারে, অন্যে পারে না। মিডিয়ম্দের এটা একটা বৈশিষ্ট্য। এই যে ভূতকে নিজের দেহ ছাড়িয়া দেওয়ার কথা বলিলাম, সেটা সম্পূর্ণ বা আংশিক দুই-ই হইতে পারে। বাহনের জ্ঞানের লোপ ঘটে নাই, অথচ তাহার হাতখানিতে নিজের অধিকার নাই, ভূতে হাতখানিকে দখল করিয়া উহা দ্বারা আপন কথা লিখিয়া দিতেছে, এমন দেখা যায়। আবার দেখা যায় বাহনের জ্ঞান ঠিকই আছে, অথচ ভূতে তাহার গলাটা অধিকার করিয়া উহা দ্বারা আপন কথা ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। এইগুলি হইল ভূতের আংশিক অধিকারের কথা। আবার ভূতেবা বাহনের সমস্ত দেহটাও অনেক সময় দখল করিয়া বসে। খুব গাঢ় নিদ্রার সময় আমাদের যেমন জ্ঞান-চৈতন্য কিছুই থাকে না, চৈতন্য সম্পূর্ণভাবে দেহটাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেইরূপ ঐ সময় বাহনের চৈতন্য দেহটাকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তখন সেই ভূত আসিয়া ঐ অসাড় দেহটাকে দখল করিয়া বসে। তখন সেই অবস্থায় ভূতেরা যে সব কথা বলে বা যে সব কাণ্ড করে, পরে বাহনের তাহার কিছুই মনে পড়ে না। বাহন সে সব কিছুই জানে না। দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে দুই একটা ঘটনা বলিতে পারিলেও সাধারণতঃ জ্ঞানলাভের পর কিছুই মনে থাকে না।

ভূতেধরা লোকের কথাবার্তা

অনেক মিডিয়ম্ ভূতাবিষ্ট হইয়া কথা বলে। অনেক লোকের অনেক প্রশ্নের উত্তর ঐরূপভাবে দিয়া থাকে। তাহারা ইচ্ছা করিলেই ভূতাবিষ্ট হইতে পারে। এই রকম মিডিয়ম্ বিস্তব আছে। ভূত আনাটা উহাদের একরূপ ব্যবসা বলিলেও চলে। আবার এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা ভূত আনা, মিডিয়মের মুখে ভূতের কথাবার্তা শুনা ব্যাপারটাকে ধর্ম বলিয়া মনে করে। অন্যান্য লোক যেমন রবিবারে গির্জায় যাইয়া পুরোহিতের ধর্মোপদেশ শুনে, ইহারা সেইরূপ

রবিবারে সন্ধ্যায় কোন বৈঠকে যাইয়া মিডিয়মের মুখে প্রেতের কথাগুলি কথাবার্তা শুনিয়া থাকে। পুরোহিতের ধর্মোপদেশগুলি, আর প্রেতের সাধারণতঃ একই প্রকৃতির। উহাতে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বা বিশেষ রকমের একটা নূতন তথ্য কিছুই পাওয়া যায় না। সেই একই রকমের একঘেয়ে ভাবের বুলি। প্রেতের কথাগুলির মধ্যে একটা অনিশ্চয়ের ভাব দেখা যায়; কিন্তু তাহা হইলেও কথাগুলি খুব উদার। উদার বটে, কিন্তু একঘেয়ে। সেই ছোট কালের দ্বিতীয় ভাগের বুলি—"মিথ্যা কথা বলিও না," "সৎ হইলে সুখী হইবে, অসৎ সঙ্গে অনেক দোষ" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই উপদেশগুলি একঘেযে রকমের শত শতবার শুনা যায়। তাহার কারণ, কথাগুলি খুব খাঁটি, খুব সত্য। ঐ সকল উপদেশ লোকে বাল্যকালে কোন পুস্তকে বা কপিবুকের মাথার উপরে লেখা দেখিলেও প্রাণে তাহাদের একটা ছাপ পড়ে নাই, উপদেশগুলির অনুসারে চরিত্র গড়িয়া তুলিবারও কেহ কোন দিন চেষ্টা করে নাই; কিন্তু যখন কোন ভূত কাহারও ঘাড়ে চাপিয়া ঐরূপ উপদেশ দেয়, বা বৈঠকের টেবিল নাড়াইয়া, শব্দ করিয়া সঙ্কেত দ্বারা ঐ রকম কথা প্রকাশ করে, তখন সকলেরই ঐ কথাগুলির উপর রুচি হয়। সকলেই তখন উপদেশ অনুযায়ী চলিতে ইচ্ছা করে। এ হিসাবে প্রেতের উপদেশ নিরর্থক নহে। খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক করিতে না পারিলে দেহের পুষ্টি হয় না। সেইরূপ সদুপদেশ গ্রহণ করিতে না পারিলেও জ্ঞানের পুষ্টি হয় না। ঐ সকল উপদেশ ঐরূপভাবে ভূতের মুখে শুনিয়া অনেকে গ্রহণ করিতে পারে—তাহাতে তাহাদের চরিত্রের উন্মেষ ও পুষ্টিসাধনও ঘটিয়া থাকে।

মিডিয়মের মুখে ভূতের কথা সাধারণতঃ খুব অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় না , কেন না, জুয়াচুরিও অনেক ঘটে। যাহাদের আভিনায়িক বিদ্যা অল্প একটুও আছে, নাটুকে লোকগুলির মত যাহারা একটু অভিনয় করিতে পারে, ইহা-উহা সাজিয়া দুই চারিটি কথা-বার্তা বলিতে পারে, তাহারা মিডিয়ম্ হইলে অতি সহজেই ভূতেধরা লোকের ভঙ্গী নকল করিয়া ভূতের একটা মাঝামাঝি রকমের বক্তৃতা শুনাইয়া দিতে সমর্থ হয়। এইরূপে সাধারণ লোকের চোখে তাহারা ধূলি দিযা থাকে। তাই বলিয়া সবগুলিই জুয়াচুরি নহে। কোন কোন স্থলে চমৎকার ব্যাপার দেখা যায়। মিডিয়ম্ যে ভাষা আদৌ জানে না, হয় তো সেই ভাষা তাহার মুখ দিযা বাহির হইতে লাগিল; গলার স্বরও হয় তো সম্পূর্ণ অন্যরূপ; কথা বলিবার ভঙ্গীটাও হয় তো একেবারেই পৃথক্ রকমের; আবার যে সকল তথ্য বাহির হইল, তাহা হয় তো সেই মিডিয়ম্ আদৌ জানে না। এই সব হইল সত্য সত্যই ভূতের ব্যাপার। আবার অনেক স্থলে দেখা যায়, মিডিয়মের মুখে যে সকল কথা বাহির হইল, তাহাতে রাশি রাশি ব্যাকরণ ভুল, রাশি রাশি ইতর ভাষা, রাশি রাশি কথার অপব্যবহার, বিশ্রী ভুল উচ্চারণ! মিডিয়ম্ অশিক্ষিত, তাই ঐ দুর্গতি! এখানে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভূত-প্রেত আদৌ আসে নাই, বাহনই অভিনয় করিতেছে। যাহা হউক, সকল মিডিয়ম্ই যে অভিনয় করে, তাহা নহে। মিডিয়ম্গুলির কথা আলোচনা করিবার সময় আমাদিগকে কয়েকটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। মিডিয়ম্ নিজে যেরূপ লোক, তাহার কাছে সেইরূপ শ্রেণীর ভূতই আসিয়া থাকে। মিডিয়ম যদি মূর্খ হয়, তবে তাহার নিকটে মূর্খ ভূতই আসে, মিডিয়ম্ যদি পণ্ডিত হয়, তবে তাহার ঘাড়ে পণ্ডিত ভূতই চাপিয়া বসে। তাহা ছাড়া আর একটা ব্যাপার ঘটে। ভূতের নিকট হইতে মিডিয়মরা যে সব সংবাদ পায়, সেগুলি তাহারা সাধারণতঃ নিজের নিজের স্বাভাবিক ভাষায় খুব অতিরঞ্জিত করিয়া ব্যক্ত করে।

ভূতের লিখিয়া দেওয়া

ভূত কখন কখন এক জনের দেহ্ অধিকার করিয়া দিব্য সুন্দরভাবে নির্ভুল করিয়া কোন কিছু লিখিয়া দেয়। যে ব্যক্তি ভূত হইয়া লিখিতেছে, সে জীবিতকালে যেমন লিখিত, এ লেখাও অবিকল সেই ছাঁদের। আবার কখন কখন ছাঁদ বদলাইয়া যায়। মিডিয়মের ছাঁদ আর ভূতের নিজের ছাঁদ মিলিয়া মিশিয়া একটা নূতন ভঙ্গীর লেখা হইতে থাকে, এই রকম নূতন ভঙ্গীটাই বেশী বেশী দেখা যায়। এই নূতন ভঙ্গীর লেখাটা বিশ্রী, পড়িয়া ওঠা যায় না, কতকগুলি হিজি বিজি্ আঁচড় বলিলেও চলে। এই সব লেখার মধ্যে ভাষার কায়দা দেখিয়া বা বিশেষ প্রমাণ দ্বারা ভূতকে আসল ভূত বলিয়া জানা যায়। আবার কখন কখন এইরূপ লেখার মধ্যেই অতি অদ্ভুত রকমের জুয়াচুরি ঘটিয়া থাকে। হয় তো আদৌ ভূত আসে নাই, মিডিয়মেরই যত কাণ্ড। লেডবিটার বলেন—"আমি দেখিয়াছি, এক জন মিডিয়ম কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেকটা লেখা লিখিয়া ফেলিল; কিন্তু লেখাগুলি এতই পিছন দিকে হেলিয়া পড়া যে, দর্পণের সাহায্য ব্যতীত তাহা পড়া যায় না। আবার অন্য রকমও দেখিয়াছি। মিসেস্ জেঙ্কিনসের সঙ্গে এক দিন বৈঠকে বসিয়াছিলাম। তাঁহার কোলে এক বৎসরের একটি শিশু ছিল। সেই শিশুর ক্ষুদ্র হস্তে একটা পেন্সিল দেওয়া হইল। আশ্চর্য্য! শিশু দৃঢ় মুষ্টিতে খুব দ্রুতভাবে ভূতের বক্তব্য লিখিয়া গেল। এক বৎসরের শিশু কেমন করিয়া ঐরূপ লেখা লিখিল তাহার আলোচনা আমরা করিব না। লেখা যে শিশুর মস্তিষ্কপ্রসূত নহে, তাহা নিশ্চয়ই; আর শিশুর মাও যে লেখেন নাই, তাহাও ঠিক; কেন না, শিশু যখন লিখিল, তখন তাহার মা তফাতে বসিয়া শিশুকে ধরিয়া ছিলেন। এই জেঙ্কিনসের কুমারীকালে নাম ছিল—কেট্ ফক্স। এই নামেই ইনি বেশী পরিচিতা। ইনিই বালিকা-বয়সে ১৮৪৭ খৃস্টাব্দে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে ঠক্ ঠক্ শব্দ দ্বারা ভূতেরা অনেক কথার জবাব দিতে পারে। আর এই তথ্য হইতেই বর্তমান প্রেততত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে।"

মিডিয়ম না হইলেও কখন কখন পরীতে পায়

মিডিয়ম্ না হইলেও অনেককে অনেক সময় পরীতে ধরে। পরী আসিয়া হাতে চাপিয়া বসিল; বসিয়া বিস্তর গূঢ় সংবাদ লিখিয়া দিল; এরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। আর এই লেখার উপর খুব বেশী লোকের অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা। বিস্তর বড় ঘরের সম্ভ্রান্ত মহিলারা বলেন যে, "থিওসফি" দ্বারা আমরা নূতন শিক্ষা কিছুই পাই না; আমাদের পরীর প্রসাদে ও সব উপদেশ আমরা বহুকাল হইতেই জ্ঞাত আছি। লেড়বিটার এই শ্রেণীর পরীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিয়াছিলেন যে, ইঁহারা পরী নহেন। ইঁহারা খুব জ্ঞানী লোকের প্রেতাত্মা। ইঁহারা ভুবর্লোকের অনেকটা খোঁজ-খবর জানেন; আর ইঁহাদের বিশ্বাস যে, পৃথিবীর লোকদিগকে ভুবর্লোকের তথ্য জানাইয়া দিতে পারিলে পৃথিবীর ও মানবজাতির বিশেষ উপকার করিয়া দেওয়া হয়। এই দৃঢ় বিশ্বাসবশতঃ না কি ইঁহারা নরমপ্রকৃতি মহিলাদিগকে খুঁজিয়া ধরিয়া বসেন; আর তাহাদিগের প্রাণে একটা ধারণা জন্মাইয়া দেন যে, তাহারাই মানবের উদ্ধারকর্ত্রী। তাহাদিগকেনা কি মানবের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে আর তাহাদের নাম না কি উত্তরকালে মানব জাতির হৃদয়পটে অঙ্কিত থাকিবে।

বিস্তর সাধুর প্রেতাত্মা মৃত্যুর পরে পরোপকারে ঐরূপে ব্রতী হইয়া থাকেন। মৃত্যুর পর তাঁহারা জীবন-মরণের অনেক তথ্য জ্ঞাত হইয়া পরোপকারের জন্য ঐরূপ উৎসুক হন। মরণের

পর তাঁহাদের মনে হয়, তাঁহারা জীবিতকালে যদি ঐ সব তথ্য জানিতে পারিতেন, তবে তাঁহাদের চরিত্র, কার্যকলাপ ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিত। তাঁহাদের মনে হয়—আর এরূপ মনে হওয়াও খুব ঠিক্—যে, পৃথিবীবাসীদিগকে পরলোকের এই সব তথ্য জানাইয়া দিতে পারিলে খুব বড় রকমের একটা পরিবর্তন পৃথিবীতে দেখা দিবে। তাঁহাদের কিন্তু মনে হয় না যে, ঐ সকল তথ্য পৃথিবীবাসীদিগের পক্ষে নূতন নহে, বহু বহুবার উহা এখানে ঘোষিত হইয়াছে, অনেক সাধনসিদ্ধ ব্যক্তি ঐ সকল কথা সাধারণকে জানাইয়া গিয়াছেন। উহা একরূপ চর্বিতচর্বণ বলিলেও চলে। একাল-সেকাল কেহই ঐ সকল কথায় কর্ণপাত করে নাই। পুনরায় উহার ঘোষণা করিলেও কেহ শুনিবে না। "যখন মহাত্মা মোজেস ও ঐরূপ আরও বিস্তর ঈশ্বরদর্শী মহাত্মা বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন নাই, তখন মবা মানুষ ফিরিয়া আসিয়াও যদি সশরীরে দেখা দিয়া পরলোকের তথ্য বলিতে আরম্ভ করে, বোধ হয়, তাহা হইলেও তাহার কথা কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিবে না।"

যে সকল মহিলা থিওসফি পড়িতে চান না, তাঁহাদের পোষা বা পারিবারিক ভূতের কাছেই সব শুনিয়া থাকেন, তাঁহার যদি থিওসফির পুস্তকাদি কিছু কিছু পড়েন, আর একটু নিরপেক্ষভাবে ভাবিয়া দেখেন, তবে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিবেন। তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, থিওসফিতে তাঁহাদের শিখিবার অনেক তথ্যই আছে। অহঙ্কার তাঁহাদের মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা সবজান্তা—এই বিশ্বাস, এই অহঙ্কার তাঁহারা ছাড়িতে পারেন না। আর তাঁহারাই পৃথিবীবাসীদের উদ্ধারকর্ত্রী, এই সুখ-স্বপ্নটাও তাঁহাদের কাছে বড়ই মনোমোহন রকমের। তাঁহাদের প্রিয় ভূতের নিকট হইতে যেটুক জানিতে পারেন, তাহা থিওসফির তথ্যের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। কখন কখন একটু আধটু মেলে মাত্র। থিওসফির তথ্য খুব বড়, খুব বিপুল। উহাদের জ্ঞান তাহার তুলনায় ছিটে-ফোঁটা বলিলেও চলে। তাহা ছাড়া, তাঁহাদের পারিবারিক ভূতেরা যে তথ্য বলেন, তাহা এলোমেলো,—বিশৃঙ্খল, আর থিওসফি-প্রচারিত তথ্য সত্যের অনুগামী।

কখন কখন দেখা যায় যে, উহাদের পারিবারিক ভূতটি প্রাচ্যদেশবাসী কোন সাধুর প্রেতাত্মা। সুতরাং তাঁহার ঘোষিত তথ্যে থিওসফির গন্ধ থাকা খুবই স্বাভাবিক। থিওসফি ব্যাপারটা নূতন নহে; ইহা খুব প্রাচীন জিনিস। পৃথিবীর সর্বত্রই মূল তথ্য বরাবরই প্রচারিত আছে, কেবল স্থানে স্থানে খৃস্টানধর্মের ভ্রম-কুহেলিকায় ইহা আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। তাই খৃষ্টধর্মের সংকীর্ণ ক্ষুদ্রগণ্ডীর বাহিরে দৃষ্টি করিলেও বড় রকমের জিনিস চক্ষুতে পড়ে, আর তাহাতে থিওসফির সংস্রব দেখা যায়। পাঁচরকম বড় বড় তথ্যের মধ্যে আমরা থিওসফির যে পরিচয় পাই, তাহা খুব সামান্য। ব্লাভাট্স্কি বা অন্যান্য মহাজন প্রচারিত থিওসফির ন্যায় তাহা পূর্ণাবয়ব নহে।

প্লান্চেট নামক যন্ত্রে কেহ যদি হাত দিয়া বসে, তবে কখন কখন ভূত সেই হাতে আসিয়া বেশ লিখিয়া দেয়, নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়া যায়। এই রকম ভাবে লিখিয়া দেওয়াটাই যেন ভূতের পক্ষে সহজ বলিয়া বোধ হয়। প্লান্চেট যন্ত্রটা বোধ হয় অনেকে দেখিয়াছেন, একখানি ক্ষুদ্র তক্তা পায়ার উপর সহজভাবে বসানো। প্লান্চেটে ভূত কেমন করিয়া আসে, সকল সময় আসে কি না, আমরা উপস্থিত সে বিষয়ের আলোচনা করিব না। তবে এমন দেখা গিয়াছে যে, প্লানচেটে যে সকল কথা যে ভাষায় বাহির হইতেছে, তাহা যে ধরিয়াছে, সে হয় তো আদৌ জানে না। কখন কখন মনে হয়, যে ব্যক্তি প্লান্চেট ধরিয়াছে, সে যেন নিজেই তক্তাখানি

নড়াইয়া নড়াইয়া লিখিতেছে; আবার কখন কখন মনে হয় যে, তক্তাখানি নিজেই যেন অন্য বাহিরের শক্তিতে বিশ্রী বেগে ঘুরিতেছে। আমরা একটা টুপীর নীচে টেবিল নড়িবার কথা বলিয়াছি। সে নড়াটা এই শেষোক্ত নড়ার মত।

ভূত কখন কখন চিত্র করিয়া দেয়

হাতে ভর করিয়া ভূতে যেমন লিখিয়া দেয়, সেইরূপ কখন কখন কাহারও হাতে আসিয়া চিত্র পর্য্যন্তও আঁকিয়া বসে। চিত্র আঁকা আর লেখা একই প্রথায় ঘটে। তবে চিত্র আঁকা ব্যাপারটা খুব কম দেখা যায়; কারণ, লেখার মত উহা সকলেই জানে না। যে সকল ব্যক্তি চঞ্চলচিত্ত, সহজেই যাহাদিগকে ভূত ধরিতে পারে, ভূত কখন কখন তাহাদের হাতের উপব বসিযা অতি শীঘ্র কাহারও একটা মূর্ত্তি বা কোন একটা স্থানেব চিত্র অতি সুন্দরভাবে আঁকিয়া দেয়। কতকগুলি প্রেতব্যবসায়ী আছে, তাহারা শুধুই মৃত ব্যক্তির ফটো আঁকিয়া দিযা থাকে; উহাতে তাহাদের বেশ দুই পয়সা উপার্জন হয়। আমি এরূপ একটা ছবি আঁকিতে-পারা প্রেত-ব্যবসায়ীকে চিনি। তাহার ছবিগুলিতে মোটামুটি কাজ চলিতে পাবে। কিন্তু জীবিত মানুষের অঙ্কিত ছবির মত ভূত অবস্থায় আঁকা ছবি তত সুন্দর হয় না। আবার ছবিতত্ত্ব অন্য বকমও আছে। দিব্যদৃষ্টি ব্যক্তিরাও অনেক সময় ফটো আঁকিয়া দেয়। এরূপ স্থলে ভূতাবেশ বলা চলে না, তাই আমরা এ বিষয়ের আলোচনা কবিতে চাই না।

ভূতাবিষ্ট লোক অথবা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা যখন কোন মবা মানুষের ফটো আঁকিতে আরম্ভ করে, তখন সেই মরা মানুষটার প্রেতাত্মাকে যে তাহাদের সম্মুখে বসিয়া থাকিতেই হইবে, তাহা নহে। তবে সে সময় তাহাদের সম্মুখে তাহার আসিযা হাজির হওয়াও নিতান্ত অসম্ভব বলা যায় না, কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি বৈঠকে বসিয়া তাহার কোন এক জন মৃত বন্ধুব কথা ভাবিতে থাকে, তখন জীবিত বন্ধুর জীব্র চিন্তার ফলে মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্ম-দেহটার ভাবান্তব ঘটে। কখন মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা স্থূল-মূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দেয়। সেই সময় সকলেই তাহাকে দেখিতে পায। তখন তাহার ফটো লওয়া খুবই সহজ-সাধ্য হইয়া উঠে।

ব্যবসায়ীর প্রতারণা

লেডবিটার কতকগুলি প্রতারকের কথা বলিয়াছেন। ভূত না আসিলেও অনেক প্রতারক ব্যবসায়ী না কি ভূত আসার ভাণ করিয়া অনেক সময় কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তিব প্রেতাত্মাকে আনিতে হইবে, সেই ব্যক্তি জীবিতকালে কথা বলিবার সময় মুখের যেরূপ ভঙ্গীটা করিত, যেরূপ ভঙ্গীতে কথা বলিত, ব্যবসাদার মিডিয়ম অবিকল সেইরূপ ভঙ্গীব অনুকরণ করিয়া বসে।

মিডিয়মরা মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার অনুকরণ করিয়া কথাবার্ত্তা বলে। শুধু তাহাই নহে, কথাবার্ত্তা বলিবার সময় তাহাদের মুখে সময় সময় খুব বেশী বকম ভাবান্তর হইয়া যায়। যে ব্যক্তি মিডিয়মের কাছে বসিয়া মৃত বান্ধবের কথা শুনিতে আসে, তাহার প্রাণে খুব একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মে যে, মৃত বান্ধবের প্রেতাত্মা মিডিয়মের ঘাড়ে চাপিয়া বসুক। তাই সে মিডিয়মের মুখখানিকে নিজের চিন্তার ও বাসনার বেগে বান্ধবের মুখের মতই দেখিয়া ফেলে। সব সময় না হইলেও অনেক সময় এই রকম একটা দৃষ্টিভ্রম ঘটে। এটা মিডিয়মের মুখের যথার্থ

পরিবর্তন নহে—এটা ভ্রমমাত্র। এই অবস্থায় মিডিয়মের ফটো লইলে প্রেতাত্মার ফটো উঠিবে না, মিডিয়মের নিজের মুখের ফটোই উঠিবে।

আবার কখন কখন মিডিয়মের ঘাড়ে প্রেতাত্মা এরূপভাবে চাপিয়া বসে যে, সত্য সত্যই তাহার মুখের ভঙ্গী লোপ পায়, আর সেখানে প্রেতাত্মার মুখশ্রীই ফুটিয়া ওঠে। অদ্ভুত ব্যাপার! এ অবস্থায় ফটো তুলিলে মিডিয়মের মুখ না উঠিয়া ভূতের মুখখানিই জ্বলন্তভাবে ফুটিয়া উঠিবে। আসল ভূতের মুখশ্রী ফুটিয়া ওঠা ব্যাপারটা দুই রকম হইতে দেখা যায়। কখন কখন দেখা যায়, ভূতের মুখের কোন একটা অংশ মিডিয়মের মুখে যথাযথ ভাবে ফুটিয়া উঠিল। মুখের যে অংশটা ভূতের মুখের সঙ্গে মিল খায়, সেটা ঠিক থাকে আর যে অংশটা মিল খায় না, সেটার উপর পাতলা পাতলা রকমের জমাট মূর্তি দেখা দেয়, তাহাতে সমস্ত মুখখানি যেন ভূতের মুখের মত হইয়া দাঁড়ায়। মুখের যে অংশটার উপর ঐরূপ ভৌতিক জমাট আসিয়া ঘটে, অংশটা মিডিয়ামের স্বাভাবিক মুখখানির অপেক্ষা কেমন যেন একটু অস্বাভাবিকরূপ বড় দেখায়। এই হইল মুখ-শ্রী ফুটিবার একরকম ব্যাপার। আবার অন্য রকমও দেখা যায়। ভূতের মুখখানি হয় তো মিডিয়মের মুখখানি অপেক্ষা ছোট। বড় মুখখানির উপর ছোট মুখখানি ফুটান খুবই শক্ত কথা। এরূপ ক্ষেত্রে মিডিযমের স্থূল মুখখানি বাস্তবিকই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভূতের সেই ছোট মুখখানির মতই হইয়া ওঠে। যাহারা এই সকল গুহ্যতত্ত্ব বহু দিন ধরিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া আলোচনা না করিযাছে, তাহাদের পক্ষে এ ব্যাপার বুঝিয়া ওঠা একেবারেই অসম্ভব। তাহারা মনে করিবে, মিডিয়মের একখানা এত বড় মুখ ভূতের প্রভাবে কেমন করিয়া ছোট হইবে?—হইতেই পারে না। তাহারা বলিবে—এ অসম্ভব। আমাদের স্থূল-শরীরের অবস্থা খুবই অস্থায়ী, খুবই পরিবর্তনশীল; আবশ্যক হইলে অবস্থাবিশেষ সহজেই ইহার পরিবর্তন হইতে পারে। এ তত্ত্ব আমাদের মধ্যেও অনেকে জানেন না।

অতি সহজেই স্থূল-শরীরের পরিবর্তন হয়

আমাদের স্থূল-দেহের পরিবর্তন অতি সহজেই হয়। এ বিষয়ের বিস্তর উদাহরণ আছে। সুখের বিষয়, এরূপ ব্যাপার খুব বেশী বেশী ঘটে না। ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি "আইশিশ্ আন্‌ভেল্ড" নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডের ৩৮৬ পৃষ্ঠায় অনেকগুলি এই রকম ঘটনার কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনাগুলি পড়িলে দেখা যায়, মা গর্ভাবস্থায় যদি উৎকট ভাবনা ভাবেন, তবে গর্ভস্থ শিশুর স্থূল-শরীর অতি বিশ্রী রকমে পরিবর্তিত হইয়া যায়। কর্ণেলিয়স্ জেম্মা বলেন, এমন একটা ছেলে জন্মিয়াছিল যে, জন্মের পর দেখা গেল, তাহার কপাল কাটা, হু হু করিয়া রক্ত পড়িতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ঐ শিশুর পিতা রাগান্ধ হইয়া শিশুর মাতাকে কাটিবে বলিযা ভয় দেখাইবার সময় রমণীর কপালের কাছে না কি সে একখানি উন্মুক্ত তরবারি লইয়া গিয়াছিল। তাহার ফলেই মাতার ভয় হয়। আর সেই ভয়েই গর্ভস্থ শিশুর ললাট সত্য সত্যই আহত হইয়া সেখান হইতে রক্তস্রাব হয়। আশ্চর্য্য কাণ্ড! ভন্ হেল্ মন্টেগুর "ডি ইনজেক্‌টিস মোটিরিয়া লিবস্" নামক পুস্তকে দেখা যায় যে, মেক্‌লিন সহরের একজন দর্জ্জির স্ত্রী গর্ভাবস্থায় এক দিন দেখিলেন যে, ঝগড়াঝাটি করিতে করিতে এক জন সৈনিকের একখানা হাত কাটা গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া রমণী বড়ই ব্যথিত ও অভিভূত হইলেন। তাঁহার মানসিক উৎকণ্ঠার ফলে তাঁহার গর্ভস্থ শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে দেখা গেল, শিশুর একখানিমাত্র হাত, অপরখানি ছিন্ন, খুব

রক্তস্রাব হইতেছে! এন্‌টোয়ার্প্‌ সহরের এক বণিকের স্ত্রী গর্ভাবস্থায় এক জন সৈনিকের একখানা হাত কাটা যাইতে দেখেন। ফলে, প্রসবের পর দেখা গেল, তাঁহার প্রসূত মেয়েটির একখানি হাত ছিন্ন, শোণিত-ধারা ছুটিতেছে। আল্‌ভার ডিউক আদেশ দিয়া ১৩ জন ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করেন। এই দারুণ ঘটনা একটি স্ত্রীলোক গর্ভবস্থায় দেখিয়াছিলেন। ফলে, প্রসবের পর দেখা শিশুর সর্বাবয়ব নিখুঁত, কেবল মস্তকটি নাই, ছিন্ন স্কন্ধ হইতে রুধির-ধারা ছুটিতেছে।

স্থূলদেহের যত কিছু ত্রুটি, সবই মায়ের মানসিক অবস্থার ফল। স্থূল পরমাণুপুঞ্জের উপর মনের কতই প্রভাব! দেহের দোষ-ঘাট ঐ প্রভাবেরই পরিচয়। মায়ের চিন্তায় যেমন ভ্রূণের দৈহিক পরিবর্তন ঘটে, ঠিক সেইরূপ ভাবে চিন্তাপ্রভাবে অনেক সিদ্ধপুরুষ বা ক্যাথারিন্‌ ইমারিকের মত রমণীরা আপন আপন দেহের পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন। "প্রকৃতির নৈশ ভাগ" গ্রন্থের ৩৮৪ পৃষ্ঠায় আমরা আর একটা ভয়ানক ব্যাপারের বিবরণ জানিতে পাই। সেখানেও দেখা যায়, বলবতী উৎকণ্ঠায় স্থূলদেহের পরিবর্তন ঘটিয়াছিল।

"মস্কো নগর হইতে ডাক্তার কার্ণারের নামে একখানা পত্র আসে। সেই পত্রে একটা ভয়ানক ঘটনার কথা ছিল। ফরাসীরা রুসীয় দেশ আক্রমণ করিলে রুসিয়ার এক জন কসাক সৈন্য এক জন ফরাসীকে তাড়াইয়া একটা কাণা গলির মধ্যে লইয়া যায়। পলায়ন করিবার পথ ছিল না। সেখানে দুই জনে ভয়ঙ্কর লড়াই আরম্ভ হয়। ফলে, ফরাসী গুরুতররূপে আহত হইয়া পড়ে। একটি লোক ঐ গলির মধ্যে বাসা ভাড়া করিয়াছিল। সে লড়াই দেখিয়া এত ভয় পাইয়াছিল যে, দেখা গেল, ফরাসীর গায়ে যেখানে যেখানে অস্ত্রাঘাত হইয়াছিল, তাহার নিজের গায়েও ঠিক সেইখানে আপনা-আপনি বিদীর্ণ হইয়াছে।"

ভূতেরা কেমন করিয়া স্থূল-শরীর ধারণ করে, সেই বিষয়ের প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ের পুনরায় আলোচনা করিব। কেবল এইটুকু বলিয়া রাখি যে, ভূত আসিয়া চাপিয়া বসিলে মিডিয়মের দেহের পরিবর্তন ঠিক ভূতের দেহের মত হইয়া পড়িতে পারে। সেটা খুবই স্বাভাবিক, আর কখন কখন সেরূপ ঘটিয়াও থাকে। এরূপ ঘটনা খুব সচরাচরই ঘটে না। মিডিয়মের দেহটাকে ঠিক নিজের মত করিয়া তোলা কাজটা ভূতের পক্ষে একটা শক্ত ব্যাপার। তাই বোধ হয়, তাহারা এতটা করে না। সাধারণভাবে দেখা দেওয়া, কথা বলা প্রভৃতি অনেকটা সহজ পথেই তাহারা বেশী সময় আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। পরিষ্কার দিনের বেলায়ও মিডিয়মের ঘাড়ে ভূত আসিয়া বসে দেখা যায়। কিন্তু মূর্তি ধরিয়া দেখা দেওয়া ব্যাপারটা মিট্‌মিটে আলোর মধ্যে না হইলে হয় না। ইহার গূঢ় কারণ আছে। পরে আমরা সে বিষয় বুঝাইয়া বলিব।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ভূতের বৈঠকে দিব্যদৃষ্টির বিষয়

বিলাতের অঞ্চলে বৈঠক করিয়া ভূত আনা হয়। এরূপ বৈঠক করিয়া বসা সেখানে একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। ঐ সকল বৈঠকে বিস্তর অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। ভূত আসিয়া কত অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেয়। আমরা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইয়া থাকি। কিন্তু অবাক্ হইবার কারণ কিছুই নাই; কেন না, মানুষ মরিয়া গেলে ভুবর্লোকে যাইয়া ওঠে, তখন সকলেই প্রায় ঐরূপ শক্তিলাভ হইয়া থাকে; সকলেই অতি সহজে ঐ সব অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারে। লেড্‌বিটার সাহেব "দিব্যদৃষ্টি" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ঐ সকল অদ্ভুত শক্তির কথা অনেক লিখিয়াছেন। মরণের পর মানুষের শক্তি যে কত বাড়িয়া যায়, তাহা সেই বইখানি পড়িলেই পাঠক জানিতে পারিবেন। একখানি পুস্তক বন্ধ আছে, অথচ প্রেতাত্মা তাহার ভিতরের লেখাটা পড়িয়া গেল; একখানি পত্র খামের মধ্যে পুরা আছে, খামখানি শীলমোহর করিয়া আঁটা, অথচ সে পত্রের লেখা প্রেতাত্মা পড়িয়া দিল; বাক্স তালাবদ্ধ, অথচ প্রেতাত্মা বলিয়া দিল যে, বাক্সের মধ্যে এই এই দ্রব্য আছে। এইরূপ তাহাদের অদ্ভুত শক্তি! প্রেতাত্মা একজনের ঘাড়ে আসিয়া চাপিয়া বসে, বসিয়া তাহার মুখে ঐ সকল কথা প্রকাশ করিতে থাকে; অর্থাৎ সেই লোকটাই বলিয়া দেয় যে, বাক্সের মধ্যে অমুক অমুক জিনিস আছে, পত্রে অমুক অমুক কথা লেখা আছে। মিডিয়ম তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে থাকিয়া ঐ প্রভাবে বলিতে থাকে। আবার কখন কখন প্রেতাত্মা আসিয়া মুখে কিছু না বলিয়া, মিডিয়মের হাতে নির্ভর করিয়া শ্লেটে কিছু লিখিয়া দেয়, কোন কোন সময় বা প্রেতাত্মা আপন গলার সুরে কথা বলিয়াও থাকে।

পৃথিবীতে কখন কি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহাও প্রেতাত্মা জানিতে পারে। জানিবার শক্তিটা আবার সকলের একরূপ নহে। ডাক্তার 'লী' প্রণীত—"সূক্ষ্ম-জগতের আবাস" নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৪৬ পৃষ্ঠায় এই মর্মের একটা গল্প আছে। গল্পটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কতকগুলি হারানো কাগজের ব্যাপার

ল্যাঙ্কাশায়ারের বোলটন্ শহরের একটা ব্যবসায়-বাণিজ্যের আফিস হইতে এক জন কেরাণীর মারফত্ অনেকগুলি টাকা ব্যাঙ্কে পাঠান হইয়াছিল। কোন কারণে ঐ টাকাটা জমা পড়ে নাই। কেরাণী দেখিল, —তাহার উপরে চুরির সন্দেহটা আসিয়া পড়িতেছে। কেরাণী ব্যাঙ্কে অনুসন্ধান করিল; ব্যাঙ্ক্ টাকা পাইবার কথা স্বীকার করিল না। তখন কেরাণী দোষ-মুক্ত হইবার আশায় চুরি ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এক দিন সে এক জন মিডিয়মের কাছে গেল ; কেন না, মিডিয়মেরা প্রেতের সাহায্যে অনেক রহস্য প্রকাশ করিতে পারে। মিডিয়াম কেরাণীকে সাহায্য করিবে বলিয়া ভরসা দিল। তাহার নিকট হইতে ব্যাপারটা সব শুনিয়া লইল, মিডিযম্ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া বসিল। বসিয়া, একটু পরেই বলিতে লাগিল—"হ্যাঁ, আমি দেখ্‌ছি, তুমি ব্যাঙ্কে গেলে—তাহার পরে দেখ্‌ছি,—তুমি ব্যাঙ্কের অমুক অমুক স্থানে গেলে—তাহার পরে দেখ্‌ছি, তুমি কতকগুলি কাগজ একটি কেরাণীব হাতে দিলে—তাহার পর সেই ব্যক্তি অমুক স্থানে

সেগুলিকে আর কতকগুলি কাগজের নীচে রাখিয়া দিল—আমি দেখ্‌ছি কাগজগুলি এখনও ঠিক সেইখানেই রহিয়াছে।”

কেরাণী মিডিয়মের কাছে ঐরূপ শুনিয়া ব্যাঙ্কে গেল। যাইয়া কেশিয়ারকে বলিল—“মহাশয়, অমুক স্থানে দেখুন তো আমার প্রদত্ত কাগজপত্র আছে কি না।” কেশিয়ার দেখিলেন, বস্তুতই কাগজগুলি সেখানে রহিয়াছে। কেশিয়ারের তখন মনে হইল যে, খুব ব্যস্ততাবশতঃ তিনি কাগজগুলি সেখানে রাখিয়াছিলেন। এই সংবাদটা খবরের কাগজে উঠিয়া গেল। লী সাহেবের এক জন আত্মীয় কাগজে ঐরূপ ব্যাপার পড়িয়া ঘটনাটি সত্য কি মিথ্যা জানিবার জন্য উপরি-উক্ত আফিসে পত্র লিখিয়াছিলেন। আফিস হইতে উত্তর পাইলেন—ঘটনাটি বস্তুতই সত্য। লী সাহেব ঐ ভদ্রলোককে এই ব্যাপার সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিলে, তিনি ১৮৭৪ খৃস্টাব্দের ৯ই নভেম্বর উত্তরে লিখিয়াছিলেন—“ব্যাপারটা খাঁটি সত্য। আফিসের পত্রখানা এখনও আমার বাড়ীতে আছে।”

ঐ কাহিনীটি পড়িয়া ঠিক বুঝা যায় না,—উহা মিডিয়মের দিব্য-দৃষ্টির উন্মেষ, কি কোন প্রেতাত্মার সংবাদ দেওয়া। প্রেতাত্মা আসিয়া বলিয়া দিয়াছিল, এইটিই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়; কেন না, মিডিয়ম সে সময়ের জন্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল। প্রেতাত্মা অতি সহজেই কেরাণীর মন হইতে কেশিয়ারকে টাকা দেওয়া তথ্যটি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল; তাহার পর অদ্ভুত শক্তিতে আপনাকে ঘটনার সাক্ষিরূপে মিশাইয়া ফেলিল, তাহার পব যেমন-যেমনটি ঘটিয়াছিল, সেইরূপ অবিকল বলিয়া দিল। নিম্নে আমরা আর একটি গল্প বলিব। সেটিও খুবসত্য ঘটনা। তাহাতেও দেখা যায়,—মিডিয়ম্ মনের কথা ঠিক ঠিক বলিয়া দেয়। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে লণ্ডন শহরে লংম্যান্ নামক এক ব্যক্তি “প্রেত-তত্ত্ব” নামক একটি প্রবন্ধ প্রচার করেন। ঐ প্রবন্ধের মধ্যে গল্পটা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। “লিন্ডডে-অধিপতির পরীক্ষা” নামক পুস্তকে ২১৫ পৃষ্ঠায় উহার বিবরণ আছে।

একখানা হারানো উইলের ব্যাপার

লংম্যানের কথা এই ঃ—

“আমার একজন বন্ধু তাঁহার ঠাকুর-মার উইল জানিবাব নিমিত্ত খুব বেশী ব্যস্ত হন। ঠাকুরমা ৪০ বৎসর হইল মারা গিয়াছেন, অথচ এই দীর্ঘকালের মধ্যে মৃত্যুব সার্টিফিকেট্ তাঁহার হস্তগত হইল না। আমরা এক দিন প্রেত-বৈঠকে বসিলাম। টেবিলে টক টক্ শব্দ করিয়া ভূত আসিল; বন্ধু তখন মনে মনে প্রশ্ন করিলেন। জানা গেল যে, উইলখানি উইলিয়ম্ ওয়াল্টার নামক এক ব্যক্তির হাতের লেখা। তিনি ‘হোয়াইট্ চ্যাপেল্’ নামক স্থানে বাস করেন। যে স্ট্রীটে ও যে নম্বব বাড়ীতে তিনি থাকেন, তাহাও প্রেত বলিয়া দিল। আমরা তাহার পব ‘হোয়াইট চ্যাপেলে’ গিয়া সে ব্যক্তিকে খুঁজিয়া পাইলাম। পরে তাঁহাব সহায়তায় উইলেব একটি নকলও পাইলাম। সে ভদ্রলোকটিকে আদৌ চিনিতাম না আব তিনিও এখান সর্বদা থাকিতেন না। কারণ, তাঁহার অবস্থা নেহাৎ মন্দ ছিল না ;—অন্যত্রও বাড়ী-ঘব ছিল। আমাদের বৈঠকে যিনি মিডিয়ম্ ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনিও সেই ভদ্রলোকটিকে চিনিতেন না। আর চিনিলেই বা কি? কারণ, আমার বন্ধু মনে মনে প্রশ্ন করিয়াছিলেন ; অথচ তাহার উত্তর মিডিয়মের মুখে ব্যক্ত হইতে লাগিল।”

তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি দিব্যদৃষ্টিপ্রভাবে কত কি বলিতে পারে

প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বিলাতে ভূতের বৈঠক বসে। এক জন মিডিয়ম তন্দ্রাচ্ছন্ন হন। তাঁহার তখন দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়। তখন তিনি বৈঠকের সভ্যবৃন্দ সম্বন্ধে বিস্তর সংবাদ দিতে থাকেন। দিব্যদৃষ্টির এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। বৈঠকের সভ্য-সংখ্যা যদি বেশী না হয়, তবে মিডিয়ম সকলেরই কথা ২/১ টা করিয়া বলেন; আর যদি বেশী হয়, তবে নির্দিষ্ট কতকগুলি সভ্যের কথা বলিতে বলা হয়। মিডিয়ম্ তখন তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিতে থাকেন।

লেড্‌বিটার বলেন,—এই দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে একটি পরিবারের গূঢ় কথা অনেকটা যথাযথভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। পূর্বে তাহা কেহ জানিত না। মিডিয়মের মুখে প্রকাশ হইলে, লোকে শুনিয়া অবাক্। কিন্তু আবার এমন সকল কথাও বাহির হয়, যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কথাগুলি বড়ই অনিশ্চিত—উড়ো-উড়ো রকমের। নিম্নে ঐ উড়ো রকমের একটা মিডিয়ম ব্যাপার দেওয়া হইল ঃ—

মিডিয়ম্। ঐ যে কোণে এক জন মহিলা দাঁড়াইয়া আছেন, উঁহার পিছনে এক জন পক্ক-কেশ বৃদ্ধ ভদ্রলোক রহিয়াছেন।

এক জন সভ্যা। উনি। উনি আমার পিতা।

মিডিয়ম্। হ্যাঁ ; উনি হাসছেন, মাথা নাড়্‌ছেন, ওঁর ভারী স্ফূর্তি দেখছি। আমি ওঁর সাদা দাড়িগুলির পর্যন্ত নড়া-চড়া দেখতে পাচ্ছি। ভারী স্ফূর্তি।"

সভ্যা। আশ্চর্য! কিন্তু মরণের পূর্বে বাবার দাড়ি ছিল না। হয় তো সূক্ষ্ম-জগতে যাইয়া তাঁহার দাড়ি হইয়াছে। অথবা হয় তো উনি আমার বাবা নহেন, হয় তো উনি আমার "জিম্" কাকা; তাঁহার দাড়ি ছিল।

মিডিয়ম্। আঃ! ঐ যে উনি আবার মাথা নাড়িতেছেন আর হাসিতেছেন। মরণের পর উনি যে খুব সুখী হইয়াছেন, সেই কথা বলিতে আসিয়াছেন।

সভ্যা। ঠিক! ঠিক! তাহা হইলে উনি নিশ্চয়ই আমার "জিম্" কাকা। কাকা বেচারীই তবে আসিয়াছেন! ৩০ বৎসর হইল, তিনি সমুদ্রে ডুবিয়াছিলেন। তখন আমার বালিকা-বয়স। তাঁহারও নবীন বয়স। ২৫ বৎসরের বেশী নয়—আহা, সেই তরুণ বয়সেই ডুবিয়া মারা গেলেন।

মিডিয়ম্। হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক—ঠিক। উঁহাকে আমি এখন আরও ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি। তুমি ঠিকই বলিয়াছ, সাদা ওটা দাড়ি নহে, ওটা কোটের নীচের জামা; মাঝি-মাল্লারা ঐ রকম জামা পরিয়া থাকে—ওটা সাদা জামা।

সকল সভ্য তখন একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"কি চমৎকার! বা বা! মরণের পরও এমন ভাবে মানুষ আসেন।"

লেড্‌বিটার সাহেব বলেন যে, ঐরূপ কথা মিডিয়মের মুখে ২০/২৫ বার শুনিয়াছেন। তিনি বলেন—এরূপ ভাবের কথা শুনিলে, মিডিয়মের শক্তির উপর খুব ভালরূপ একটা বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা জন্মে না। কিন্তু এমন দেখা যায় যে, মিডিয়ম্ এখন এলো-মেলো রকম কথা বলিতেছে, আবার সে-ই অন্য সময় হয় তো ঠিক ঠিক কথা বলিয়া বসে। উপরে যে মিডিয়মের কথা উদ্ধৃত হইল, উহারই মুখ দিয়া হয় তো এমন সব ব্যাপার বাহির হইতে পারে, যাহা জানা বা অনুমান করা উহার পক্ষে ঘোর অসম্ভব।

মিডিয়মের আর একটা পরীক্ষা

লণ্ডন শহরের একটা সামান্য শহরতলীতে লেড্‌বিটার সাহেব একটা মিডিয়ম দেখিয়াছিলেন। লেড্‌বিটারের কথাগুলি এই ঃ—

"দেখিলাম, মিডিয়ম্ এক জন পাড়াগেঁয়ে রকমের স্ত্রীলোক; আমি আর কখন তাঁহাকে দেখি নাই ; তাঁহাকে শিক্ষিতা বলিয়া বোধ হইল না। তিনি বৈঠকের প্রতি সভ্যকেই একই কথা বলিতে লাগিলেন। সকলেরই পিছনে না কি প্রেতাত্মা, আর প্রেতাত্মার গায়ে ঢিলে পোশাক ও মুখে মৃদুহাসি। আমিও বৈঠকের সভ্য ছিলাম। আমার বেলায় একটু অন্যরূপ বলিলেন— আমার কাছে না কি এক জন কৃষ্ণকায় বিদেশী ভদ্রলোকের প্রেতাত্মা ছিল, তাহার মাথার চারিদিকে কি একটা সাদা দেখা যাচ্ছিল। তাঁহার কথাগুলি আমার একটু সত্য বলিয়াই বোধ হইল।

মিডিয়ম্ তখন বলিতে লাগিলেন, যে, প্রত্যেক সভ্যের কাছেই পক্ককেশ, ঢিলে পোশাক-পরা, সৌম্যমূর্তি প্রেত দাঁড়াইয়া আছে! তখন আমার মনে হইল—মিডিয়ম চিন্তা-মূর্তি দেখিতে পান কি না, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এই মনে করিয়া, আমার কাছে যে স্ত্রীলোকটি সভ্যা হইয়া বসিয়াছিলেন, আমি খুব একাগ্রতার সঙ্গে চিন্তা করিতে লাগিলাম, যেন তাঁহার কাছে দুইটি গোল-গাল বালক দাঁড়াইয়া আছে। ভাবিলাম—মিডিয়ম ঐ সভ্যার কথা বলিবাব সময় কি বলেন দেখা যাক। সকলের কথা বলিতে বলিতে যখন ঐ স্ত্রীলোকটির কথা বলিতে আসিলেন, তখন মিডিয়ম অবিকল আমার চিন্তা-প্রকৃত সেই বালক দুটির কথা বলিয়া দিলেন। মিডিয়ম্ বলিলেন—ছেলে দুইটি তোমার। সভ্যা বলিলেন—আমার ছেলে অত ছোট নহে, তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে। মিডিয়ম্ বলিলেন—তবে তোমার নাতি হইতে পারে। সভ্যা বলিলেন—তাঁহার নাতি নাই। তখন রহস্যের উদ্ভেদ হইল না, কেহই তখন বুঝিতে পারিলেন না যে, বালক দুইটি কাহার? আমি এই ঘটনা হইতে দুই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম। প্রথম সিদ্ধান্ত এই করিলাম যে, মিডিয়ম ঐরূপ কথাবার্তা বলিতে পারেন। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই, মিডিয়মই হন আর প্রেতাত্মাই হন, কোন্‌টা স্থূলীভূত চিন্তা-মূর্তি আর কোন্‌টা ভুবর্লোকবিহারী সূক্ষ্ম-শরীরী জীবাত্মা, ইহা বুঝিয়া উঠিবার যথেষ্ট ক্ষমতা উঁহার নাই।"

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

প্রেতের আংশিক মূর্তি-পরিগ্রহ

ভূত আনিবার যে সকল বৈঠক হয়, তাহাতে অনেক রকম আশ্চর্য্য ব্যপার ঘটে। তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভূতের মূর্তি ধরিয়া দেখা দেওয়াটাই অদ্ভুত। ভূতেরা সূক্ষ্ম-জগতে সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করিতে থাকে। স্থূল-জগতে কাজ করিতে হইলে, তাহাদিগকে নিজের নিজের সূক্ষ্মদেহের উপর স্থূল-জগতের স্থূল পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণ করিয়া, একটা বহিরাবরণ নির্মাণ করিয়া লইতে হয়। এইরূপ ব্যাপারকে মূর্তিধারণ করা বলে। এই মূর্তিধরা তিন প্রকারে ঘটিতে পারে। লেডবিটার সাহেবের "ভূবর্লোক" নামক একখানি পুস্তিকায় ভূতের এই মূর্তিপরিগ্রহ বিষয়ে অনেক ব্যাপার লিপিবদ্ধ আছে। আমরা সেই পুস্তিকার ১৮ পৃষ্ঠা হইতে একটি স্থল উদ্‌ধৃত করিয়া নিম্নে সংযুক্ত করিলাম। স্থলটি এই ঃ—

প্রেত-বৈঠকে যাঁহারা সর্বদা যাতায়াত করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ভূতের মূর্তি তিন প্রকারে প্রকাশ হয়;—(১) স্পর্শ দ্বারা বুঝা যায়, অথচ দেখা যায় না; (২) দেখা যায়, অথচ স্পর্শ করা যায় না; (৩) দেখাও যায়, আবার স্পর্শ করাও যায়—এই তিনভাবে ভূত আসে। প্রথম রকমের আসাটাই খুব বেশী ঘটে। প্রায়ই শুনা যায়, ভূতকে কেহ দেখিতে পাইল না অথচ বৈঠকের কোন সভ্যের মুখে কে যেন আসিয়া হাত বুলাইয়া দিয়া গেল, কিংবা কোন ক্ষুদ্র একটা জিনিস এখান হইতে ওখানে সরিয়া গেল, কিংবা কোথাও কিছু নাই, অথচ একটা মানুষের গলার স্বর শুনা গেল। এই সব ব্যাপার প্রথমোক্ত প্রকারে আসিবার ফল। এই প্রকারে আসিবার সময় ভূতেরা যে স্থূল জড়াংশ গ্রহণ করে, তাহা আলোক প্রতিফলিত করিতে বা আলোকের বাধা জন্মাইতে পারে না; কেবল স্থূলবিশেষে বায়ু-মণ্ডলে স্পন্দন উদ্ভূত করিতে পারে। আমরা সেই স্পন্দনকে শব্দ বলিয়া শুনিয়া লই। আলোকের অবরোধ ঘটানো বা আলোক প্রতিফলিত করা এ সব ব্যাপার না পারিলেও ঐ শ্রেণীর জড়াংশে কতকটা নীলাভ রকমের মূর্তি প্রকট হইয়া থাকে। এই মূর্তি সাধারণতঃ দেখা না গেলেও ছবি তোলার ফলে প্রকটিত হয। তাই আমরা অনেক সময় শুনিতে পাই যে, অমুক ব্যক্তির ফটো তুলিবার সময় তাঁহার মৃত আত্মীয়ের প্রেত-আত্মা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফটো তোলাইয়াছে।

সুস্পষ্ট মূর্তিতে দেখা দিতে হইলে, ভূতের অনেকটা শক্তির প্রয়োজন। ততটা শক্তি না থাকিলে, উহারা ধুঁয়ার মত অস্পষ্ট মূর্তি ধরিয়া দেখা দেয়। এইরূপ ভাবে দেখা দেওয়াটা আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে ধরিয়া লইতে পারি। এরূপ ভাবে আসিলে, ভূতেরা বৈঠকের সভ্যদিগকে প্রায়ই বলিয়া থাকে—আমাদিগকে স্পর্শ করিও না। স্পষ্ট মূর্তি ধরা খুবই শক্তির কাজ। ভূতেরা সময় সময় সেরূপ শক্তিও প্রকাশ করে। কিন্তু সেরূপ ঘটনা খুব অল্পই দেখা যায়। ভূত যখন স্পষ্ট মূর্তিতে আসে, তখন তাহাকে দেখাও যায়, আবার স্পর্শও করা যায়।

স্পষ্ট মূর্তিতে দেখা দেওয়া ব্যাপারটা অনেকটা প্রথম প্রকারেরই মত। প্রথম শ্রেণীর বেলায় ভূতকে দেখা না গেলেও তাহাকে রীতিমত স্থূলীভূত হইতে হয়; নচেৎ সে কি করিয়া ঘরের জিনিসপত্র সরাইবে, কি কবিয়া একটা ভারী দ্রব্য উচ্চে তুলিবে, আর কি কবিয়াই বা

ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতে পারিবে? আমরা ভূত দেখিতে পাই না, অথচ ভূতের কাজ দেখি। এইরূপ ব্যাপারই খুব বেশী। কিন্তু কখন কখন ভূতকে কাজ করিতেও দেখা যায়। সেরূপ ঘটনা বড়ই বিরল। স্যার উইলিয়ম ক্রুক্স, এফ্, আর, এস তাঁহার সুবিখ্যাত "প্রেত-তত্ত্বের গবেষণা" নামক পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় ঐরূপ দেখা দেওয়ার একটা গল্প লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গল্পটি এই ঃ—

একখানি দীপ্তিশালী হাত

কুমারী ফাক্স্ এক জন মিডিয়ম্। আমি তাহার কাছে বসিয়াছিলাম। বৈঠকে আমরা ছাড়া আমার স্ত্রী ও আর এক জন সম্ভ্রান্ত মহিলাও ছিলেন। মহিলাটি আমার আত্মীয়া। আমি একখানি হাতে কুমারীর অর্থাৎ মিডিয়মের দুইখানি হাত ধরিয়া বসিয়াছিলাম। তাহার পায়ের তলা দু'খানিও আমার পায়ের উপরে ছিল। আমাদের সম্মুখের টেবিলের উপর কাগজ, আমার অপর হস্তে একটা পেন্সিল—এই অবস্থায় আমরা আছি। এমন সময় একখানি ঝক্‌ঝকে হাত ঘরের ছাদের দিক হইতে আমাদের কাছে নামিয়া আসিল। কয়েক সেকেণ্ড হাতখানি আমরা কাছে শূন্যে থাকিয়াই, আমার হাত হইতে পেন্সিলটা লইয়া ফেলিল; তাহার পর সেই কাগজখানির উপরে তর-তর করিয়া খানিকটা লিখিয়া পেন্সিলটা ফেলিয়া দিল। তাহার পর হাতখানি আমাদের মাথার উপর দিয়া উঠিয়া গেল। শেষে বেশ বে-মালুম মিলাইয়া গেল।

ভূতেরা অনেক সময় ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ করে কিংবা কোন একটা জিনিস নড়াইয়া চড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। এরূপ ঘটনা বেশী দেখা যায়। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, ভূতকে দেখা যাইতেছে না, অথচ খুব একটা ভারী জিনিস শূন্যে উঠিয়া গেল বা শূনে উঠিয়া ঝুলিয়া থাকিল। খুব বিরল হইলেও এমনটি দেখা গিয়াছে। আমরা ক্রুকস সাহেবের যে পুস্তকের কথা বলিলাম, সেই পুস্তকের ৮৯ পৃষ্ঠায় এইরূপ একটা ব্যাপারের উল্লেখ আছে। এইরূপ লেখা আছে ঃ—

"পাঁচটি বিভিন্ন স্থলে দেখা গিয়াছে যে, মধ্যাহ্ন-ভোজনের একখানি ভারী টেবিল মেঝে হইতে শূন্যে উঠিয়া পড়িল। কখন বা কয়েক ইঞ্চি উঠিয়াছে, কখন বা এক হাত পর্যন্ত উঠিয়াছে। এইরূপ ব্যাপার! আর ঐ সকল স্থলে কাহারও বজ্জাতি করিবার সম্ভাবনাও ছিল না। বেশ দেখা গিয়াছে, ঐগুলি খাঁটি ভূতেরই কাণ্ড। আবার এক দিন দেখা গেল, একটা খুব ভারী টেবিল পরিষ্কার আলোকিত ঘরে উপরের দিকে উঠিয়া পড়িল। তখন আমি মিডিয়মের হাত-পা আটকাইয়া ধরিয়াছিলাম। আবার আর এক দিন দেখা গেল, টেবিল উপরের দিকে উঠিয়াছে; তখন কেহই টেবিল ছুঁইয়া ছিল না; আর আমি পূর্ব হইতে এমন সাবধান ছিলাম যে, কাহারও দুষ্টামী করিবারও সম্ভাবনা না থাকে। এগুলির খাঁটি ভৌতিক ব্যাপার।"

লেড্‌বিটারের জীবনেও এইরূপ ব্যাপার আর একবার ঘটিয়াছিল। ভূতে তাঁহাকে টানিয়া ছাদের কাছে তুলিয়াছিল। সে কাহিনী ইহার পূর্বেই বলা হইয়াছে। "সূক্ষ্ম-জগতের দ্বারদেশে পদ-সঞ্চার" নামক গ্রন্থের ৭৪ পৃষ্ঠায় মিঃ রবার্ট ডেল্ আউয়েন্ ঐরূপ ভাবের একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভারী জিনিস শূন্যে লম্বিত থাকিল

"কাউন্ট্ ডি অরচেস্ নামক এক জন ফরাসী ভদ্রলোক প্যারিস শহরের নিকট বাস করিতেন। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখে দুই প্রহরকালে তাঁহার ভোজনাগারের টেবিলে বসিয়া

আমরা ৭ জন খাইতেছিলাম। টেবিলের উপর ফল ও মদ্য ছিল। দেখা গেল, টেবিলটি শূন্যে উঠিয়া পড়িল, আবার আস্তে আস্তে নামিল। টেবিল উঠিবার সময় আমরা ৭ জনই উহার চারিদিকে দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন টেবিলটি কেহই ছোঁয় নাই। আমরা সকলে উহা দেখিলাম। ইংরাজ সেনাপতি কিডের্ পুত্র ও ইঁহার স্ত্রী ১৮৫৯ খৃঃ এপ্রিল মাসে প্যারিস্ শহরে ২৮ নং 'রু ডি লা ফার্ম ডেস্ ম্যাথুয়া রিনস' ঠিকানায় সন্ধ্যার সময় জনৈক বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিড্-পত্নী একখানি চেয়ারে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মনে হইল, যেন চেয়ারখানি নড়িতেছে; বোধ হইতে লাগিল, যেন কোন লোক চেয়ারখানির নীচে হইতে ধরিয়া উপরের দিকে তুলিতেছে। তাহার পর চেয়ারখানি সত্য সত্যই ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। উঠিয়া প্রায় ৩০ সেকেণ্ডকাল শূন্যে ঝুলিয়া থাকিল। রমণীর পদদ্বয় মাটী হইতে ৪/৫ ফিট উচ্চে রহিল। অদ্ভুত ব্যাপার! তাহার পর চেয়ারখানি আবার ধীরে ধীরে আসিয়া মাটিতে নামিল। এমন বে-মালুম ভাবে উঠিল ও নামিল যে, রমণী কোনরূপেই ঝাঁকি বা ঠেলা বুঝিতে পারিল না। চেয়ারখানি যখন শূন্যে ওঠে, তখন কেহই উহা ছুঁইয়া ছিল না। কোন লোকও উহার কাছে ছিল না। কেবল রমণীর স্বামী পাছে পত্নীর কোনরূপ আঘাত লাগে ভাবিয়া, চেয়ারের কাছে গিয়া চেয়ার স্পর্শ করিয়াছিলেন। ঘরখানি সুন্দর আলোকে আলোকিত ছিল; কেন না, ফরাসীদের বৈঠকখানা রীতিমতভাবে সজ্জিত থাকে। আমরা সেখানে ৮/৯ জন ছিলাম, সকলেই ঐ ব্যাপারটা ভাল করিয়াই দেখিলাম। কিড্ ও তাঁহার পত্নী যখন ঐ গল্পটি বলিলেন, আমি তখন লিখিয়া লইলাম। তাঁহারা বলিলেন—মহাশয়, এই গল্পটা খাঁটি সত্য। আপনি আমাদের নাম দিয়া পর্য্যন্ত ইহা প্রকাশ করিতে পারেন;—তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

চেয়ার সুদ্ধ উপরে ঐরূপ ভাবে উঠিয়া যাওয়া ব্যাপার একটা-আধটা হয় নাই। ঐরূপ ব্যাপার অনেকবার ঘটিয়াছে। কিন্তু ৫ ফিটের বেশী উপরে উঠিতে বড় একটা দেখা যায় নাই। ক্রুক্স সাহেবও ঐরূপ ব্যাপার কয়েকটা দেখিয়াছেন। তাঁহার "গবেষণা" পুস্তকের ৮৯ পৃষ্ঠায় উহার বিবরণ আছে। সেই বিবরণ এই ঃ—

"এক দিন দেখিলাম, একখানি চেয়ারে এক জন রমণী বসিয়া আছেন, অথচ চেয়ারখানি মাটি হইতে কয়েক ইঞ্চি উপরে উঠিয়া পড়িল। আর এক দিনও ঐরূপ ভাবে উঠিল। সে দিন রমণী চেয়ারের উপরে পা তুলিয়া হাঁটু পাতিয়া বসিলেন, পাছে লোকের ধারণা হয় যে রমণীই ঐরূপটিই করিতেছেন, এই জন্যই চেয়ারের উপর পা তুলিয়া বসিলেন। তখন চেয়ারের চারিখানি পা-ই সকলের চোখে দিব্য পড়িল। চেয়ার ৩ ইঞ্চি উঠিয়া ১০ সেকেণ্ডকাল শূন্যে থাকিল। তাহার পর আস্তে আস্তে নামিল। আর একবার দুইটি বালক সমেত চেয়ার উপরে উঠিয়া গেল দেখিলাম। আমি জানু পাতিয়া বসিয়া দেখিলাম, চেয়ারের পায়ার দিকে খুব লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কেহই চেয়ার ছোঁয় নাই। মানুষের চাতুরী বা কৌশল সেখানেও ঘটে নাই,—একেবারে খাঁটি ভূতের কাণ্ড!

মিঃ হোমের বাড়ীতে যে ব্যাপারটা দেখিয়াছি, সেইটাই সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত। আমি তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনবার চেয়ারসুদ্ধ উপরে উঠিতে দেখিয়াছি। একবার উঠিবার সময় তিনি আরাম-চেয়ারে বসিয়াছিলেন, আর একবার চেয়ারের উপরে জানু পাতিয়া বসিয়াছিলেন। আর একবার চেয়ারের উপরে দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রত্যেকবারই খুব ভাল করিয়া দেখিয়াছি।

মিঃ হোম অনেকবার চেয়ারসুদ্ধ শূন্যে উঠিয়াছিলেন। অন্ততঃ একশতবার উঠিবার কথা লিপিবদ্ধ আছে। বিস্তর ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়াছেন। ইহার মধ্যে তিন

জনের নাম খুবই বিখ্যাত—আর্‌ল্ অব ডন র‍্যাভেন, লর্ড লিণ্ডসে ও ক্যাপটেন সি, উইন্। ইঁহারা হোমের শূন্যে উঠিবার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ সব বিবরণ যদি বিশ্বাস করা না যায়, তবে মানুষের কোন কথাই বিশ্বাস করা চলে না। কেন না, ধর্মশাস্ত্রই বল, আর ইতিহাসই বল, এত প্রমাণ-প্রয়োগ আর কুত্রাপি নাই। এরূপ দৃঢ় প্রমাণ কোন স্থানেই দেখা যায় না।"

হোমের কাণ্ডকারখানা যাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের এক জনের মুখে ঐ ব্যাপার কর্ণেল্ অল্‌কট্‌ও শুনিতে পান। তিনি "পরলোকের লোক" নাম পুস্তকে হোমের শূন্যে উঠিবার কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিও কয়েকটা অতি অদ্ভুত রকমের ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। তিনিও কয়েকটা অতি অদ্ভুত রকমের ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন।

লেড্‌বিটার্ নিজেও ঐরূপ তিনটি ঘটনা দেখিয়াছেন। খুব ভারী চেয়ারে মিডিয়ম্ বসিয়া আছে, তাঁহারাও চারিদিকে বসিয়া আছেন, মাঝে টেবিল, এমন অবস্থায় চেয়ারসুদ্ধ মিডিয়ম সকলের মাথার উপর দিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার পর চেয়ারখানি টেবিলের ঠিক মাঝখানে আসিয়া নামিল। লেডবিটার বলেন—"দুইবারের ঘটনায় আমি নিজে মিডিয়মের একখানা হাত ধরিয়াছিলাম, আর এক জন বিশ্বাসী বন্ধু আর একখানি হাত ধরিয়াছিলেন। চেয়ারসুদ্ধ মিডিয়ম যখন শূন্যে বিচরণ করিতেছিল, তখন ঐ ভাবে আমরা তাহার হাত ধরিয়াই ছিলাম। এরূপ ব্যাপার যদিও অন্ধকার ঘরে হইতেছিল, তথাচ উহা যে কোন লোকের দ্বারা হইতেছে না, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ঐরূপ ব্যাপার কোন লোকের দ্বারা হইতেছে কি না, তাহাও আমাদের অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন হয় নাই; কেন না, ঐরূপ বিশাল দৈহিক বলেব কাজ করিতে পারে, এরূপ কোন বীরভদ্রও তখন সে ঘরে ছিল না। মিডিয়মকে বুকে করিয়া যখন সেই বিশাল চেয়ারখানি টেবিলের উপর নামিল, তখন আলো জ্বালিবার সঙ্কেতসূচক শব্দ হইল। আলো জ্বালা হইলে দেখিলাম, চেয়ার টেবিলের উপর নামিয়াছে। মনে হয়, আমাদিগকে দৈহিক বলের পরিচয় দিয়া ভূতেরা যেন একটু গর্ব অনুভব করিয়া থাকে।"

ভূতে লেডবিটারকে টানিয়া ছাদের কাছে তুলিয়াছিল

লেড্‌বিটার এইরূপ বলিয়াছেন—ভূতে আমাকেও এক দিন অস্বাভাবিকভাবে টানিয়া শূন্যে তুলিয়াছিল। তখন আমি একটি ভূতের বৈঠকে ছিলাম। ঘটনাটা আজ অনেক দিনের। তখন আমি খুব বেশী বেশী ভূতের বৈঠকে যাইতাম। যে বৈঠকে এই ঘটনা হয়, তাহার অনেক সভ্যকে আমি চিনতাম না। মাঝে টেবিল রাখিয়া আমরা বসিয়া আছি। আমার সম্মুখে টেবিলের অপর ধারে কয়েক জন মহিলা আছেন। ঘরটি ঘোর অন্ধকার। হঠাৎ মহিলারা বলিয়া উঠিলেন, ভূতে তাঁহাদের গায়ে হাত বুলাইতেছে। আমার বড় বিশ্বাস হইল না। ভূতেব স্পর্শ পাইয়া তাঁহারা কিন্তু আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় অধীরা! তাঁহাদের উল্লাস-বেগ একটু প্রশমিত হইলে, আমি লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলাম—"ভূত মহাশয়! দয়া করিয়া আমাকে স্পর্শ করিবেন কি? যেমন বলা, অমনই ভূত আসিয়া খপ্ করিয়া বজ্র-মুষ্টিতে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া উর্ধদিকে টানিতে লাগিল। যে সে টান্ নহে, আমাকে টানের বেগে উঠিতে হইল। আমি বাধ্য হইয়া দাঁড়াইলাম। তখনও টান—সেই বিষম টান। তখন চেয়ারের উপর দাঁড়াইলাম। তখনও টানিতে লাগিল। হাত ছিনাইয়া লইবার সাধ্য হইল না। বিশ্রী বেগে টানিতে লাগিল। মুহূর্তের মধ্যে আমাকে শূন্যে

তুলিয়া ফেলিল; শূন্যে উঠিলাম, তথাচ টানের বিরাম নাই, ক্রমে উপরে উঠিতেই লাগিলাম। আঙ্গুলের গ্রন্থিগুলি শেষে সিমেন্ট করা ঠাণ্ডা মসৃণ ছাদের গায়ে যাইয়া ঠেকিল। ঘরের ছাদও খুব উঁচু। ছাদের ভিতর হইতে যেন আর একখানি হাত আসিয়া আমার গায়ে বুলাইতে লাগিল। তাহার পর আমাকে আস্তে আস্তে নামাইতে লাগিল। একটু পরেই আমার পা আসিয়া চেয়ারে ঠেকিল। ভূত তখন আমার সঙ্গে একটু জোরে করমর্দন করিয়া, আমাব হাতখানি ছাড়িয়া দিল। আমি চেয়ার হইতে নামিলাম। মনে মনে বেশ বুঝিলাম যে, একখানি শক্তিশালী হাত আমাকে ধরিয়াছিল।

এই ব্যাপারটি আমার মুখে শুনিয়া নাস্তিকের দল বলিয়া উঠিল—"ও কিছু নয়" উহাদের ধারণা—ছাদের গায়ে হয় লুকানো দবজা ছিল; সেই পথ দিযা কেহ কৌশল করিয়া আমাকে ঐরূপভাবে টানিয়া তুলিযা থাকিবে কিংবা মিডিয়ম্ নিজে হয় ত অন্ধকাব ঘরে টেবিলের উপব দাঁড়াইয়া ঐরূপভাবে আমাকে টানিয়া তুলিয়াছিল। এ দুইটি কথাই অসার। ছাদটা বেশ পালিস করা, সুধ-ধবলিত, একটা চেরা-ফাটা পর্য্যন্ত কোথাও নাই। আমি চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া আলোব সাহায্যে বেশ কবিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে ছাদটা যদিও দূরে থাকে, অথচ ফাটা-ফাটা চেরা-ফাঁড়া থাকিলে অবশ্যই চোখে পড়িত। সেরূপ কিছু ছিল না। তাহা ছাড়া আমি যে ভূতকে এরূপভাবে অনুরোধ কবিব, তাহাও পূর্বে কেহ জানিত না। তবে আমাকে ছাদের ভিতর দিয়া টানিয়া তুলিবার বন্দোবস্তই বা পূর্ব হইতে কিরূপে থাকিবে? মিডিয়ম্ নিজে আমাকে তুলিয়াছিল—এ কথাটা নিতান্ত অসঙ্গত ; কেন না, মিডিয়ম্ এক জন খর্বাকৃতি কৃশ লোক, আর আমার ওজন ১৩ স্টোনেরও অধিক (দুই মণ ১১ সেরেরও বেশী)। যদি কোন নাস্তিক একপদবিশিষ্ট একখানি গোল-টেবিলের ধাবে দাঁড়াইয়া এক হাত দিযা নিজের অপেক্ষা খুব একটি ভারী বস্তু টানিয়া মাথার উপর তুলিয়া এক হাতের সাহায্যে সেটাকে শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে, তবে তখন বুঝিতে পারিবে যে, সেরূপ কার্য্যটা ঘোর অসম্ভব কি না।

শূন্যে গুরুভার জিনিসের অবস্থান

স্থূল জিনিস শূন্যে উঠিবার কথায় মনে হয়, এগুলি ভূতের স্থূলীভূত হইবার পরিচায়ক। ভূত স্থূলমূর্তি ধরিয়া কোন-কিছু টানিয়া তুলিলে—উপরের ব্যাপারগুলিতে তাহাই বুঝা যায়। কিন্তু ভূতের সংস্রব নাই, অথচ স্থূল জিনিস উপরে উঠিতেছে, এরূপ ব্যাপারও ঘটে। এ রকম ব্যাপার প্রাচ্যদেশেই দেখা যায়। যাঁহারা এরূপ ঘটনা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা যোগ-বিদ্যা ও বিজ্ঞান আরও ভালরূপ জানেন। তাঁহারা পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ-শক্তি ও বিকর্ষণ শক্তি দুইটিই আয়ত্ত করিয়াছেন। লেড্‌বিটার বলেন, তিনি এরূপ শক্তি-সম্পন্ন মানুষ দেখিয়াছেন। তিনি বলেন, যাঁহারা যাদুবিদ্যা দেখাইয়া থাকেন, তাঁহার এই বিকর্ষণ-শক্তি অবগত আছেন। আকর্ষণ-শক্তির সঙ্গে বিকর্ষণ-শক্তির ভাবকেন্দ্র ঠিক করিয়া দিতে পারিলেই কোন কিছুকে শূন্যে রাখিয়া দেওয়া যায়। উপরের ব্যাপারগুলিতে নিশ্চয়ই এইরূপ শক্তির প্রয়োগ হয় নাই।

মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি বস্তুতঃ চৌম্বক শক্তির মত একটা শক্তি। চৌম্বক-শক্তির যেমন মোড় ফিরান যায়, আকর্ষণকে বিকর্ষণে পরিণত করা যায়, সেইরূপ মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিরও পরিবর্তন ঘটান ও উহাকে বিপরীতমুখী করান চলে। আকর্ষণী শক্তিকে অপসারিকা শক্তিতে পরিণত

করিবার কৌশল আছে। যিনি ঐ কৌশল অবগত আছেন, তিনি ইচ্ছামাত্র ঐরূপ করিতে পারেন। অনেক যোগী-সন্ন্যাসী ইচ্ছা না করিয়াও ধ্যাননিরত অবস্থায় শূন্যে উঠিয়া যায়। শুনা যায়, সাধ্বী "টেরেসা" ও সাধু "কুপার টিনোর জোসেফ" ধ্যানাবস্থায় শূন্যে উঠিতেন। লেডবিটার বলেন, ভূতের বৈঠকে যাঁহারা ওঠেন, তঁহারা ওরূপভাবে ওঠেন না; তাঁহাদিগকে ভূতেই টানিয়া তোলে।

ভূতের স্থূল হইয়া যেমন মানুষকে শূন্যে তোলে, তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজও করে। তাহারা বৈঠকে আসিয়া বাদ্যযন্ত্রে দম দেয়, সভ্যদিগের মাথার উপর বাদ্যযন্ত্র শূন্যে লইয়া বেড়ায়, অনেক সময় সুস্বরে বাজায়, কখন কখন জল বা সুগন্ধি দ্রব্য ছিটাইয়া দেয়, কখন কখন নানাবিধ ফুল, ফল, এমন কি, চিনির ডেলা পর্য্যন্ত আনিয়া ফেলে। লেড্‌বিটার দেখিয়াছিলেন, একটা ভূত কৌশলপূর্বক কয়েক জন বন্ধুর মুখের ভিতর চিনির ডেলা ঢুকাইয়া দিয়াছিল।

ভূতেরা শ্লেটেও লিখিয়া দেয়। এরূপ ঘটনা সচরাচরই ঘটে। ভূত স্থূলীভূত হইয়া, ক্ষুদ্র একটা পেন্‌সিল গ্রহণ করিয়া অতি তাড়াতাড়ি লিখিয়া দেয়।

শ্লেটে লিখিবার ব্যাপার

প্রায় ২০ বৎসর হইল, লণ্ডন সহরে এক জন বিখ্যাত মিডিয়ম ভূতকে দিয়া শ্লেটে লিখান। কাজটা তিনি খুব ভাল করিয়া করিতে পারিতেন। ঘোর নাস্তিকও তাঁহার কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইত। গ্রীষ্মকাল, রৌদ্র ঝক্-ঝক্ করিতেছে, বেশ ফুটফুটে দিন। বেলা ১১ টার সময় এক দিন এক জন নাস্তিককে তাঁহার কাছে লইয়া যাওয়া হইল। যাইবার সময় পথিপার্শ্বস্থ দোকান হইতে দুইখানি শ্লেট ও সাধাবণ শ্রেণীর দুইটি পেন্‌সিল কিনিয়া লওয়া হইল। দুইখানি শ্লেটের মাঝে পেনসিল ২/৩ টুকরা করিয়া রাখিয়া, শ্লেটখানিকে একত্র করিয়া কটা রঙ্গের কাগজে মোড়া হইল। তাহার পর খুব শক্ত করিয়া সেই মোড়াটাকে বাঁধা গেল। তাহার পব খুব ভাল গালা কিনিয়া নাস্তিককে বলা হইল, তোমার এই শ্লেটের মোড়কের বাঁধানের উপর যত ইচ্ছা এই গালা দিযা শীল কর; আরমোড়কটা নিজের হাতে রাখ—খবরদার—কাহাকেও দিও না।

এইরূপে প্রস্তুত হইয়া, আমরা সেই মিডিয়মের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর বৈঠকে বসিলাম। বসিবার সময় নাস্তিককে বলিয়া দিলাম,—তুমি শ্লেটের মোড়কের উপর বস, তাহা হইলে কেহ সয়তানী করিতে পারিবে না। মিডিয়মের নিজের দুইখানি শ্লেট ছিল সে দুইখানি টেবিলের উপরেই থাকিত, যে কেহ ইচ্ছা করিলে পরীক্ষা করিয়াও দেখিতে পারিত ; তাহাতে মিডিয়মের কোন আপত্তি ছিল না। সে শ্লেট লইয়া মিডিয়ম বৈঠকের কার্য আরম্ভ করিলেন। ঐ শ্লেট সম্বন্ধে নাস্তিকের কৃত অদ্ভুত ধারণাই ছিল। তাহার ধারণা—ঐ শ্লেটে আগে হইতে লেখা থাকিত—তাহার পর মদ দিয়া ধুইয়া ফেলা হইত। তাহাব ফলে লেখাটা কিছু সময়ের জন্য অদৃশ্য হইয়া থাকিয়া, পরে আবার ফুটিয়া উঠিত। আবার এরূপও তাহার ধারণা যে, মিডিয়ম হস্ত-কৌশলে নিজেই ঐরূপ লিখিয়া ভূতের লেখা বলিয়া পরিচয় দেন। নাস্তিক যখন ঐরূপ ধারণা করিতেছিল, তখন মিডিয়ম তাঁহার কাজ করিতেছিলেন। নাস্তিককে তখন না ঘাঁটানোই ভাল মনে হইয়াছিল।

মিডিয়মের কাছে একটা কাঠের টেবিল ছিল। টেবিলটা খুব সাদা সিদে রকমের। তাহাতে একটাও ড্রয়ার বা কোনরূপ কল-কব্জা খাটানো নাই; টেবিলটা ছোট, একখানা পালিশ করা

কাঠের, একখানা কাপড় পর্যন্তও তাহার উপর পাতা নাই। মিডিয়ম নিম্নদিক হইতে একখানা শ্লেট টেবিলের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া থাকেন। তাহার পর সভ্যবৃন্দকে প্রশ্ন করিতে বলা হয়। তখনই সেই প্রশ্নের উত্তর শ্লেটে লেখা হয়। বলা বাহুল্য—সে উত্তর ভূতে লিখিয়া দেয়। লেখা হইলে, মিডিয়ম প্রশ্নকর্তাকে বলেন যে, ভূতে এই উত্তর লিখিয়া দিয়াছে। মিডিয়মের কার্যপ্রণালী একপ্রকার। এ ক্ষেত্রে নাস্তিক আসিয়া ইচ্ছা প্রকাশকের যে, প্রশ্নের উত্তর সংস্কৃত ভাষায় বা চীনদেশীয় ভাষায় বা চিরোকী ভাষায় লেখা হোক। ভূত যদি জানায় যে, ঐ ঐ ভাষা সে জানে না, তবে নাস্তিক প্রশ্নকর্তার উল্লাস দেখে কে! সে মনে করে, মিডিয়ম বড়ই জব্দ হইয়াছে। কখন কখন ভূত ঐ ঐ ভাষা জানা প্রেতকে আনিয়া ঐ ঐ ভাষায় উত্তর লিখিয়া দেয়; তখন নাস্তিক থতমত খাইয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়ে। তথাচ গোঁ- রোগ ছাড়ে না; তখনও বলিতে থাকে—কি করিয়া সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় উত্তর লিখিল, বুঝিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু এটা যে খাঁটি জুয়াচুরি ব্যাপার, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বৈঠকে পূর্ণমাত্রায় কাজ চলিতে লাগিল. তখন এক জন জিজ্ঞাসা করিল, ভূত আসিয়া আমাদের হাতের শ্লেটে কিছু লিখিয়া দিতে পারে কি? বলা হইল—হ্যাঁ পারে। ভূতেরা কিন্তু এ রকমটা সব সময় পারিত না—সব সময় তাহাদের এতটা শক্তি দেখা যায় না। যেই উত্তর হইল—হাঁ, পারে, অমনই এক জন আমাদের নাস্তিকের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার শ্লেটের মোড়কটা আন, আর ভাল করিয়া দেখ, শীলমোহর ঠিক আছে কি না। তাহার পর নাস্তিককে বলা হইল যে, তুমি নিজে মোড়কটা টেবিলের উপর ধরিয়া রাখ। নাস্তিক তাহাই করিল। মিডিয়ম আলগোছে মোড়কটার একটি প্রান্ত ছুঁইয়া থাকিল। তাহার পর নাস্তিককে বলা হইল,—তুমি ভূতকে মনে মনে একটা প্রশ্ন কব, তাহার একবর্ণও কাহাকেও জানাইবার আবশ্যক নাই। নাস্তিক তাহাই কবিল। যেমন মনে মনে প্রশ্ন করা, অমনই তাহার উত্তর সেই মোড়ক করা শ্লেটের গায়ে লেখা হইতে লাগিল। শীলমোহর করা মোড়ক নাস্তিকের হাতেই আছে, অথচ তাহাব মধ্যে ঘস্ ঘস্ করিয়া লেখাব শব্দ হইতেছে। আশ্চর্য ব্যাপার! এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া নাস্তিক থতমত খাইয়া কেমন একরূপ হইয়া গেল। মুহূর্তমধ্যে লেখা শেষ হইল। তাহার পরই তিনটি শব্দ হইল, তাহার সঙ্কেত এই যে লেখা শেষ হইয়াছে। মিডিয়ম্ মোড়ক হইতে হাত উঠাইলেন। তাহার পর নাস্তিককে বলিলেন—ভাল করিয়া দেখুন, শীলমোহর ভাঙ্গিয়া যায় নাই ত? ঠিক্ ঠিক্ আছে ত?

পার্শেলের মোড়ক ঠিকই ছিল। তখন নাস্তিক ছুরি দিয়া দড়ি কাটিয়া মোড়ক খুলিল। খুলিয়া দেখিল যে, শ্লেট দুইখানির ভিতর দিকে তাহার প্রশ্নের উত্তর অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা রহিয়াছে। নাস্তিক অবাক্; তাহার মুখে কথা সরিল না। বিস্মিত হইয়া ভাবিতে ভাবিতে নাস্তিক গৃহে গেল। ৭ দিন ধরিয়া ভাবিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাহার পর নাস্তিক আপনার গোঁ-রোগের পরিচয় দিয়া বলিল—মিডিয়ম খুব জুয়াচুরিটাই খেলিয়াছে, কিন্তু কিরূপ করিয়া সে ঠকাইল, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; মিডিয়ম যেমন করিয়াই হউক, আমাদের মাথা খারাপ করিয়া দিয়াছিল; তাই, "যাহা নয়, তাহাই দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে।" নাস্তিককে বুঝাইয়া ওঠা খুবই শক্ত ব্যাপার। যে অবুঝ, তাহাকে বুঝাইবে কে? আমাদের ঐ নাস্তিক প্রায়ই মিডিয়মের কাছে ঠকিয়া আসার কথাটা বলিত। বলিত,—"খুব বুদ্ধি-কৌশল বটে, কিন্তু ভূত-প্রেত সর্বৈব মিথ্যা!" এই ব্যাপারটি নাস্তিক সর্বদাই মনে তোলপাড় করিত, তাই সর্বদাই তাহার মুখে ঐ কথা শুনা যাইত। ইহাতে মনে হয়, নাস্তিক্য-

বুদ্ধি তাহার অন্তর হইতে কতকটা অপসারিত হইয়াছিল। সে স্বীকার না করিলেও সে কতকটা উপকৃত হইয়াছিল।

ভূতের নিকট হইতে শ্লেটে লেখার ভিতর দিয়া যে উত্তর পাওয়া যায়, তাহা খুব জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। আমার মনে হয় ভূতের জ্ঞানবুদ্ধি উত্তরের মধ্যে যত আসুক না আসুক, প্রশ্নকর্তার বিদ্যা-বুদ্ধির প্রভাবই উহাতে অধিক থাকে। প্রশ্নকর্তার মনোভাবই প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়ে। লেড্‌বিটার বলেন,—আমি কতকগুলি লোককে খুব শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহারা বাঁচিয়া ছিলেন কি না—এই প্রশ্ন এক দিন করিয়া বসিলাম। উত্তর পাইলাম—হাঁ, বাঁচিয়া আছেন। শুধু তাহাই নহে, আমি তাঁহাদের উপরে যেমন শ্রদ্ধান্বিত, ভূতও তাঁহাদের কথা বলিতে বসিয়া সেইরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল। অথচ ঐ ভূতই অন্য সময়ে অন্য প্রশ্ন-কর্তার কাছে বলিয়াছিল যে, তাঁহারা জীবিত নাই। মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে উহার এই অস্বীকার। আবার এখন আমার কাছে স্বীকার! ইহাতে কি বুঝিতে হইবে? এমন হইতে পারে, এই দুই সময়ের দুইটি ভূত পৃথক্, অথচ এক জন অপরের নাম করিয়া পরিচয় দিয়াছে। ভূত দুইটি পৃথকই হোক আর একই হোক, ইহার মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। দুইবারই প্রশ্ন-কর্তার নিজের নিজের মনের ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছিল। তবে আমি এ কথা অস্বীকার করি না যে, আমরা অনেক সময় অপ্রত্যাশিত উত্তরও পাইয়া বসি—সে উত্তরের চিন্তাও কখন করি নাই, আর উত্তরের মধ্যে এমন সকল সংবাদও পাওয়া যায়, যাহা আমরা কিছুমাত্র জানি না।

ভূত-প্রেতের নিকট হইতে সংবাদ লইতে হইলে, শ্লেটে লিখাইয়া আনার প্রথাটাই সর্বাপেক্ষা সহজ। আর এটা দিনে দুপুরেও হইতে পারে। কেন সহজ, আর দিনের বেলায় আলোকের মধ্যেই কেন হইতে পারে, তাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন নহে। ভূত কখন আলোকে আসিতে পারে না, ইহাই প্রকৃত কথা। তবে শ্লেটে লিখিতে আসে কিরূপে? দুইখানা শ্লেট সংযুক্ত করিলে, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই অন্ধকার হয় অথবা একখানি শ্লেট টেবিলের নীচে তক্তার সঙ্গে চাপিয়া ধরিলেও অন্ধকার হয়। সেই অন্ধকারে ভূত আসিয়া লিখিতে পারে। তাহাতে তাহার আসার বাধা ঘটে না। অন্ধকারে ভূতযোনি স্থূলীভূত হইয়া থাকে। সে সময়ে বাহিরের স্পন্দন কতকটা প্রতিহত করিতে পারে।

আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে ভূত যে স্থূলশরীর ধারণ করে, সেটা একটা নকল শরীরমাত্র—খানিকটা সময়ের জন্য কতকগুলি অনুকূল জড়াংশ আবদ্ধ হয় মাত্র। আসল শরীরের মত উহা দৃঢ় নহে। আসল শরীর যেমন বাহিরের আলোকস্পন্দন সহ্য করিতে পারে, ভূতের নকল শরীর তাহা পারে না। আলোকের তীব্র স্পন্দনে সে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়; তাই খুব সাবধান হইয়া ভূতকে তাহার নকল স্থূল-শরীরটা রক্ষা করিতে হয়। তাহা ছাড়া শরীর গড়িয়া লইবার সময় মিডিয়মের স্থূল-শরীর হইতে স্থূল পরমাণু লইয়াই সে শরীর গড়া হয়। মিডিয়মের নিরন্তর আকর্ষণেও সে শরীর স্থায়ী হইতে পারে না। তবে আলোকের তীব্র স্পন্দনেও কোন কোন সময় ভূতের শরীর নষ্ট হয় না। স্থলবিশেষে সেরূপ শরীরও দেখা যায়।

তীব্র আলোকের স্পন্দনে ভূতের শরীর নষ্ট হইলেও, মৃদু আলোকে খানিকটা সময় উহা তিষ্ঠিতে পারে। তাহাতে উহার বিশেষ ক্ষতি হয় না। গ্যাসের আলোক খুব মৃদু করিয়া দিলে, তাহাতে ঐ শরীর থাকিতে পারে। রঙ-মাখান কাঠের এক রকম ঝক্‌ঝকে শ্লেট আছে, অন্ধকারে ঐ শ্লেট চক্‌চক্ করে; সে চাকচিক্যের মধ্যে ভূতের শরীর তিষ্ঠিতে পারে। ভূতেরা ভুবর্লোকে থাকে। ভুবর্লোকবিহারীরা একরূপ আলোক সৃষ্টি করিতে পারে; অবশ্য সে আলোক খুব মৃদু

ও স্নিগ্ধ। ঐরূপ আলোকের মধ্যে অবস্থান কবিযাও কখন কখন ভূতেরা আসিয়া লিখিতে থাকে। সেইরূপ ভাবের একটা বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। মিঃ লিভারমোর কট্ফক্স্ নাম্নী বমণীর সঙ্গে ১৮৬১ খৃঃ ১৮ই আগস্ট তাবিখে একটি ভূতেব বৈঠকে বসিয়া ব্যাপার দেখিয়াছিলেন. বিববণটি এই ঃ—

ভূত এক ঘন্টা ধরিয়া লিখিল

এক ফুট্ ব্যাস পরিমাণের একটা আলোক-বৃত্ত আসিযা কার্ডগুলির উপব পড়ল। ব্যপার কিরূপ হয়, খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম. আলোকের মধ্যে একখানা ভূতেব হাত, হাতে আমারই পেন্‌সিলটা! হাতখানি বাঁ-দিক্ হইতে ডানদিকে পুনঃ পুনঃ যাইতেছে, আর দিব্য লেখা হইতেছে। প্রথমে দেখা গেল, হাতখানি বেশ সুগঠিত—ক্রমে উহা কাল ও ছোট হইয়া আসিল। কিন্তু তখনও পেন্‌সিলটা ধরিয়া আছে, তখনও লেখা চলিতেছে। এইরূপ ব্যাপার প্রায় এক ঘন্টা ধরিযা হইল। ভূতে যে লিখিযা দিতে পারে, ইহাব অপেক্ষা ভাল প্রমাণ আব কখন পাই না। এ ব্যাপার খুব খাঁটি; কেন না, কেহ ঠকাইতে না পাবে, সে বিষয়ে আমরা ভালরূপ সতর্ক ছিলাম। আমি মিডিয়মের দুইখানি হাতই বরাবব ধরিয়া বসিয়াছিলাম। কার্ডগুলি আমাব কাছে এখনও আছে, উহাদের দুই পিঠেই ভূতের লেখা। যে বিষয়গুলি লেখা, তাহা খুব জ্ঞানগর্ভ, পবিত্র-ভাব-ব্যঞ্জক ও আধ্যাত্মিক। ("বিতণ্ডাভূমি"—৩০১ পৃষ্ঠা)

ঐ গল্পটি খুব সত্য হইলেও বুঝিয়া ওঠা শক্ত যে, হাতখানি অতক্ষণ ধরিয়া কি করিয়া থাকিল। হাতখানির আকার বরাবর সমান ছিল না বটে, কিন্তু তাহা হইলেও পেন্‌সিল ধরিয়া একটা দৃশ্য বস্তু বরাবর লিখিতেছিল।

ত্রিংশ অধ্যায়

ভূতে ছবি আঁকিতেও পারে

লেডবিটার সাহেব আরও লিখিয়াছেন ঃ—

ভূতে খুব সুন্দর ছবি আঁকতে পারে। পূর্বোক্ত ঘটনায় যেমন দেখা গেল, একখানা হাত আসিয়া লিখিল, ঐ রকমভাবে ছবিও আঁকিয়া দেয়। আমি দেখিয়াছি, ঘোর অন্ধকারে একখানা ছবি আঁকা হইল। সম্ভবতঃ সেটা ভূতেরই লেখা। 'সম্ভবতঃ' বলিতেছি, কারণ, অন্যরূপেও ওরূপ ছবি আঁকা যাইতে পারে। কিন্তু সেটা খুবই কঠিন প্রণালী। তাই মনে হয়, সেরূপ প্রণালীতে আর কেহ আঁকিতে যায় নাই। আমি যাহা দেখিয়াছি, সেটা নিশ্চয়ই ভূতের কাণ্ড। এক শ্রেণীর মিডিয়ম আছেন, যাঁহারা ভূতের সাহায্যে ছবি তুলিতে খুবই সিদ্ধহস্ত। ভূতের কাণ্ডকারখানার মধ্যে ছবি আঁকা ব্যাপারটা খুবই তৃপ্তি-প্রদ। আমি এরূপ ব্যাপার দুইবার দেখিয়াছি, দুইবার একটা একটা স্থানের দৃশ্য আঁকা হইল দেখিয়াছি। আমি যে ছবি দেখিয়াছি, তাহা লম্বে ৮ ইঞ্চি, প্রস্থে ৫ ইঞ্চি; ১৫ হইতে ২০ মিনিটের মধ্যে অন্ধকার ঘরে একখানা নির্দ্দিষ্ট কাগজের উপর ছবি আঁকা হইয়া গেল। ছবিখানি অতি সুন্দর—রঙ খুব স্বাভাবিক আর বেশ পরস্পর সামঞ্জস্য। আলো আনিয়া দেখিবার সময় দেখা গেল, কোন রঙ তখনও কাঁচা (ভিজে) রহিয়াছে। আমি যে কাগজ সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, ঠিক সেই কাগজের উপরেই ছবি আঁকা হইয়াছিল। কোন প্রকার প্রতারণা হয় নাই। অন্ধকার করিয়া যখন আলো সরানো হয় তখন আমি একখানা কাগজের কোণ হইতে একটু ছিঁড়িয়া রাখিলাম। ভাবিলাম, দেখা যাক, ঠিক আমার নির্দ্দিষ্ট কাগজেই ছবিটা আঁকা হয় কি না। ছবি আঁকা হইলে যখন আলোক আনিয়া দেখা গেল, তখন দেখিলাম, ঠিক সেই ছেঁড়া কাগজেই আঁকা হইয়াছে। ছেঁড়া অংশটা জুড়িয়া দেখিলাম, ঠিক ঠিক মিলিয়া গেল।

দুইবার আঁকা দেখিয়াছি। দুইবারই স্থানবিশেষের দৃশ্য। কিন্তু সে দুইটি স্থানের একটিও আমি চিনি না। মিডিয়মের ঘরে অনেক স্থানের দৃশ্য ছিল। তাহার মধ্যে অনেকগুলি আমার চেনা জায়গা। শুনিলাম, সেগুলিও না কি এইরূপ ভাবে অন্ধকারে ভূতের দ্বারা আঁকা হইয়াছিল। আমি যে দুইবার আঁকা দেখিয়াছি, সে দুইবাবই ভূতকে গঁদ-মিশ্রিত রঙের বাক্‌স ও রং-দানী এবং তুলি দেওয়া হইয়াছিল। বৈঠকের পরে পরীক্ষা করিয়া জানা গেল যে, বাস্তবিকই ভূত সেগুলির ব্যবহার কবিয়াছিল। আমি আর এক জন মিডিয়মের কাছেও ছবি আঁকা ব্যবহার দেখিয়াছি। সে ক্ষেত্রে দেখিলাম, ছবি খুব বড় রঙিন খড়ি দ্বারা আঁকা, এখানে আরও অল্পসময়ে আঁকা হইয়াছিল। কিন্তু শেষোক্ত ছবি আগেকার মত নিখুঁত নহে। উহাতে ভুলভ্রান্তি ছিল। শেষোক্ত ঘটনায় ভূতকে একটা রমণীর মুখ আঁকিতে বলা হইয়াছিল; আঁকা হইলে দেখা গেল, ছবি দেখিয়া রমণীকে চিনিতে পারা যায়, সাদৃশ্য খুব আছে বটে, কিন্তু বেশ নিখুঁত নহে। আমি যে কয়বার দেখিয়াছি, সে কয়বারই মিডিয়মের চালাকী ছিল না। মিডিয়মের দুইখানি হাতই আমি ধরিয়া বসিয়া ছিলাম। আর ঘরের মাঝে অন্ধকারও খুব নিবিড় ছিল না, মিডিয়ম নড়িলে চড়িলেই ধরা পড়িত।

ভূতের বাদ্যযন্ত্র বাজান

জীবিতকালে যদি কোন ব্যক্তি কোন যন্ত্র বাজাইবার নিপুণতা লাভ করিয়া থাকে, তবে মরণের পরও তাহার সে নিপুণতা থাকিয়া যায়। মৃত্যুর পর আমি ভূতকে বেহালা ও বাঁশী বাজাইতে শুনিয়াছি। ঘরে তখন খুব অন্ধকার ছিল না, তাই বুঝিলাম যে, সে বাজনাটা ভূতেরই, আর কাহারও নহে। "কন্‌সাটিনা" নামক যন্ত্রের এক দিক আমি ধরিয়া রাখিয়াছি আর ভূত যন্ত্রটা বাজাইতেছে, এরূপ হইয়াছে। এরূপ ব্যাপার আরও অনেক দিন ঘটিয়াছে। আমার সাক্ষাতে পিয়ানো নামক যন্ত্রও বাজাইয়াছে। পিয়ানো বাজাইবার সময় তাহার ডালা খুলিতে হয়। ভূতে যখন বাজায়, তখন উহা খোলাই থাকুক আর আঁটাই থাকুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। ভূত সকল অবস্থাতেই বাজাইতে পারে। কখন কখন ভূতে ডালা খুলিয়া ফেলে। তখন দেখা যায়, মানুষ বাজাইবার সময় ঘাটগুলি যেমন চাপিয়া নীচু করিয়া ফেলে, ভূতের বাজানোর সময় ঘাটগুলি সেইরূপ নীচু হইতে থাকে। ভূত ডালা খুলিয়া বাজাইতেছে, এমন সময় যদি আমরা ডালাটা বন্ধ করিয়া দিই, তবুও পূর্ব্ববৎই বাজনা হইতে থাকে। আবার এমনও দুইবার দেখিয়াছি, ঘাটগুলি নীচু হইতেছে না অথচ বীণার বাদ্যের মত ঝঙ্কার বাহির হইতেছে।

একটা লোক জীবিতকালে বেশ যন্ত্র বাজাইতে পারিত। মরণের পরও তাহার সে শক্তি রহিয়া গেল। সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স তাঁহার পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠায় ঐ ব্যক্তির বিবরণ লিখিয়াছেন। লোকটা যে তাহার যন্ত্রটি যথার্থই ব্যবহার করিত তাহা নহে, যন্ত্রটি থাকিলে শক্তির পরিচয় দিত। গল্পটি এই ঃ—

ভূতে টেলিগ্রাফ্ করিয়াছিল

"এক দিন আমি মিঃ হোমের সঙ্গে বৈঠক করিয়া বসিয়া আছি। আমাদের মাঝে টেবিল রহিয়াছে। টেবিলের উপর একটা কাঠের যন্ত্র; যন্ত্রটিতে টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা শব্দ তোলা যায়। যন্ত্রটি আপনা আপনি টেবিলের উপর অনুপ্রস্থভাবে আমার দিকে সরিয়া আসিল। ঘরে দিব্য আলো ছিল। যন্ত্রটিতে আমি হাত রাখিলাম, কে যেন আমার হাতের উপর টিপ্ দিয়া দিয়া টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা সঙ্কেত-শব্দ তুলিতে লাগিল। শুধু শব্দ নহে, তাহাতে একটা সংবাদ গঠিত হইল। যন্ত্রটির একটা দিকে আমার হাত ছিল; অপর দিক্‌টা টেবিলের উপর সংলগ্ন। যন্ত্রটি মিঃ হোমের নিকট হইতে খানিকটা দূরেই ছিল।

"যন্ত্রে স্পষ্ট শব্দ হইতেছিল, আর সেটি সম্পূর্ণভাবে ভূতের আয়ত্ত বলিয়া বোধ হইল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম—যন্ত্রস্থ প্রেত আমার হাত দিয়া 'মর্সী' সঙ্কেতের টেলিগ্রাফ করিতে পারে কি? সেখানে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই ঐ সঙ্কেত জানিতেন না। আমি ঐরূপ প্রশ্ন করিবামাত্র আমার কথামত 'মর্স' সঙ্কেত হইতে লাগিল। ভূত খুব দ্রুতভাবে টেলিগ্রাফ করিতে লাগিল, তাই আমি সকল কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না, মাঝে মাঝে দুই একটি কথা ধরিতে পারিয়াছিলাম। মূল কথা, মোটের উপর সংবাদটা ব্যর্থ হইয়া গেল, তবে এইটুকু বুঝিলাম যে, ভূত খুব ভালরূপ মর্স টেলিগ্রাফ জানে।"

ভূতে ঠিক মানুষের মত গলার স্বর করে

ভূতে বাঁশী বাজায়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেরূপ ক্ষেত্রে মুখ ও হাত দুইটিরই স্থূলীভূত হইবার প্রয়োজন। কেন না, বাঁশী বাজাইতে হইলে মুখ দিয়া ফুঁ দিতেও হয়, আবার আঙ্গুল দিয়া

বাঁশীর ছিদ্রগুলি সময় সময় চাপিতে ও সময় সময় খুলিতে হয়। বৈঠকে ভূত সচরাচরই স্থূল-মূর্তি ধরিয়া মানুষের মত স্পষ্ট গলার স্বর বাহির করিয়া থাকে। হাতের স্থূলমূর্তি ধরা অপেক্ষা গলার স্বর বাহির করা অবশ্যই আরও কঠিন ব্যাপার। তথাচ বৈঠকে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শব্দ বাহির করিবার উপযোগী গলা গড়িয়া তোলা সাধারণতঃ কঠিন হইয়া ওঠে। তাই ভূতের স্বর প্রায়ই বিকৃত রকমের ও বাঁশীর সুরের মত। লেড্‌বিটারের ধারণা, মরণের পর কোন মানুষ ভূত হইয়া কথা বলিতে গেলে প্রথম প্রথম তাহার কথা খুব মৃদু ফুস্-ফুস্ শব্দের মত শুনাইবে; কেন না, সে তখনও স্পষ্ট শব্দ বাহির করিবার মত স্থূল কণ্ঠ গড়িয়া তুলিতে অনভ্যস্ত। কিন্তু বৈঠকের ভূতেরা বারে বারে বৈঠকে আসিয়া কথা বলিতে চেষ্টা করায় স্থূল কণ্ঠ গড়িয়া তুলিতে খুব মজবুত হইয়া ওঠে। তাই তাহাদের স্বর খুব স্বাভাবিক ও স্পষ্ট হইয়া থাকে।

গত ২৫ বৎসর যাবৎ "রাজা জন্" নামধারী একটি ভূত বিখ্যাত মিডিয়মের বৈঠকে হাজির হইত। বৈঠকবিহারী ব্যক্তিমাত্রেই সে কথা জানেন। সেই ভূতের গলার স্বর যেমন উচ্চ, তেমনই স্পষ্ট। বৈঠকে তাহার চেনা কোন সভ্য উপস্থিত হইলেই সে তাহাকে খুব স্ফূর্তির সঙ্গে অভিবাদন করিত। লেড্‌বিটার বলেন—এক দিন তিনি এক জন মিডিয়মের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে গমের ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া পল্লীভবনে যাইতেছিলেন। ঠিক সেই সময় একটা ভূত আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কথায় যোগ দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিল। ভূত এত স্বাভাবিক স্বরে কথা বলিতে লাগিল যে, তাহাকে ভূত বলিয়াই বুঝা গেল না, ঠিক যেন এক জন তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ভূত কথা বলে শুনিয়া অনেকে ধারণা করেন যে, ভূত কখন কথা বলিতে পারে না, মিডিয়ম্‌ই এমন কৌশলে কথা বলে যে, কথা শুনিয়া মনে হয়, দূর হইতে শব্দ আসিতেছে। কিন্তু এ ধারণা সত্য বলিয়া লওয়া চলে না; জীবিতকালে এক ব্যক্তির গলার স্বর যেমনটি ছিল, মরণের পর সে যদি ভূত হইয়া অবিকল সেই স্বরে কথা বলে, তবে আমরা ভূতের স্বর বলিয়া মনে না করিব কেন? তাহা ছাড়া ঐ ধারণা যে অসার, তাহার একটা প্রমাণ আছে। প্রমাণটি এই—লেডবিটারের বাড়ীতে এক দিন বৈঠক বসে। বৈঠকে আদৌ স্ত্রীলোক ছিল না, তাঁহারই বিশ্বস্ত কয়েক জন পুরুষ বন্ধু ছিলেন; মিডিয়ম্‌ও পুরুষ। মিডিয়ম্ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া একেবারে অসাড়ভাবে পড়িয়া রহিল। এমন সময় চারি জন প্রেত আসিয়া একসঙ্গে গান গাহিতে লাগিল। গানের ভিতর চারি জনের গলার স্বর স্পষ্টভাবে পৃথক পৃথক্ করিয়া বুঝা যাইতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই চারিটির মধ্যে দুইটি গলা স্ত্রীলোকের আর খুবই সুমিষ্ট। এ ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত ধারণার সার্থকতা কোথায়?

আমরা এ প্রবন্ধে আর একটা বিষয়েরও আলোচনা করিব। ভূত আসিয়া ফটোগ্রাফ তোলাইয়া দেয়; তাহার আলোচনাও কর্তব্য। আমরা স্থূল-পদার্থেরই ফটো বা আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়া থাকি। জীবিত আত্মীয়-স্বজনের ফটোর সঙ্গে সঙ্গে যখন মৃত আত্মীয়ের ফটো উঠিয়া পড়ে, তখন নিশ্চিত বুঝিতে হইবে যে, সে সময় মৃত আত্মীয়ের প্রেতাত্মা স্থূলমূর্তি ধরিয়াছিল। স্থূলমূর্তি ধরিলে সেটা সূক্ষ্ম জড় পরমাণুর সমাবেশেই গঠিত হয়, আর সে মূর্তি কতকটা আলোক প্রতিফলিত করিতেও পারে। চিত্র তুলিবার 'ক্যামেরা" নামক যন্ত্র অতীব সহজবিকারী। সূর্য্য-কিরণের কয়েকটা রঙ্ মাত্র আমাদের চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে। কিরণের আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবস্থা আছে, যাহা আমাদের চক্ষুর অগোচর। ক্যামেরা সেগুলি খুব ভালরূপ

ধরিতে পারে. প্রেতাত্মার সূক্ষ্ম প্রতিবিম্ব ক্যামেরা অনায়াসেই গ্রহণ করে। তাই মানুষের স্থূলদৃষ্টির বিষয়ীভূত না হইলেও প্রেতাত্মা ফটো তোলাইতে সমর্থ হয়। মূলতঃ সেটা প্রেতাত্মার স্থূলীভূত অবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যাঁহারা ভালরূপ ফটো তুলিতে জানেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কৌশল পূর্বক ভূতের ফটোর মত ফটো তুলিতে পারেন বটে; কিন্তু তাই বলিয়া যে প্রেতের ফটো নাই, সবগুলিই যে চালাকী, তাহা নহে। লেড্‌বিটার সাহেব মিঃ ডব্‌লিউ টী স্টেডের কাছে অনেকগুলি খাঁটি ভূতের ফটো দেখিয়াছিলেন। তিনি আর এক জন সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তির কাছেও অনেকগুলি দেখিতে পান।

একটা ভূতের ফটো

লেড্‌বিটার সাহেবের কাছে এক জন সেনাপতি এইরূপ গল্প করেন ঃ—"আমার তিনটি কন্যা মারা যায়। খুব অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা মারা পড়িল। একটা বড় সহরে—সহরটা আমার বাড়ী হইতে শত শত মাইল দূরে—এক জন ভাল ফটোগ্রাফার আছে বলিয়া এক দিন একটা বিজ্ঞাপন দেখিলাম। শুনিলাম, সে না কি মৃত ব্যক্তির ফটো তুলিতে পারে। আমি মেয়ে তিনটির জন্য শোকে কাতর, তাই কালবিলম্ব না করিয়া তাহার কাছে যাইয়া উঠিলাম। যাইয়া বলিলাম, 'তুলুন।' মেয়ে তিনটির উল্লেখও করিলাম। ভাবিলাম—এ ব্যক্তি আমার নিজের ফটো ভিন্ন আর কিছুই তুলিতে পারিবে না। সেই ফটোগ্রাফার আমার একেবারেই অপরিচিত। ফটো তোলা হইলে দেখিলাম, আমারই ফটোর কাছে আমাব সেই তিনটি মরা মেয়ের মুখ উঠিয়াছে। মুখ তিনটি একটু ঝাপ্‌সা—একটু অস্পষ্ট। তাহা হইলেও আমি বেশ চিনিতে পারিলাম। তাহাদের জীবিতকালের ফটোও ছিল, এ ফটোর সঙ্গে জীবিতকালের ফটো মিলাইলে দেখা যায়, ঠিক একই চেহারা।

ছোট তক্তা দ্বারা "প্লানচেট্" নামক একরূপ যন্ত্র করা হয়। ঐ যন্ত্রে সম্ভবতঃ ভূত আসে। লেড্‌বিটার বলেন—ভূতের আংশিক স্থূলমূর্তিই উহাতে আসে। উহাতে কয়েকটি অঙ্গুলিমাত্র স্পর্শ করিয়া থাকিতে হয়, তাহার পর যন্ত্রটি বেশ সুস্পষ্টরূপে নড়িতে থাকে। যাঁহারা ঐরূপ ভাবে বসিয়াছেন, তাঁহাবা ভালই জানেন যে, সে নড়াটা তাঁহাদের দ্বাবা ঘটে না, সেটা খাঁটি ভূতেরই কাণ্ড। যাঁহারা ধরেন, তাঁহারাই বা তাঁহাদেব মধ্যে এক জন মিডিয়ম হইয়া থাকেন। তাঁহার শরীর হইতে সূক্ষ্ম জড় পরমাণু গ্রহণ করিয়াই ভূত-যোনি আংশিক স্থূলীভূত হয় ও প্লানচেট যন্ত্রটিকে নড়াইয়া থাকে, অথচ মিডিয়ম্ এতটা কাণ্ডের কিছুই জানে না।

একত্রিংশ অধ্যায়

নানাবিধ ভূতুড়ে কাণ্ড

ভূতের বৈঠকে ভূত আসিয়া সাদা কাগজের উপর লিখিয়া দিয়া যায় এবং ছবি আঁকিয়া দেয়, এ কথা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু ভূতে না লিখিলেও বা না আঁকিলেও ঐ সব ব্যাপার অন্য উপায়েও হইতে পারে। সেই উপায়টি কি, আমরা এক্ষণে তাহা বিশেষ করিয়া বলিব। সে উপায়টিকে বৈঠকী ভাষায় "দানাদার-করণ" বলা হয়। এই দানাদার-করণ-প্রণালীতে ছবি বা লেখা হইলে সে ছবি বা লেখা ভূতের লেখা বা আকার অপেক্ষা খুব ভাল ও খুব শীঘ্র হয়। কিন্তু একটি কথা, মিডিয়মের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা যদি খুব বেশী না থাকে, তবে এই দানাদারকরণ-প্রণালী অবলম্বন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই প্রণালীর ব্যাপার এইরূপ ঃ—

এই প্রণালীতে যদি কেহ কিছু লিখিতে বা আঁকিতে চায়, তবে তাহাকে একখানা সাদা কাগজ লইয়া লিখিবার বা আঁকিবার বিষয়টি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খুঁটিনাটি পর্যন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া মনে মনে তাহার একটা সুস্পষ্ট চিত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহার পর চিন্তা-শক্তির প্রভাবে সেই কাল্পনিক চিত্রটিকে বাস্তবে পরিণত করিয়া কাগজখানির উপর সেটাকে নিক্ষেপ করিতে হইবে। আর তখনই লেখা বা চিত্র সাধারণের চক্ষুতে ফুটিয়া উঠিবে। কল্পনা দানা বাঁধিয়া স্থূল হয়, এই জন্যই বোধ হয় প্রণালীটির নাম—"দানাদার-করণ" দেওয়া হইয়াছে। মরণের আগেই হোউক, আর পরেই হোউক, এরূপ কাজ করাটা যে খুব শক্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই! সাধারণের পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব বলিলেও চলে। অনেকে জীবিত অবস্থাতেই এরূপ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, আবার মরণের পরও অনেককে এরূপ শক্তি লাভ করিতে দেখা যায়।

লেড্‌বিটার বলেন—"আমি এরূপ প্রণালীতে বেশ আস্তে আস্তে লেখা হইতেছে, তাহাও দেখিয়াছি। দেখিলাম, বেশ একটি কথার পর একটি কথা, তাহার পর আর একটি কথা, এইরূপভাবে লেখাটা স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। একটির পর একটি হইল বটে, কিন্তু হাতের লেখার অপেক্ষা খুব দ্রুতই হইল। আবার ঐ প্রণালীতে ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাও দেখিয়াছি। একখানা ছবির উপর যদি একটা কাগজ চাপা থাকে আর সেই চাপা কাগজখানি আস্তে আস্তে সরাইয়া লওয়া হয়, তবে তাহার নীচে ছবিখানি যেমন আস্তে আস্তে বাহির হইতে থাকে, ইহাও ঠিক সেইরূপভাবে আস্তে আস্তে ছবিখানি ফুটিয়া উঠিল। চমৎকার ব্যাপার!"

এই প্রণালীতে যাহারা ছবি আঁকে বা লেখে, লিখিবার বা আঁকিবার কালে রঙ প্রভৃতি কখন কখন তাহাদের আবশ্যক হয়। দানাদার-করণ প্রণালীতে যখন মিডিয়ম্ লিখিতে বসে, তখন তাহার কাছে কালী বা রঙিন খড়ি দেওয়ার প্রয়োজন হয়; সেইরূপ, ছবি ফুটাইবার সময়ও রঙ দিবার আবশ্যক হয়। রঙ গুলিয়া দিলেও হয়, আবার গুঁড়া রঙ দিলেও চলে। মিডিয়মের যতটা কালী বা রঙের আবশ্যক, ঠিক ততটা দ্রব্য সে চিন্তা-শক্তি-প্রভাবে অণুপরমাণুতে বিশ্লিষ্ট করিয়া কাগজের উপ লইয়া ফেলে। আবার যে মিডিয়ম আরও শক্তিশালী, তাহার কালী বা রঙের

প্রয়োজন হয় না। সে চিন্তাপ্রভাবে ব্যোমপদার্থ হইতে ঐ দ্রব্যের পরমাণু আকর্ষণ করিয়া কাগজের উপর লইয়া ফেলে। সে ক্ষমতা বড়ই বিস্ময়কর; ইচ্ছা করিলে যে সে ইহার অনুকরণ করিতে পারে না।

এখন আমরা "ভূতের আলোক" সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অনেক সময় বৈঠকে নানাবিধ আলোক দেখা যায়। এইগুলি খাঁটি ভূতেরই কাণ্ড স্যর্ উইলিয়ম ক্রুক্‌স তাঁহার পুস্তকের ৯১ পৃষ্ঠায় ঐ ভূতুড়ে আলোকের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ক্রুক্‌স বলেন ঃ—

ভূতে নানাপ্রকার আলোক দেখায়

এক দিন বৈঠকে বসিয়া দেখিলাম, একটা আলোকময় দ্রব্য ঘরের ভিতর ফুটিয়া উঠিল, তাহার উপর এখানে-সেখানে সেটা চলা-ফেরা করিতে লাগিল। মুরগীর ডিম যত বড় হয়, আলোকময় পদার্থটা ঠিক তত বড়। প্রথমে এতটা উচ্চে দেখা গেল যে, এক জন লোক ডিঙ্গী মারিয়া সে স্থানটি নাগালই পায় না, তাহার পর সেটা মেঝের উপর আসিল। আমরা ১০ মিনিটকাল ধরিয়া সেটাকে দেখিলাম। তাহার পর মিলাইয়া গেল। যাইবার সময় টেবিলের উপর তিনবার শব্দ করিয়া গেল। শব্দটা ঠিক যেন একটা শক্ত জিনিস দিয়া আঘাত করিবার মত। যে সময় আমরা এই আলোকটা দেখিতেছিলাম, তখন মিডিয়ম্ অজ্ঞান অচেতনের মত একখানি আরাম-চেয়ারে পড়িয়া ছিল।

আমরা বৈঠকে এক সময়ে অনেকে বসিয়া আছি, দেখিলাম, ছোট ছোট আলোক-বিন্দু আগুনের ফুলকীর মত ছুটিয়া ছুটিয়া আসিল; আসিয়াই আমাদের কাছে কাছে বেড়াইতে লাগিল, তাহার পর আমাদের মাথার উপর আসিয়া হাজির। ঐ ফুলকীগুলির তেজে জ্বলিয়া জ্বলিয়া ওঠাকে সঙ্কেত করিয়া আমি অনেক প্রশ্নের উত্তরও প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি যদি অমুক হও, তবে এতবার জ্বলিয়া ওঠ, এই প্রশ্নের যদি এই উত্তর হয়, তবে এতবার জ্বলিয়া উঠ, এইরূপ করিয়া অনেক প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিয়াছি। এমন অনেকবার দেখিয়াছি যে, আলোকের ফুল্‌কীগুলি টেবিলের উপর হইতে ঘরের ছাদে গিয়া উঠিল, আবার ছাদ হইতে টেবিলের উপর আসিয়া পড়িল, পড়িবার সময় এমন শব্দ হইল, যাহা সকলেই বেশ শুনিতে পায়। ঐ আলোক শূন্যে অতি মৃদু জ্বলিতেছে, আবার মাঝে মাঝে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে আমি অক্ষরের সঙ্কেত করিয়া লইয়াছিলাম। সঙ্কেত স্থির হইলে, মৃদু মৃদু জ্বলা আর প্রদীপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি লিখিয়া যাইতে লাগিলাম। শেষে তাহাতে বেশ একটি পরিস্ফুট সংবাদ গঠিত হইল। এক দিন দেখিলাম, উপরে একখানি ছবিব কাছে আলোকময় একখানা মেঘের মত কি যেন একটা রহিয়াছে। আর এক দিন কে যেন আমার হাতে একটা ঝক্‌ঝকে নিরেট জিনিস দিল। যে হাতখানি ঐ জিনিসটা ধরিয়া আনিল, সেটা সে ঘরেব কাহারও হাত নহে। যে ঘরে আমরা বৈঠক করিয়া বসিয়াছিলাম, সেই ঘরেব এক পাশে একটি টেবিল ছিল। সেই টেবিলের উপর একটি জ্যোতিষিক যন্ত্র ছিল। দেখা গেল, ঘরে আলো রহিয়াছে, তথাচ আর একটা উজ্জ্বল আলোকরাশি ঘনীভূত অবস্থায় ঐ যন্ত্রটিব উপরে শূন্যে ঝুলিয়া আছে। খানিক পরেই উহা হইতে কড়াং করিয়া একটা পেরেক খুলিয়া আসিল। আসিয়াই এক জন রমণীর গায়ে পড়িল। আবার কখন কখন এমন দেখিয়াছি যে, ঐরূপ আলোক-রাশি ক্রমেই ঘনীভূত হইয়া পরিশেষে একখানি হাত হইয়া পড়িল। শুধু হওয়া নহে, ঐ হাত ছোট ছোট দ্রব্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

লেড্‌বিটার পরলোক-তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথম প্রথম নিজের বাড়ীতেই বৈঠক করিয়া প্রমাণ-সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন। তখন তাঁহার বৈঠকে কোন নামজাদা মিডিয়ম্ আসিতেন না। সেই প্রথম অবস্থায়ও তিনি ত্রিবিধ "ভূতের আলো" দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার পরও তিনি ঐ রকম আলোক অনেকবার দেখিয়াছেন। ঐ সকল আলোকের মধ্যে কখন কখন তিনি এত উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইতেন যে, সেগুলিকে বিদ্যুতের আলোক বলিয়া ভ্রম হইত, একটা আলোতেই ঘর দেদীপ্যমান। আবার এক দিন একটা আলো এত ঝক্-ঝক্ করিয়াছিল যে, সে দিন তাঁহার চোখ ঝলসিয়া গেল, চোখে ঝাপ্‌সা লাগিয়া শেষে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, চাক্‌চিক্যে অন্ধীভূত হইয়া গেলেন। অন্ধীভূত করিয়া ফেলে, এমন ঝক্‌ঝকে আলো ভূতের বৈঠকে প্রায়ই দেখা যায় না। তাহার কারণও পূর্বে বলা হইয়াছে। কারণ এই যে, তীব্র আলোকে ভূতেরা স্থূল-দেহ ধরিয়া কার্য্য করিতে পারে না, আলোকের তীব্র স্পন্দনে উহাদের নকল দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে।

যাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর মিডিয়ম্, যাঁহারা অতীন্দ্রিয়শক্তির প্রয়োগ ও আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আর একটি অদ্ভুত ক্ষমতা দেখা যায়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই কোন একটা স্থূল দ্রব্যকে অণুপরমাণুতে বিশ্লেষণ করিয়া ফেলিতে পারেন, আবার সূক্ষ্মতম পরমাণুপুঞ্জ হইতে একটা স্থূল দ্রব্যের সংগঠন করিয়া তুলিতে সমর্থ হন। এ শক্তির কথা আমরা পূর্বে 'দানাদার-করণ' প্রণালী প্রসঙ্গে একটু বলিয়াছি। এই প্রণালী যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একটা স্থূল জিনিসকে বিশ্লিষ্ট করিয়া এমন সূক্ষ্ম অবস্থায় লইয়া যান যে, তাহার কোন প্রকার অনুভূতিই থাকে না; সেই সূক্ষ্মাবস্থাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে আণবিক অবস্থা বা ব্যোম অবস্থাও বলা চলে। দ্রুত পরিস্পন্দের বলেই ঐ অবস্থাটা ঘটান যায়; কেন না, যে দ্রব্যটিকে সূক্ষ্ম করিতে হইবে, তাহার পরমাণুর মধ্যে পরস্পর একটা সংশ্লেষ—একটা আকর্ষণ থাকে, দ্রুত পরিস্পন্দ ঐ সংশ্লেষ বা আকর্ষণ বিনষ্ট করিয়া দেয়। পরিস্পন্দে বেগ যত বেশী হইবে, অণু-পরমাণু ততই বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে। কোন দ্রব্য এইরূপে সূক্ষ্মাকারে পরিণত হইলে উহা অতি দ্রুতভাবে দেশ দেশান্তরে পবিচালিত হইতে পারে। আবার যেমন ঐ স্পন্দন অপসৃত হইবে, অমনই পরমাণুভূত ঐ দ্রব্যটি আবার পূর্ব্বের মত স্থূল আকারে আকারিত হইয়া পড়িবে।

আকারটা কি করিয়া থাকিতে পারে?

মিডিয়মের ইচ্ছাশক্তি-প্রভাবে একটা স্থূল পদার্থ হাওয়ায় পরিণত হইয়া পড়ে, আবার হাওয়ার অবস্থা ছাড়িয়া যখন স্থূল অবস্থায় আসে, তখন দ্রব্যটির পূর্ব আকার কেমন করিয়া থাকিতে পারে, এই প্রশ্ন অনেকেই করেন তাই আমরা লেড্‌বিটার সাহেবের "ভুবর্লোক" নামক গ্রন্থ হইতে আর একটা স্থল উদ্‌ধৃত করিয়া এই প্রশ্নটির উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। লেড্‌বিটার এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

"আপাততঃ সাধারণের মনে আসে যে, একটা জিনিস সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণত হইবার পর যখন আবার তাহাকে স্থূল অবস্থায় আনা হয়, তখন তাহার পূর্ব আকার থাকিতে পারে না—থাকা নিতান্তই অসম্ভব। তাঁহারা বলেন,—একটা ধাতু-গঠিত চাবি-কাঠিকে সূক্ষ্ম করিতে গেলে প্রথমে তাহাকে গলাইলাম, তাহার পর সেই দ্রবীভূত অবস্থা হইতে তাহাকে আরও সূক্ষ্ম করিলাম, তখন তাহা বাষ্পাকারে পরিণত হইল। তাপপ্রয়োগ দ্বারা চাবি-কাঠিকে ধর এইরূপ

করা গেল। আবার তাপ আকর্ষণ করিয়া লইলেই ঐ বাষ্প জমিয়া তরলাবস্থায় আসিবে; তাহার পর আরও তাপ আকর্ষণ করিলে উহা কঠিন অবস্থায় আসিবে। কঠিন অবস্থায় আসিলে দেখা যাইবে—চাবি-কাঠি আর চাবি-কাঠির আকারে গঠিত নাই, তখন উহা এক ডেলা ধাতুমাত্র; সুতরাং মিডিয়মরা কোন জিনিসকে সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত করিয়া আবার স্থূল অবস্থায় উহাকে আনিবার পরে পূর্ব আকারটি কি করিয়া বজায় রাখিবেন? উঁহাদের চাবির উদাহরণটা খুব সুন্দর, উঁহাদের তর্কও আপাত-দৃষ্টিতে বেশ সু-সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, চাবির দৃষ্টান্তটা মিডিয়মদের বেলায় ঠিক খাটে না। চাবির বেলায় দেখা যায়, ধাতুর পরমাণুপুঞ্জের মধ্যে একটা বিশ্লেষ আনিবার ফলে চাবিকাঠিটির আকারের পরিবর্তন ঘটিল বটে, কিন্তু ধাতুর হিসাবে কোন পরিবর্তনই হইল না। ধাতু যেমন, তেমনই রহিল। নিসর্গের বায়ুমণ্ডলে ধাতু-পরমাণুর মহান্ সমুদ্র বিরাজ করিতেছে, চাবি-কাঠিকে বাষ্প করিয়া ফেলিলে উহার পরমাণুগুলি সেই বিরাট্ পরমাণু-সমুদ্রে যাইয়া মিশিয়া পড়ে। তাহাতে ধাতুর পরমাণুর বস্তুতঃ কোন পরিবর্তনই হয় না, কেবল অস্থায়ী স্থূল-মূর্তিটাই পরিবর্তিত হয়। মানুষের বেলায়ও ঐরূপ। মানুষের মরণের পর আত্মার নিজস্বগুলি অর্থাৎ তাঁহার চিন্তা, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার ধারণা, তাঁহার মানসিক উৎকর্ষ—এগুলির কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে না। এগুলি অতি সূক্ষ্মাবস্থায় জাগতিক চিন্তা, বাসনা প্রভৃতির বিরাট্ সাগরে সুন্দরভাবে মিশিয়া থাকে। পবিবর্তন হয় শুধু দেহটার। মরণান্তে যখন দেহটাকে ভস্মীভূত করা হয়, তখন মাত্র অস্থায়ী দেহের স্থূল-মূর্তিটাই পরিবর্তিত হয়। আসল মানুষটা অর্থাৎ জীবনীশক্তি, তার গুণ-দোষ, এ সবগুলি যেমন তেমনই থাকে। ইহাঁদের আদৌ পরিবর্তন হয় না।

"তাই বলিতেছিলাম, সাধারণে বলেন, যখন চাবির স্থূল অবয়বটা নষ্ট হইয়া একডেলা ধাতু হইয়া পড়ে, তখন মিডিয়মরা কেমন করিয়া আকার বজায় রাখেন? মনে রাখিতে হইবে, মিডিয়ম্ যখন ইচ্ছা করেন—আমি এই চাবিটিকে সূক্ষ্ম অবস্থায় পরিণত করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইব, তখন উহার পরমাণগুলিকে বিশ্লিষ্ট করিয়া ফেলিলেও যাহাতে উহার পুনর্যোজনার সময়ে পূর্বাকৃতির বিপর্য্যয় না ঘটে, সে বিষয়ে তিনি খুব তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখেন। এমন ভাবে এমন অবস্থায় পরমাণুগুলিকে চালিত করিয়া লইয়া যান, যাহাতে চাবিটিব পূর্ব-আকার প্রকটিত কবা তাঁহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হয় না। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা পরমাণুগুলিকে একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে পরিচালন করেন। সেই ভঙ্গীটাই শেষে একটা ছাঁচের কাজ করে। পবিশেষে বিকর্ষণঘটন-পটীয়সী শক্তি টানিয়া লইবামাত্র পরমাণুগুলি ঐ ভঙ্গীর ছাঁচে পড়িয়া ঘনীভূত হইয়া পূর্বাকারে চাবি হইয়া দাঁড়ায়। অতএব শক্তিশালী মিডিয়মদের কাছে কোন স্থূল দ্রব্যের আকার ঠিকই ফুটিয়া উঠে; একটুও নষ্ট হয় না।

"অনেক সময় বৈঠকে দেখা যায়, মিডিয়ম্ ভূতের সাহায্যে অনেক দূরবর্তী স্থানের দ্রব্য নিমেষের মধ্যে আনিয়া হাজির করে। স্থূল দ্রব্য যখন সূক্ষ্ম অবস্থায় অর্থাৎ হাওয়ায় পরিণত হয়, তখন তাহা ঘরের দেওয়ালের মধ্য দিয়া যাইতে ও আসিতে পারে। বাক্স বন্ধ থাকিলেও ভিতরের স্থূল দ্রব্য এই উপায়ে বাহির করিয়া আনা যায়। চালুনীর ভিতব দিয়া জল, কিম্বা তবল পদার্থের ভিতর দিযা বাষ্প যেমন অনাযাসেই যাইতে পারে, কোনরূপ বাধা জন্মে না, সেইরূপ বিশ্লিষ্ট আকাবে, পরমাণুভূত অবস্থায যাবতীয় কঠিন পদার্থই অন্য কঠিন পদার্থেব ভিতর দিযা যাওয়া আসা করিতে পারে।

"পরিস্পন্দের বলে যেমন কঠিন পদার্থকে ব্যোম পদার্থে পরিণত করা যায়, সেইরূপ পরিস্পন্দের বিপরীত প্রণালীতে পরমাণু-ভূত অবস্থা হইতে স্থূল দ্রব্য গঠিত করা বা ফোটাইয়া তোলাও চলে। প্রথমটি বিশ্লেষপ্রণালী, দ্বিতীয়টি সংশ্লেষ-প্রণালী। তীব্র ইচ্ছাশক্তি প্রথমটির বেলায় পরমাণুগুলির পরস্পরের আকর্ষণী শক্তিকে বশীভূত করে; দ্বিতীয়টির বেলায় স্থূলীভূত পদার্থটিকে বিশ্লিষ্ট হইতে দেয় না, উহার পরমাণ-পুঞ্জকে নিবিড়ভূত রাখিতে চায়। দুইটি ব্যাপারেই দীর্ঘকালস্থায়ী তীব্র ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োজন।"

ঐ শক্তির প্রভাবে খুব দূরদেশের দ্রব্য আনা যায়

ভূতেরা নিজেদের অদ্ভুত শক্তি দেখাইতে ভালবাসে। তাহারা কখন কখন বৈঠকে আসিয়া এক ঘরের জিনিস অন্য ঘরে লইয়া গিয়া বা খুব দূরদেশ হইতে দর্শকদের প্রার্থিত দ্রব্য আনিয়া দিয়া আপনাদের অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করতে আনন্দ অনুভব করে। স্যর উইলিয়ম্ ক্রুক্স তাঁহার পুস্তকের ৯৭ পৃষ্ঠায় এই ব্যাপারের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি এক দিন কুমারী কেটের সঙ্গে বৈঠকে বসিয়াছিলেন; সে দিন একটা প্রেত লাইব্রেরীঘর হইতে একটা ঘন্টা আনিয়া ফেলিল। অথচ ঐ ঘর তালা-বন্ধ ছিল; তালার চাবি-কাঠিও ক্রুক্সের নিজের পকেটে ছিল। অদ্ভুত কাণ্ড।

লেড্‌বিটার নিজেও এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার অনেক দেখিয়াছেন। তিনি এইরূপ বলেন ঃ—"ভূতে খুব দূরদেশ হইতে ফুল আনিয়া দিল, ফল আনিয়া ফেলিল, এরূপ ঘটনা খুব সচরাচরই ঘটে। এক দিন আমি ইংলণ্ডের এক বৈঠকে বসিয়া ভূতকে বলিলাম, গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ফুল আনিয়া দাও। যেমন বলা, অমনই গরম দেশের কতকগুলি বেশ টাট্‌কা ফুল ও ফল আমার কাছে আনিয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা হইতে এগুলি আনিলে? উত্তরে ভূতটি বলিল—'মহাশয়, আমরা কাহারও জিনিস চুরি করি না, গরম দেশে এ সব দ্রব্য যেখানে-সেখানে প্রচুর জন্মিয়াছে, সেখান হইতে লইয়া আসিলাম।' আর এক দিন ঐরূপভাবে একটা ভুঁইচাঁপা ফুলের গাছ ও একটা 'ফার্ণ' গাছ আনিয়া ফেলিল। গাছ দুটি খুব তাজা, তখনকারই তোলা, শিকড়ে কাঁচা মাটি পর্যন্ত লাগিয়াছিল। আমি ঐ দুইটি গাছ বাগানে লাগাইয়াছিলাম। বেশ লাগিয়া গেল, আর স্বাভাবিকভাবে দিব্য বাড়িতে লাগিল।"

"ছায়ারাজ্য" নামক গ্রন্থে ম্যাডাম্ ডি এসপ্যারান্স বৈঠকে গাছ আনিয়া ফেলাব খুব ভাল ভাল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ২৬১ পৃষ্ঠা হইতে নিম্নে একটা বিবরণ উদ্‌ধৃত করিলাম। তাঁহার বৈঠকে যে প্রেতিনীটি খুব বেশী বেশী আসিত, তাহার নাম—"যোলান্দী।" ঐ পুস্তকের একটা বিবরণ এইরূপ ঃ—

"যোলান্দী একটা ঘর অতিক্রম করিয়া মিঃ রিমার্স যেখানে বসিযাছিলেন, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই "রিমার্স" নামক ভদ্রলোকটি সমগ্র ইউরোপের মধ্যে এক জন খুব সুবিখ্যাত প্রেততত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি। কিছু অদ্ভুত শক্তি দেখাইবার নিমিত্ত যোলান্দী তাঁহাকে নিকটের একটা ঘরে যাইতে ইসারা করিল। আমরা পূর্বেও যোলান্দীর অনেক কাণ্ড-কারখানা দেখিয়াছি। সে চোখের সাম্‌নে ফুল তৈয়ারী করিতে পাবিত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাহাকে জল ও বালি দিতে হইত। তাই পূর্ব হইতেই আমবা জল ও বালিব যোগাড় করিযা বাখিয়াছিলাম। রিমার্স্‌কে সঙ্গে করিয়া যোলান্দী বৈঠকে আসিয়া উপস্থিত হইযাই বালি ও জল চাহিয়া বসিল। আমরা

চাহিবামাত্র ঐ দ্রব্য দিলাম। তাহার পর একটা বড় কাচের বোতল চাহিল। তাহাও দিলাম। তখন যোলান্দী রিমার্স্‌কে বলিল—'তুমি মেঝেয় হাঁটু পাড়িয়া বসো, আর এই বোতলটির মধ্যে বালি দিয়া অর্ধেকটা পুরিয়া ফেল।' রিমার্স্‌ তাহাই করিলেন। তখন যোলান্দী বলিল—'এখন উহার মধ্যে জল ঢালিয়া দাও।" রিমার্স্‌ জল ঢালিয়া দিলেন। তখন বলিল—'এখন বোতলটি বেশ করিয়া ঝাঁকড়াও।' রিমার্স বেশ করিয়া ঝাঁকড়াইয়া যোলান্দীর হাতে দিলেন।

"যোলান্দী বোতলটি লইয়া বেশ করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার পর উহা মেঝের উপরে রাখিয়া একটা পাতলা কাপড় দিয়া ঢাকা দিল; বোতলে জল ও বালি পোরা হইলে, আর যে বাকী জল বালি সে ঘরে ছিল, তাহা মিঃ আর্মস্ট্রং সে ঘর হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন। ঐ ঘরে কাপড় চাপা দেওয়া শুধু ঐ বোতলটাই থাকিল। সেই ঢাকা দেওয়া কাপড়খানি খুবই পাতলা। তাহার ভিতর দিয়া বোতলের আকার, মাথা, আংটা সবই দেখা যাইতেছিল।

"যোলান্দী সঙ্কেত করিল। আমরা বুঝিলাম, এখন আমাদিগকে কৌতূহলের বেগ একটু কমাইতে হইবে। মনের বেগ একটু সংযত করিতে হইবে,—এই উদ্দেশ্যে যোলান্দী আমাদিগকে গান করিতে বলিতেছে।

"আমরা গান করিতেছিলাম, হঠাৎ চাহিয়া দেখি, বোতলটার মুখ হইতে সেই পাতলা কাপড়খানি একটু উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কুড়ি জন সে ঘরে ছিলাম। সকলেই ঐটি লক্ষ্য করিলাম।

"যোলান্দী নিকটের একটা নির্জন ঘর হইতে বারে বারে আসিয়া বোতলটি দেখিয়া যাইতেছিল। বোতলটি আমাদের ঘরেই ছিল। কাপড়খানি একটু উঁচু হইয়া উঠিলে যোলান্দী তাহার নির্জন ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পর খুব ব্যগ্রভাবে বোতলটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর খুব নরম হাতে কাপড়খানি একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া কি যেন দেখিতে লাগিল। এত নরম হাতে, এত সন্তর্পণে ঢাকার কাপড়খানি ধরিয়াছিল, যেন উহার নীচে খুবই একটা কোমল জিনিস আছে, পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, তাই এত সাবধানতা। তাহার পর যোলান্দী খুব আস্তে আস্তে কাপড়খানি তুলিয়া লইল। আশ্চর্য! আমবা তখন বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, বোতলের ভিতর হইতে সুন্দর একটি গাছ উঠিয়াছে। গাছটিকে দেখিয়া 'লরেল্‌' গাছ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যোলান্দী বোতলটি হাতে করিয়া তুলিল। স্বচ্ছ কাচের বোতল। বাহির হইতেই ভিতরের জল, বালি, গাছের শিকড় সবই সুন্দরভাবে দেখা যাইতেছিল। দেখা গেল, শিকড়গুলি ঐ বালির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ বহিয়াছে।

"যোলান্দীর মুখে যেন গর্ব ও আনন্দেব ভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সে দুই হাত দিয়া বোতলটি ধরিয়া ঘরেব অপরাংশে মিঃ অক্‌স্‌লীর কাছে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দিল। সে বৈঠকে সে দিন তিনিও এক জন দর্শক ছিলেন। তিনি খুব বিখ্যাত দার্শনিক লেখক। প্রেততত্ত্ব ও মিশবদেশীয় 'পিবামিড' সম্বন্ধে তিনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া জগতে যশস্বী হইয়াছিলেন।

"যোলান্দী তাঁহাকে ঐ গাছসুদ্ধ বোতলটি দিযা সেখান হইতে চলিযা গেল। এমনভাবে চলিয়া গেল, যেন সেদিনকাব মত তাহাব আর অন্য কাজ নাই। অক্‌স্‌লী গাছটি লইযা বেশ করিয়া দেখিলেন, তাহাব পব কাছে আব টেবিল না থাকায় বোতলটি নিজেব কাছেই মেঝের উপরে রাখিলেন। তখন এই বোতলেব মধ্যে কেমন করিয়া গাছ জন্মাইল, এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে অনেক প্রশ্ন, অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা, অনেক জল্পনা-কল্পনা চলিতে লাগিল। গাছটি দেখিযা মনে হইতে লাগিল—এটা এক জাতীয 'লবেল্‌'—ইহাব পাতা খুব বড বড় ও খুব

চক্‌চকে হইয়া থাকে কিন্তু ইহার ফুল হয় না; মোটের উপর আমাদের মধ্যে কেহই গাছটিকে ভাল করিয়া কোন্ জাতীয়, তাহা স্থির করিতে পারিল না।

আবার সঙ্কেতসূচক শব্দ হইল। আবার আমরা বুঝিলাম, বাগবিতণ্ডা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে আর কিছু সময় অন্যমনস্ক হইতে হইতে হইবে। তাই আবার আমরা গান-বাজনা আরম্ভ করিয়া দিলাম। গান শেষ হইলে আবার সঙ্কেত-শব্দ। বুঝিলাম—এবার গাছটি দেখিতে হইবে। গাছটির দিকে চাহিয়াই আমরা অবাক্। দেখি—মাথায় প্রকাণ্ড একটা ফুল। ফুলিটির ব্যাস পাঁচ ইঞ্চি। অক্‌স্‌লীর পায়ের কাছে গাছটি থাকিতে থাকিতেই ফুলটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"ফুলটির রঙ ঠিক করিয়া বলা কঠিন, না দেখিলে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। আমি ঐরূপ রঙ্ তাহার পূর্বে আব কখনও দেখি নাই; কতকটা কমলালেবুর মত বলা যাইতে পারে।

"ফুলটিতে প্রায় দেড় শত দল, এক একটা দল আবার তারার মত। বোঁটাটা বেশ একটু লম্বা রকমেব। ফুলের গাছটি ২২ ইঞ্চি উচ্চ, ডাঁটাটায় বেশ একটু শক্ত বকমের কাঠও হইয়াছে, উহা বোতলের গলা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, গাছটিতে ২৯টি পাতা, পাতাগুলি প্রায় ২৷৷০ ইঞ্চি করিয়া চওড়া ও ৭৷৷০ ইঞ্চি করিয়া লম্বা; আবাব কোন কোন পাতা অতটা চওড়া ও লম্বা নহে। প্রত্যেক পাতাটাই পালিশ কবা ও চক্‌চকে—দেখিতে অনেকটা লবেল্ গাছের পাতার মত। আমরাও প্রথমে উহাকে লরেল্ বলিয়া ধাবণা কবিয়াছিলাম। শিকড়গুলি খুব সরু সরু—বালিব মধ্যে যেন স্বাভাবিকভাবেই জড়ান বহিয়াছে।

"বোতলে থাকা অবস্থাতেই আমরা গাছটিব ফটো তুলিযা লইলাম; বোতল হইতে উহাকে বাহির করাও তত সহজ ছিল না, কারণ, বোতলের গলা এত সরু যে, তাহাব মধ্য দিযা উহার অতটা শিকড আসিতে পাবে না। গাছের ডাঁটাটাতেই বোতলের মুখের ছিদ্র একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আমরা শুনিলাম—এরূপ গাছ ভাবতে জন্মে; ইহার নাম—'ইক্‌সোরা ক্রোকেটা।"

"ভারতের গাছ কি করিষা সেখানে আসিল? গাছটি কি সতই বোতলের মধ্যে জন্মিল? গাছটিকে কি কেহ সূক্ষ্মাবস্থায় আনিয়া বৈঠকঘরে আবার স্থূলীভূত করিয়া দিল?

"আমরা পবস্পর ঐ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই করিযা উঠিতে পারিলাম না। কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যাই মনে আসিল না। গাছটি দেখিয়া মনে হইল, উহা নেহাত চারা নহে, কয়েক বৎসরের গাছ। এক জন পাকা মালীও তাহাই বলিল।

"বেশ করিয়া দেখিলাম, গাছটিতে পূর্বে আর পাতা হইয়াছিল কি না। দেখিলাম, অনেক আগে আরও পাতা হইয়াছিল, সেগুলি ঝরিয়া গিয়াছে, কিন্তু দাগগুলি কিছু কিছু এখনও আছে। শিকড়গুলি বালির সঙ্গে জড়ান, যেন উহা বোতলেব মধ্যেই জন্মিয়াছে। সমস্ত শিকড়ই বেশ নিখুঁত, একটাও ছেঁড়া-ফাটা নহে, ঠিক যেন ঐখানেই জন্মে, কোন স্থান হইতে যে উপড়াইয়া আনা হইয়াছে, এমনটি বোধ হইল না। বাহির হইতে যে কেহ গাছটিকে গুঁজিয়া বোতলেব মধ্যে দিয়াছে, তাহাও মনে হইল না, কেন না, অত শিকড ও ডাঁটা অত সরু মুখ দিয়া যাইতে পারে না। গাছটিকে বাহির করিবার সময় বোতলটিকে ভাঙ্গিতে হইয়াছিল।"

মিঃ অক্‌স্‌লী পরে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ বলিয়াছিলেন—"আমি পরদিন গাছটির ফটো লই। তাহার পর গাছটি আনিয়া নির্দিষ্ট স্থানে মালীর হেপাজতে তিন মাস পরে উহা শুকাইতে লাগিল। পাতাগুলি তুলিয়া বাখিলাম, যে চাহিল, তাহাকেই দিলাম, কেবল ফুলটি আর মাথার তিনটি পাতা কাহাকেও দিলাম না, মালী উহা গাছ হইতে তুলিয়া রাখিয়া দিল। এখনও কাচের পাত্রে আমি রাখিয়া দিযাছি। উহা এখনও ঠিক আছে,

ভূতের মত মিলাইয়া যাইবার কোন চিহ্নই তো দেখিতেছি না। এই 'ইক্‌সোরা ক্রোকেটা' নামক ফুলগাছটি ফুটাইয়া তোলার পূর্বে যোলান্দী আর এক দিন আমাকে একটা গোলাপফুল দেয়; ফুলটির বোঁটা খুব ছোট, এক ইঞ্চির বেশী লম্বা নহে। আমি গোলাপটি বুকে পরিলাম। কেমন কেমন একটু বেশী বেশী চক্‌চকে রকমের দেখিয়া ফুলটি বুক হইতে খুলিলাম। খুলিয়া দেখি, একটা ফুল দুইটা হইয়া রহিয়াছে। মনে মনে বিস্মিত হইয়া, গোলাপ দুইটিকে আবার বুকে পরিলাম। তাহার পর বৈঠকের অন্তে আবার খুলিয়া দেখিলাম যে, উহার বোঁটাটা সাত ইঞ্চি লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, আর দুইটার স্থানে এবার তিনটা গোলাপ হইয়াছে, তাহা ছাড়া আর একটা কোবকও রহিয়াছে। আবার কতকগুলি কাঁটাও আছে। আমি বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। ফুলগুলি বাড়ী লইয়া আসিলাম। খুব যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলাম, শেষে শুকাইয়া গেল, দলগুলি ও ডাঁটাটা আস্তে আস্তে শুষ্ক হইয়া গেল। ইহাতে মনে হয়, এই ফুল অলীক নহে, বাস্তবিক খাঁটি জিনিস।"

মিঃ অক্‌সলী নানাপ্রকার গাছ-পালা সংগ্রহ করিয়া একটা উদ্ভিদ্‌তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন। যে গাছটির কথা উপরে বলা হইল, ঐটি তিনি সংগ্রহ কবিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সাধারণ চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় শেষে ভূতের বৈঠকে বসিয়া ভূতের সাহায্যে আনাইয়া লইলেন। ইহার পূর্বে যোলান্দী ঐ গাছ দিবে বলিয়া অক্‌স্‌লীর কাছে প্রতিশ্রুত হয়। এখন সেই প্রতিজ্ঞা সে পালন করিল। তাই বৈঠকে অত লোক থাকিতে সে গাছটি লইয়া অক্‌স্‌লীকে দিল। যোলান্দী গাছটি যে বৈঠকে আনিয়া দিল—এই ব্যপাবটির মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। বিষয়টি এই—ঐ ফুলগাছটি হঠাৎ উপস্থিত হয় নাই; ফার্ণ গাছ বা ভুঁইচাঁপা গাছ যেমন ধপাস্ কবিয়া আসিযা টেবিলের উপর পড়িয়াছিল, ইহা সেরূপভাবে আসে নাই। দেখা গেল, একটা আবরণের নীচে বোতলের মধ্যে দিব্য ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে যেন গাছটি জন্মিল। অবশ্য বর্ধিত হইবার ধারাটা নেহাত অস্বাভাবিক; কেন না, কোন গাছই অত শীঘ্র অত বড় হইতে পারে না। যোলান্দী অক্‌স্‌লীকে উহা লইয়া দিবার পরেও উহার বৃদ্ধি থামে নাই, তখনও উহা বাড়িতেছিল, কাবণ, দেওয়ার পরে ফুলটি হইয়াছিল।

আমরা সাদা চোখে দেখিলাম যে, বোতলের মধ্যে দিব্য আস্তে আস্তে গাছটি বাড়িল। কিন্তু এ দেখাটা দেখা নহে। এ বৃদ্ধিটাও বস্তুতঃ সাধারণ শ্রেণীর বৃদ্ধি নহে। কেন না, বিশেষ পরীক্ষায় জানা গিয়াছিল, পূর্ণ সাতটি বৎসরের কমে ঐরূপ একটি গাছ তৈয়ার হইতে পারে না। গাছটি সাত বছরের গাছ। তবে পাইলাম কিরূপে? আমাদিগকে ধারণা করিতে হইবে যে, গাছটির টুকরা টুকরা অংশ সূক্ষ্মাকারে আসিয়া বোতলের মধ্যে সঞ্চিত ও সজ্জিত হইয়াছিল। নিশ্চয় যোলান্দী এই ব্যাপারটি করিয়াছিল। একটা সমগ্র গাছকে সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত করিয়া, তাহার পরমাণুগুলিকে অতি শীঘ্র অন্যত্র পরিচালিত করিয়া, আবার পূর্বাবস্থায় স্থূলীভূত করিয়া তোলা যখন অসম্ভব নহে, তখন এক একটা খণ্ডকে ঐ ভাবে আনিয়া স্থূলীভূত করাই বা অসম্ভব হইবে কেন? কিন্তু খণ্ড খণ্ড করিয়া আনা অপেক্ষা সমগ্র গাছটা আনাই সহজ কাজ, তাহাতে বারে বারে শক্তি প্রেরিত হয় না। সহজ হইলেও সে কাজটা খুব শক্তি-সাপেক্ষ। যোলান্দীর আরও সূক্ষ্মদেহী অনুচর থাকারই সম্ভাবনা। তাহারা হয় তো ঐ গাছটিকে ঐরূপভাবে আনিয়া দিতেছিল; হয় ত তীব্রশক্তি প্রয়োগ করিয়া সমগ্র গাছটিকে আনিয়া ফেলা তাহাদেব সাধ্য হইতেছিল না, তাই ঐরূপ টুকরা টুকরা করিয়া আনিয়াছিল। আর আনিবার জন্য হয় তো তাহাদিগকে বারে বারে আনা-গোনা করিতে হইতেছিল। গাছটির বর্দ্ধিত হইবার ভঙ্গী দেখিয়া

মনে হয়, অনুচরেরা প্রথমে গাছটির শিকড়গুলিকে আনিয়া বোতলের বালির মধ্যে বিন্যস্ত করিল, জন্মস্থানে শিকড়গুলি যেমন যেমন ভাবে বিস্তৃত ছিল, বোতলের বালির মধ্যেও ঠিক তেমনই ভাবে বিন্যস্ত করিল। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে তাহারা গাছটির অপর অংশগুলি আনিয়া সংযুক্ত করিল। সর্বশেষে ফুলটি আনিয়া ফেলিল। ব্যাপারটা যেন রঙ্গালয়ের অভিনয়ের মত অতীব সুন্দরভাবে চোখের উপর দিয়া হইয়া গেল।

ভারতবর্ষের যাদুকরেরা এই বকম কাণ্ড অনেক দেখায়। তাহারা সকলের সাক্ষাতে একটা আমের আঁটি বপন করে। তখনই গাছ হয়, সে গাছ তখনই বড় হয়, তাহাতে মুকুল হয়, তখনই আম হয়, আবার তখনই সে আম পাকে। চমৎকার কাণ্ড! এ রকম বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে অস্বাভাবিক;—হইতেই পারে না। আমাদের মনে হয়, সে কাণ্ডটাও যোলান্দীর এই ফুলগাছেরই মত। যাদুকর হয় ত স্থূল দ্রব্যকে সূক্ষ্মাকারে পরিণত করিয়া পুনবায় তাহাকে স্থূলীভূত করিবার কৌশল জানে। আর সেই কৌশলেই হয় তো অন্যস্থান হইতে সত্যকার গাছ ও আম লইয়া আনিয়া ফেলে। অসম্ভব কিছুই নহে। বোতলের মধ্যে ফুলগাছটাকে গুঁজিয়া দেওয়া খুব শক্ত হইলেও পবিণত করিলে উহাকে বোতলের মধ্যে আনিয়া ফেলা নিতান্তই সহজ। যোলান্দীব অনুচরেবা তাহাই করিয়াছিল। তাহাবা শিকড়ের একটি একটি পরমাণু অতি সাবধানে বোতলেব ভিজে বালির মধ্যে সাজাইয়াছিল। এরূপভাবে পরমাণু বিন্যাস করা খুবই কঠিন কার্য সন্দেহ নাই। ইহাতে খুবই হুঁশিয়ার হইবারও প্রয়োজন। তাই কাজটি সুসঙ্গতভাবে হইয়া গেলে যোলান্দীর মুখে খুব একটা গর্বেব ভাব দেখা দিয়াছিল। সুতরাং তাহার গর্ব দেখিয়া আমাদের বিস্মিত হইবার কোন কারণই নাই। এরূপ শক্ত কাজে কৃতকার্য্য হইলে কে না গর্ব করে?

মিঃ অক্‌স্‌লী হয় ত মনে করিয়াছিলেন যে, গাছটা অস্থায়ী দৃশ্য, প্রেতের কৌশলে স্থূলীভূত হইয়াছে, পরক্ষণেই ভূতের দেহের মত মিলাইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার পর দেখিলেন, তাহা নহে, উহা সত্য সত্যই একটা গাছ, অদ্ভুত প্রণালীতে আনিয়া হাজির করা হইয়াছে। তাই তিনি বাগানে রাখিয়া দিলেন। গাছটিও বেশ তিন মাস থাকিল আর স্বাভাবিক গাছেরই মত শুকাইয়া মবিয়া গেল। গরম দেশের গাছ ভয়ানক শীতের দেশে গিয়া পড়িয়াছিল, তাই শীঘ্রই মারা গেল; নচেৎ আরও অনেক দিন বাঁচিত সন্দেহ নাই। অক্‌স্‌লী গাছটির যে ফটো লইয়াছিলেন, তাহার অনুরূপ চিত্র তাঁহার পুস্তকে বিবরণের সঙ্গে প্রকাশ করিতে ভুলেন নাই। অক্‌স্‌লী যে গোলাপের কথা বলিয়াছেন, তাহাও অস্থায়ী স্থূলীভূত দৃশ্য নহে। তাহাও আসল গোলাপ, ঐ ফুলগাছেরই মত সূক্ষ্মাকারে আনীত ও প্রকটিত। যে গোলাপ গাছ হইতে ছেঁড়া যায়, তাহা কখনই বাড়ে না। কিন্তু অক্‌স্‌লী বলিয়াছেন, বুকে গুঁজা থাকার পরও বাড়িয়াছে, সুতরাং তাহা তখনও সূক্ষ্মাকারে আনীত, সংযোজিত ও প্রকটিত হইতেছিল।

অক্‌স্‌লীর পুস্তকের ৩২৬ পৃষ্ঠায় আর একটা গল্প আছে। সেটাও ঐ যোলান্দীরই কাণ্ড। সে গল্পটা আগেকার অপেক্ষাও অদ্ভুত, কিন্তু উপাখ্যান অংশটা প্রায় একইরূপ। অদ্ভুত এই জন্য যে, সেটাতে যোলান্দী গাছটাকে ধার করিয়া আনিয়া দেখাইয়াছিল। এই ধার করিয়া আনাটাই একটা নূতন ব্যপার। শুধু আনা নহে, যোলান্দীকে আবার গাছটা ফিরাইয়াও দিতে হইয়াছিল। ব্যাপারটা এইরূপ :—

"মিঃ অক্‌স্‌লীর সাহায্যে যোলান্দী একটা ফুলের টবে খানিকটা বালি ও পাঁকমাটি মিশাইয়া রাখিল। তাহার পর 'ইক্‌সোরা ক্রোকেটা' উৎপাদনের সময় যেমন একটা কাপড় দিয়া বোতলটা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ এবারও টব্‌টা খুব পাতলা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিল।

"দেখা গেল, সাদা ঢাকা দেওয়া কাপড়খানি ধীরে ধীরে উঁচু হইয়া উঠিতেছে, উপরে যতই উঠিতে লাগিল, কাপড়খানিও ততই ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যোলান্দী কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। সেই পাতলা জালের মত আবরণটা যতই উপরে উঠিতেছিল, যোলান্দীও হাত দিয়া তাহা সরাইয়া দিল। শেষে সেটা তাহার নিজের অপেক্ষাও খুব উঁচু হইয়া উঠিল। তখন যোলান্দী বেশ সাবধানতার সঙ্গে কাপড়খানি উঠাইয়া লইল; দেখা গেল, লম্বা গাছ পুষ্পগুচ্ছের ভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে, আর সেই বড় পুষ্পগুলি হইতে খুব তীব্র সুগন্ধ বাহির হইতেছে।

তখনই গাছ ও ফুলের বিবরণ লিখিয়া লইলাম। গাছটি শিকড় হইতে মাথা পর্য্যন্ত সাত ফিট্ লম্বা, আমার অপেক্ষা প্রায় দেড় ফুট্ উঁচু। গাছটির মাথায় এগারটা বড় বড় ফুল, সেই ফুলের ভারে গাছটি বাঁকিয়া পড়িয়াছে, তবুও আমার অপেক্ষা উঁচু। ফুলগুলি খুব সুন্দর, উহাদের ব্যাস ৮ ইঞ্চি। পাঁচটি একেবারে প্রস্ফুটিত, তিনটি স্ফুটনোন্মুখ, আর তিনটির কোবক অবস্থা। সবগুলিই নিখুঁত ও শিশির-সিক্ত। ফুলগুলি বেশ মনোরম। কিন্তু উহাদের তীব্র গন্ধে আমি কেমন একরূপ অসুস্থ বোধ করিতেছিলাম।

"যোলান্দী এই ফুল প্রকটিত করিয়া বেশ একটু গর্ব অনুভব করিয়া শেষে আমাদিগকে বলিল—'যদি তোমরা ইহার ফটো লইতে চাও, তবে এখনই লও, কারণ, আমি এটাকে আবার এখনই লইয়া যাইব।' সে ইহার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন মিঃ বট্‌লাবফ্ গাছটির ও যোলান্দীর দুইবার ফটো তুলিয়া লইলেন।"

এই গাছটির নাম—"লিলিয়ম্ অরেটম্।" এটি জাপানের ফুল। এই ফুলের বর্ণ ঠিক স্বর্ণের মত। ১৮৯০ খৃঃ ২৮শে জুন তারিখের বৈঠকে এই জাপানী ফুলের আবির্ভাব-ব্যাপার ঘটিয়াছিল। উপরে যে ফটোর কথা বলা হইল, তাহার অনুরূপ চিত্র ও বিবরণের সঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই চিত্র দেখিলেই বুঝা যায় যে, ঐ পুষ্প বড়ই মনোরম।

যোলান্দী নিজেও স্থূলমূর্তিধারিণী প্রেতিনী। এই যোলান্দী ঐ ফুলটি ধার করিয়া আনিয়া ছিল ; আর যাহার ফুল, তাহাকে যথাসময়ে দিতে না পারিয়া খুব অস্থির হইয়া পড়িল। জাপান হইতে ফুলটিকে আনিয়া বৈঠকে ফুটাইয়া তুলিতে তাহার যথেষ্ট শক্তির ক্ষয় হইয়াছিল ; তাই যথাসময়ে ফিরাইতে পারিল না। শক্তিতে আর কুলাইল না। যথাসময়ে ফুলগাছটি ফিরাইতে পারিল না বলিয়া যোলান্দী বিষন্ন হইয়া বৈঠকের বন্ধুবর্গকে বলিল—'আপনারা এই গাছটি সাবধানে রাখিবেন।' তাঁহারও প্রাণপণ যত্নে ঐটিকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে দেখা গেল—গাছটি বিবর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এক দেশের গাছ অন্য দেশে গিয়া উঠিয়াছে; সুতরাং বিবর্ণ হওয়াটা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তাহার পর সাত দিনের অন্তে যোলান্দী গাছটাকে সূক্ষ্মাকারে লইয়া গিয়া যাঁহার গাছ তাঁহাকে দিল। বায়ুমণ্ডল অনুকূল না থাকায় যোলান্দী সাত দিনের মধ্যে গাছটিকে লইতে পারে নাই। পাঠকের নিশ্চযই জানিতে ইচ্ছা হয়, গাছটির হঠাৎ তিরোভাব দেখিয়া উহার মালিক না জানি কতই বিস্মিত হইয়াছিলেন। চোর ধরিবার জন্য না জানি তিনি কত চেষ্টাই করিয়াছিলেন। আবার উহার আকস্মিক আবির্ভাবেও না জানি তাঁহার কত বিস্ময়ই হইয়াছিল!

বায়ুমণ্ডলের অনকূলতা-প্রতিকূলতার একটা কথা বলা হইয়াছে। বায়ুমণ্ডল নিরন্তরই স্পন্দিত হইতেছে; বৈদ্যুতিক প্রবাহ সেখানে নিরন্তরই ছুটিতেছে। ঐ স্পন্দন ও বিদ্যুৎপ্রবাহের যখন আলোড়ন-বিলোড়ন বেশী বেশী হয়, তখন স্থূল দ্রব্যকে সূক্ষ্ম করা বা সূক্ষ্ম অবস্থা হইতে একটা স্থূল দ্রব্যকে আকারিত করিয়া তোলা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করা যায় না। তীব্র

আলোক-স্পন্দনে যেমন ভূতেরা স্থূল শরীর ধরিতে পারে না, স্পন্দনে সেই দেহ ভাঙ্গিয়া যায়, সেইরূপ বায়ুমণ্ডলের তাড়িতের তীব্র স্পন্দনেও ঐরূপটা ঘটে। তাই যোলান্দী গাছটিকে হাওয়ায় পরিণত করিয়া লইয়া যাইতে পারিল না—কেন না, উহার পরমাণুগুলিকে যে ভাবে লইয়া গেলে পুনরায় গাছের আকারে আকাবিত করা যায়, তীব্র বৈদ্যুতিক স্পন্দনে সে ভাবটা—পরমাণুর সে বিন্যাসটা বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল।

পরমাণুতে পরিণত করিয়া আবার তাহাকে স্থূল আকারে আনিয়া একটা স্থূল জিনিসকে লইয়া যাওয়া-আসা করা অপেক্ষা চতুর্থ পরিমাপের দিক্ দিয়া উহাকে স্থানান্তর কবা কার্য্যটাই আমাদের খুব সহজ বলিয়া বোধ হয়। যোলান্দীর কার্য্যপ্রণালীতে মনে হয়, সে ঐ পন্থা অবলম্বন করে নাই; তাহা হইলে জিনিস অত আস্তে আস্তে বর্দ্ধিত হইত না। কিন্তু স্থূল জিনিসের আবির্ভাব-তিরোভাব-ব্যাপারে খুব বেশী সময় চতুর্থ পরিমাপেব কাণ্ডটাই মনে আসে। কোন একটা কিছু করিবার পক্ষে নানাবিধ উপায় থাকিতে পারে। কোন্ উপায়টি যে অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা মাত্র লিখিত বিবরণ পড়িয়া ঠিক্ করিযা ওঠা কঠিন।

স্থূল দ্রব্যকে সূক্ষ্মাকারে আনা যায়, আবার চতুর্থ পবিমাপের দিক্ দিয়াও অন্যের অলক্ষিতভাবে আনিয়া ফেলা চলে। এ ভাবের আর একটি বিবরণও দেখিতে পাওয়া যায। এ রকম ব্যাপার লৌহের অঙ্গুরী লইয়া ঘটিয়াছিল। লেড্‌বিটারও তিনবার এরূপ ঘটনা দেখিয়াছেন। একটা নিরেট লেহার আংটি, এত ছোট যে, কোনরূপেই তাহার মধ্য দিয়া হাত যাইতে পাবে না, অথচ তাহার ভিতর দিয়া হাত চলিয়া গেল। তাহার পব এমন আঁটিয়া গেল যে, সেটাকে খুলিযা ফেলা মানুষের অসাধ্য, না ভাঙ্গিযা কিছুতেই খোলা যায় না, এমন অবস্থা। কিন্তু ভূতের সাহায্যে দিব্য সুন্দরভাবে খুলিয়া গেল। লেড্‌বিটার এইরূপ বলেন—"আমি মিডিয়মেব হাত ধরিয়া আছি অথচ একখানা চেয়ারের পিঠের দিক্‌টা আমার হাতের উপর আসিয়া শূন্যে ঝুলিয়া থাকিল, এরূপ ঘটনা অনেকবার ঘটিয়াছে। এক দিন খুব একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলাম। আমার সম্মুখে একখানা চেয়ার আসিয়া ঝুলিয়া দাঁড়াইল, তাহারপর চেয়ারখানা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া বে-মালুম মিলাইয়া গেল, মিলাইতে না মিলাইতে আবার আমার পিছনে ফুটিয়া উঠিল, মনে হইল স্থূল চেযাবখানি সূক্ষ্মাবস্থায় আমার শরীরের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। কি অদ্ভুত ব্যাপাব!"

একটি স্থূল জিনিস কখনও কখনও ঠিক্ দুইটা হইয়া পড়ে, বৈঠকে এরূপ কাণ্ডও দেখা যায়, কিন্তু এরূপ ব্যাপাব খুব বিরল। একটি স্থূল জিনিসকে দুইটি করিবাব সময প্রকৃত জিনিসটির আকার তীব্রভাবে চিন্তা করা হয়। তাহাতে মানস-স্তবে একটা সূক্ষ্ম-মূর্ত্তি গঠিত হইয়া পড়ে, তাহার পর সেই মূর্ত্তির সঙ্গে স্থূল-জগতের জড়পবমাণুর সমাবেশ করা হয়। এরূপ করিবার সময় আসল জিনিসটির অন্তর-বাহির সকল দিক্‌টাই যুগপৎ চিন্তা করিতে হইবে। সেরূপ করাটা খুব সহজ নহে।? কারণ, যে ঐরূপ কবিতে চেষ্টা করে, তাহার খুব বেশী চিন্তার একাগ্রতা আবশ্যক হয়। যাঁহারা ব্যোম-সমুদ্র হইতে স্থূল জড়পরমাণু আকর্ষণ করিয়া লইতে অসমর্থ, তাঁহার যে জিনিসটির প্রতিমূর্ত্তি গড়িতে চান, সেই জিনিসটি হইতেই ঐ পরমাণু টানিয়া নেন। এরূপ ক্ষেত্রে কাজে কাজেই তখন জিনিসটির ওজন কমিয়া যায়।

একটা আগুনের কাণ্ড

ভূতের বৈঠকে অন্য একরূপ অদ্ভুত ব্যাপাবও ঘটে। কিন্তু সেরূপ কাণ্ড খুব বেশী ঘটে না। ব্যাপারটা এই যে, ভূতে জ্বলন্ত আগুন হাতে আনিয়া দেয়, অথচ তাহাতে হাত পুড়ে না।

লণ্ডনের এক বৈঠকে এক দিন দেখা গেল, একটা ভূত মূর্তি ধরিয়া হাজির। তাহার পর সে একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে একখানি হাত প্রবেশ করাইয়া একখানা লাল গনগনে জ্বলন্ত আগুনের ডেলা লইয়া আসিল। আগুনেব ডেলাটা ছোট নহে, টেনিশ বলের মত অত বড়। তাহার পর লেড্‌বিটারকে বলিল,—"ধর ধর, তোমার হাতে একটু লও।" জ্বলন্ত আগুন লইতে সকলেই ভাবনা-চিন্তা কবে, লেডবিটার ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু ভূতটা জিদ করায়, তাড়াতাড়ি করায় যা কপালে থাকে, লইয়া ফেলি, হাত না পুড়িতেও পারে, আর নেহাৎ গরম লাগিলে ফেলিয়া দিলেই হইবে—এই ভাবিয়া তিনি হাত পাতিলেন। ভূতও সেই টকটকে আগুনের ডেলাটা তাঁহার হাতে দিল। আশ্চর্যের বিষয, আগুনটাকে কিছুমাত্র গরম বলিয়া বোধ হইল না। লেড্‌বিটাব ভাবিতেছেন, এ কি প্রকার ঠাণ্ডা আগুন। ঠিক তখন ভূতটা এক খণ্ড কাগজ উহাব উপর দিল, আর কাগজের টুক্‌রাটা দপ্ কবিয়া জ্বলিয়া উঠিল। লেড্‌বিটার প্রায দেড় মিনিটকাল আগুনের ডেলাটা হাতে ধরিয়া ছিলেন, তাহার পর তেজ কমিয়া আসিল। তখন দ্রুত ঐটিকে কুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে বলিল। লেড্‌বিটারও তাহাই করিলেন। পবে তিনি হাতের দিকে চাহিয়া দেখেন, হাতে একটু দাগও হয় নাই, একটুও পোড়া গন্ধ হয় নাই, কেবল সামান্য একটু ছাই লাগিয়া আছে মাত্র।

এ ব্যাপাবটিতে আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? লেড্‌বিটার বলিয়াছেন-—"ঐ কাণ্ডের কিছুই আমি সে সময় বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বৈঠকের ভূতেরাও কিছু বুঝাইয়া দিল না। তাহার পরে বহু দিন ধরিয়া গুপ্তবিদ্যার আলোচনাব ফলে বুঝিয়াছি যে, ব্যোম পদার্থেব সূক্ষ্মতম স্তরটি এরূপভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া দেওয়া যায় যে, তাহার ভিতর দিয়া আগুনের তাপ আসিতে পাবে না। আমার বিশ্বাস, ভূতটা ব্যোম পদার্থের ঐরূপ একটা পরিবর্তিত পর্দা দিয়া আমার হাতটা ঢাকিযা দিয়াছিল, কারণ, তাহার পক্ষে ঐরূপটি করা খুবই সহজ। ভূত কিরূপ করিযা ঐ অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটাইল, জানি না, তবে ঘটনাটি খাঁটি সত্য।"

অলৌকিক ক্ষমতা বা সিদ্ধি যাঁহারা কিছু কিছু লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছামাত্র আগুন উৎপন্ন করিয়া ফেলিতে বা আগুনের দাহিকা-শক্তির বিলোপ ঘটাইতে পারেন। কোথাও কিছু নাই অথচ আগুন আপনা-আপনি জ্বলিয়া উঠিল। এরূপ ব্যাপার লেডবিটার সাহেব নিজেও একবার দেখিয়াছেন। "পারিবারিক ভূতের কাণ্ড" নামক পুস্তকে মিঃ মবেল থিওবলড ঐরূপ ব্যাপারের অনেকগুলি বিবরণ দিয়াছেন। তিনি না কি ঐরূপ ব্যাপার বিস্তবই দেখিয়াছেন। তাঁহার বাড়ীর মৃত আত্মীয়দিগের প্রেতাত্মা না কি অনেক কাজ-কর্ম করিয়া থাকেন। প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া, আগুন জ্বালিয়া দেওয়া, এ সব কাজ না কি তাঁহাদের প্রাত্যহিক ব্যাপার। স্কট্‌ল্যাণ্ড দেশে এক শ্রেণীর পরী আছে, তাহারাও না কি গৃহস্থের বাড়ীতে প্রদীপ জ্বালা প্রভৃতি কার্যগুলি করিয়া দেয়। তাহাদের বিশেষ বিবরণ আমারা জানি না বলিয়া কোন গ্রন্থ হইতে উদ্‌ধৃত করিতে পারিলাম না।

অগ্নি-উৎপাদন

লেড্‌বিটার বলিয়াছেন—"ইংলণ্ডের একটা বৈঠকে আমি ভূতের আগুন তৈয়ার করা দেখিয়াছি। বৈঠকে আমরা বসিয়া আছি, এমন সময় শব্দ হইল। তাহাতে বুঝিলাম, টেবিলের উপর বড় একখানি রেকাবী রাখিয়া তাহার উপর কতকগুলি সিগারেটের ভাঙ্গা বাক্স ও আগুন ধরাইবার মত কিছু হালকা দ্রব্য আমাদিগকে রাখিতে হইবে। আমরা সেইরূপ রাখিলাম। তাহার পর

সঙ্কেত অনুসারে আমরা ঘর হইতে আলোক অপসৃত করিয়া গান করিতে লাগিলাম। ঘরে ঘোর অন্ধকার। আমরা টেবিলের চারিদিকে হাত ধরাধরি করিয়া বসিয়া গান করিতে লাগিলাম; অনুমান আধ ঘন্টা হইবে (বরং কিছু কমই হইবে) কাটিয়া গেল। এমন সময় একটা অদ্ভুত রকমের গাঢ় লাল আগুন সেই স্তূপীকৃত ভাঙ্গা বাক্সগুলির মধ্যে দেখা দিল। আগুনটা কখনও বাড়িতে লাগিল, কখনও কমিতে লাগিল, এইরূপ হইতে হইতে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমাদিগেব মধ্যে কেহই উহা স্পর্শ করে নাই আর এরূপভাবে জ্বলিযা উঠিল যে, কেহ দেশলাই জ্বালিয়া আগুন করিয়া দিল এরূপ ধারণাও আসিতে পারে না।

লেড্‌বিটার বলেন—তাপ ব্যোম কম্পন ছাড়া আর কিছুই নহে। যেরূপ কম্পন বা স্পন্দনে আগুন হইতে পাবে, ভূতেরা যদি সেই স্পন্দন ঘটায়, তবে আগুন আপনা-আপনি জ্বলিয়া ওঠে, তাহাতে বিচিত্র কি? আর উপরের ঘটনাতেও সম্ভবতঃ তাহাই হইযাছিল। আবার অন্যরূপ ধারণাও করা যাইতে পারে। হয় তো চতুর্থ মাপের দিক্ দিযা ভূতেবা আমাদের অলক্ষ্যভাবে কোন স্থান হইতে আগুনের একটা ফুলকি আনিয়া ঐ ভাঙ্গা বাক্সেব মধ্যে ফুঁ দিয়া উহাকে জ্বালিয়া দিল। কিংবা এমনও হইতে পারে যে, ভূতেরা রাসায়নিক দ্রব্য আনিয়া রাসাযনিক প্রণালীতে আগুন করিয়া ফেলিল। পল্লীর দেবতা হইয়া পল্লীবাসীদিগকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে আগুন জ্বালিয়া গ্রাম ছারখার করিয়া দিলেন, এমন ভূরি ভূরি গল্প ভারতবর্ষে শুনা যায়। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে, যিনি সূক্ষ্মজগতেব ক্ষমতায ক্ষমতাশালী, অগ্নি উৎপাদন করিয়া তোলা তাঁহার পক্ষে আদৌ কঠিন নহে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ভূত মূর্তি ধরিয়া দেখা দেয়

ভূত তিন রকমের স্থূল-মূর্তি ধরে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। মূর্তি ধরিয়া কাজ করে, অথচ মূর্তিটা দেখা যায় না, এই প্রকারের কথা আমরা পূর্বেই বুঝাইয়া দিয়াছি। এখন অন্য দুই প্রকারের কথা বলিব। ভূত ঝাপ্‌সা মূর্তিতে আসে—এইটি দ্বিতীয় প্রকার। ভূত পরিস্ফুট মূর্তিতে আসিয়া কথাবার্তা বলে—এইটি তৃতীয় প্রকার। ভূত যখন দ্বিতীয় মূর্তি ধরিয়া দেখা দেয়, তখন তাহার সে দেহটা স্পর্শ করিলে কোন একটা স্থূল জিনিস স্পর্শ করিলাম বলিয়া বোধ হয় না। তাহা ছাড়া সে দেহটা খুব স্বচ্ছ—তাহাতে আলোকের অবরোধ ঘটে না। দেহটার ওদিকে যে জিনিস-পত্র আছে, তাহা এদিক্ হইতে দেখা যায়। স্বচ্ছ হইলেও, যখন পূর্ণ মূর্তিটি ধরে তখন তাহাকে জীবিত ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। মূর্তিটি একেবারে অবিকল। এইরূপ ঝাপ্‌সাভাবে মূর্তি ধরিয়া দেখা দেওয়া প্রায়ই ঘটে। এরূপ ঘটনা খুব বেশী বেশী দেখা যায়। সাধারণতঃ ভূতেরা মূর্তি ধরিয়া মানুষকে দেখা দিতে চায় না। মানুষের কাছ হইতে তফাৎ থাকিবার চেষ্টা করে। তাহা হইলেও এক দিন একটা ভূত ঝাপ্‌সা মূর্তি ধরিয়া বৈঠকে আসিয়া লেড্‌বিটারকে বলিয়াছিল—"তুমি আমার শরীরের ভিতর দিয়া তোমার হাত আস্তে আস্তে পরিচালন কর।" লেড্‌বিটার সেইরূপ করিলেন; কিন্তু তাঁহার হাতে কোনরূপ কিছু শক্ত পদার্থ ঠেকিল না, যেন শূন্যের মধ্য দিয়া হাত লইয়া গেলেন। হাতে কিছুই ধরিতে পারিলেন না দেখিয়া ভূতটা দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। লেড্‌বিটার লিখিয়াছেন—"স্পষ্ট মূর্তিতে ভূতটা আমার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, আমিও উহার গায়ের ভিতর হাত চালাইয়া দিলাম অথচ চোখ বুজিয়া অনুভব করিতে পারিলাম না যে, হাতখানি উহার দেহের বাহিরে রহিয়াছে কি ভিতরেই আছে। গাঢ় স্থূল-মূর্তি ধরা অপেক্ষা এইরূপ ঝাপ্‌সা মূর্তি ধরা ভূতের পক্ষে সহজ , স্থূলমূর্তি ধারা বেশ একটু কঠিন। আমি উহার বেশ ভাল প্রমাণও দুই একবার পাইয়াছি। ভূত মূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইলে দেখিলাম, তাহার সমস্ত অংশ নিরেট হয় নাই, খানিকটা মাত্র নিরেট করিতে পারিয়াছে, সমস্তটা ঐরূপ করিয়া ভূত আসিয়া অনেক সময় বজ্রমুষ্টিতে করমর্দন করে; সে স্থলে করতলটা নিরেটভাবে গঠিত হয়। কিন্তু করতলের উপরের অংশটা নিরেট থাকে না, সে সব অংশ ঝাপসা ও পাতলা থাকে। তাই বলিতেছি সমস্ত অংশটা নিরেট করিয়া তোলা মহা শক্ত ব্যাপার। অন্যান্য অংশটা নিরেট না হইলেও আমাদের চোখে তাহা নিরেট বলিয়া মনে হয়।" স্যার উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স্ তাঁহার 'গবেষণা' নামক পুস্তকের ৯৪ পৃষ্ঠায় এই দ্বিতীয় প্রকারের দেখা দেওয়া বিষয়ের বিবরণ দিয়াছেন। বিবরণ এইরূপ ঃ—

ছায়া-মূর্তি

ক্রুক্‌স বলিতেছেন—"এক দিন সন্ধ্যাকালে আমার নিজের বাড়ীতে আমি বৈঠকে বসিয়াছি; মিঃ হোমও আমার কাছে আছেন; সন্ধ্যা বেশ ঘোর হইয়া আসিয়াছে। দেখিলাম, জানালার পর্দা

নড়িতেছে। পর্দাটা মিঃ হোমের নিকট হইতে প্রায় ৮ ফিট্ দূরে ছিল। পর্দার নড়া-চড়া দেখিয়া আমরা সকলেই সেই দিকে চাহিলাম; দেখিলাম—একটা কাল ছায়ামূর্তি দাঁড়াইয়া পর্দাটি ধরিয়া নাড়িতেছে! মূর্তিটা খুব নিবিড় নহে, অর্ধ-স্বচ্ছ ভাবের, আর সেটা মানুষের অবয়ববিশিষ্ট। আমরা সকলে সেই দিকে চাহিলে অল্পসময়ের মধ্যেই মূর্তিটা মিলাইয়া গেল, পর্দাটার নড়া-চড়াও বন্ধ হইল। ইহা অপেক্ষাও আর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিতে দেখিয়াছি। তখনও মিঃ হোম আমাদের দলে মিডিয়ম ছিলেন। দেখিলাম—বৈঠকের ঘরের এক কোণ হইতে একটা ছায়ামূর্তি আসিল; আসিয়া, একাট বাদ্য-যন্ত্র লইয়া বাজাইতে বাজাইতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমাদের সকলেই অনেকক্ষণ ধরিয়া ঐ মূর্তিটিকে দেখিতে পাইল। আমাদের সকলেই অনেকক্ষণ ধরিয়া ঐ মূর্তিটিকে দেখিতে পাইল। আমাদের ঘরেই একটু দূরে এক জন মহিলা ছিলেন।সেই ছায়া-মূর্তিটি তাঁহার কাছে যাইয়া হাজির। তাহার পর অস্ফুট স্বরে কি একটা বলিয়া অন্তর্ধান হইল।"

যাঁহারা সিদ্ধপুরুষদিগের শিষ্য হইতে পারিয়াছেন, সূক্ষ্মজগৎ-সুলভ ক্ষমতা অনেকটা তাঁহাদের আয়ত্ত। তাঁহারা বিশেষ, সময়ে বিশেষ কারণে স্থূলমূর্তির আর্বিভাব ঘটাইয়া থাকেন। হাওয়া হইতে একটা স্থূলমূর্তি গড়িয়া তুলিবার সময় তাঁহারা ব্যোম-সমুদ্র হইতে আবশ্যকমত পরমাণু পুঞ্জ আকর্ষণ করিয়া ঐরূপ মূর্তির সৃষ্টি করেন। তাহাতে অন্য কোন দেহীর অনিষ্ট হইতে পারেনা। কিন্তু বৈঠকে যে সকল স্থূলমূর্তি ফুটিয়া ওঠে, তাহাদের গঠন-প্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার, তাহাদের দেশ ব্যোম হইতে সংগৃহীত হয় না। মিডিযমের দেহ হইতে তখন ভূতেরা স্থূল জড়াংশ আকর্ষণ করিয়া দেহ রচনা করে. কারণ, সেইটাই তাহাদের পক্ষে সহজ পথ। ভূতেরা মিডিয়মের দেহ হইতে জড়াংশ টানিয়া লইতেছে, আর জড়াংশগুলি ধুঁযার মত হইয়া মিডিয়মের দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে—এই অদ্ভুত কাণ্ডটাও অনেক সময় দেখা যায়। মিঃ ডব্লিউ ইংলিন্টন্ "উভয় জগতের সংযোগ" নামক একখানি সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক লিখিয়াছেন। মিডিয়মের দেহ হইতে সকলের সমক্ষে জড়াংশ চলিয়া যাইবার বিববণ ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। পরমাণু এত নিবিড়ভাবে বাহির হইয়াছিল যে, সেগুলিকে খুব গাঢ় ধুঁয়ার মত দেখাইয়াছিল; আর তখন মিডিয়ম্ একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পডিয়াছিল, তাহাকে তখন পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই।

ঐ ধুঁয়ার মত পরমাণুপুঞ্জ শীঘ্রই জমিয়া ঘনীভূত হইয়া, একটা মূর্তি হইয়া দাঁড়ায়। মূর্তিটা অনেক সময় মিডিয়মের সেই দেহেরেই অনুরূপ হইয়া ওঠে; যেন তাহারই সূক্ষ্মমূর্ত্তি বলিয়া দেখায়। লেড্বিটার বলেন—"আমি এরূপ একটা ব্যাপার দেখিয়াছি। এক দিন আমি একটা বৈঠকে সুবিখ্যাত মিডিয়ম মিঃ সিসীল্ হস্কের সঙ্গে বসিয়া আছি; বসিয়া ভূতের প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় দেখি, একটা তীব্র আলোক জ্বলিয়া উঠিল, এত আলো যে, ঘরেব মধ্যস্থ সব জিনিসই পরিষ্কাররূপে দেখা যাইতে লাগিল। দেখা গেল, সে সময় মিডিয়ম্ একখানি চেয়ারে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছেন। তিনি কেমন একরূপ অস্বাভাবিকভাবে অভিভূত, নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছেন। কিন্তু ঠিক তাঁহার সম্মুখে একেবারে অবিকল তাঁহারই একটা মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; মূর্তিটি সজীব, সচল! আর তাহার হাতের উপর ডিমের মত গড়নের কি একটা পদার্থ। সেই পদার্থটা হইতে ঐরূপ তীব্র আলোক বাহির হইতেছিল। মূর্তিটি খানিকটা সময় ঐরূপভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর আলোটা হঠাৎ নিভিয়া গেল। তার পর ভূতটা পরিচিত স্বরে কথা বলিতে লাগিল। ইহাতে বেশ বুঝা যায়, সে মিডিয়মেরই দেহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া দেখা দিয়াছিল।"

ভূতেরা দেখা দিবার সময় যে অস্থায়ী দেহ গড়িয়া লয়, তাহা যে মিডিয়মেরই ব্যোম অংশ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ব্যোম অংশ যেমন গ্রহণ করে, স্থূল ও তরল পদার্থও উহারা সেইরূপভাবে আর্কষণ করিয়া লইতে পারে। সে ব্যাপারটা কেমন করিয়া পারে, তাহা বুঝিয়া ওঠা আমাদেব পক্ষে খুব শক্ত হইলেও উহারা সত্যই তাহা পারে। স্থূল অংশ ভূতে মিডিয়মের শরীর হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, এরূপ ব্যাপার লের্ড্রিটার নিজেও দেখিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে মিডিয়মের দেহের ওজনও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া তখন মিডিয়মের স্থূল দেহটাও কেমন একরূপ বিশ্রী হইয়া যায়, স্থানে স্থানে থুবড়াইয়া পড়ে, কুঁচুকাইয়া যায়, এইরূপ কাণ্ড হয়। যখন ভূতেরা মিডিয়মের দেহ হইতে ঐরূপভাবে স্থূল, নিরেট, তরল পদার্থ আকর্ষণ করিয়া লয়, তখন মিডিয়ম্ যাহাতে লোকের চক্ষুতে না পড়ে, সেইরূপ চেষ্টা করে। এ অবস্থায় সকলে মিডিয়মকে না দেখে, সেই ভাল। কারণ, তখন তাহার চেহারা বড়ই বিশ্রী হইয়া পড়ে, সে চেহারা দেখিলেই সকলেরই মনে তাহার জীবন সম্বন্ধে একটা ঘোর আশঙ্কা আসিয়া পড়ে। সে একটা কিম্ভূত রকমের মূর্তি! যাহারা সহজে আকুল বা ভীত হয়, এরূপ ব্যক্তি মিডিয়মের সে মূর্তি দেখিলে বাস্তবিক চঞ্চল হইয়া পড়ে।

কর্ণেল অল্‌কট্ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ২৪৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ ব্যাপারের একটা বিবরণ লিখিযাছেন। গ্রন্থের নাম "সূক্ষ্ম-জগৎ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তি।" একটা প্রেতিনী মূর্তি ধরিয়া আসিয়া অলকটেব কাছে হাজির হয়। বলিল—আমার নাম "হন্টু।" অল্‌কট তাহাকে ওজন করিয়া দেখিলেন, সে কতটুকু ভারী। হন্টর চেহারা দেখিয়া মনে হইল, সে আমেরিকা বাসিনী একটি বালিকা। ওজন করিলে দেখা গেল, তাহার ওজন ৮৮ পাউণ্ড। কর্ণেলের অনুরোধে সে তৎক্ষণাৎ নিজের দেহভার কমাইয়া ফেলিল; তখন দেখা গেল, ওজন ৫৮ পাউণ্ড; তাহার পর ওজন বাড়িয়া ৬৫পাউণ্ড উঠিল। এতটা হ্রাসবৃদ্ধি সবই ১০ মিনিট কালের মধ্যেই ঘটিল এই হ্রাস-বৃদ্ধির সময়ে তাহার পরিচ্ছদের কিছুই পরিবর্তন হইল না। হন্টুর মূর্ত্তি যখন এইরূপভাবে ওজনে বাড়িতেছিল, তখন মিডিয়মের দেহের ওজনও সেই অনুপাতে কমিতেছিল। ইহাতে মনে হয়, সে মিডিযমের দেহ হইতে স্থূল জড়াংশ আকর্ষণ করিয়াছিল।

ঐ পুস্তকেরই ৪৮৭ পৃষ্ঠায় আর একটি কাহিনী আছে: কর্ণেল "কেটী ব্রিঙ্ক" নামে একটা স্থূলীভূত প্রেত-দেহেরও ওজন করিয়াছিলেন। এটাও প্রেতিনী; প্রথম ওজনে দেখা গেল, দেহটি ৭৭ পাউণ্ড। পরক্ষণেই ৫৯, আবার তখনই ৫২ পাউণ্ড হইয়া পড়িল। অথচ এইরূপ ব্যাপারে দেহের বাহ্য পরিবর্তন কিছুমাত্র দেখা গেল না। এই ব্যাপারের সময় একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। যখন কেটী ব্রিঙ্কের ওজন চলিতেছিল, তখন কর্ণেল দেখিলেন যে, মিডিয়ম্ লোকটা অন্তর্ধান হইয়াছে! কর্ণেল মিডিয়মকে তাহার চেয়ারে কার্পাস সূত্রের শক্ত দড়ি দিয়া বেশ করিয়া আটকাইয়া বাখিয়াছিলেন। দড়ি না ছিঁড়িয়া মিডিয়মের যাইবার উপায় ছিল না। অথচ দেখিলেন—মিডিয়ম নাই! কর্ণেল যে শুধু বাঁধিয়াই রাখিয়াছিলেন,তাহা নহে। বেশ সাবধান হইয়া সেই বাঁধনেব উপর নিজের সীল-মোহরও কবিয়াছিলেন। কোন প্রকার প্রতাবণা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। একটা নির্জন গৃহের মধ্যে মিডিয়ম্‌কে ঐরূপভাবে রাখা হইয়াছিল। কর্ণেল বৈঠকের কাজ চলিতে চলিতে একবার সেই নির্জন কক্ষে মিডিয়ম্‌কে দেখিতে গেলেন। যাইযা দেখিলেন—চেযাব শূন্য! মিডিয়ম্ নাই। তখন তিনি চেয়ারের উপরেও চারিদিকে হাত চালনা করিয়া দেখিলেন, কিছুই হাতে ঠেকিল না। ফিরিয়া বৈঠকে আসিলেন। বৈঠকের অন্তে আবার ঘরে গেলেন। যাইয়া দেখিলেন, মিডিয়ম্ পূর্বাবস্থায় বন্ধনদশাগ্রস্ত হইযা চেয়ারে পড়িয়া আছে।

দেখা গেল, তাহার অর্ধমূর্চ্ছার ভাব, একেবারে অভিভূত অবস্থা! কিন্তু বাঁধন ও শীল-মোহর সম্পূর্ণই ঠিক আছে! বাস্তবিকই বিস্ময়জনক ব্যাপার। বিস্ময়জনক হইলেও এরূপ ঘটনা অনেক ঘটে। (এম্ এ, আক্‌শাকো প্রণীত "ভূতের অন্তর্ধান" নামক গ্রন্থ দেখ।)

ভূতে যে সময় মিডিয়মের দেহ হইতে জড়াংশ আকর্ষণ করিয়া নেয়, তখন উহা মিডিয়ম্ দেহের পার্শ্বদেশ হইতে বহির্গত হয়। আবার কখন কখন সমগ্র দেহটার উপর হইতেই বাহির হইতে থাকে। ঠিক যেন আকর্ষণ করিয়া বা শোষণ করিয়া লইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ম্যাডাম্ ই, ডি, এস্‌পারান্স ঐ জড়াংশ-নির্গমনের এরূপ বর্ণনা করিয়াছেনঃ—

"তাহার পর একটা অদ্ভুত অনুভূতি হইতে লাগিল। আরও অনেক বৈঠকে আমার কখন কখন ঐরূপ অনুভূতি ঘটিয়াছিল। অনেকের মুখে অনেকবার শুনিয়াছিলাম, অনুভূতিটা ঠিক যেন্ মাকড়সার জাল মুখের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ার মত। কিন্তু আমার অন্যরূপ বোধ হইল আমার মনে হইতে লাগিল। আমার শরীরের প্রতি লোমকূপ দিয়া খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূতা কে যেন টানিয়া বাহির করিতেছে।" (ছায়ারাজ্য ২২৯ পৃষ্ঠা।)

ম্যাডাম্ ডি এস্‌পারান্স

অনেক মিডিয়ম্ই তাঁহাদের নিজের নিজের জীবন-চরিত নিজেরাই লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু লেড্‌বিটার বলেন, ম্যাডাম্ ডি এস্‌পারান্সের জীবনটাই সর্বাপেক্ষা উপাদেয়। বইখানি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনই সত্য ঘটনাপূর্ণ। তাহা ছাড়া গ্রন্থকর্ত্রী নিজে খুব চতুরা বলিয়া সকল ঘটনাই বেশ ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছেন। সাধারণ মিডিয়ম্‌দিগের ঐরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেখা যায় না। সত্যের অনুসন্ধান করাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে কোন্ স্থানে সত্য নিহিত আছে সেইটুকুই তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতেন।

কোন একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটিলেই তিনি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সেইটার আলোচনা করিয়া তাহা হইতে সত্য খুঁজিয়া বাহির করিতেন। এস্‌পারান্স যথেষ্ট সুখ্যাতির পাত্রী হইলেও তাঁহার একটা ত্রুটি ছিল। তিনি "থিওসফি" সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করেন নাই। ভূতের কাণ্ড-কারখানা তিনি খুব সাহসের সঙ্গে, খুব দৃঢতাব সঙ্গেই পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। বিস্তর ক্লেশ পাইয়া এক একটা বিষযের মীমাংসা করিযাছিলেন। কিন্তু "থিওসফির" পুস্তকাবলী পড়া থাকিলে তাঁহার ঐ সব ব্যাপাব বুঝিতে এত ক্লেশ হইত না। থিওসফি না পড়ায় তাঁহাকে নিরর্থক যাতনাও উদ্বেগ ভোগ কবিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুস্তকপাঠ করিলেই জানা যায় যে, তাঁহার বাল্যজীবনে এমন সকল ঘটনা ঘটিত, যাহা শুনিলে বাস্তবিকই প্রাণে ব্যথা লাগে। ক্রমে তাঁহাব পারলৌকিক জ্ঞান বৃদ্ধি হইল। কিন্তু অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়া মিডিয়ম্ হইয়া উঠিতে তাঁহাকে যথেষ্ট মানসিক উৎকণ্ঠা, অনেক উদ্বেগ পোহাইতে হইয়াছিল। যখন তিনি পরিস্ফুট মিডিযম্ হইযা উঠিলেন, তখন তাঁহাব অতীন্দ্রিয জ্ঞানৈশ্বর্য অতীব চমৎকাব হইল। তাঁহার সম্বন্ধে এমন সব ব্যাপাব ঘটিযাছিল যে, তাহা শুনিলে সাধারণ শ্রেণীর লোকে তাহা বিশ্বাস কবিয়া উঠিতে পাবে না। তিনি যে সব অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্ভবপব বলিয়া বর্ণনা করিযাছেন, লেড্‌বিটার সেরূপ ঘটনা নিজেও ঘটিতে দেখিয়াছেন। লেড্‌বিটার তাঁহাব কোন বর্ণনাই অতীব অসম্ভব বলিযা মনে করেন না।

মিডিযমের দেহাংশ লইযাই ভূতেব স্থূল-শবীব গঠিত হয়। সুতরাং স্থূলীভূত প্রেতদেহেব সঙ্গে মিডিযমেব দেহেব সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। এস্‌পাবান্স এই সম্পর্কটা খুব প্রাণে প্রাণে

বুঝিতেন; তাই বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি উহার বর্ণ করিয়াছেন। আমরা সকলেই দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন। আমরা আমাদের দেহকেই সর্বস্ব মনে করি। আমি বলিতে দেহকেই বুঝি। দেহের অতিরিক্ত যে একটা আত্মা আছে, তাহার যে ক্ষয়বৃদ্ধি নাই, সেটা আমরা আদৌ ভাবি না। তাই যখন শুনি যে, অমুক অমুক ঘটনায় দেহ এইরূপ বিশ্রী হইয়া যায়, তখনই আমরা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ি। দেহের একটা কিছু ঘটিলেই আমরা অস্থির হই ; বস্তুতঃ আত্মার তাহাতে কিছু আসে যায় না। ম্যাডাম্ এস্‌পারান্স তাঁর পুস্তকের ৩৪৫ পৃষ্ঠায় একটা ঘটনার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে বিষয়টি পড়িলেও দেখা যায়, মিডিয়মের দেহ হইতে জড়াংশ লইয়া ভূতের শরীর গঠিত হইতে থাকে, তখন মিডিয়মের দেহটা অতি বিশ্রী ও আশঙ্কাজনক হইয়া পড়ে। দেহের সে অবস্থাটা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয় ও অ-স্বাস্থ্যকর। সে ঘটনাটি এইরূপঃ—

অ্যানা না আমি

"বৈঠকে বসিয়া আছি। আমিই মিডিয়ম্। দেখিলাম, ঘরের এক কোণের দিক্ হইতে একটি রোগা ছোট বালিকামূর্তি হাত বিস্তার করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। তখন বৈঠকের একটি স্ত্রীলোক আসিয়া বালিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া আবেগভরে বলিতে লাগিলেন—'অ্যানা, আমার অ্যানা, আমার বাছা, আমার প্রাণের অ্যানা!'

"যখন এইরূপ ব্যাপার হইতেছিল, তখন আর একটি স্ত্রীলোকও ঐ বালিকাটির কাছে যাইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন; তাহার পর তিনিও অ্যানাকে ধরিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তাহার পর তাহাকে সোহাগ করিলেন, আদর করিলেন। যখন এইরূপ কাণ্ড চলিতেছে, তখন সকলেই সেই দিকে চাহিয়া ঐ সব ব্যাপার দেখিতেছেন। সকলেই দেখিতেছেন যে, একটি রোগা বালিকার কাছে শোক-চিহ্ন স্বরূপ কাল পোশাক-পরা দুইটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছেন। শুধু দাঁড়ানো নয়, তাঁহারা বালিকাটিকে ধরিয়া আছেন। আমার দিকে কাহারও লক্ষ্য ছিল না। আমার শরীরটা সে সময়ে যেন বাতাসে দুলিতেছিল, চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতেছিলাম। আমি আমার চেয়ারেই বসিয়াছিলাম বটে, কিন্তু মনে হইতেছিল, যেন আমার বুকের উপর আর কাহারা আসিয়া উদ্বেগ ভরে কাঁদিতেছে। যেন কি একটা ব্যাপার হইতেছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

"মনকে প্রবোধ দিলাম, আমার বুকের উপর কেহ আসে নাই, আমারই বুকেব ঐরূপ স্পন্দন হইতেছে। কিন্তু আমার গায়ে যে অপরের স্পর্শ অনুভব করিলাম, স্পষ্ট অনুভব, তাহার ব্যাখ্যা কি করিয়া করি? তখন মনে হইতে লাগিল। —ঐ অ্যানাই আমি। চেয়ারেব উপর এই মূর্তিটিই আমি, না ঐ বালিকা মূর্তিটিই আমি, ভাবিয়া স্থিব কবিতে পাবিতেছিলাম না। অ্যানা শোকাতুবা বৃদ্ধার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, আমি ভাবিতেছিলাম, আমিই কি ঐ গলা ধবিয়া রহিয়াছি? ঐ হাত দুখানাই আমার, না এই হাঁটুর উপরেব হাত দুখানা আমাব?

"অ্যানার মুখে বৃদ্ধা চুমো খাইতেছিলেন। বৃদ্ধা ও অ্যানাব ভগিনী তাহার গায়ে চোখের জল ফেলিতেছিল। আমার মনে হইতে লাগিল, উহাবা আমারই মুখে চুমো খাইতেছে—আমাবই গায়ে চোখের জল ফেলিতেছে। ভাবিলাম—এ কিরূপ ব্যাপার। অপবেব সহিত এইরূপ অভিন্ন হইয়া পড়ায় কেমন একরূপ অশান্তি বোধ হইতে লাগিল। আমাব হাত দুখানা নিস্পন্দ হইয়া ঝুলিতেছিল। ভাবিলাম, একখান হাত তুলিয়া বিস্তাব কবি। বিস্তাব কবিয়া কাহাকেও স্পর্শ

করিয়া একবার বুঝিয়া লই যে, আমি সত্য সত্যই বাঁচিয়া আছি কি না; যাহা দেখিতেছি, তাহা প্রকৃত কি স্বপ্ন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব। ভাবিলাম তাহা হইলে জানিতে পারিব, আমি অ্যানা হইয়া গিয়াছি, না আমি আমিই আছি।

"বৃদ্ধার হস্তের কম্পন, তাঁহাব আদর -চুম্বন, অ্যানার ভগিনীর চোখের জল, সোহাগ আদর—সবই আমি অনুভব করিলাম। আমার প্রাণে কেমন একরূপ উদ্বেগ অশান্তি হইতে লাগিল। ভাবিলাম—এ ভাব কতক্ষণ থাকিয়া যাইবে। আমি এক ছিলাম, এখন অ্যানা আর আমি এই দুইটি হইয়া পড়িলাম। আমার এই দুইটি হইয়া থাকা কতক্ষণ থাকিবে? পরিণামই বা কি দাঁড়াইবে—আমি কি তবে অ্যানা হইয়া যাইবি, না অ্যানাই আমি হইয়া যাইবে? কোন্‌টা দাঁড়াইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

"এইরূপ ভাবিতেছ, এমন সময় 'জন্টি' নামক একটি ছোট ছেলে আমাব গায়ে হাত দিল। তখন আমার অসাড় ভাবটা গেল, আমি তখন বুঝিলাম, আমি ঠিকই আছি। আমার প্রাণে যেন একটু সজীবতা আসিয়া পড়িল।

"জন্টি আমাকে স্পর্শ কবায় আমি খুবই তৃপ্তি পাইলাম। তাহার স্পর্শেই আমার সন্দেহ দূর হইল, তন্দ্রায় ভাবে যখন এইরূপ একটু শান্তি ভোগ করিতেছি, ঠিক তখনই অ্যানা অন্তর্দ্ধান হইয়া পড়িল। শোকাতুবা বমণী দুই জনও আপন আপন স্থানে গিয়া বসিলেন। তাঁহাদের চোখে জল, প্রাণ আলোড়িত , অথচ প্রাণাধিক আত্মীযকে মরণের পর পাইযা খুব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

"ঐ রাত্রে আরও অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা অনেক হইয়াছিল; কিন্তু আমি বড়ই দুর্বল হইযা পড়ায় সে দিকে বিশেষ, লক্ষ্য করি নাই। আর লক্ষ্য করিতে ইচ্ছাও হইল না। আশ্চর্য আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিতে লাগিল, কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমার সমস্ত প্রাণটুকু বাহির হইযা যাইতেছে। তাই আমি নির্জনে যাইয়া বিশ্রামের অভিলাষিণী হইয়া পড়িলাম।"

উপরের কাহিনীতে দেখা গেল, মিডিয়ম্ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মিডিয়মেরা প্রায়ই এইরূপভাবে অবসন্ন হইয়া পড়েন। স্যার্ উইলিযম্ ক্রুক্‌শ তাঁহার "গবেষণা" নামক পুস্তকের ৪২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন ঃ—"মিঃ হোম্ এক জন মিডিয়ম। বৈঠকের পর অনেক দিনই তাঁহাকে একেবারে অবসন্ন ও মৃতকল্প দেখিয়াছি। সে অবস্থাটা বড়ই আশঙ্কাজনক ও যাতনাপ্রদ। অনেক দিন দেখিয়াছি, রক্তহীন মূর্তিতে বাক্‌বোধ অবস্থায় মর-মব হইয়া ভদ্রলোক মেঝেয় পরিয়া আছেন। এই সব দেখিয়া মনে হয়, অধুনা মানুষের অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হইলেও অপরদিকে জীবনী শক্তির হ্রাস ঘটিয়াছে।"

লেড্‌বিটার বলেন—"আমি সম্পূর্ণভাবে ক্রুক্‌শের ঐ কথাগুলি সত্য বলিয়া স্বীকার করি। আমি নিজেও বৈঠকের পরে অনেক মিডিযম্‌কে অবসন্ন হইয়া পড়িতে দেখিয়াছি। এমন কি, তাহাবা প্রকৃতিস্থ হইবার নিমিত্ত সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছে। বৈঠকে তাহাদের দেহ হইতে জড়াংশ লইয়া ভুতেরা স্থূলীভূত, অস্থাযী দেহ রচনা করিযা কার্য-কলাপ কবায় তাহাদের জীবনীশক্তি এতই নষ্ট হইয়া যাইত যে, তাহাদিগকে দেখিলে মনে হইত, তাহাদের শরীরে দারুণ অস্ত্রোপচার কবায় তাহারা ঐ প্রকার কাহিল হইযা পড়িয়াছে। তাহারা যেন অস্ত্রকরা বোগী। আর ঐরূপ না দেখাইবেই বা কেন? তাহাদের শরীর হইতে যখন ৪০ পাউণ্ড স্থূল দ্রব্য বাহির হইয়া যাইত, তখন আর অস্ত্র কবার বাকীই বা রহিল কোথায়? অবশ্য পরে আবার ঐ ৪০ পাউণ্ড ভূতেবা ফিরাইয়া দিত।

স্থূলীভূত ভূতের সঙ্গে মিডিয়মের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ; এ বিষয় ম্যাডাম্ ডি, এস্‌পারান্স স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে "যোলান্দী" নাম্নী প্রেতিনীর কিরূপ ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটি এই ঃ—

ভূতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা

"আমাদের মধ্যে বেশ একরূপ বন্ধুত্ব ছিল। তাহার উপর আমার কোন জোর ছিল না, ইচ্ছা করিলেই যে তাহাকে আনিতে পারিতাম, তাহা নহে। অথচ সে সর্বদাই আসিত। আসা না আসাটা একেবারেই তাহার ইচ্ছাধীন ছিল। কিন্তু সে যখনই আসিয়া মূর্তি ধরিয়া দাঁড়াইত, তখনই আমার উপরেই তাহার মূর্তির অস্তিত্বটা নির্ভর করিত। সে আমারই দেহের জড়াংশ লইয়া তাহার দেহ গড়িয়া তুলিত। আমার তখন জ্ঞানের কিছুমাত্র অপচয় ঘটিত না বটে, কিন্তু শরীরটা বিশ্রী দুর্বল হইয়া পড়িত। তাই পরে বুঝিতে পারিলাম যে, আমার শরীর হইতে সে অনেকটা অংশ আকর্ষণ করিয়াছিল। আমার দেহের পরিবর্তনটা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কেমন করিয়া আকর্ষণ করিতেছে, যদি নিবিষ্টভাবে ভাবিবার, বুঝিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে যোলান্দী দুর্বল হইয়া পডিত (ছায়ারাজ্য—২৭১পৃষ্ঠা)"।

বৈঠকে যখন ভূতেরা মিডিয়মের দেহাংশ গ্রহণ করিয়া মূর্তিমান্ হয় ও নানাবিধ কার্য্য করিতে থাকে, তখন মিডিয়ম্ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। কিন্তু সেসময়ে তাহার ভিতরে ভিতবে জ্ঞান থাকে, জ্ঞানের বিলোপ ঘটে না। সেই সময় যদি মিডিয়ম্ যুক্তিতর্কের শৃঙ্খলা রাখিয়া ভূতেব কাণ্ড-কারখানা চিন্তা করিতে বসে, তাহা হইলে ভূতের সেই স্থূলীভূত অস্থায়ী দেহটা খুবই দুর্বল হইয়া পড়ে। এমন কি, তাহা হইলে তাহারা আদৌ মূর্তিই ধরিতে পাবে না। কেন না, মূর্তি ধবিতে হইলেই মস্তিষ্কের ভিতর হইতে এক প্রকার তেজোময় পদার্থ গ্রহণ কবিতে হয। মিডিয়ম্ যদি উদাসীনভাবে পড়িয়া থাকে, তবে তাহার মস্তিষ্কের ঐ পদার্থ লইয়া ভূতেরা বেশ দেহ গড়িয়া কাজ কবিতে পাবে। তাহাতে ভূতের শরীরও থাকে, মিডিযমেরও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু যদি মিডিয়ম্ চিন্তার শৃঙ্খলা রাখিতে যায়, তবে তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে একটা রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে থাকে অর্থাৎ ঐ তেজোময় পদার্থ আলোড়িত, বিলোড়িত ও রূপান্তবিত হইতে থাকে। তখন সেখান হইতে পরমাণু সংগ্রহ করিয়া দেহ রচনা করা ভূতের প[illegible] সহজ হয় না। আলোড়িত মস্তিষ্কের পরমাণু বহির্গত হওয়া সহজ কথা নয়। তাহাতে মিডিয়মেব জীবনাশও ঘটিতে পারে। মিডিয়মের শবীরাংশ লইয়াই ভূতের স্থূলশরীর গঠিত হয। আবাব যতক্ষণ ভূতেব শবীর হইতে ঐ অংশগুলি মিডিযমের শরীরে ফিরিয়া না যায়, ত[illegible]ক্ষণ মিডিয়মের বিপদ কাটে নাই বুঝিতে হইবে। তাই ভূতের উপর হঠাৎ আক্রমণ করিলে বা [illegible] ব্যতিব্যস্ত কবিযা তুলিলে তাহাতে মিডিয়মেরই ক্ষতি করা হয়। তাহাতে ভূতের কিছু হোক না হোক, মিডিয়ম্ মাবা পডিতে পারে। তাই যদি কোন অবিশ্বাসী নাস্তিক "ভূতের মূর্তি" দেখিয়া গোঁয়ারেব মত তাহাকে ধরিতে যায়, তবে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করা উচিত। সেরূপ নির্বোধকে পাগল মনে কবিযা তাহার জন্য শাস্তিবিধান করা কর্তব্য। যে ব্যক্তি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ ভূত ধরিতে যায়, তাহাকে খুনী আসামী মনে করাই উচিত। ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে বৈঠকে লইয়া বসা উচিত নহে। ঐরূপ নির্বোধ গোঁয়ারদের দ্বারা যে কি ভয়ানক অপকার হইতে পাবে, তাহা ম্যাডাম্ ডি এস্‌পারান্স নিজেই একবার টেব পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুস্তকেব ২৮৯ পৃষ্ঠায় সে ঘটনাটি লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন. ব্যাপারটি এইরূপ হইয়াছিল।

একটা লজ্জাকার বলপ্রয়োগ

"বৈঠক কতকক্ষণ চলিয়াছিল, তাহা আমি জানি না, তবে এইমাত্র জানি যে আমি নির্জন ঘরটিতে থাকিলাম, আর 'যোলান্দী' একটা কলসী কাঁধে করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার পর বৈঠকে যে সব কাণ্ড হইয়াছিল, তাহা আমি পরে শুনিয়াছিলাম। 'যোলান্দী' গেলে পর আমার মনে হইতে লাগিল, কে যেন আমাকে মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া ধরিতেছে। তাহাতে আমার খুব ভয় ও যাতনা বোধ হইতেছিল। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন জীবন বলিয়া পদার্থটা আমার দেহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। ইহার কারণ তখন কিছুই জানিতে পারিলাম না, কিছুই দেখিতে পাইলাম না, কিছুই শুনিতে পাইলাম না; কেবল খুব দূরাগত একটা ক্রন্দনধ্বনি যেন আমার কানের মধ্যে প্রতিধ্বনির মত আসিতে লাগিল। আমর মনে হইতে লাগিল, আমার জীবন প্রদীপ নিভিয়া যাইতেছে। মনে হইতে লাগিল, আমি যেন খুব নীচে নামিয়া যাইতেছি। কোথায়, তাহাই জানি না। আমি যেন বাঁচিবার জন্য কিছু ধরিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু যাহাই ধরিতে যাইতেছি, তাহা যেন পিছলাইয়া পড়িতেছে। তাহার পর অজ্ঞান হইলাম। পরে জ্ঞান হইলে দেখিলাম, আমি ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছি। কে যেন আমাকে মুচড়াইয়া মুচড়াইয়া মারিয়া ফেলিতেছিল,—ঐরূপ একটা অনুভূতি তখনও প্রাণের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে।

"আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ধীরে ধীরে আবার সেগুলিকে প্রকৃতিস্থ করিলাম। পরে আস্তে আস্তে আমার ঐরূপ হইবার কারণগুলি বুঝিতে পারিলাম। 'যোলান্দী' মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বৈঠকে উপস্থিত হইলে এক ব্যক্তি তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়াছিল, তাহার বিশ্বাস, আমিই 'যোলান্দী' সাজিয়া প্রতরণা করিতে গিয়াছলাম।

"পরে আমি ঐরূপ কাণ্ডের কথা শুনিলাম। উহা আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলাম না। কেন না, আমি ঐ কাণ্ডের ফলে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, এমন কি, নড়িবার বা কথা বলিবার শক্তি পর্য্যন্তও আমার ছিল না। আমার মনে হইতে লাগিল, জীবনীশক্তির খুব সামান্য একটুমাত্রই আমার দেহে আছে, আর যেটুকু আছে, তাহাও যাতনাময়। আগে আমার মুখ দিয়া রক্ত উঠিত; দক্ষিণ-ফ্রান্সে বাস করায় সে ব্যারামটা সারিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার ফলে সে ব্যারামটা আবার হঠাৎ দেখা দিল। বিশ্রী রক্তবমি হইতে লাগিল। আমি যাই আর কি! ইহার পর বহুদিন যাবৎ আমি রুগ্ন অবস্থায় শয্যাশায়িনী থাকিলাম। স্বাস্থ্যের জন্য স্থান-পরিবর্তনের কথা হইল। কিন্তু আমাকে নড়াইবার উপায় নাই। কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া আমাকে ইংলণ্ডে আরও কিছুকাল থাকিতে হইল।

"ভূত মূর্তি ধরিয়া আসিলে যদি কেহ তাহাকে ধরে, তবে মিডিয়মের ঐ প্রকার ভয়ানক অবস্থা দাঁড়ায়। তাই ভূতেরা যাহাতে মিডিয়মের কোন ক্ষতি না হইতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকে। বদ্‌মায়েসরা ভূতকে চাপিয়া ধরিলে তাহাতে যে শুধু মিডিয়মের ক্ষতি হয়, তাহা নহে; তাহাতে উহাদেরও যাতনা হয়। বৈঠকের লোকদের উপর বিশ্বাস করিয়া উহারা অনেক সময় প্রতারিত হয়।" নিম্নলিখিত বিবরণটি লেড্‌বিটার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ—

"আমার দুই জন বন্ধু অতীব বুদ্ধিমান্। এক জনের নাম—ডাক্তার এ, ডি, উইলসন; অপরের নাম—অধ্যাপক জেম্‌স্ মেপ্‌স। দুই জনই নিউ-ইয়র্কবাসী ছিলেন। এখন তাঁহারা ইহজগতে নাই। তাঁহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভূতের ঝক্‌ঝকে হাত দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া

ধরিয়াছিলেন। ভূত ধরিলে যে ফল হইবার কথা, তাহাই হইয়াছিল। ধরিবামাত্রই হাত মিলাইয়া গেল! অতঃপর ভূতেরা আমাকে জানাইয়াছিল যে, ঐরূপ কাণ্ডে তাহাদের যাতনা হইয়াছিল। এইসব ব্যাপার ঘটে বলিয়া ভূতেরা মানুষের মূর্তি ধরিয়া জীবিত মানুষের খুব কাছে আসিতে চায় না। যাহাকে খুব বিশ্বাস করে, কেবল তাহারই কাছে আসে। আমি অনেক ভূতের স্থূলীভূত মূর্তি দেখিয়াছি, কিন্তু তাহাদিগকে ধরিবার লোভ প্রাণে আসিলেও সে লোভ দমন করিয়াছি, তাই ভূতের তত্ত্ব সংগ্রহে কতকটা কৃতকার্য হইয়াছি।"

ভূতকে চাপিয়া ধরিলে সে বাস্তবিকই যাতনা পায় কি না, তাহা আমরা জানি না। তবে স্থূলীভূত দেহটাকে আঘাত করিলে যে তাহার কষ্ট হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই জন্যই ভূতাবিষ্ট লোকের চতুর্দিকে তরবারি সঞ্চালন-প্রথা বোধ হয় চলিয়া আসিতেছে। ইহাতে অন্য লোকের অত্যাচার করিবার সম্ভাবনা থাকে না। মধ্যযুগের যাদুকরেরাও বোধ হয় এই কারণেই সর্বদা তরবারি ব্যবহার করিত।

কোন অস্ত্রেই ভূতের সূক্ষ্ম দেহের ক্ষতি হয় না। উহাকে পুনঃ পুনঃ তরবারি দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা কাটে না। ভূতের অনুভূতিই হয় না যে, তরবারি তাহার দেহের ভিতর দিয়া সঞ্চালিত হইয়া গেল। কিন্তু ভূত যখন স্থূলীভূত হইয়া দেখা দেয়, তখন তাহাকে তরবারির আঘাত করিলে তাহাতে তাহার যাতনার অনুভূতি হয়। জীবিত মানুষের দেহে অস্ত্রাঘাত করিলে যেমন বেদনার অনুভূতি হয়, তাহারও তখন সেইরূপ যাতনাই বোধ হইয়া থাকে। শুধু ভূত নহে, ভূতের উপর অত্যাচাব করিলে মিডিয়মেরও খুব বেশী যাতনা হয়। তাহার প্রমাণ আমরা ম্যাডাম্ ডি, এস্পারান্সের ঘটনায় পাইয়াছি।

লেড়বিটার বলেন—"মিঃ আউয়েনের উপরিউক্ত কথাগুলি আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমি যখনই ভূত-প্রেতের তথ্য সংগ্রহে ব্রতী হইয়াছি, তখনই ঐ কথাগুলি মনে রাখিয়া কার্য করিয়াছি। প্রেত-তত্ত্বটা খাঁটি জুয়াচুরি, এই ধারণাটি অনেকের বদ্ধমূল. তাহারা প্রেত-তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই সংকল্প করে—প্রতারণা ধরিব। তাই নানারূপ কলকৌশল করিতে যায়। আর এ কথাটিও সত্য যে, যতগুলি ভূতের কাণ্ড শুনা যায়, তাহার অনেকগুলি মিথ্যা ও প্রতারণা মূলক, কেন না, অবিশ্বাসীব বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ভূতেরা খুব বেশী ব্যস্ত নয়। মূর্তি ধরিয়া দেখা দিয়া বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ভূতেরা খুব বেশী ব্যস্ত নয়। মূর্তি ধরিয়া দেখা দিয়া বিশ্বাস করাইতে হইবে তাহাদের এত গরজ নাই। তাই বলিতেছি, ভূতের সব কাহিনীই সত্য নয়।"

ডাক্তার আল্‌ফ্রেড্ আর ওয়ালেস্ এক সময় এই মন্তব্যটি করিয়াছিলেন ঃ—"ভূত সম্বন্ধে সকল বৈজ্ঞানিকেরই একরূপ কথা। তাঁহারা বলেন—'ভূতের তথ্য অনুসন্ধানকালে আমরা কতকগুলি শর্তের কথা বলিব, সেইগুলি মানিয়া যদি ভূত দেখা দেয়, তবেই ভূতের ব্যাপার আমরা বিশ্বাস করিতে পারি ; আর আমাদেব শর্তের মধ্যে না আসিলে আমরা উহা মানিতে প্রস্তুত নাই। সে ক্ষেত্রে জুয়াচুরি বলিয়াই আমরা ধরিয়া লইব।' তাঁহারা উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন যে, প্রকৃতির অন্যান্য বিভাগের তত্ত্ব করিবার সময় সর্ত জাহিব করা প্রকৃতির হাতেই থাকে; প্রকৃতিপ্রদত্ত সর্ত্তের অনুগমন না করিলে কোন পরীক্ষাই সফল হয় না। ধীরভাবে প্রকৃতির নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া ঐ সকল সর্ত জানিয়া লইতে হয়। শুধু তাহাই নহে। এক এক বিভাগের সর্তও এক একরূপ। যখন স্থূল বিষযেব বেলাতেই এইরূপ, তখন অতিশয় দুর্বোধ্য অতীন্দ্রিয় শক্তির সর্ত যে খুব পৃথক্ রকমের হইবে, তাহাব আব বিচিত্র কি? মানিয়া লইলে ক্রমে সকল

বিষয়ই পরিস্ফুট হইয়া আসে। আবার মানিয়া না লইলে প্রকৃত তথ্যও উড়িয়া যায়। একটা উহাহরণ লইয়া বুঝা যাক। কতকগুলি দ্রব্য এমন আছে, যাহাদের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হইতে পারে না। এখন বিদ্যুৎ তত্ত্ব জানিতে বসিয়া আমরা যদি প্রথমেই ঐ সকল দ্রব্যের ঐ গুণটি অস্বীকার করিয়া তোতা পাখীর মত 'মিথ্যা' বলিয়া চীৎকার করিতে থাকি, তবে বৈদ্যুতিক শক্তির অস্তিত্বও অসাধারণ ও কার্য্যকারিতা প্রভৃতি কখনই মানবের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইবে না। ভূত-প্রেত সম্বন্ধে মানুষ যে কত অজ্ঞ, তাহা কর্ণেল, অল্‌কট্‌ প্রণীত 'পরলোকের ব্যক্তি' নামক গ্রন্থের ৩৬/৪০পৃষ্ঠার বিবরণে আমরা জানিতে পারি।"

লেড্‌বিটার বলেন—"ভূতের তথ্য জানিতে হইলে বিশ্বাস কবিয়া আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে ভূতের সঙ্গে একটা সদ্ভাব জন্মে—তাহার ফলে ভূত এমন অনেক কাণ্ড দেখায়, যেগুলিকে সত্য না বলিয়া থাকা যায় না। অবিশ্বাসী. সাজিযা তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে কোন ফলই ফলে না। কিছুই জানিবার উপায় হয় না। আমি নিজে বিশ্বাস করিয়াই প্রবৃত্ত হই। সেইটিই আমার রীতি, তবে যখন অবিশ্বাসের কারণ কিছু ঘটে তখন অবিশ্বাস করি তাহাতে দোষ কি?

অনেক বৈঠকে আমাকে প্রতারিত করিবারও চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু যখন বুঝিয়াছি যে, সেগুলি মিডিয়মের কাণ্ড, তখন মনে মনে বুঝিলেও ঝগড়া ঝাটি করি নাই। বাগ্‌ বিতণ্ডা করি নাই, লক্ষ্মীটির মত চুপ্‌ চাপ্‌ করিয়া গিয়াছি। আবার অনেক বৈঠকে এমন দেখিয়াছি যে, মিডিয়ম্‌ বাস্তবিক পক্ষে নির্দোষ। শুধু অন্য ব্যক্তি আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়াছি—মিডিয়ম্‌ বাস্তবিকই তন্দ্রাচ্ছন্ন, তাহার দেহটার উপর একটা সাদা কাপড়ের মত পদার্থ রহিয়াছে। ভূতে সঙ্কেত দ্বারা জানাইল, যে, ঐ দেখ, ভূত মূর্তিমান হইয়া কাপড় গায়ে দিয়া বসিয়া আছে। ঐ ব্যাপাব খাঁটি জুয়াচুরি। মূর্তি ধরিয়া আসিয়া দাঁড়ান কাজটি শক্তিসাপেক্ষ। সেই শক্তির যেখানে অভাব, সেইখানেই এইরূপ প্রতারণা ঘটে। এ ঘটনাব পর যখন মিডিয়ম্‌ তন্দ্রা-মুক্ত হইয়া উঠিয়া বসে, তখন সে এই সব কাণ্ড শুনিয়া বিরক্ত হয়, তাহার তখনকার ভাবভঙ্গী দেখিলে বাস্তবিকই তাহাকে নির্দোষ বলিয়া মনে হয়। অল্প শক্তি-সম্পন্ন ভূতেরাই এইরূপ কাণ্ড করে। অন্য সময় এই মিডিয়ম্‌ই হয় তো কত অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছে, এমনও দেখিয়াছি। বুঝিতে হইবে, ঐ সময় শক্তিশালী ভূতের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

ঠিক এইরূপ ব্যাপার হওয়ায় এক জন সুবিখ্যাত মিডিয়মের নিন্দা ঢাকে ঢোলে খবরের কাগজে বাহির হইয়াছিল। সে ক্ষেত্রেও বাস্তবিক পক্ষে মিডিয়ম্‌ নির্দোষ। লেড্‌বিটার বলেন—একটা প্রতারণার ব্যাপার ঘটিলেই সব সময়ে মিডিয়মের নিন্দা করা চলে না। তিনি বলেন—"আমি নিজে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছি। বৈঠকে আমবা আছি, এমন সময় মিডিয়ম্‌ আমাদিগকে একটু কাপড় দিল; কাপড়টুকু তাহার পকেটেই ছিল। দেখা গেল, সেটুকু 'ভূতের কাপড়' অর্থাৎ মিডিয়মের সত্যকার কাপড়েব পরমাণুপুঞ্জ আকর্ষণ করিয়া ভূত ঐ কাপড়টুকু স্থূলীভূত করিয়া তুলিয়া ছিল।" এরূপ ব্যাপাব আরও অনেকবার ঘটিয়াছে। ম্যাডান্‌ ডি, এস্‌পারান্সও এইরূপ একটা কথা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কথা এইরূপ ঃ—

ভূতের কাপড়

ক্রিশ্চিয়ানা নামক স্থানে আমরা অনেকগুলি বৈঠক করিয়াছিলাম। এক দিন একটি বৈঠকে এক জন লোক ভূতের দেহ হইতে একটা কাপড় টানিয়া লইলেন। তাহার পর দেখা গেল, আমার

নিজের পোষাকের খানিকটা নাই—কে যেন কাটিয়া ছিঁড়িয়া লইয়াছে। আমার পোশাকটা কালো উলের ঘন বুনানি ছিল। সভ্য মহাশয় যে অংশটা ভূতের গা হইতে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন, দেখা গেল, সেটা আমারই কাপড়ের ছেঁড়া অংশটার মত—কেবল কিছু বড়, আর রঙটা সাদা, বুনানিটা খুব পাতলা, যেন সূক্ষ্ম মাকড়সার জাল।

ইংলণ্ডেও ঐরূপ একটা কাণ্ড ঘটিয়াছিল। যে প্রেতিনীটা মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছিল, তাহার নাম—"নিনীয়া।" নিনীয়ার গায়ে খুব কাপড় চোপড় পরা ছিল। এক জন সভ্য তাহার কাছে একটু কাপড় চাহিলেন। নিনীয়া প্রথমে একটু অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া শেষে দিতে সম্মত হইল এবং দিল। বৈঠকের অন্তে দেখা গেল যে, আমারই একটা নূতন পোশাক খানিকটা ছেঁড়া। পোশাকটি আমি সেই দিনই কেবল পরিয়াছি। নূতন পোশাকটি ছিঁড়িবে! তাই নিনীয়া প্রথমে কাপড় দিতে অনিচ্ছা করিতেছিল, বুঝা গেল। তখন ভাবিলাম, নিনীয়া না ভাবিয়া চিন্তিয়া এই অন্যায় কাজটি করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পরেও আবার এরূপ কাণ্ড ঘটিল। তখন বুঝিলাম—এটা আকস্মিক ঘটনা নহে, বৈঠকের ভূত আমারই পোশাকের জড়াংশ গ্রহণ করিয়া তাহার চক্‌চকে পোষাক প্রস্তুত করিয়া লয়।—"ছায়ারাজ্য",৩৩৭পৃষ্ঠা।

এই যে ভূতের কাপড়ের কথা বলা হইতেছে, ইহা নানা প্রকারের দেখা যায়। কোন কোন কাপড খুব মোটা, আবার কোন কোনখানি চমৎকার সূক্ষ্ম, ভারতের শিল্পীরাও অত সূক্ষ্ম কাপড় বুনিতে পারে না। কখন কখন ভূত বা প্রেতিনী আসিয়া কোন এক জন সভ্যকে হয় তো বলিয়া বসে—"আমার পোশাকে আপনি হাত দিয়া দেখুন, কেমন নরম, কেমন সূক্ষ্ম।" আবার কখন কখন বলে—"আপনি ইহা হইতে একটু কাটিয়া লউন।" লেড্‌বিটারেব কাছে ভূতের কাপড়ের কাটা অংশ অনেকগুলি ছিল। ভূত ইচ্ছা করিয়া ঐগুলি দিয়াছিল। অনেকগুলি খণ্ড আসল কাপড়ের মত অনেকদিন ঠিক ছিল; আবার অনেকগুলি খণ্ড এক ঘন্টার মধ্যেই মিলাইয়া গেল, কোন কোনখানা আবার ১০ মিনিটের মধ্যেই লোপ পাইল। ভূতেরা সাধারণতঃ হাল্কা সাদা পোষাকই পরে; ঐটিই উহাদের রীতি। আবার সভ্য সমাজ প্রচলিত পোশাক পরিয়া হাজির হইতেও তাহাদের কখন কখন দেখা যায়। জীবিতকালে লোকটা যে পোশাক পরিত, কখন কখন সেরূপ পোষাক পরিয়াও আইসে।

ভূতের সুস্পষ্ট মূর্তি

ভূত সুস্পষ্ট মূর্তি ধরিয়া পরে বিলীন হইয়া গেল, এরূপ ভাবের একটা বিবরণ "ছায়ারাজ্য" নামক গ্রন্থের ২৫৭পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে। যিনি সর্বদা বৈঠকে যাওয়া আসা করিয়া স্বয়ং ঐ কাণ্ড দেখিয়াছেন, এমন এক জন সভ্য উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্যাপারটা এইরূপ ঃ—

"বৈঠকে আছি, এমন সময় দেখিলাম, সেই ঘরের মেঝের উপরে কি যেন সাদা রকমের খানিকটা জিনিস পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার পর ঐ জিনিসটা নড়িয়া চড়িয়া বাড়িতে লাগিল, মনে হইল, যেন একটা সজীব কাপড়ের পুঁটুলি। বাড়িতে বাড়িতে সেটা ৩ ফিট লম্বা, ২৷৷ ফিট প্রস্থ আর ৫/৬ ইঞ্চি বেধ—এই পরিমাণ হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই সেটা উঁচু হইয়া উঠিতে লাগিল, যেন উহার মধ্যে একটা মানুষের মাথা আছে, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। আর সেই অস্পষ্ট সাদা জিনিসটাও যেন তখন কাপড়-চোপড় বলিয়া স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে দুই ফিট্ উঁচু হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, যেন উহার মধ্যে একটা বালক রহিয়াছে, যেন

বালকটা কাপড় চোপড়ের মধ্যে আবৃত থাকিয়া চারিদিকে হাত সঞ্চালন করিয়া কোন কিছু সরাইয়া ফিরাইয়া রাখিতেছে।

"কাপড়-ঢাকা জিনিসটা উঠিতে লাগিল, কখন একটু ছোট হয়, আবার পরক্ষণেই খুব বাড়িয়া ওঠে। এইরূপভাবে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। এইরূপ বাড়িতে বাড়িতে ৫ফিট উঁচু হইল, তখন একটা মানুষের মূর্তি দেখা গেল, মূর্তিটা যেন জুতবরাত করিয়া কাপড় চোপড় গায়ে দিতেছে, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল।

"তখনই সেই ঘন-নিবিষ্ট কাপড় রাশির ভিতর হইতে মাথার দিকে উঁচু হইয়া দুইখানা হাত বাহির হইতে দেখা দিল। একটু পরেই সুন্দরী যোলান্দীর লাবণ্যময়ী দেহ-লতা সম্মুখে প্রকট হইল। তাহার দেহটা প্রায় ৫ ফিট্ লম্বা; মাথায় পাগড়ীর মত একটা পোষাক। সেই পাগড়ীর নীচে হইতে দীর্ঘ কালো কালো চুলগুলি কাঁধের উপর দিয়া আসিয়া পিঠে পড়িয়াছে।

"তাহার গায়ের পোশাক অনেকটা পূর্বাঞ্চলের মত। পোষাকের মধ্য দিয়া তাহাব দেহের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। কাপড় চোপড়ের বাড়্তি অংশটা সে কোমরে জড়াইয়া লইল, আবাব একটু পবেই খানিকটা পোষাক মেঝের রাখিয়া দিল, যেন আবশ্যকমত লইবে, এইরূপ ভাব।

"১০।১৫ মিনিট ধরিয়া এইরূপ কাণ্ড করিল।

"তাহার পর যখন প্রেতিনীটা মিলাইয়া গেল, তখন নিম্ন-লিখিত প্রকার ঘটনা হইল। নিজেকে চেনা দিবার অভিপ্রায়ে যোলান্দী সকলের সম্মুখে সরিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে মুখেব আবরণটি সরাইল। তাহার পর নব বিবাহিত বৌটির মত মুখের উপর ঘোমটা দিল। তাহার পর ছোট হইতে লাগিল। তাহার পব ক্রমেই তাহার আয়তন কমিয়া যাইতে লাগিল। শেষে আব তাহাকে যোলান্দী বলিয়া চেনা গেল না। তাহার পর আরও ছোট হইয়া পড়িল—তখন আব তাহাকে মানুষ বলিয়াই বোধ হইল না। তাহার পর ১০।১২ ইঞ্চি হইযা গেল। তাহার পরেই খানিকটা কাপড়ের রাশি হইয়া পড়িল—মনে হইল, যোলান্দীর পরিত্যক্ত পোষাকটা পড়িয়া রহিযাছে। পরক্ষণেই সে কাপড়ও ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল।

"৫ মিনিটের মধ্যেই যোলান্দীর এই অন্তর্ধান ব্যাপারটা শেষ হইয়া গেল। আর দুইব মিনিটের মধ্যেই কাপড়-চোপড় মিলাইয়া গেল। আর এক দিন এইরূপ কাণ্ড কবিবার সময় যোলান্দীর অন্তর্দ্ধান হইলেও তাহার কাপড়গুলি রহিয়া গেল। সেগুলি স্তূপীকৃতভাবে মেঝেয় পড়িয়া রহিল। একটু পরেই আর একটা প্রেত একটা নির্জন ঘর হইতে আসিয়া ঐ কাপড়গুলির দিকে চাহিয়া থাকিল—যেন কি ভাবিতেছে। যোলান্দীর এইরূপভাবে চলিয়া যাওয়াটা ভাল হয় নাই. মুহূর্তমধ্যে এই লম্বা মূর্তিটাও মিলাইয়া গেল। পরক্ষণেই একটা ছোট চঞ্চলা স্ফুর্তির প্রাণ বালিকামূর্তি দেখা দিল। এ স্পেনদেশীয় সেই বালিকা—সেই 'নিনীয়া'। নিনীয়াও যোলান্দীর পরিত্যক্ত পোষাকটা দেখিতে লাগিল। নিনীয়ার গায়ে বেশ ভাল পোষাক ছিল, তথাচ সে আমোদচ্ছলে যোলান্দীর পোষাকটা কুড়াইয়া লইয়া পরিতে লাগিল।"

লেড়বিটার বলেন—"আমি নিজেও অনেকটা ঐ রকম কাণ্ড দেখিয়াছি। আমি ভূতটাকে আসিতে দেখিয়াছিলাম, সে বিশ্রী লম্বা। সে কাপড় চোপড়ের ভিতর দিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই। আমি দেখিলাম—প্রথম মেঝের উপর একটা আলোকের মত পদার্থ দেখা গেল—সেটা বাড়িতে বাড়িতে একটা গাছের গুড়ির মত হইয়া উঠিল। তাহার পর সেটা আমাদের অপেক্ষাও উঁচু একটা থামের মত হইল। তাহার পর সেই থামটা ক্রমে যেন মানুষের আকারে ফুটিয়া

উঠিল। মানুষ হইয়াই আমার কাছে আসিয়া বেশ সজোরে আমার সঙ্গে করমর্দন করিল। তাহার পর আসল মানুষের মত খুব সুস্পষ্টভাবে আমার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল। ৫ মিনিট কাল আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়া, আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়া করমর্দন করিয়া বিদায় লইতে প্রস্তুত হইল। বিদায়সূচক অভিবাদন করিয়াই সে অবিলম্বে অস্পষ্ট হইয়া পড়িল, পরক্ষণেই আবার সেই থামের আকার। তাহার পরেই সেই থামটা পূর্বেকার আলোকের মত হইয়া গেল। একটু পরেই আলোটা ২।১ বার কাঁপিয়া কাঁপিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল।"

আমি তিন জন ভূতের মূর্তি একসঙ্গে দেখিয়াছি। এক জন আরব, এটা মিডিয়ম্ অপেক্ষা ৬ ইঞ্চি লম্বা। আর এক জন ইউরোপবাসী, এটি সাধারণ মাপের লোক। তৃতীয়টি একটি কৃষ্ণকায়া বালিকা। এটি আমেরিকাবাসিনী। যখন এই মূর্তিগুলি দেখা দেয়, তখন মিডিয়মকে একটা তারের বাক্সে সুন্দররূপে আবদ্ধ করিয়া তালার চাবি-কাঠি আমি নিজে রাখিয়াছিলাম। আর অন্য একটা তালাও দেওয়া ছিল—সেটা অক্ষর খাটানো তালা, বাহিরে থেকে ভিন্ন খোলা যায় না। খানিকটা পরে খাঁচা খুলিয়া দিলাম। তখন ঐ তিন মূর্তির দুই জনে সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন মিডিয়মকে দুইখানা হাত ধরিয়া বাহিরে আনিল। আমরা মিডিয়ম্ ও মূর্তি দুইটির গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম। মূর্তি দুইটি মিডিয়ম্ অপেক্ষাও শক্ত বলিয়া বোধ হইল। তাহারা মিডিয়মকে আর তারের খাঁচার মধ্যে লইয়া গেল না, আমাদের সকলেই সম্মুখে একখানি সোফার উপরে শোয়াইয়া রাখিল। তাহার পরে আমাদিগকে বলিল যে, নিদ্রাভঙ্গের পর সে ভয়ানক দুর্বল হইয়া পড়িবে। এইরূপ বলিয়াই মূর্তি দুইটি অদৃশ্য হইয়া পড়িল। একটা মিটমিটে আলোর মধ্যে এই সব কাণ্ড হইয়া গেল। মিটমিটে, কেন না, সে সময় গ্যাসের আলো কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আলো মন্দীভূত হইলেও মিডিয়মের ও মূর্তি দুইটির মুখশ্রী বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। তাহারা কে ও কি করিতেছে, তাহা বেশ ভাল করিয়াই আমরা দেখিয়াছিলাম।

ভূত মূর্তি ধরিয়া সর্বদা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়ায় না। উপরে যেরূপ ঘরের এধার ওধার করিয়া বেড়াইবার কথা বলা হইল, সাধারণতঃ সেরূপটা দেখা যায় না। খুব বেশীর ভাগ তাহাদিগকে মিডিয়মের কাছেই অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। ভূতের স্থূলীভূত দেহের পরমাণুপুঞ্জ মিডিয়মেরই দেহ হইতে সংগৃহীত; তাই মিডিয়মের দেহের দিক্ হইতে নিরন্তরই একটা আকর্ষণ হইতে থাকে। এই কারণে তীব্র আকর্ষণের ফলে ভূতের দেহ অনেকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে না, উহার পরমাণুগুলি তীব্রবেগে পুনরায় মিডিয়মের দেহেই চলিয়া যাইতে চাহে; যাইয়াও থাকে। ভূতের দেহ হইতে ঐ সূক্ষ্ম পরমাণুগুলি যখন মিডিয়মের দেহে আসিতেছে তখন যদি আসিতে না দেওয়া হয়, তবে তাহাতে মিডিয়মের ভয়ানক বিপদ ঘটে। এমন কি, তাহাতে সে মারা পড়িতেও পারে। সেযে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা আমরা উপরে উদ্ধৃত ম্যাডাম ডি, এস্পারান্সের গল্পেই বলিয়াছি। ম্যাডামের ব্যাপারে আমরা বুঝিয়াছি যে, তাঁহার দেহের সামান্য অংশটাই নির্জন ঘরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আর শরীরের খুব বেশী অংশটাই যোলান্দী নাম্নী প্রেতিনীর দেহ-গঠনে ব্যয়িত হইয়া আবদ্ধ ছিল। যোলান্দীকে যখন অন্যায় করিয়া আটকানো হইল, তখন ম্যাডামের শরীরস্থ সামান্য পরমাণুরাশি বাহির হইয়া যোলান্দীর দেহের দিকে আসিয়াছিল। এই কারণেই লোকে মনে করিয়াছিল যে, তিনি ঐ কাণ্ডের সময়ে নির্জন ঘরের বাহিরে আসিয়াছিলেন। এই কারণেই যাহারা প্রেততত্ত্বের ব্যাপার বিশেষরূপ জানে না, তাহাদিগকে বৈঠকে বসিতে দেওয়াই উচিত নহে।

বৈঠকে যে সব সভ্য বসেন,তাঁহাদের সকলের দেহ হইতেই ভূত কিছু কিছু জড়াংশ আকর্ষণ করিয়া লয়। এই নিমিত্ত যাহাকে তাহাকে বৈঠকে না লইয়া বেশ বিবেচনাপূর্বক সভ্য মনোনীত করিয়া লওয়া কর্তব্য। ভূতের স্থূলীভূত দেহে তখন সকলের দেহের জড়াংশ মিশ্রিত হইয়া পড়ে। সকলের দোষ গুণই ঐ জড়াংশের সঙ্গে সঙ্গে ভূতের দেহে যাইয়া ওঠে। সভ্যদের মধ্যে কোন অসৎ লোক থাকিলে তাহার অসদ্‌গুণ ভূতের দেহে আকৃষ্ট হওয়ায় সেই গুণের কু-ফল তখন সভ্যদের উপরে আসিয়া ফলিতে থাকে। তখন সকলকেই অল্পবিস্তর জ্বালাতন হইতে হয়। মিডিয়মের উপরেই বেশী ফলে; কেন না, মিডিয়মই সকলের অপেক্ষা তরল প্রকৃতি আর ভূত তাহার শরীর হইতেই বেশী জড়াংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। আমরা ম্যাডাম্ ডি, এস্‌পারান্সের অমূল্য গ্রন্থের ৩০৭ পৃষ্ঠা হইতে আর একটা গল্প উদ্ধৃত করিতেছি। ম্যাডাম্ এইরূপ বলিয়াছেন ঃ—

তামাকের কু-ফল

"ভূতের বৈঠকে যাইতে আরম্ভ করিয়াই বৈঠকান্তে আমার গা-টা কেমন বমি বমি করিত; কখনও কখনও বমি করিয়াও ফেলিতাম। আমি মনে করিতাম, এটা বোধ হয়, বৈঠকে বসার স্বাভাবিক ফল। বোধ হয় ইহার হাত হইতে নিস্তার পাইবার উপায় নাই। বৈঠক যখন আমার নিজের বাড়ীতে করিতাম কিংবা যখন বৈঠকে বালকের দল থাকিত, তখন আমার ওরূপ ভাবটা হইত না। আর যে বৈঠকে ভূতের ছবি তোলা হইত, সে বৈঠকের পর আমার অসুখটা খুবই বাড়িত, এমন কি আমি ২।৩দিন যাবৎ শয্যাগত থাকিতাম। তামাকের বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে শরীরের যেরূপ যেরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, আমার অসুখের সময়ও তাহাই দেখা যাইত। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল যে, বৈঠকে যখন তামাকসেবী লোক না থাকে, তখন আমার ঐরূপ অসুখ করে না, তামাক খোরের সঙ্গে বৈঠকে বসিলেই অসুখটা হইয়া পড়ে। আবার কোন সভ্য যদি পীড়াগ্রস্ত থাকিতেন, তবে সে বৈঠকের অন্তেও আমি অসুস্থ বোধ করিতাম। ম্যাডামের সঙ্গে বৈঠকে বসিলেও অসুস্থ হইতাম; সে অসুখও তামাক খোরের সঙ্গে বসিয়া অসুস্থ হইবার মত।

"বৈঠকে বসিয়া ঐরূপভাবে অসুস্থ হইলেও একপক্ষে আমার উপকার হইয়াছিল। আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, তামাক খাওয়া, মদ খাওয়া প্রভৃতি কতকগুলি প্রথা মানবসমাজে বিশেষ দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত না হইলেও উহা বৈঠকের পক্ষে ও মিডিযমের স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারক।"

যে ভূত বহুদিন ধরিয়া বৈঠকে-যাওয়া আসা করে, সে অতীন্দ্রিয় শক্তি বিষয়ে খুবই অভিজ্ঞ হয়। অনেক সময়ে সে বৈঠকের সভ্যদিগকে অনেক অদ্ভুত কাণ্ড দেখাইয়া সকলকে বিস্মিত করিয়া ফেলে। "জন্ কিং" নামক একটা ভূত অনেক দিন হইল, একটা বিস্ময়কব ব্যাপার দেখাইয়াছিল। ইচ্ছা করিলে সে এখনও সেরূপ ঘটনা আবার দেখাইতে পারে। বৈঠকে একরূপ রঙ্ মাখান চক্‌চকে শ্লেট ব্যবহৃত হয়। ঐ ভূতটা অনেক সময় ঐরূপ একখানা শ্লেট লইয়া তাহার উপর নিজের একখানা হাত ফুটাইয়া তুলিত। বেশ একখানা সুন্দর মোট-সোটা, বলিষ্ঠ সু-গঠিত হাত। বেশ সুস্পষ্ট হাত। হাতখানি সকলেই যখন অবাক্ হইয়া দেখিতেছে, তখন উহা কমিতে কমিতে একটা দুগ্ধ পোষ্য শিশুর হাতের মত ছোট হইয়া পড়িত। ছোট হইলেও

আগেকার বড় হাতখানির গঠনেব সঙ্গে গঠনে মিল থাকিত। অদ্ভুত ব্যাপার! আবার একটু পরেই বড় হইতে থাকিত। ধীরে ধীরে বাড়িত। বাড়িতে বাড়িতে শ্লেটখানির মত অত বড় হইয়া পড়িত। আবার কমিত, কমিয়া কমিয়া স্বাভাবিক হইয়া আসিত। সমস্ত ব্যাপারটা যেন একটা ভেল্কীর মত বলিয়া বোধ হইত। সকলের চোখেই যখন এই ব্যাপারটা পড়িত, আর উপস্থিত কেহই যখন ভেল্কীবাজ নহেন, তখন উহা বস্তুতঃ ভেল্কী নহে। উহা নিশ্চয়ই ভূতেরই কাণ্ড। ভূত মূর্তি ধরিয়াই ঐরূপ হাতের হ্রাসবৃদ্ধি করিত। যে ভূত জড়াংশ নাড়া-চাড়া করিতে শিখিয়াছে, তাহার পক্ষে ঐরূপ কাণ্ড করা খুবই সহজ।

ভূতেরা কখনও কখনও মানুষের সঙ্গে তামাসা করে

ভূতেরা শুধু যে মানুষের মূর্তি ধরিয়া থাকে, তাহা নহে। অন্য মূর্তিও কখনও কখনও ধরিয়া আসে। সেরূপ ব্যাপার লেড্‌বিটার একবার স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন—"আমি ঐরূপ ব্যাপার দেখিয়াছি আর তাহা আমার সুস্পষ্টভাবে আজও মনে আছে। জীবিতকালে যাঁহারা খুব রসিক থাকেন, মরণের পরও তাঁহাদের সে রসিকতার প্রবৃত্তিটা যায় না। এক দিন একটা বৈঠকে বসিযা আমরা ভূতের কাণ্ড কারখানা দেখিব বলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছি। আমাদের মাঝে এক জন নাস্তিক রকমের লোক ছিল। সে চীৎকার করিয়া গর্বের সঙ্গে আমাদিগের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে টীকাটিপ্পনী করিতেছিল। বলিতেছিল—'ভূত-ফুত সব মিথ্যা কথা, সর্বৈব জুয়াচুরি, আজ আমি আছি, ভূতের সাধ্য কি যে আমার সামনে আসে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকক্ষণ নাস্তিক ঐরূপভাবে বকিতে লাগিল। আমরা চুপ করিয়া থাকিলেও আমাদের মিডিয়ম্ বলিলেন—'মহাশয়! অত উদ্ধতভাবে কথা বলিবেন না, ভূতেরা অনেক সময় উদ্ধত মানুষকে রীতিমত শিক্ষা দিয়া থাকে।' ঐ মিডিয়ম্ ধীরপ্রকৃতি, নিরীহ ভদ্রলোক ওই ঐরূপ ভদ্রতার সঙ্গে নাস্তিককে সংযত হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু সংযত হওয়া দূরে থাকুক, নাস্তিক-আরও উদ্ধতভাবে কথাবার্তা, ঠাট্টা, বিদ্রূপ আরম্ভ করিয়া দিল। বলিতে লাগিল—'ভূত যদি থাকে, তবে আমাকে ভয় দেখাক্, একবার আমার সামনে আসুক দেখি তো?' আমরা এতক্ষণ অন্ধকার ঘরে বসিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম। কিছুই ঘটিল না। বৈঠকের প্রথমে কেবল শুনিলাম যে, শক্তিসঞ্চয় হলেই ভূত আসিয়া দেখা দিবে। সময় অনেক হইয়া গেল; আমরাও বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। তাহার পর আমার মনে হইতে লাগিল, এই নাস্তিক বেটাই যত নষ্টের মূল। এই পাপটার জন্যই আজিকার বৈঠকটা বৃথা হইয়া গেল। তাহার পর যে ঘটনা ঘটিল, তাহা দেখিয়া বুঝিলাম, আমার সে ধারণাটা ভুল।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইলে আমাদের বৈঠক-ঘরখানি কিরূপ তাহার একটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ঘরখানি বেশ সুন্দর পরিপাটি; দোতলার উপর; একটা বাড়ীর পিছন অংশে অবস্থিত। ঘরখানির সংলগ্ন আর একখানি বড় রকমের ঘর আছে। দুই ঘরের মাঝের দুয়ার কব্জাখাটানো; সুতরাং সেই দুয়ারকে বেশ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পর্দে পর্দে রাখা যায়। সে দুয়ার একবারে ছাদ পর্য্যন্ত উঁচু। আমাদের ঘরের টেবিলটা বিশ্রী রকমেব বড়; এত বড় যে, তাহার পাশের চেয়ারগুলিব কোন কোনখানা দেওয়ালে, কোন কোনখানা বা সেই উঁচু দুয়ার পর্য্যন্ত যাইয়া ঠেকিয়াছে। টেবিলটাতেই বেশী স্থান জুড়িয়া থাকায় চেয়ারগুলিকে ঐরূপভাবে সাজান হইয়াছে। আমাদের ঘরখানির আর একটা কোণের দিকে একটা দ্বার ছিল—সেটা দিয়া

সিঁড়িতে যাওয়া যাইত। সে দরজাটায় তালা বন্ধ ছিল, তালার চাবিটা ঘরের ভিতরের দিকেই তালার গায়ে লাগানো ছিল। তাহা ছাড়া আমাদের দিকে একটা হুড়কা দিয়া আবদ্ধ ছিল। আমরা বসিয়া আছি ; ৪৫ মিনিট কাটিয়া গেল, ভূতের সাড়াশব্দ নাই। আমি নিজে বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলাম।

হঠাৎ একটা বিশ্রী বড় রকমের পায়ের শব্দ কানে আসিল। মনে হইতে লাগিল, যেন একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস পাশের ঘরে দুম্‌দাম্‌ করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ব্যাপারটা কি, দেখিবার উদ্দেশ্যে যেমন আমরা মাথা উঁচু করিয়া চাহিয়াছি, অমনই বিকট শব্দে দরজা খুলিয়া গেল; দরজার গায়ে যে সব চেয়ারগুলি ঠেসান ছিল, সেগুলি ধাক্কা খাইয়া টেবিলের উপর পড়িল, টেবিলটা ভীষণ বেগে সম্মুখের চেয়ারের উপর পড়িল। সেই উন্মুক্ত দরজার ভিতর একটা বিশ্রী রকমের আলো ফুটিয়া উঠিল, সেই আলোর সাহায্যে দেখিলাম,-- একটা প্রকাণ্ড হস্তী সটান আমাদের দিকে আসিতেছে, তাহার গায়ের ধাক্কায় চেয়ারগুলি এ দিক্ ও দিক্ ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে. অতটুকু ঘরের মধ্যে এত বড় একটা প্রকাণ্ড হাতী! ভয়ানক ব্যাপার! হাতীটা সত্যের হাতী কিংবা ওটা ভূত, তাহা ভাবিবার কাহারও সময় হইল না।হাতীটা আসিয়া কি করে না করে, তাহা দেখিবার কথাও কাহার মনে আসিল না। হাতীটা যেন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে মনে হইল। যে লোকটা সিঁড়ির দরজার কাছে ছিল, সে তাড়াতাড়ি সেটা খুলিয়া ফেলিল। আমরাও ক্ষণবিলম্ব না করিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উন্মত্তভাবে দুড়্‌দুড়্‌ করিয়া সেই সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া পড়িলাম।

নামিয়া পড়িবামাত্র একটা বিশ্রী অট্টহাসি কানে আসিল। মুহূর্তমধ্যে বুঝিলাম, ওটা হাতী নহে, ভূতের কাণ্ড। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার ফিরিয়া সেই ঘরে গেলেন, যাইয়া আলো জ্বালিলেন। দেখিলেন, ঘর শূন্য, পাশের ঘরও শূন্য, হাতীও নাই বা অপর কেহই নাই! ঐ দুই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবারও ঐ সিঁড়িটা ভিন্ন অন্য পথ ছিল না। আর আমরা ত সিঁড়ির কাছেই ছিলাম। কোন লোক যে ঐরূপ তামাসা করিয়া লুকাইয়া থাকিবে, এমন স্থানও ছিল না। ঘরে হাতীর চিহ্নও দেখা গেল না; কেবল দেখা গেল, চেয়ারগুলি ওলট্‌-পালট্‌ হইয়া পড়িয়াছে; আর সেই বড় কজ্জা খাটানো দরজার হুড়্‌কাটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, দুয়ারটাও খুলিয়া রহিয়াছে। তিনখানা চেয়ারও হাতীরূপী ভূতের বেগে আসিবার ফলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আমরা আবার বৈঠকে একত্র হইয়াছিলাম। একত্র হইয়া খুব হাসিলাম। সেই নাস্তিকটি আর আমাদের ঘরে আসিল না। সে চোঁচা দৌড় দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ভয়ে বাছাধনের আক্কেল-গুড়ুম্ হইয়াছিল। ঘরে কোট ও টুপী ফেলিয়া গিয়াছিল, সেগুলি লইতে আসিবারও সাহস হয় নাই। রাস্তায় দাঁড়াইয়া ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, এক জন ঐ জিনিসগুলি তাহাকে দিয়া আসিল। আমি তাহার পর সে লোকটাকে আর দেখি নাই। কিন্তু আমার কখন কখন জানিতে ইচ্ছা হয়, সেই গর্বিত নাস্তিক এই ঘটনা দেখিয়া কি সিদ্ধান্ত করিয়াছে।"

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

প্রেত-তত্ত্বের সুফল-কুফল

প্রেত-ব্যবসায়ীরা "থিওসফিস্ট" সম্প্রদায়কে বেশ একটা প্রীতির চক্ষুতে দেখেন না। উঁহারা কোন থিওসফিষ্টকে দেখিলেই বলিয়া থাকেন---"মহাশয়! কোন একটা অলৌকিক অদ্ভুত রকমের ঘটনা দেখিলেই আপনারা বলিয়া থাকেন যে, উহা কোন না কোন দেব, পরী বা ব্যোমচারী সয়তানের কার্য।" প্রেত-ব্যবসায়ীদিগের এরূপ ধারণা নিতান্তই ভুল। যিনি বাস্তবিক থিওসফিষ্ট অর্থাৎ যিনি বাস্তবিকই গুপ্তবিদ্যার কিছু না কিছু জানেন, তিনি কদাচ ওরূপ বলেন না। তিনি মাত্র এইটুকু বলেন যে, ভূত-প্রেত যেমন অলৌকিক কার্য দেখায়, কখন কখন দেব-যোনিবাও ঐরূপ কার্য্যের সংঘটন করিয়া থাকে। আরএ কথাটাও প্রকৃতপক্ষে সত্য। প্রেত-ব্যবসায়ী ও থিওসফিস্ট এ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অমূলক নিবর্থক মনোমালিন্য, অবিশ্বাস ও অসৌজন্য চলিয়া আসিতেছে। এরূপ দ্বেষা-দ্বেষি বাস্তবিকই দুঃখের কথা। এরূপ দেখা গিয়াছে, এক জন প্রেত-ব্যবসায়ী হয় তো এক জন থিওফিষ্টকে যাহা মুখে আসিয়াছে, তাহাই বলিয়া গালাগালি করিতেছে ; সে গালাগালির সীমা নাই, অবধি নাই ; আবার হয় ত অন্য সময়ে এক জন থিওসফিস্টও একজন প্রেত-ব্যবসায়ীর উপর তীব্র ঘৃণার হলাহল বর্ষণ করিয়াছেন, অথচ প্রেত-ব্যবসায়ের মূল তত্ত্ব তিনি কিছুই জানেন না। এই উভয়ে যদি পরস্পরের মূল তত্ত্ব ভাল করিয়া অবগত হন, তবে ইঁহাদের মধ্যে বিদ্বেষ থাকিতে পারে না, তখন উভয়েই উভয়কে সম্মান করিয়া চলেন। বাস্তবিকপক্ষে উভয়েই জগতের মহান্ হিতসাধনে বদ্ধপরিকর , বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে যেমন পরস্পরের মধ্যে একটা ঝগড়া-ঝাটি নাই, এই পরলৌকিক অনুসন্ধানের বেলায়ও এইরূপ বিরোধের ভাব থাকা উচিত নহে। ঝগড়া-ঝাটি করা নিতান্তই নির্বোধের কার্য্য।

থিওসফিস্ট ও প্রেততত্ত্ববিদ উভয়ের কার্যকলাপে সৌসাদৃশ্য আছে। উভয় দলই বলিয়া থাকেন যে, মানুষের আত্মা মরে না, নশ্বর দেহ নষ্ট হইয়া গেলেও তাহার প্রাণটা থাকিয়া যায় ও তখনও উন্নতির পথেই ধাবিত হইতে থাকে। এই বিশ্বাস উভয় সম্প্রদায়েরই মজ্জাগত ও কেন্দ্রীভূত। উভয় দলেরই বিশ্বাস যে, আমাদের ইহজীবনের কর্মানুসারে পারলৌকিক জীবনের পারলৌকিক জীবনের সুখ-দুঃখ নিরূপিত হইবে। ঈশ্বর আমাদিগের সাধারণ পিতা, আর আমরা সকলে মানবেরই ভ্রাতৃসম্পর্কে সম্পৃক্ত ; এ ধারণাও উভয় দলের মধ্যে প্রচলিত। উভয় সম্প্রদায়ই জানেন যে, পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য পারলৌকিক বিভূতির কাছে অতীব তুচ্ছ, ঘৃণ্য, নগণ্য। এ ক্ষেত্রে উঁহাদের মধ্যে কোন কোন তুচ্ছ বিষয়ে মতদ্বৈধ ঘটিলেও একটা বিদ্বেষভাব থাকা উচিত নহে। সংসারের অজ্ঞান ব্যক্তিবর্গকে প্রকৃত জ্ঞান দান করিবার নিমিত্ত উভয় সম্পদায়েরই পরস্পরকে ভাইয়ের মত সাহায্য করা উচিত। তাহা হইলেই প্রকৃত কাজ হইবে। আর সেইটাই কার্য্য-সাধিনী প্রণালী। এইরূপ ভাবে যদি আমরা কাজ করিয়া যাই, তবে কালক্রমে সকল পার্থক্যই বিদূরিত হইবে।

আমরা থিওসফিস্ট বটে, কিন্তু আমাদেরও যুক্তিতর্কের একটা দার্শনিক শৃঙ্খলা আছে। "প্রেত-তত্ত্বজ্ঞ" ভাইরা আমাদের দার্শনিক ভাবটা দেখিতে চান না, আর আমরাই বা গায়ে পড়িয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতে যাইব কেন? তাঁহাদিগকে শীঘ্রই বোধ হয় আমাদিগের মত জানিতে হইবে; তখন আমরা তাঁহাদিগকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিব। মরণের পর আমাদিগকে আবার এই পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এ বিষয়ে কোন কোন প্রেত-তত্ত্বজ্ঞ আমাদের সঙ্গে একমত; আবার কেহ কেহ ইহা স্বীকার বা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এই মতপার্থক্যে কি আসে যায়? এই জন্মান্তর বাদটা আমাদের কাছে খুবই আশাপ্রদ ও উপকার-জনক; কেন না, ইহার সাহায্যে আমরা অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি। জন্মান্তর না মানিলে কোন কালেই কোন উপায়েই সে সব বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না। আমরা গায়ে পড়িয়া জোর করিয়া কাহাকেও কোন কথা বুঝাইতে চেষ্টা করি না। আমাদের কার্য্যপ্রণালী সেরূপ নহে।

আমাদের ধারণা এই—মানুষ মরণের পর কিছু দিন সূক্ষ্ম জগতে থাকে, তাহার পর আবার এই পৃথিবীতে জন্মে; আবার মরে, আবার জন্মে, এইরূপ বহুবার জন্ম-মৃত্যু দ্বারা তাহার জীবাত্মা ক্রমেই উন্নতির শিখরে আরোহণ করিতে থাকে। প্রতি জন্মেই তাহার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বর্ধিত হইতে হইতে যায়। প্রেত-তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন—ঠিক সেরূপটা হয় না। তাঁহাদের মতে মানুষ উন্নতি করিতে করিতে ঊর্দ্ধদিকেই যাইতে থাকে, আর এ পৃথিবীতে আসে না। মানুষ যে ক্রমেই উন্নতির পথে যাইতে থাকে, এ কথাটা আমরা দুই দলেই স্বীকাব করি। অতএব যাহাতে এ জীবনের চবম উৎকর্য করিয়া পরলোকে আরও ভাল অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতে পাবি, সে বিষয়ে আমাদের যত্নশীল হওয়া কর্তব্য। যত্নশীল হইলে আমাদের মনোরথ অবশ্যই পূর্ণ হইবে। আমরা ক্রমেই উপরের দিকে যাইব, কি আবার ফিরিয়া আসিব, সে তুচ্ছ বিষয়ে ঝগড়া বাধাইবার প্রয়োজন কি? এখন আমরা সকলেই ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ ; উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করাই এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। যখন সকলেই তুল্যরূপে উন্নত হইয়া উঠিব, তখন তর্ক বিতর্ক করিয়া দেখা যাইবে যে, কোন্ সম্প্রদায়ের মত বা ধারণাটি সত্য আর কোন্টিই বা মিথ্যা, এখন সে বিচার করিতে যাওয়া নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন।

অজ্ঞ লোকে ভৌতিক কাণ্ড দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারে না। প্রেততত্ত্বজ্ঞদিগের বৈঠকে অনেক প্রকার ভৌতিক কাণ্ড -কারখানা দেখা যায়। আমরা কোন প্রেত-তত্ত্বজ্ঞের সঙ্গে ঝগড়া করিতে ইচ্ছুক নই। আমরা জানি যে, ঐ সকল কাণ্ড সত্য সত্যই ঘটে, আর উহা দ্বারা সমাজের অনেক উপকারও হয় ; কেন না, অনেক নাস্তিক ঐ ব্যাপার দেখিয়া পরলোকের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করে। বৈঠক নাস্তিককে আস্তিক করিয়া তুলে, এটা কম উপকার নহে। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা অপরের কথা শুনিয়া বিশ্বাস করতে চান না ; তাঁহারা সব কাজই নিজে দেখিতে ও বুঝিতে চান। সেরূপ ধরণের লোকেরা ভৌতিক ব্যাপার দেখিলেও টের পান না ; কেন না, দেখিবার মত চোখ, দেখিবার মত শক্তি তাঁহাদের কোথায়? এ সম্বন্ধে মিঃ ফুলার্টনের মন্তব্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

সূক্ষ্ম জগতের বিষয় দেখা সহজ নয় ; দেখিলেও দেখিলাম বলিয়া মনে হয় না। ঐ দেখার প্রণালী শিখিতে হয়। অনেক দিন ধরিয়া সাধনা করিলে তবে ঐরূপ দেখার শক্তি জন্মে। মানুষের প্রকৃতিগত অনেক ভ্রম-প্রমাদ আছে ; অনেক যত্ন করিয়া সেগুলি পরিহার করিতে হইবে। কোন্টি প্রকৃত ব্যাপার, কোন্টি অপ্রকৃত, কোন্টি আসল, কোন্টি ভ্রম, তাহা বিচার

করিয়া দেখিতে হইবে। যখন স্থূল-জগতের অনেক বিষয়ও ঐরূপভাবে জানিবার আবশ্যক হয়, তখন দুর্বোধ্য ঘোর জটিলতাপূর্ণ সূক্ষ্মজগতের কাণ্ড বুঝিতে যে খুবই বিচার-বিবেচনায় প্রয়োজন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাঁহারা বহুকাল ধরিয়া সূক্ষ্ম জগতের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কথার অপেক্ষা, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তির সিদ্ধান্ত অধিকতর সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, তবে আমরা সেই অজ্ঞ ব্যক্তিকে একটা সৃষ্টিছাড়া জীব—একটা বর্জিত বিধির স্থূল বলিয়া মনে করিয়া লইব। ঐরূপ দাম্ভিক ব্যক্তির সংখ্যা কম নহে। তাহারা পৃথিবীর যাবতীয় লোক অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। উহাদের কি ভয়ানক অহঙ্কার। কি দারুণ ভ্রম! উহারা যদি সামান্য একটু মানব-প্রকৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়, তবে নিজেদের মূল্য বুঝিতে পারে, তখন ঐ অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যাইতে পাবে। উহারা হয় তো কেহই কোন বিদ্যাতেই বিশেষজ্ঞ নহে, কেহই হয় তো উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিদ্ বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্ বা পদার্থবিদ্যাবিদ্ নহে, অথচ সূক্ষ্ম জগতেব আলোচনায পণ্ডিত সাজিয়া মনে কবে যে, পৃথিবী প্রথিত পণ্ডিতদের গবেষণার ফলের অপেক্ষাও উহাদের কথাই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য।"—("থিওসফিব প্রমাণাবলী", ৭ পৃষ্ঠা)।

যদি কোন ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদের মীমাংসা মানিয়া না লাইয়া নিজেই হাতে-কলমে কোন কিছু জানতে চান, তবে তিনি প্রেততত্ত্বের বৈঠকে স্বয়ং ভৌতিক কাণ্ডকারখানা দেখুন। দেখিয়া দেখিয়া চোখ ফুটাইযা লউন। এইরূপভাবে অনেক অবিশ্বাসীব চোখ ফুটিযাছে। আমবা মনে করি, বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের কথা মানিয়া লওযাই নিরাপদ উপায়; বৈঠকে যাওযাটা তত নিবাপদ নয়, তাহাতে বিপদ্ অনেক আছে। আমরা যাহাকে তাহাকে বৈঠকে যাইবাব উপদেশ দিই না।

ভূতের বৈঠকে যাওয়ার বিপদ

বৈঠকে-বিহারীদের অনেক দোষ ঘটে। তাহারা খুব বেশী মাত্রায় বিশ্বাসী হইয়া ওঠে। যুক্তি-তর্ক না করিয়াই ধাঁ কবিয়া কোন কিছু বিশ্বাস করিযা বসে। এত সহজে বিশ্বাসবান্ হওয়াটা বাস্তবিকপক্ষে একটা ভয়ানক দোয। নাস্তিকের দল এটাকে হয তো দোষ বলিয়াই মনে কবিবে না, বা এরূপ হওয়াটা অসম্ভব মনে করিয়া তাহারা হয় তো আমাদের কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। কোন নাস্তিক যদি বৈঠকে রীতিমত যাওয়া-আসা করে, তবে আমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা, অচিরাৎ বুঝিতে পারিবে। তখন সে দেখিবে যে, তাহার বিশ্বাসেব মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছে। ঘড়ির পরিদোলকটা যেমন এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সরিয়া যায়, নাস্তিকের দশাও ঐরূপ ঘটে। তাহারও মনটা অবিশ্বাসের এক প্রান্ত হইতে বিশ্বাসের অপর প্রান্তে বে-মালুম সরিয়া যাইবে। তখন সে ভূতের কথাবার্তাগুলিকে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইবে ; ভূত টেবিল প্রভৃতি নড়াইয়া-চড়াইয়া যে সঙ্কেত করে, সেগুলিকে সে দেবতার কাজের মত পবিত্র বলিয়া মনে করিযা লইবে।

বৈঠকে যাওয়ার আর একটা বিপদ আছে। সেটা এই যে, ভূত অনেক সময় পিছনে লাগে। নিরন্তর সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। সর্বদাই যদি ভূত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে, তবে সে অবস্থাটা বড়ই অসুখেব হইয়া ওঠে। বৈঠকে সচরাচর বদ্‌মায়েস ভূত অনেক আসে। নৈতিক জ্ঞানেব লেশও তাহাদেব নাই, ভয়ানক পাজী, কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করাই তাহাদেব উদ্দেশ্য ; কেবল সেই সুযোগই খুঁজিয়া

বেড়ায়। যে ভূতটা প্রধান হইয়া বৈঠকে কাজকর্ম করে, সে ঐ সকল বদ্‌মায়েস ভূতের দলকে বাড়াবাড়ি করিতে দেয় না, সে উহাদের নিকট হইতে মিডিয়মকে রক্ষাও করে। কিন্তু বৈঠকের পরে যখন সভ্যেরা বাড়ী যায়, তখন ঐ বদমায়েসরা তাহাদের পিছনে লাগে। প্রধান ভূত সেটা নিবারণ করিতে পারে না। এ কথা শুনিয়া কোন নাস্তিক মনে করিতে পারে যে, আমি খুব দৃঢ়চিত্ত, ভয়শূন্য, আমার কাছে কোন ভূতের বাহাদুরী খাটিবে না। ভূত তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাড়ীতে আসিয়া হয় তো স্ত্রী বা কন্যাকে ধরিয়া বসিবে। সেটাই কি বাঞ্ছনীয়? নাস্তিক দৃঢ়চিত্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহার সকল আত্মীয়স্বজনই যে তাহার মত হইবে, তাহার সম্ভাবনা কি? এমন দেখা গিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি বহুবার বৈঠকে গিয়াও ভূতের হাতে পড়ে নাই, অথচ তাহার বাড়ীর লোকেরা ভূতের উপদ্রবে অস্থির। এখনও এরূপ কাণ্ড অনেক ঘটিতেছে। লেড্‌বিটার বলেন—"ভূতের নিরন্তর উপদ্রবে মানুষ পাগল হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ ঘটনা আমি অনেক দেখিয়াছি। আর বৈঠকে যাওয়াই তাহাদের ঐরূপ দুর্দ্দশার মূল। বৈঠক হইতেই ভূত তাহাদের পিছন ধরিয়াছিল।" যাহাদের মনের বল খুব বেশী, তাহারা উপদ্রবে ঠিক থাকিতে পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে না পড়িলে মনের বল আছে কি না আছে, তাহা কি করিয়া জানা যায়?

ভূতের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রয়োজন

যখন ভূত আসিয়া কাহাকেও ধরিয়া সর্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকে, জ্বালাতন করিয়া তুলে, তখন সেই ঘোর অশান্তির মধ্যে একটা পরিত্রাণের উপায় আছে। কিছুতেই ভয় পাইব না, এইরূপ একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা মনে মনে করিয়া তুলিতে হইবে। ভূতের শক্তির অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছা-শক্তি বেশী। ইচ্ছা-শক্তির কাছে ভূতের শক্তি পরাভূত হইয়া থাকে, এ তথ্যটুকু দৃঢ়তার সহিত বুঝিয়া রাখিতে হইবে। আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক মানুষেরই একটা স্বাতন্ত্র্য আছে অর্থাৎ ইহলোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, সে স্বাধীনভাবে আপন ইচ্ছামত সঙ্গী নির্বাচন করিয়া লইতে পারে। যদি তুমি ভূতের উপদ্রবে উপদ্রুত হইয়া থাক, তবে তোমার ঐ স্বাতন্ত্র্যের—ঐ স্বাধীনতার পরিচালনা কর, দেখিবে, সকল উপদ্রবের শান্তি হইয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে কুমারী ফ্রীয়ার তাঁহার "পারলৌকিক গবেষণাবলী" নামক পুস্তকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা তোমাদের প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া রাখা কর্তব্য। সে উপদেশ এই ঃ—

"যদি তোমার মনে হয় যে, ভূত তোমার পিছনে লাগিয়াছে, প্লানচেটের মধ্য দিয়া যদি ভূতের সঙ্কেত বুঝিয়া থাক, টেবিলে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতেছে, যদি তাহা ভূতের ব্যাপার বলিয়া বুঝিয়া থাক, মাঝে মাঝে যদি অজ্ঞান হইয়া বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়, আর সেটাকে ভূতাবেশ বলিয়াই যদি তোমার মনে হয়, তবে ভূতের কথাটা মন হইতে একেবারে ভুলিয়া যাইবে। ঐরূপ ক্ষেত্রে একখানি বাইসাইকেল্ চাপিয়া বেড়াইতে যাইবে অথবা দুর্বোধ্য হিব্রু ভাষা শিখিতে বসিবে, আথবা বেড়াইতে বাহির হইবে, অথবা বাগানের আগাছা সাফ করিতে বসিবে। মাথা ঠিক থাকিলে ঐরূপ একটা না একটা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। যদি ঠিক না থাকে, তবে সজ্জনের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার উপদেশমত চলিবে। আত্মসংযম থাকিলে ভূতে কিছুই করিতে পারে না। সংযমের অভাবই পাপ ও পীড়া।"

সূক্ষ্ম জগতের আলোচনায় প্রতারণার সম্ভাবনা আছে

সূক্ষ্ম-জগতের আলোচনায় অনেক সময় প্রতারণা দেখা যায়। মিডিয়ম্ যে সব সময়ে প্রতারিত করে বা অন্য কোন লোক আসিয়া অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে ঠকাইয়া বসে, তাহা নহে। ভূতযোনির মত অনেক সূক্ষ্ম ব্যোমচর ঐরূপ কাণ্ড করে। তাহাদের প্রতারণার মূলে হয় তো সদভিপ্রায় থাকে, তাহাদের উদ্দেশ্য হয় তো ভাল বৈ মন্দ নহে, তবুও সেটা প্রতারণা ত বটে! এরূপও দেখা যায় যে, একটা ভূত মানুষের কাছে আসিয়া নিজেকে অপর ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া কথাবার্তা বলে। অবশ্য সদুদ্দেশ্যেই এরূপটা করে। মনে কর, একটা লোক মরিয়া ভূবর্লোকে যাইয়া উঠিল। যাইয়া তাহার পার্থিব আত্মীয়দের বড় একটা খোঁজ-খবর রাখিল না। আত্মীয়েরা শোকে মুহ্যমান হইয়া হা হুতাশ করিতে লাগিল। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কোন ভূত হয় তো আসিয়া বলে, আমি তোমাদের অমুক! এই পরিচয় দিয়া প্রবোধ দিতে থাকে। আবার এমনও হয়—যিনি মারা গিয়াছেন, তাঁহার জীবাত্মা হয় তো ভূবর্লোকেও নাই, সেখান হইতে হয় তো স্বর্লোকে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং পার্থিব আত্মীয়দের কান্নাকাটি কিছুই জানিতে পারিতেছেন না! এ দিকে আত্মীয়েরা মনে করিতেছে, আমাদের অমুক বড়ই নির্দয় হইয়া আমাদের মায়া কাটাইয়াছে। এই ভাবিয়া তাহারা আরও শোকাতুর হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রেও অনেক ভূত মৃত ব্যক্তি সাজিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দেয়। যে সকল ভূত এরূপ ব্যাপার করে, আমরা তাহাদিগকে নিন্দা করিতে পারি না। তাহাদের এরূপ কার্য ভালও হইতে পারেষ, আবার মন্দও হইতে পারে। তাহাদের বিবেক যেরূপ বলে, তাহারা সেইরূপ করে। আমাদের সে বিষয়ে আলোচনা করিতে যাওয়া ঠিক নহে। আমরা কেবল বলিতে চাই যে, ঐরূপ ব্যাপার প্রকৃতপক্ষে ঘটিয়া থাকে।

আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। মরণের সময় যেমন আমাদের স্থূলশরীরটা এখানে পড়িয়া থাকে, পরে ঠিক সেইরূপ একটা আতিবাহিক দেহ ভূবর্লোকে পড়িয়া থাকে আর তাহার ভিতর হইতে জীবাত্মা স্বর্লোকে চলিয়া যায়। কালক্রমে সেই পরিত্যক্ত দেহটা নষ্ট হয় ("ভূবর্লোক" গ্রন্থের ৪৯—৫৩ পৃষ্ঠা দেখ)। ঐ পরিত্যক্ত দেহটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজেকে সেই দেহধারী আত্মীয় বলিয়া শোকবিধুর আত্মীয়ের কাছে দেখা দেওয়া আরও সহজ ব্যাপার। ভূতেরা এই সহজ পন্থাটাই বেশী সময় অনুসরণ করে।

মানবের জীবাত্মাই যে ঐরূপভাবে নিজেকে অপর বলিয়া পরিচয় দিয়া প্রবোধ দিতে আইসে, তাহা নহে। পরী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর স্ফূর্তিবাজ ও সহৃদয় দেব-যোনিরাও অনেক সময় ঐরূপ কাণ্ড করে। নিম্নশ্রেণীর দেব-যোনিরা ক্রমোন্নতির হিসাবে বস্তুতঃ মানুষ অপেক্ষা নীচু। মানুষের কাছে আসিয়া কথাবার্তা বলিয়া তাহাদের আনন্দিত করিতে পারিলে তাহারা তাহাতে বেশ একটু আনন্দ অনুভব করে।

ঐ রকম দেব-যোনিরাই বৈঠকে আসিয়া আপনাদিগকে সেক্ষপীয়র, জুলিয়স্ শীজব, মেরী কুইন্ অব্ স্কটস্, জর্জ ওয়াশিংটন প্রভৃতি ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেয়। আবার নিম্নশ্রেণীরাও ঐরূপ করে। এরূপ করিবার কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। ঐ নামগুলি জগদ্বিখ্যাত। উঁহাদের জীবাত্মা আসিয়াছেন শুনিলে বৈঠকের সভ্যেরা মহা আনন্দিত হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিবে। এই ভাবিয়া সম্মান উপভোগ করিবার অভিপ্রায়ে উহারা ঐরূপ কাণ্ড করিয়া থাকে। ময়ূরের পালক লইয়া দাঁড়কাক যেমন ময়ূর সাজিয়াছিল, উহাদের ব্যাপারও কতকটা সেইরূপ। উহারা হয় ত

ভাবে—আর এরূপ ভাবাটা অসম্ভবও নহে—যে, মানুষগুলো বড় সহজেই যা তা একটা বিশ্বাস করিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রে আমরা যদি আপনাদিগকে খুব নামজাদা লোক বলিয়া পরিচয় দিই তবে তাহারা তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসিবে। ঐ সকল দেব-যোনির ও ভূতের উদ্দেশ্য ভাল হইলেও কার্য্য-প্রণালীটা আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করতে পারি না।

ঐরূপ ঘটনা বিরল নহে। যখন তখনই উহা দেখা যায়। নিউইয়র্ক সহরের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এড্‌মণ্ডস্ প্রেত-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বই লিখিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, বিস্তর দেব-যোনি ও ভূত আপনাদিগকে সুইডেনবার্গ, বেকন, ওয়াশিংটন, শার্লম্যান প্রভৃতি ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া অনেক সংবাদ দিয়াছে। সেই সকল সংবাদ ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। ঐ সকল মহাত্মার যে বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি ছিল, ইহাদের কথাবার্তায় সে বিদ্যাবুদ্ধির কিছুমাত্র পবিচয পাওয়া যায় না। যে সকল ভূত বেকন প্রভৃতি সাজিয়া সংবাদ দিয়াছে, তাহারা ঘোর অজ্ঞ ; তাহাদের প্রদত্ত সংবাদও সেই একঘেয়ে রকমের, নূতনত্ব কিছুই নাই, সকল মিডিয়মই তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ঐরূপ একঘেয়ে কথা বলিতে থাকে ; তাহা ছাড়া অনেকগুলি সংবাদ একেবারে মিথ্যা।

ঐরূপ কাণ্ডেব একটা সুন্দর প্রমাণ অ্যালান কার্ডে প্রণীত "ভূতের কেতাব" নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের উপক্রমণিকার সঙ্গে একটা নামের তালিকা দেওয়া আছে। তালিকাটি এই ঃ—"সেন্ট্ আগষ্টাইন্, সেন্ট ভিন্সেন্ট্ ডিপল্, সেন্ট লুই, ট্রথের দেব-যোনি, সক্রেটিস্ প্লেটো, ফেনিলন্ ফ্রঙ্কলিন্, সুইডেনবার্গ ইত্যাদি ইত্যাদি।" তালিকাটির শেষে "ইত্যাদি, ইত্যাদি" আছে ঐ "ইত্যাদি" শব্দটি বড়ই রহস্যজনক। উহা পড়িলেই লোকে বিস্মিত হইয়া পড়ে আর ভাবিতে থাকে, ঐ সব নাম ছাড়া ঐরূপ বিখ্যাত নামের বিষয় ভূতের কি তবে সে সময় আরও মনে আসিয়াছিল?

ঐরূপ বাড়াবাড়ি করিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিতে আসায় উহাদের জুযাচুরী অতি শীঘ্রই ধরা পড়ে : লোকে টের পাইয়া ফেলে। ওয়াশিংটন বেকন্ প্রভৃতির মত জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি না সাজিয়া ভূত যখন কোন সাধারণ ব্যক্তি সাজিয়া আইসে, তখন চিনিয়া উঠা একটু শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। যদি মিডিয়াম সত্যসত্যই সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন হয়, তবেই সে ঐরূপ ছদ্মবেশী ভূতকে চিনিয়া উঠিতে পারে ; নচেৎ পারে না। লেড্‌বিটার প্রণীত "ভূবর্লোক" নামক গ্রন্থের ১০৮ পৃষ্ঠা হইতে আমরা নিম্নে একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"বৈঠকে যে সব ভূত আসে, তাহারা প্রায়ই আসল ভূত। আবার কখন কখন ছদ্মবেশী ভূতও দেখা দেয়। সাধারণ সভ্যের পক্ষে কোন্‌টা প্রকৃত ভূত আব কোন্‌টা ছদ্মবেশী, তাহা বুঝিয়া ওঠা নিতান্ত অসম্ভব ; কেন না ভূতেরা সূক্ষ্ম জগতে থাকায় সেখানকার শক্তি উহারা এত আয়ত্ত করিয়া ফেলে যে, তাহা দ্বারা মানুষকে অতি সহজেই প্রতারিত করিতে পারে। মানুষ সহস্র চেষ্টাযও উহাদের কৌশল ভেদ করিতে পারে না।

"তোমার সহোদর মনে কর বহুদিন হইল মারা গিয়াছে। হঠাৎ একটা ভূত আসিয়া বৈঠকে তোমাকে বলিল—আমি তোমার ভাই এসেছি। তুমি শুনিয়া মনে করিলে, সত্যই আমার ভাই এত দিন পরে আসিয়াছে। কিন্তু সে যে তোমার ভাই, ইহার কোনই নিশ্চয়তা নাই। হয় তো ঐ ভূতটা এমন সব গূঢ় কথা তোমাকে বলিল, যাহা তোমার ভাই-ই জানিত আর তুমি জান, তাহা ছাড়া আর এক প্রাণীও জানে না। ইহা দেখিয়াই কি তুমি মনে করিবে যে, তবে ঐ ভূত সত্যসত্যই তোমার ভাই। ঐরূপ ধাবণা করাও তোমার অন্যায়। কাবণ, যে কোন ভূতই তোমাব অন্তঃকরণ দেখিতে পাইতেছে; তোমার মন হইতে জানিযা কিংবা ভুবলোক সুলভ জ্ঞানালোকেব সাহায্যে

পারিপার্শ্বিক অবস্থা জ্ঞাত হইয়া যে কোন ভূতই ঐ গূঢ় কথা বলিয়া দিতে পারে। আবার যদি এমন ঘটনা হয় যে, ভূত খুব বড় রকমের একটা গুপ্ত বিষয় বলিয়া দিল, যে বিষয়টি তুমিও জান না, ভূতের মুখে শুনিয়া পরে অনুসন্ধান দ্বারা জানিলে যে, উহা সত্য, তবে তাহাতেই কি মনে করিবে যে, ভূত তোমার ভাই? তাহাও মনে করিতে পার না। কেন না, প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক ব্যাপার সূক্ষ্ম জগতে লিপিবদ্ধ আছে। ভূত উহা সেখানে দেখিয়াও তোমার কাছে ভাই সাজিয়া বাহাদুরী দেখাইবার জন্য বলিতে পারে। সকলেই যে ছদ্মবেশে আসে, তাহা নহে। প্রকৃত আত্মীয়ের জীবাত্মাও অনেক আবশ্যক কথা বলিয়া যায়। আমাদের বক্তব্য এই যে, যেমন সত্যকার, তেমনই ছদ্মবেশী ভূতও আসে, সাধারণ সভ্যেরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না।"

আমরা জানি, প্রতারণা করা অসম্ভব নহে, হইয়াও থাকে। তথাচ, অনেক স্থলেই ভূতেরা অকপটে নিজেদের নাম প্রকাশ করে। প্রতারণা করিবার সময় আপনাদিগকে যে লোক বলিয়া পরিচয় দেয়, অনেক সময় সেই লোকের অবিকল মূর্ত্তিই ধরিয়া বসে।

মিডিয়মের অপকার সাধিত হয়

প্রেত-তত্ত্বের অনুষ্ঠানে আর একট কুফল ঘটিয়া থাকে। বৈঠকের পরে মিডিয়মের শরীর যে কতদূর অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহা আমরা ইহাব পূর্বেই বলিয়াছি। দেহ এত অবসন্ন হয় যে, অনেক সময় প্রকৃতিস্থ হইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে সুবা পর্যন্ত পান করিতে দেখা যায়। এইটিই যে একমাত্র কুফল, তাহা নহে। নৈতিক চরিত্রও হীন হইয়া পড়ে। অনেক বৈঠকে মিডিয়ম্ টাকা লয় ; টাকা লইয়া সভ্যদিগকে ভৌতিক কাণ্ড দেখায়। এটা খুবই গর্হিত কার্য। মিডিয়ম্ বলিয়া দিল—লোকপিছু এত করিয়া দিলে আমাব বৈঠকে সভ্য হইয়া বসিতে পাবিবে। এইরূপভাবে টাকা লইয়া বৈঠকের ব্যবসায় করিতে করিতে মিডিয়ম্ দিন দিন লোভী হইয়া পড়ে। ইচ্ছা করিয়া লোভের বশীভূত হওয়া কোন মানবেরই কর্তব্য নহে। ভৌতিক কাণ্ড যাহারা দেখিয়াছে, তাহারাই জানে যে, ভূতের দেওয়া সংবাদ অনেকগুলিই মিথ্যা হইযা থাকে। মিডিয়মেব শক্তি খুবই কম, ভূতের অনুগ্রহ ও খেয়ালের উপর তাহাকে অনেক সময নির্ভব করিতে হয়। ক্ষেত্র যখন এইরূপ, তখন পরের কাছে টাকা লইয়া যদি তাহাকে খাঁটি সংবাদ মিডিয়ম্ দিতে না পারে, তবে তাহাকে বড়ই সঙ্কটে পডিতে হয়। আবার ঠিক সংবাদ দিব, ভৌতিক কাণ্ড দেখবি, বলিয়া মিডিয়ম্ টাকা লইয়া বৈঠক করিয়া বসিল, অথচ ভূত সেদিন আসিল না, এরূপ ঘটনাও হয়; এরূপ হইলে তাহাকে বিষম লজ্জায় পডিতে হয়। যাঁবা প্রেত-তত্ত্বেব আলোচনা ও গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এ ব্যাপার অবগত আছেন। কুমারী গুড়রিচ ফ্রীয়ার তাঁহার "সূক্ষ্ম জগতেব গবেষণাবলী" নামক পুস্তকে এ কথাব সমর্থন করিয়া যে কথাগুলি লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্‌ধৃত করিযা দিলাম ঃ—

"আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, পরলোকের কাণ্ডকারখানা আযত্ত কবিতে যাওয়া মানুষের পক্ষে মহা গর্হিত কার্য্য। ***** ভগবানেব আদেশে দেবদূত ও মানব সকলেই স্ব স্ব কর্ম সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। তাঁহারই আদেশে দেবদূতেবা কখন কখন পৃথিবীতে আসিয়া মানবের উপকার কবে সত্য; তাই বলিয়া তাহারা মানবের বঙ তামাসা দেখাইবার ভৃত্য নহে। কখন কখন তাহারা মানবের ভবিষ্যৎ বলিয়া দেয় সত্য; তাই বলিয়া মানুষ দোকান খুলিয়া বসিয়া একটি করিযা 'গিনি' ফী লইযা তাহাদিগকে ডাকিলেই যে তাহাবা আসিবে, তাহা নহে। সাধনা

বলে আমরা খানিকটা সময়ের জন্য অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভ করিয়া অনেক কথা যে বলিয়া দিতে পারি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যখন তখন যেখানে সেখানে পারলৌকিক তত্ত্ব আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করা কখনই কর্তব্য নহে।"

তাই বলিতেছিলাম, মনে কর, একজন মিডিয়ম আগে হইতে টাকা লইযা বৈঠকে বসিয়াছে। ভূতের কাণ্ড কারখানা দেখাইবে, এই কথা। কিন্তু ভূত আদৌ আসিল না, কোন কাণ্ডই হইল না। এ দিকে সভ্যেবা টাকা দিয়াছে, তাহারা ছাড়িবে কেন? তাহারা দেখিবাব জন্য বসিয়া আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে মিডিয়ম্ কি করে? উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে মহা জুয়াচরীর আশ্রয় লয়। প্রতারণা করিয়া সভ্যদিগকে ঠকান মিডিয়মের পক্ষে খুবই সহজ। তখন সে তাহাই করিতে বসে। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, সভ্যেরাই মিডিয়ম্‌কে ফী দিয়া তাহাকে এইরূপ প্রতারণার পথে লইযা যায়। সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে গেলে সভ্যেবাই আপনাদিগকে আপনারা এক হিসাবে প্রতারিত করে। ফী দিযা, লোভ দেখাইয়া, কাহাকেও ঐরূপটি করিয়া তোলা আমাদের উচিত নহে।

অতএব মিডিযম্ জুযাচুবী করিলে শুধু যে সেই নিন্দনীয়, তাহা নহে, যাহারা ফী দিয়া তাহাকে ঐ দশায় আনিয়াছে, তাহারাও সেই জন্য নিন্দার ভাজন সন্দেহ নাই।

প্রেত-তত্ত্বের ফলে জীবাত্মারও ক্ষতি হয়

প্রেত-তত্ত্বের আলোচনায় মৃত ব্যক্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মরণেব পর কোন কোন লোক জীবিত আত্মীয়দের কাছে মনের দুঃখ ব্যক্ত করিযা প্রাণের ভাব কমাইতে আসে। সেরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে আসিবাব সুযোগ দেওযা নিতান্তই কর্তব্য, কিন্তু জীবাত্মাব ঐরূপভাবে আসা খুবই বিরল। কদাচিৎ কখন এইরূপভাবে আসে। আবশ্যক হইলে মৃত আত্মীয়েরা নিজেবাই আমাদিগকে খুঁজিয়া আমাদেব কাছে আসে। তাহাবা যাহাতে আপনা হইতে আসে, সেইটিই ভাল। চেষ্টা কবিয়া তাহাদিগকে আনা আমাদেব নিতান্তই অন্যায। কেহ কেহ বলে, মৃত পুত্রকে মা যদি দেখিতে চান, তবে কি সেটা স্বাভাবিক নহে? আমবাও তাহা হইলে বলিতে পারি, ঐ পুত্রটির পক্ষে কোন্‌টি মঙ্গলজনক? নিঃস্বার্থভাবে চিন্তা করা মায়ের পক্ষে আরও স্বাভাবিক হওয়া উচিত। নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত সন্তানেব কষ্ট উৎপাদন করা কখনই মাযের কর্তব্য নহে। মানুষ মরিতে মরিতেই জীবিত আত্মীযের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারে। তাহাতে তাহার বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু তাহাকে বেশী বেশী বার পৃথিবীতে আনিলে পৃথিবীব মায়া সে কাটাইয়া উঠিতে পাবে না। তাহাতে সে স্বর্লোকে যাইতে পাবে না ; পৃথিবীর কাছে কাছে ঘুবিয়া বেড়ায়। সে অবস্থাটা তাহার পক্ষে বডই কষ্টকর।

প্রেত-তত্ত্বের স্থান ও কার্য্য

প্রেত-তত্ত্বের অশেষবিধ কু-ফল থাকিলেও উহারও একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। উহা অসংখ্য নর-নারীর মহা উপকাবসাধনও করিয়া থাকে। খৃষ্টধর্মের "ক্যাথলিক" সম্প্রদায় ও "মুক্তিসেনা" সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘোর বিরোধ ও মতের ভয়ানক পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ তাহারা একই ধর্মের মহিমা প্রচার করে। তাহারা একই ধর্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। উহাদের প্রত্যেকেরই স্থান ও কার্য্য আছে। সেইরূপ থিওসফি ও প্রেত-তত্ত্ব একই পারলৌকিক ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ; উহাদের প্রত্যেকেরই স্থান ও কার্য্য আছে। যাঁহারা আমাদের মত ও ধারণা জ্ঞাত আছেন, প্রেত-তত্ত্বের

ব্যাপার তাঁহাদের ভাল লাগে না। প্রেত-তত্ত্বের সেই একঘেয়ে ব্যাপার—মিডিয়ম্ সব স্থানেই তন্দ্রাচ্ছন্ন। সেই একই রকমের একঘেয়ে ভূতের কাণ্ড—এ সব তাহার ভাল লাগে না। আবার যাহারা ঐ রকম ভূতেব কাণ্ড দেখিয়া তৃপ্তি পায, যাহারা ভূতেব কথাগুলিকে ডাক্তাব "ডী"র মত বেদ-বাণী বলিয়া মনে করে, তাহারা আমাদের গবেষণা-প্রণালীতে সুখ পায় না। তাহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা প্রেত-তত্ত্বেই মিটিয়া থাকে।

প্রেত-তত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যেও আবার অনেক প্রকার দল আছে। প্রকার ভেদ সর্ব-বিভাগেই দেখা যায়। প্রেত-তত্ত্বের বেলায়ই বা অন্যরূপ হইবে কেন? প্রেত-ব্যবসায়ীদেব মধ্যে এক দল আছে, তাহারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় ; আর সেই অবস্থায় ভূত ঘাড়ে চাপিয়া কথাবার্তা বলিতে থাকে। রবিবারে রবিবাবে এই দলের কার্য্য হয। যাহারা এই দলের ভক্ত, তাহারা ভূতেব ঐরূপ কার্য্যগুলিকে বিশ্বাস করিয়া চলাই প্রকৃত ধর্ম বলিয়া ভাবে। অন্যান্য ব্যক্তি যেমন উপাসনার্থ গির্জায় যায, এক দল সেইরূপ মহাভক্তির সঙ্গে ভূতেব কথা শুনিতে ছুটে। এই দল ঘোর স্বার্থ ; ইহাবা নিজের নিজের গুপ্তকথা, গুপ্ত অভিসন্ধি জানিবার জন্য আপন আপন মৃত আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যেই মহাব্যস্ত থাকে। আর একটা দল দেখা যায়, তাঁহাবা সৎ ও নিঃস্বার্থ। যাহারা অজ্ঞান, অনুন্নত, পতিত, তাহাদের উন্নতি-সাধন করাই এই দলের মুখ্য উদ্দেশ্য। আব ইঁহারা এবম্প্রকাব উন্নতি করিয়াও থাকেন। ইঁহাদের দ্বারা অনেকেই উপকৃত। আবাব অন্য দল আছেন, তাঁহারা কাহারও উপকারে ব্রতী নহেন। তাঁহাবা সূক্ষ্ম জগৎ, পবলোক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় ব্যাপারগুলি বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণেব সঙ্গে বুঝিয়া লইতে চান। ইহাতেই তাঁহাদের সুখ ও পরিতৃপ্তি। ইঁহারা অল্পদিনেই বুঝিতে পারেন যে, ইঁহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর ভূতের বৈঠকে মিলে না। তখন আমাদেব থিয়সফিষ্ট সম্প্রদায়ই তাঁহাদের প্রাণের পিপাসা মিটাইতে অগ্রসর হয়।

অনেক সময লোকের মুখে একটা প্রশ্ন শুনিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা মরণের পব আসিয়া আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তাহারা পুনর্জন্ম বিষয়ে কোন কথা বলে না কেন? এ প্রশ্নের উত্তব খুবই সহজ। প্রথমতঃ কেহ কেহ পুনর্জন্মের উপদেশ সত্য সত্যই দিয়া থাকে। ফ্রান্সে আ্যংলান্ কার্ডের সম্প্রদায় ইহজীবনের পব পুনর্জন্ম বিশ্বাস কবেন। ঐ সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি মরণেব পব আসিয়া দেখা দিলে তাঁহার মুখে আমরা পুনর্জন্ম বিষয় শুনিতে পাই। ইংলণ্ড ও আমেরিকাব লোকেরা পুনর্জন্ম বিষয়ে কিছুই জানেন না। তাই, এই দুই দেশের ভূতের মুখে আমবা ঐ বিষযেব কোন কথাই শুনিতে পাই না। আমরা বহুপূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, জীবাত্মা ভুবর্লোকে বেশী দিন থাকে না, কারণ শরীর ধরিয়া তথা হইতে স্বর্লোকে চলিয়া যায় ; সুতরাং পুনর্জন্মের জটিল তথ্যগুলি সে মরণের পরও ভালরূপে জানিতে পারে না। পার্থিব জীবনে যতটুকু জ্ঞান ছিল, মরণের পর ততটুকু জ্ঞানই থাকিয়া যায়। তাই ভূত হইয়া ঐ তথ্য বলিতে আসিলেও সেই আগেকার জ্ঞান অনুসারেই কথা বলিয়া থাকে, নূতন কথা কিছুই বলিতে পারে না। তবে যদি কোন থিওসফিষ্টেব বা ভারতীয় মহাপুরুষের জীবাত্মার কাছে ঐ বিষয়ের তথ্য জ্ঞাত হইবার সৌভাগ্য তাহার ঘটে, তাহা হইলে তাহার মুখে অনেক নূতন কথা শুনা যায়।

কখন কখন ভূতের বৈঠকে পুনর্জন্মের সমর্থন সূচক প্রমাণ পাওয়া যায়। মনসিয়র গেব্রিল ঐরূপ অনেকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া একটা প্রেত-তত্ত্বের সভায় কয়েক বৎসর হইল বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৯০২খৃঃ ১৩ই ডিসেম্বরের "প্রগ্রেসিভ-থিঙ্কার" পত্রিকা হইতে আমরা একটি অদ্ভুত বিবরণ উদ্‌ধৃত করিতেছি ঃ—

যে বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, সেটি পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পত্রের আকারে প্রেরিত হইয়াছিল। স্বাক্ষর ছিল—এস্ ও, স্থান—মেক্‌সিকো ; তারিখ অস্পষ্ট বিবরণটি এই ঃ—

পূর্বজন্মের কথা.

"আমি কোন ধর্ম-মতের সমর্থন করিতে বসিয়া এই পত্রখানা লিখিতেছি না। স্ব-চক্ষুতে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আপনাকে জানাইতেছি। যে ঘটনা বলিতে যাইতেছি, তাহা ২৮ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। তখন আমি মিডিয়ম্ কাহাকে বলে, মিডিয়মের কার্য কি এ সব ব্যাপার আদৌ বুঝিতাম না; পুনর্জ্জন্ম বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহাও জানিতাম না। তখন আমার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর। এক বৎসর হইল আমার বিবাহ হইয়াছিল।

"আমার গর্ভ হইল ; আর তখন হইতেই আমার মনে হইতে লাগিল, যেন একটা প্রেত আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। আমি যেন বেশ সহজেই বুঝিয়া ফেলিলাম, আমার সঙ্গীটি প্রেত, আর আমার অপেক্ষা কয়েক বৎসরের বড়। প্রেতটা ক্রমেই পরিস্ফুট হইতে লাগিল। আমার গর্ভ যখন তিন মাস, প্রেতটা তখন দেখা দিয়া গল্পস্বল্প আরম্ভ করিয়া দিল। সে আমাকে বলিত, 'তুমি স্বাস্থ্যের দিকে বেশ লক্ষ্য রাখিবে। তাহার গলার স্বর আমি বেশ সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পাবিতাম, তাহার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা বলিয়া বেশ একটু আরাম বোধও করিতে লাগিলাম। আমার কাছে সে তাহার নাম, জাতি ও জীবনের খুঁটিনাটি সকল কথাই বলিয়াছিল। আমার ভালবাসা পাইবার জন্য সে অস্থির। সর্বদাই সে আমাকে দেখা দিবার চেষ্টা করিত। পরিশেষে জীবিত মানুষের মত আমার সঙ্গিণী হইয়া উঠিল। আমি ঘরটা বন্ধ করিযা বসিলেই ঘরের মধ্যে তাহার মূর্তি ফুটিয়া উঠিত। তখন আমি তাহাকে বেশ দেখিতে ও তাহার কথাও বেশ শুনিতে পাইতাম।

"আমার প্রসবের ২/৩ সপ্তাহ পূর্বে সে আমাকে বলিল—'আমার বড় অসময়ে মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া পৃথিবীব কোন সুখই আমার ভোগ করা হয নাই ; তাই মনে করিয়াছি, তোমার যে সন্তান জন্মিবে, আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া পার্থিব সুখ ভোগ করিব। এই উদ্দেশ্যেই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছি।' আমি তাহাব কথা খুব ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারিলাম না, মনটাও কেমন অস্থির হইয়া পড়িল, একটা প্রেত আমার সন্তানের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে ভাবিয়া মন বড় চঞ্চল হইয়া পড়িল।

"যে রাত্রিতে আমার সন্তানটি জন্মিল, তাহাব পূর্ব-রাত্রিতেও আমি সেই প্রেতটাকে দেখিয়াছিলাম। তাহার পর তাহাকে আর দেখি নাই। সেই রাত্রিতে দেখা দিয়া সে বলিল—'আমাদের সময় নিকট হইয়া আসিয়াছে ; ভয় করিও না, মঙ্গল হইবে।'

"একটা মেয়ে হইল। দেখিতে অবিকল সেই প্রেতটার মত। আমাব মত বা উহার জনকেব মত বা আমাদেব কুলের কাহারও মতই হইল না। মেয়েটিকে দেখিয়া সকলেই বলিতে লাগিল—'এ কিরূপ মেয়ে রে বাবা! মেয়ে বলিয়াই মনে হচ্ছে না, যেন ২০ বছরের নাবী।"

"কিছু দিন পরে সংবাদ-পত্রে আমি একটা স্ত্রীলোকের জীবনী পড়িয়া দেখি যে, সেটা সেই প্রেতেই জীবনী। সে সব কাহিনী আর কেহই জানিত না, প্রেত আমাকে বলিয়াছিল, তাই আমি পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। আমিও কথাগুলি পেটে করিয়া রাখিয়াছিলাম, কাহারও কাছে উহার বিন্দুবিসর্গ পর্য্যন্ত বলি নাই। আমি অল্পবয়স্কা হইলেও বুঝিয়াছিলাম যে, কথাগুলি সাধারণ্যে ব্যক্ত হইলে প্রেতের নিন্দা রটিবে।

"মেয়েটি পনের বৎসর বয়স্কা হইলে, আমি তাহার নিকটে প্রেতের কথাটা অসাবধানে বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। সে তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া বলিল—'মা, আমার বাবা আমাকে অমুক নামে ডাকিতেন না কি?'(মেয়ের বয়স যখন এক বৎসর, তখন তাহার জনক মারা যান)।

আমি বলিলাম—'না, মা ; ও নাম তোমার কখনই ছিল না।' মেয়ে বলিল—'আমার যেন বেশ মনে পড়ছে যে, আমাকে ঐ নামে কেহ না কেহ ডাকিত!'

"পরিশেষে আমি এই বলিতে চাই যে, আমার মেয়ের চরিত্রটাও ঠিক সেই ইতিহাস-প্রথিত রমণীরই মত হইয়াছিল।

"মহাশয়,এই আমার বক্তব্য। ইহাতে যদি কোন ধর্মমতের সমর্থন হয়, খুবই ভাল। বাস্তব ঘটনাই মতের উৎকৃষ্ট পোষক। আমি যাহা সত্য ঘটনা, তাহাই বলিলাম। সত্য ঘটনা নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া নিজেই দাঁড়ায়, উহা মতামত দেখিতে চাহে না। আমি যাহা বলিলাম, তাহা খাঁটি সত্য।"

যত মিডিয়ম্ দেখা যায়, তাহার মধ্যে ম্যাডাম ডি এস্‌পারান্সই সর্বপেক্ষা উন্নত ও বিদুষী। তিনি জন্মান্তর বিশ্বাস করিতেন। এক জন মৃত বন্ধুর জীবাত্মা না কি তাঁহাকে ঐ ব্যাপারে ও থিওসফির আরও অনেক তথ্য জানাইয়াছিলেন। "ছায়া-রাজ্য" নামক পুস্তকে তিনি ঐ কথা লিপিবদ্ধও করিয়া রাখিয়াছিলেন। একবার না কি তিনি স্থূল-শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম-দেহের অবস্থাটা খানিক ক্ষণের জন্য অনুভব করিয়া দেখিয়াছিলেন। এইটিই তাঁহার একটা অদ্ভুত কাণ্ড। তখনই তিনি কার্য্য-কারণ-বাদ, ক্রমোন্নতি, জন্মান্তর এই সব ব্যাপার ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন। আর তখনই বুঝিলেন যে, সকলের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। সকলেই একই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত। মানুষের এ তথ্যটা খুব পরিস্ফুটভাবে প্রচারিত বা পরিব্যক্ত না থাকিলেও বস্তুতঃ একই সত্তা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। বৈঠকে ভূতেরা যে জীবন পথের পরিচয় দেয়, তাহাতেও কর্মবাদের পরিচয় পাওয়া। ভূতেরা বলে—"এ পথ তোমরাই প্রস্তুত কর; ইহা ব্যতীত তোমাদের অন্য পথ নাই।" ম্যাডাম্ নিম্নলিখিত ব্যাপারে ক্রমোন্নতির তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন। সূক্ষ্মদেহী হইয়া জ্ঞান নেত্রে তিনি দেখিলেন যে, শত শতবার তিনি শত শত প্রকার দেহ ধারণ করিয়াছিলেন; তাঁহার একই জীবন কখন পাহাড়ে, কখন বালুকায়, কখন সমুদ্রে,কখন ঘাসের শীষে, কখন গাছে, কখন ফুলে, কখন বা জীবজন্তু হইয়া পরিভ্রমণ করিয়াছে। ইহাতেই বুঝয়াছিলেন, তাঁহার জীবন ক্রমোন্নতির পথে প্রধাবিত হইতেছে। তিনি দেখিলেন, জগৎটই ক্রমোন্নতির দিকে ছুটিয়াছে।

জন্মান্তর সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"ঐশ আত্মা মানবশরীরে দেখা দিলে প্রথমেই শরীর পূর্ণাঙ্গ হয় না। মানব দেহেরও তারতম্য আছে। সকল মানুষ সমান উন্নত নহে। অসভ্যদিগের দেহ ধারণ করিয়া জীব তখন হইতেই বহুদর্শিতা ও নূতন নূতন শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এক দেহে যতটা শিক্ষা হইতে পারে, তাহা হইয়া গেলে সে দেহত্যাগ করিয়া অন্য দেহ ধারণ করে। এইরূপে শত শত দেহ ধারণ করিয়া ক্রমেই জ্ঞানের গণ্ডী বর্ধিত করিয়া লয়। প্রত্যেক দেহে একটা একটা নির্দিষ্ট কার্য করিয়া যায়, নির্দিষ্ট পরিমাণ উন্নতি ক রিতে করিতে যায়। নির্দিষ্ট কার্য হইয়া গেলেই সে দেহ বিনষ্ট হয়। "বিনষ্ট হয়"—অর্থাৎ যে উপাদানে ঐ দেহ গঠিত, সেই উপাদানে যাইয়া মিশিয়া পড়ে। আবার ঐ সব উপাদান দেহ মুক্ত জীবের ভাবী দেহের গঠনে কাজে লাগে। এইরূপ উন্নত হইতে উন্নততর দেহ ধারণ করিয়া জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করেও দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।"

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

স্বর্লোক

সকল ধর্মই বলে যে স্বর্গ আছে। পৃথিবীতে ভালভাবে জীবন যাপন করিতে পারিলে স্বর্গের সুখ ভোগে অধিকারী হওয়া যায়, এ কথা সকল-ধর্মই ঘোষণা করিয়া থাকে। খৃষ্টান ধর্ম আব মুসলমান ধর্মের মত এই যে, মানুষ ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তিনি মানুষকে পুবস্কাবরূপ "স্বর্গসুখ" দান করেন। আব অন্যান্য বেশীর ভাগ ধর্মেই বলে যে, স্বর্গভোগ ইহ জীবনেরই পরিণাম ; অর্থাৎ ইহজীবন ধর্মপথে কাটাইতে পারিলে তাহার ফলে স্বর্গভোগ ঘটিবেই, ভগবানেব দয়াব কোন কথা নাই, মানুষ আপন জোরেই স্বর্গে যাইবে। আমরা থিওসফিষ্ট, আমরাও এই কথা বলি। সকল ধর্মেই স্বর্গের মনোমোহিনী বর্ণনা আছে, কিন্তু কোন বর্ণনাই মানুষের মনের উপব একটা ছাপ দিতে পারে নাই। কোনটিই যেন মানুষ মনে প্রাণে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতে পারে না। বর্ণনাগুলি এত অস্বাভাবিক যে, আমাদেব কাছে তাহা ঘোর অসম্ভব ও কিম্ভুত বলিযা বোধ হয় ; কেন না, ওরূপ ব্যাপার আমবা কুত্রাপি দেখিতে পাই না। সকল দেশেই স্বর্গের গল্প-সল্প প্রচলিত আছে। আমবা বাল্যকাল হইতেই ঐ সকল কাহিনী শুনিযা আসিতেছি। শুনিযাও কিন্তু বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। এই অসম্ভব ব্যাপাবেব বর্ণনা সকল জাতিব ধর্মেই আছে। নিজেদেব দোষ ত্রুটি লোকে বড একটা দেখিতে চাহে না, তাই পরের ত্রুটিব দিকেই বেশী বেশী রকম চোখটা পড়ে। বৌদ্ধ ও হিন্দুবা স্বর্গের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিযাছিলেন—স্বর্গে খুব বড় বড় বাগান আছে, এত বড় যে, তাহাব পবিমাণ কল্পনা করা যায় না, অনন্ত— অসীম বলিলেও চলে; সেই বাগানে না কি নানাবিধ তরু; তরুগুলি স্বর্ণের, কতকগুলি বা রৌপ্যের। ঐ সকল তরুর ফলও নানাবিধ, আর সেগুলি নাকি মণি মাণিক্য! এই বর্ণনা শুনিযা আমাদের হাসি পাইলেও হাসিতে পাবি না; কেন না, ঐরূপ ভাবেব বর্ণনা আমাদের ধর্মপুস্তকেও আছে। আমাদের ধর্মপুস্তকে বর্ণনা আছে যে, স্বর্গেব বাস্তাগুলি স্বর্ণের, আব তোবণগুলি মুক্তাব!

ঐ সকল বর্ণনার মধ্যে একটা বিবেচনা করিবাব কথা আছে। কথাটি এই যে, বর্ণনাগুলিব সাদা অর্থ বুঝিতে গেলে উহা অসম্ভবই হইয়া ওঠে। উহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সত্যটুকু এই যে, স্বর্গের অসীম, অনন্ত, অনুপমেয়, অনির্বচনীয়। বর্ণনা করিয়া সে সুখ বুঝাইয়া দিতে না পাবিলেও যে যতটুকু পারিয়াছে, যেমন পাবিয়াছে, তাহারই চেষ্টা করিযাছে মাত্র। চেষ্টাই করিয়াছে সত্য, কিন্তু কেহই বুঝাইতে পাবে নাই; সকলেই তুল্যরূপে অকৃতকার্য্য। হিন্দুদের মধ্যে যে লেখক স্বর্গের চিত্র আঁকিয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি ভারতীয় নৃপেন্দ্রদিগের মনোরম উদ্যান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া স্বর্গের ঐরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন। ইহুদী লেখকদিগের ভাগ্যে ওরূপ উদ্যান দেখিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই। ইহুদী লেখক হয় প্রকাণ্ড শহর দেখিয়া থাকিবেন। হয় ত আলেকজান্দ্রিয়াব মত শহরের অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল। তাই তিনি স্বর্গের কল্পনা করিতে গিয়া লিখিয়া বসিলেন যে, সেখানে বড় বড় সমৃদ্ধ শহর আছে, আর বহুমূল্য সাজ-সজ্জায় শহরগুলি সজ্জিত, তত

মূল্যবান্ দ্রব্য না কি পৃথিবীতে নাই! তাই দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেকেই নিজের নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুসারে উপমা সংগ্রহ করিয়া স্বর্গের অতুল বিভবের বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। অনেকে স্বর্গেব ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছেন। তাঁহাবাই উহাব বর্ণনা করয়িাছেন ; কিন্তু বুঝাইয়া উঠিতে পারেন নাই। আমাদের সম্প্রদাযেবও অনেকে স্বর্গেব বিভব দেখিয়াছেন। ইহারা যেরূপ দেখিযাছেন, তাহাব বর্ণনাও আছে। সে বর্ণনা "থিযসফিক্যাল ম্যানুয়েল" নং ৬ পুস্তকে সন্নিবেশিত আছে। স্বর্গের বর্ণনা করতে বসিযা আমবা আব এখন রজত-কাঞ্চন, মণি-মাণিক্যের কথা বলি না ; স্বর্গীয় দ্রব্যের আকার ও বর্ণ অতীব সুন্দব, এইটুকুই আমরা এখন বুঝাইতে চাই; সূর্য্যাস্তকালীন গগনমণ্ডলের শোভা বা তত্রত্য অন্যান্য মাধুবী-বিন্যাস তাই উপমাস্বরূপ হাজির করিযা বসি। স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মাণিক্য অপেক্ষা ঐ সকল উপমা আরও বেশী দৈবীভাব সম্পন্ন বলিয়া আমরা মনে কবি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে আমাদের স্বর্গ-বর্ণনার চেষ্টাও বিফল। পুরাকালীন লোকের মণি মাণিক্যের চেষ্টা যেমন বিফল, আমাদেব সূর্য্যাস্ত প্রভৃতিব উপমাও তেমনই নিষ্ফল। স্বর্গের কথা আমবা কেহই বুঝিতেই পাবি নাই। সে সুখ অনির্বচনীয় ; ভাষায তাহা বুঝান যায না। কিন্তু মরণেব পব সকলেই একদিন না একদিন সে সুখ—সে ঐশ্বর্য্যেব আস্বাদ পাইবে , সে সম্পদ স্ব চক্ষে দেখিবে।

"স্বর্গ" কল্পনা নহে, খাঁটি সত্য

স্বর্গ কবিব কল্পনা নহে, স্বপ্নেব মত মিথ্যা নহে। উহা প্রদীপ্ত সত্য। স্বর্গ সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতে আমাদেব যে সকল ধাবণা আছে, তাহার একটা ধারণাব পরিবর্তন কবিতে হইবে , নচেৎ স্বর্গব্যাপাবটা আদৌ বুঝা যাইবে না। মনে কবিতে হইবে—স্বর্গ একটা স্থানবিশেষ নহে, উহা জ্ঞানেব অবস্থামাত্র যদি তোমবা আমাদিগকে জিজ্ঞাসা কব—"স্বর্গ কোথায়?" আমরা উত্তরে বলিব—উহা এইখানে, বাতাসের মত উহা তোমার চাবিদিকে অতি কাছেই বহিয়াছে। বহু কাল পূর্বে বুদ্ধ বলিযাছিলেন—"স্বর্গীয় আলোক তোমার চতুর্দিকেই বিদ্যমান রহিয়াছে ; তোমাব চক্ষুতে বাঁধন আছে বলিয়াই দেখিতে পাইতেছ না , বাঁধন খুলিয়া ফেল, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে।" এই বাঁধন খুলিয়া ফেলাটা কি? বাঁধন বলিতে আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে? ঐ রূপকের অর্থ—আমাদিগের জ্ঞান-চৈতন্যেব উন্নতিসাধন কবিতে হইবে, সাধনা কবিয়া উহাকে সূক্ষ্ম জগতেব অভিমুখ কবিযা তুলিতে হইবে। আমবা পূর্বেই বলিয়াছি ইহা অসম্ভব নহে , বলিযাছি, ইহজীবনেই অনেকে ভূবর্লোকের ঐশ্বর্য দেখিতে সমর্থ হইযা গিয়াছেন। আর একটু সাধনায অগ্রসর হইলেই দৃষ্টি শক্তিকে স্বর্লোক পর্য্যন্ত তুলিতে পাবা যায। মানুষের যেমন একটা আতিবাহিক দেহ আছে, আর সেই দেহে ভুবর্লোকের স্পন্দন গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ উহার একটা কাবণ-শরীরও আছে। ঐ দেহে স্বর্গের প্রত্যেক স্পন্দনই অনুভূত হয়। জ্ঞান চৈতন্যেব উন্নতি ঘটিলে মানুষ ইহজীবনেই স্বর্গেব অতুল বিভবের অনুভব করিতে সমর্থ হয়। ঐ অনুভব ঘটিলে পার্থিব সম্পদ তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

সাধারণ শ্রেণীব লোকেরা মরণের পর স্বর্গের ঐ অতুলনীয় সুখের অস্তিত্ব বুঝি... আর মরিতে মরিতে যে বুঝে, তাহাও নহে। তবে মরিতে মরিতেই স্বর্গে যায়, এমন লো... আছে। তাহাদের সংখ্যা খুব কম। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীব মরণের পর ... মনোরাজ্য। কাটাইতে থাকে, ক্রমেই আত্মস্থ হইতে চেষ্টা পায়। ভুবর্লোকে যত দিন থাকে, ...। যে যেরূপ

ঐ চেষ্টাই করে, তখন অনুক্ষণই পৃথিবী হইতে স্নেহ, ভালবাসা, আশা, আকাঙক্ষা, বাসনা, চিন্তা সবই গুটাইতে থাকে। যখন সেখানে সমস্ত বৃত্তিটা চূড়ান্তভাবে গুটান হয়, তখন জীব ভুবর্লোকেও আর থাকে না। তখন স্বর্লোকে চলিয়া যায়। ভুবর্লোকেও যেন তখন তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু সে মৃত্যুতে যাতনার লেশও নাই। সে মরণের কথা পার্থিব দেহীরা ধারণাও করিতে পারে না। সে একটা সুখের মরণ। স্বর্লোকে গেলে ভুবর্লোকে একটা দেহ পড়িয়া থাকে। সেটা বাসনা দেহ। মানুষ ভুবর্লোকে ঐ দেহেই বিচরণ করে। কখন কখন তাহাকে আতিবাহিক দেহও বলে। জীব স্বর্লোকে যাইয়া দেখে সেখানে জীবের সুযোগ সুবিধা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরও বেশী। ভুবর্লোক হইতে স্বর্লোকে যাইবার সময় একটা সুখের তন্দ্রায় জীব যেন ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়ে। তাহার পর ঘুমটা ভাঙ্গিলেই দেখে, সে স্বর্গে, একটা মহা আনন্দ-রাজ্যে যাইয়া উঠিয়াছে। জ্ঞানচৈতন্য যেন শতমুখী হইয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা থিওসফির আলোচনা করেন, তাঁহাদের অনেকেই ঐ অবস্থার আস্বাদটা অনুভব করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ অবস্থাটার জন্য খুবই লালায়িত ; কেন না, সেখানকার সুখ অতুলনীয়। পার্থিব মৃত্যুর সময় যেমন একটু অজ্ঞানাবস্থা আসে, তাহার পরেই জীব ভুবর্লোকে যাইয়া জাগরিত হয়, সেইরূপ ভুবর্লোক হইতে স্বর্গে যাইবার সময়ও একটু অজ্ঞানবস্থা ঘটে, তাহার পরেই স্বর্গসুখের মধ্যে জাগরণ। লেড্‌বিটার সাহেব "দেবকনিক ভূমি" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে স্বর্গের বিশেষ বিবরণ আছে। স্বর্গের কতটি স্তর, মানুষ কোন্ কোন্ স্তরে কি দ্রব্য দেখিতে পায, উহার একটা তালিকা পর্য্যন্ত ঐ পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যোগীরা পারলৌকিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া ঐ সব ব্যাপার অবগত হইয়াছেন ; সাধারণকে জানাইবার জন্য শেষে পুস্তকেও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা সে পুস্তকের অতিরিক্ত্ বিষয়েব আলোচনাই এখানে কবিব, ইচ্ছা করিলে পাঠক যে পুস্তকখানিও পড়িয়া দেখিতে পারেন। তাহাতে জ্ঞানের সীমা বর্ধিতই হইবে।

চিন্তা-রাজ্য

স্বর্গ-রাজ্যটা কিরূপ? এ প্রশ্নের এক কথায় উত্তর এই যে, উহা [illegible] 'ঐশ মনন্তর।" উহা একটা বিশাল মনোরাজ্য। মানুষের যাহা কিছু সৎচিন্তা মনে আসে, তাহাই মূর্তিমতী হইয়া এই স্তরে বিরাজ করে। সেই চিন্তাগুলি সুস্পষ্ট, সজীব, সত্য। স্বর্গটা সজীব সত্যের চমৎকার রাজ্য। আমাদের একটা বড় মস্ত ভুল ধারণা আছে যে, স্থূল জিনিসগুলিই সত্য, আর যাহা স্থূল নহে, তাহাই স্বপ্নের মত অলীক, অবাস্তব। প্রকৃত তথ্যটা অন্যরূপ। আসল ব্যাপারটি এই যে, যাহাই স্থূল, তাহাই প্রোথিত, লুক্কায়িত। পদার্থের মধ্যে যেটা সার, যেটা সদ্বস্তু, সেটা স্থূলমূর্তির বেলায় স্থূল পরমাণু পুঞ্জের ভিতরে আবৃত অবস্থায় অবস্থিতি করে। স্থূল আবরণ ভেদ করিয়া সহজে সেটাকে দেখা যায় না। কিন্তু সেটা সূক্ষ্ম জগতের দিকে উঠিলে অতটা অস্পষ্ট—অতটা লুক্কায়িত [illegible] না। 'চিন্তা রাজ্য'—এ কথাটি শুনিলেই কবির মত আমাদের মনে হয়, উহা [illegible] স্বপ্নের উপাদানে গঠিত", উহা বুঝি একটা অবাস্তব ব্যাপার। মানুষ মরণের পর যখন স্বর্লোকে যাইয়া ওঠে, তখন ভুবর্লোকটা তাহার কাছে খুবই সজীব—খুবই সত্য বলিয়া মনে [illegible] মনে হইতে থাকে— "বাঁচিয়া থাকা যে কাহাকে বলে, তাহা যথার্থরূপে এই এখনই জীবনের আস্বাদটা এই প্রথমে পাইলাম; ইহার আগে এ সুখ কখনও বুঝি নাই,

মত শহরের
যে, সেখানে

এতদিন স্থূল-শরীরে যেন কয়েদী অবস্থায় ছিলাম। আমার অবস্থাটা ঠিক যেন গুটিপোকার মত ছিল। গুটিপোকা অতি ধীরভাবে পাতার উপর নড়িয়া চড়িয়া বেড়ায়, আমিও স্থূল শরীর লইয়া স্থূল জগতে বেড়াইতাম আর নিজেকে খুব কর্মঠ, খুব জ্ঞানী, খুব চট্‌পটে ভাবিতাম। এখন দেখিতেছি, ভয়ানক ধীরগতি ও অলসের অধম ছিলাম। গুটিপোকার কিছুদিন পরে পাখা ওঠে, তখন সে প্রজাপতি হইয়া মুক্ত গগনে সৌর কিরণে স্ফূর্তির প্রাণে নাচিয়া বেড়ায়। আমিও স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া স্ফূর্তির সঙ্গে বিপুল রঙ্গে বিচরণ করিয়া কতই আরাম পাইতেছি। আবার ভুবর্লোক ছাড়িয়া যখন সে আরও উচ্চতর জগতে অর্থাৎ স্বর্লোকে যাইয়া ওঠে, তখন তাহার আরও আরাম বোধ হয়। সে সুখের তুলনায় ভুবর্লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও ঐরূপভাবে তাহার কাছে হেয় বলিয়া মনে হইতে থাকে। সে দেখে—স্বর্গের সুখ এত পূর্ণ, এত বিরাট, এত গভীর যে, তাহার তুলনা হইতে পারে না। সে সুখ অতুলনীয়, অনুপম। আবার স্বর্লোকের অপেক্ষাও ভাল স্থান আছে। সত্য সত্যই আছে। সেখানকার তুলনায় স্বর্গের সুখও হীনপ্রভ। সৌরকরের কাছে কৌমুদী যেমন, সে সুখের নিকটে স্বর্গ-সুখের অবস্থাও তদ্রূপ। কিন্তু এখন সে সব সুখের কথা, সে সব জগতের কথা চিন্তা করা নিষ্প্রয়োজন।

স্থূল-জগৎ অপেক্ষা চিন্তা-রাজ্যটা আরও সত্য, এ কথা শুনিয়া অনেকে হয়ত ভাবিবে যে, ইহা হইতেই পারে না, ঘোর অসম্ভব। ঐ সব লোক যত দিন এ জীবনের অপেক্ষা কোন কিছু উচ্চতর ব্যাপারের পরিচয় না পায়, তত দিন উহাদের ঐরূপ ধারণাই থাকিয়া যায়, তত দিন চিন্তারাজ্য আছে ও উহা খাঁটি সত্য, তাহা মানে না। এখন রাশি রাশি কথা বলিয়া বুঝাইলেও তাহা বুঝিবে না, আর উচ্চতর জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলেই মুহূর্তমধ্যে তাহারা বিস্তর তথ্য বিশ্বাস করিয়া বসিবে। যে যত অবিশ্বাসী, সে আবার তত শীঘ্র বিশ্বাসী হইয়া উঠে। সামান্য একটুমাত্র প্রমাণই তাহার মহা পরিবর্তন আনিয়া ফেলে। স্যর হমফ্রে ডেভীর কথাটি আমাদের মনে করা উচিত। "নাইট্রস্‌ অকসাইড" নামক বাষ্প নিঃশ্বাসপথে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করায়, তাঁহার একটা অতি অদ্ভুত রকমের সুখবোধ হইয়াছিল। তিনি সেই অনুভূতিটির খুব একটা বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কথাগুলি এই ঃ—"বাহ্যবস্তুনিচয়ের অনুভূতি মন হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইল, সজীব দৃশ্যমান মূর্তিপুঞ্জ দ্রুতবেগে আমার মনের মধ্যে দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, মূর্তিগুলির মুখে অতি চমৎকার কথা; শুনিলে এক সম্পূর্ণ নূতন ভাবের অনুভূতি প্রাণের মধ্যে ঝঙ্কার দিয়া ওঠে। আমার মনে হইল, এক নবীন ভাবের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি।" যখন বাষ্পের প্রভাব গেল, যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"চিন্তা ব্যতীত আর কিছুর অস্তিত্ব নাই ; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই চিন্তা, ধারণা, সুখ ও দুঃখের গঠিত।" হম্‌ফ্রের বর্ণনাটা ঐরূপ তিনি ভুবর্লোকের খুব সামান্য একটু পরিচয় পাইয়াছিলেন, আর যাহা কিছু অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাও সমস্তটা মনে ছিল না, অল্প অল্প মনে ছিল। তাহারই ঐরূপ বর্ণনা। ভুবর্লোক তাহা হইলে কতই সুখের। আবার স্বর্লোকের সুখ ভুবর্লোক অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ উপাদেয়। অতএব স্বর্লোকের সুখের কল্পনা বা ধারণা করা আমাদিগের পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও চলে।

ঐশ মন

স্বর্লোকে একটা অসীম পূর্ণায়ত ঐশ মন বিরাজ করিতেছে। স্বর্লোক একটা খাঁটি মনোরাজ্য। সেই ঐশ মনটা শুধু মন নহে, উহার ভতর অনন্ত, অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য নিহিত আছে। যে যেরূপ

ঐশ্বর্য চায়, সে সেইরূপই পায়। যে যত চায়, সে ততই পায়। স্বর্গে যাইয়া আমরা সকলেই যে সমান পরিমাণে সুখ পাই, তাহা নহে। পৃথিবীতে সৎকর্ম দ্বারা যতটুকু পাইবার অধিকারী হইয়াছি, ঐখানে ততটুকুই পাইব। তাহার বেশী নহে। মানুষ যখন পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার মধ্যে ভগবদংশ বীজরূপে নিহিত থাকে। সৎকর্ম দ্বাবা সেই বীজকে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত করিতে হয়—উৎকর্ষ সাধন কবিয়া লইতে হয়। প্রতি জন্মের উদ্দেশ্যই—উৎকর্ষ সাধন। যাহাব এই উৎকর্ষ সম্যক্‌ভাবে সাধিত হইয়াছে, সে মরণেব পর স্বর্লোকেব ঐ অফুরন্ত সুখ ও মহিমা উপভোগ করে। ভোগের পূর্ণতা কেবল তাহাবই ঘটে। আমরা সাধারণ শ্রেণীর মানব, আত্মাব পূর্ণ উন্নতি—পূর্ণ উৎকর্ষ সাধনের এখনও অনেক বিলম্ব, বহু কোটি বৎসবেব পর হয় তো সে সৌভাগ্যের উদয় হইবে, আমরা হয় তো আত্মাব সামান্য উন্নতিই কবিযাছি, আই মরণের পর সম্যক্ সুখ-ভোগ আমাদেব ঘটিবে না, সে অনন্ত সুখেব পূর্ণ ধাবণাও আমাদেব পক্ষে এখন অসম্ভব। ভিন্ন ভিন্ন লোক মবণেব পব ভিন্ন ভিন্ন শক্তি লইযা স্বর্গে ওঠে। এ সম্বন্ধে প্রাচ্য দেশে বেশ একটা রূপক আছে। রূপকটা এই—সকলেই এক একটা বাটি লইযা স্বর্গে যায় ; কাহারও বাটিটা বড়, কাহারও বা ছোট। তাহাবা সেই অফুবন্ত সুখ-সমুদ্র বাটি পূবিযা পুরিয়া গ্রহণ করে। যাব বাটি যত বড, সে তত পাইযা উঠে।

সকল ধর্মেই স্বর্গের এই সুখেব কথা বলে। কিন্তু সকলেব পক্ষেই ঐ সুখ কেন ঘটে না, সে কথাটা বেশ পরিষ্কাব কবিযা কোন ধর্মেই বলে নাই। সেটুকু জানা নিতান্তই আবশ্যক। স্বর্গ একটা মনোরাজ্য; সে মন ভগবানের চিন্তা। অনন্ত, অনির্বচনীয মহিমায তাহা পূর্ণ। যে যেরূপ মহিমা বুঝিবার মত সাধনা কবিযাছে, সে সেই রূপটাই সেখানে যাইযা দেখিতে পায। স্বর্গে কেহ অনেক দিন থাকে, কেহ বা অল্পদিন থাকে। জীবিতকালে পৃথিবীতে মানুষ যেমন কর্ম করে, সেই অনুসাবে তাহার স্বর্গবাসের কাল নিরূপিত হয। এই পৃথিবীতে মানুষ সাধনাবলে যতটুকু সুখের অধিকারী হইযা ওঠে, ঠিক ততটুকু সুখ স্বর্গে গিযা পায। আর যে যেরূপ বিষয়ের চর্চা করিয়া পার্থিব জীবন যাপন কবে, স্বর্গেও ঠিক সেই বিষযজনিত আনন্দই উপভোগ কবিয়া থাকে। স্বর্গে সকলেই আপন আপন সাধনা অনুসাবে সুখভোগ করে। সেখানকার সুখেব সীমা নাই।

স্বর্গে সুখভোগের প্রণালী

পৃথিবীতে জীবিতকালে মানুষ নানাপ্রকাব বাসনা করে, নানাবিধ প্রবৃত্তির পথে ছুটিযা বেডায়। তাহার ফলে মরণের পর তাহাব একটা বাসনা দেহ গঠিত হয়। ঐ দেহে মরণেব পবে ভুবর্লোকে তাহাকে ঘুরিষা বেড়াইতে হয়। পৃথিবীতে যদি সে কাজকর্ম ভাল কবিয়া থাকে, তবে বাসনা দেহেও সে অসুখী হয় না, আব যদি অসৎ কাজ করিয়া থাকে, তবে বাসনা দেহে তাহার দুঃখেব অবধি থাকে না। বানসনাদেহ লইযা ভুবর্লোকে কষ্টভোগ কবাকেই নরকভোগ বলে, ঐটিই পার্থিব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কষ্ট ভুগিয়া ভুগিয়া যখন বাসনার ক্ষয় হইয়া যায়, তখন তাহাব স্বর্লোকে গতি হয়। পৃথিবীতে সে যে সকল সচ্চিন্তা, নিঃস্বার্থ ভাবনা, উদার আশা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিল, সেইগুলি সব পুঞ্জীভূত হইয়া স্বর্গে তাহার জন্য অপেক্ষা কবে। মানুষ স্বর্গে যাইবামাত্র তাহার ঐ প্রকার নিঃস্বার্থ চিন্তাদি তাহার কাছে আসিযা তাহার চাবিদিকে একটা আবরণস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ঐ আবরণের ভিতর দিয়া তখন সে স্বর্গের স্পন্দন অনুভব করিতে

থাকে। ঐ সচ্চিন্তারাশির দ্বারাই তখন সে স্বর্গের মহিমা বুঝিতে পারে। উহাই তাহাকে স্বর্গভোগের শক্তি প্রদান করে। তখন সে বুঝিতে পারে যে স্বর্গ সুখৈশ্বর্য্যের বিপুল আগার, মানুষ পার্থিব জীবনের কর্মানুসারে নিদ্দিষ্ট পরিমাণমাত্র ভোগের অধিকার পায়। যাহার নিঃস্বার্থভাব যত বেশী, স্বর্গে সে ভাবের শক্তি তত বেশী হয়, সুতরাং সুখভোগের মাত্রাও তাহার তত অধিক হইয়া থাকে। নিঃস্বার্থ স্নেহ, ভালবাসা, নিষ্কাম ভক্তি অনুরাগ প্রভৃতির ফল এখন ফলিতে থাকে। স্বর্গে ঐ সকল ভাব ব্যতীত আর কিছুই নাই। যাহা কিছু স্বার্থ-বিজড়িত, যাহা কিছু সকাম, তাহা সমস্তই ভুবর্লোকে পড়িয়া থাকে। সেইটিই বাসনাভূমি, সেইটিই নরক।

পৃথিবীতে আমবা যে স্নেহ -ভালবাসা ব্যক্ত করি, তাহা দুই প্রকাব। তাহাব মধ্যে এক প্রকারকে অমন পবিত্র নাম দেওয়া চলে না। স্নেহ ভালবাসা হইলেও সেটা অতীব ঘৃণিত। ভালবাসিলাম; বাসিয়া হিসাব-নিকাশ করিতে লাগিলাম যে, ইহাতে আমার কতটুকু স্বার্থসিদ্ধি হইল, আর প্রতিদানস্বরূপই বা কতটুকু পাইলাম। যে ভালবাসার মধ্যে এইরূপ জমাখরচ, এইরূপ হিসাব-নিকাশ, এইরূপ লাভালাভের চিন্তা নিহিত থাকে, সে ভালবাসা অতীব ঘৃণিত। পার্থিব জীবনেই উহার ফলে দ্বেষ ও সন্দেহ দেখা দেয়। মবণের পবও উহাব কুফল বড কম নহে। ঐ প্রকাব স্বার্থমাখা ভালবাসার ফলে মানুষকে ভুবর্লোকে যাইয়া দৈন্যদশায় পডিতে হয। ইহা ব্যতীত আব এক প্রকাব ভালবাসা আছে, তাহা নিঃস্বার্থ, উদার, অকপট, প্রাণখোলা ভালবাসা। তাহাতে প্রতিদানে কি পাইলাম, না পাইলাম, সে হিসাব থাকে না। সে ভালবাসা অতীব পবিত্র, উপাদেয়, স্বর্গীয় জিনিস। সে ভালবাসার প্রবল বন্যায প্রাণ ডুবিয়া ভাসিযা প্লাবিত হইযা যায়। ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসিয়াই তৃপ্তি—মহাতৃপ্তি। এই প্রবল ভালবাসার উদ্দাম তরঙ্গ-ভঙ্গ রোধ কবিতে পাবে, ভুবর্লোকেব এমন শক্তি নাই। তাই এই পবিত্র ভাবেব মধুব মন্দাকিনী ভুবর্লোক অতিক্রম করিযা স্বর্লোকে যাইযা ঐশ মনের মহাপাবাবাবে মিশিয়া পড়ে। নিঃস্বার্থ ভালবাসাব উপাদান অতীব সূক্ষ্ম; তাই তাহা ভুবর্লোকেব স্থূলতব উপাদানেব মধ্যে মিশ খায না। ভুবর্লোকেব ক্ষুদ্র আযতনেব মধ্যেও উহার স্থান হয না। স্বর্গের সূক্ষ্ম পবমাণু আর তত্রত্য বিরাট আযতনই উহার পক্ষে যথার্থ উপযোগী। পূজার্চনার সময আমাদের ভিতব হইতে যে ভক্তি নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহাও দ্বিবিধ। ঠাকুর দেবতাব কাছে ভক্তি দেখাইয়া আমবা অনেক সময় অনেক দ্রব্য চাহিয়া বসি। আমাদেব এই ভক্তিটি বডই নিম্নশ্রেণীব কাণ্ড , ইহাকে এক প্রকার ব্যবসাবুদ্ধি বলিলেও চলে। আবার এক প্রকাব ভক্তি আছে, তাহা খাঁটি নিষ্কাম, তাহাতে যাজ্ঞাপ্রার্থনা নাই , প্রাণের মধ্যে এই ভক্তিব উচ্ছ্বাস আসিলে ভক্ত জগৎ ভুলিযা আত্মহারা হইযা আবাধ্য দেবেব ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া পডে। তখন তাহার বাহ্য-চৈতন্যের লেশও পরিলক্ষিত হয় না। এই ভাব অতীব পবিত্র।

আমরা সকলেই জানি যে, নিষ্কাম ভক্তিব মধ্যে এমন মধুবতা আছে, যাহার তুলনা পৃথিবীতে নাই। নিঃস্বার্থ ভালবাসার মধ্যে এমন তৃপ্তি আছে, যাহা বুঝাইতে ইহলে ভাষা মূক হইযা পড়ে। পবিত্র সঙ্গীত বা শিল্পের মধ্যে হইতে প্রাণেব অন্তস্তলে এমন গভীব ভাবেব ধাবা বহিযা আসে, যাহার অনুভূতি এই তুচ্ছ জগতেব পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পার্থিব জীবনে উহার কার্য্যকারিতা না থাকিলেও উহার শক্তি অমোঘ। স্বর্লোকে উহাব শক্তি পুঞ্জীভূত থাকে। ঐ সকল শক্তির ফল সেখানেই ফলে। কল-কব্জার শক্তি যেমন বিনষ্ট হয না, অলক্ষিতভাবে বিদ্যমান থাকে, নিষ্কাম ভক্তি ভালবাসা প্রভৃতির শক্তিও সেইরূপ অক্ষুন্ন অবস্থায় চিন্তাবাজ্যে অর্থাৎ স্বর্লোকে সঞ্চিত থাকে। কখন না কখন তাহাব কার্য্য দেখা যাইবে। নিঃস্বার্থ ভালবাসা

যাঁহার প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, উহার শুভফল তিনি পাইবেনই। পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ আয়তনে ও স্থূল জড়াংশের মধ্যে সে ফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। তবে কখন্ ও কেমন করিয়া সেই অব্যর্থ ফল ফলিবে? উহা স্বর্গে প্রতীক্ষা করিতে থাকে। যিনি পৃথিবীতে এইরূপ ভালবাসার পরিচয় দেন, তিনি মরণের পর ভুবর্লোকে, তাহার পর স্বর্লোকে যাইয়া ওঠেন। তখন তাঁহার সেই ভালবাসার ফল ফলে। ভূর্লোক, ভুবর্লোক ত্যাগ করিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত উহা সঞ্চিত শক্তির মত স্বর্লোকে অবস্থান করে। প্রতিক্রিয়ার নিমিত্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে। নিঃস্বার্থ প্রেমিক যত দিন ভূর্লোকে বা ভুবর্লোকে থাকেন, তত দিন তাঁহার উপর তারই ভালবাসার শুভফল ফলিতে পারে না। যেই তিনি স্বর্লোকে যাইয়া পৌঁছান, অমনই যেন প্লাবন তোরণ খুলিয়া যায়, আর পূর্ব প্রকাশিত নিঃস্বার্থ ভালবাসার স্রোত প্রবলবেগে তাঁহার উপর আসিতে থাকে। পৃথিবীতে আমরা কাহাকেও নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিয়া, তাহার কোন প্রতিদান না পাইয়া হয় তো মনে করি যে, ভালবাসাটা আমাদের নিষ্ফল হইয়া গেল। কিন্তু তাহা নহে। এখানে কিছুই নিষ্ফল হয় না। সমস্তই যথাসময়ের জন্য সঞ্চিত থাকে। ভগবানের রাজ্যে অবিচার নাই। সবই থাকে, কিছুই নষ্ট হয় না। এই তত্ত্বটা কবি ব্রাউনিং অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। আমি সুন্দর করিয়া বুঝাইতে পারিলাম না। তাঁহার বর্ণনাটা এই,—

"শুভকার্য আর শুভচিন্তারাশি,
বিনষ্ট হবে না কভু ; থাকিবে নিশ্চয়।
অশুভ অসৎ, নশ্বর এ সব
শবদ নীরবে যথা, পাইবে বিলয় ॥
শুভ আনে শুভ, পরিণামে বৃদ্ধি,
অপূর্ণ হেথায় বটে, পূর্ণাঙ্গ তথায়।
আশা, ইচ্ছা, স্বপ্ন শুভময় যদি
দেখা দিবে মূর্তি ধরি বিধাতৃ-কৃপায় ॥
লাবণ্য, শকতি, যাহা কিছু শুভ
শৌর্য্য-বীর্য্য, উদারতা, মধুর সঙ্গীত।
কিছু নহে নষ্ট, সকলই সজীব,
পরিস্ফুটভাবে হবে প্রকাশিত ॥
প্রেমিকের প্রেম-গাথা কল্পনা কবির।
খাঁটি যদি হয় তাহা রহে চির-স্থির ॥"

থিওসফিস্ট সম্প্রদায়ও স্বর্গ সম্বন্ধে ঠিক এইরূপ ধারণাই করেন। এই সম্প্রদায় পৃথিবীতে না জন্মিতেই কবি তাঁহার ধারণা ঐ ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আত্মার জ্ঞান-গবাক্ষ

স্বর্গের ধারণা করিবার সময় সর্বপ্রথমে চিন্তা করিবার প্রয়োজন যে, মানুষ স্বর্গে নিজে সুখভোগের পথ কেমন করিয়া খুঁজিয়া লয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, স্বর্গে সৌন্দর্য ও মহিমা অফুরন্তভাবে বিরাজ করিতেছে; মানবের যে কয়টি গবাক্ষ খোলা থাকে, সে কয়টির মধ্য দিয়াই যে যতটা দেখিবার, তাহাই দেখে। মানুষের চিন্তামূর্তিগুলি তাহার পক্ষে যেন এক একটা

গবাক্ষ। সেই চিন্তামূর্তির ভিতর দিয়া সুখের স্পন্দন আসিতে থাকে। যে ব্যক্তি পৃথিবীতে জীবিতকালে শুধু পার্থিব ঐশ্বর্যের কথাই ভাবিয়াছে, স্বর্গে তাহার গবাক্ষ প্রায়ই খোলা থাকে না; সুতরাং স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিবার সুযোগ তাহার বড় একটা হইয়া ওঠে না। কিন্তু নিঃস্বার্থ চিন্তা একটিবারও করে নাই, এরূপ লোক দেখা যায় না। মানুষ যত পাপীই হোক না কেন, জীবনে অন্ততঃ একটা চিন্তা-মূর্তিও গবাক্ষস্বরূপ সে হইয়া আছে। তাহার মধ্য দিয়াই সে একটু স্বর্গসুখের আস্বাদ পাইবে। মানুষ যখন ঘোর অসভ্য ছিল, সেই অসভ্য যুগের অসভ্য লোকদের পক্ষে সম্ভবতঃ স্বর্গসুখ ভোগ করিবার সুযোগ হইত না। অসভ্যদের কথা ছাড়িয়া দিলে মনে হয় মানুষমাত্রেরই কিছু না কিছু সুখভোগ সেখানে ঘটে। যে সকল ধর্ম গোঁড়ামীতে পূর্ণ, তাহাতে বলে যে, মনুষ্যের মধ্যে কেহ স্বর্গ আর কেহ কেহ বা নরকে যায়। আমরা তাহা বলি না। আমরা বলি স্বর্গ, নরক এ দুইটিই মানুষমাত্রেই ভোগ করিয়া থাকে। প্রত্যেককেই এ দুইটি ভোগ করতে হয়। "নরক" এ নামটিই ভয়ানক, নামটা শুনিলেই মানুষ ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া ওঠে ; কিন্তু মরণের পরই আমরা যে অবস্থায় যাইয়া উঠি, সেই অবস্থাটা অর্থাৎ ভুবর্লোকের সর্বনিম্ন স্তরটাই নরক। যতটা ভয়ানক বলিয়া শুনা যায়, বাস্তবিক পক্ষে তত ভযানক নহে। সে যাহা হোক, প্রত্যেক মানুষই ঐ স্বর্গ-নবক ভোগ করে। তবে ভোগেব কাল সকলেব পক্ষে সমান নহে।

আমাদের একটা কথা স্মরণ বাখিতে হবে এই যে, মানুষ নিজেকে যতই উন্নত ভাবুক না কেন, প্রকৃত হিসাবে সে এখনও উন্নতির অতি নিম্ন সোপানেই পড়িযা বহিয়াছে। মানুষেব অনেকগুলি কোষ। অন্নময় কোষটাই—স্থূলদেহ, ইহা ছাড়া জ্ঞানময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, মনোময় প্রভৃতি দেহ আছে। এতগুলি দেহের মধ্যে মানুষ কেবল স্থূল-দেহটাকে কতকটা আয়ত্ত করিতে পাবিয়াছে মাত্র ; বাসনা-দেহেও একটু চলাফেরা করিয়া থাকে; কিন্তু সে চলা ফেরার কথা মানুষ স্থূল জড়াংশ-গঠিত মস্তিষ্কে স্মবণ বাখিতে পারে না। বাসনা-দেহ অপেক্ষা মনোময়-কোষটা সূক্ষ্ম। প্রত্যেকেরই ঐ কোষ আছে , অথচ থাকিযাও যেন নাই। মানুষ আদৌ উহা ব্যবহার কবিতে শিখে নাই। উহাব ভিতর দিযা সূক্ষ্ম জগতের কোন স্পন্দনও সে লইতে পারে না।

স্বর্লোকে মানুষের অবস্থা

আমবা দেখিযাছি, মানুষকে ভূর্লোকেই হোক আর ভুবর্লোকেই হোক, খুব ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হয়। স্বর্লোকে তাহাকে সেরূপটি কবিতে হয না। স্বর্লোকে যাইযা সে যে খুব স্ফূর্তিব প্রাণে বেড়াইতে পাবে, তাহাও নহে। স্বর্লোকটা কর্মভূমি নহে, সেটি ভোগভূমি। মানুষকে সেথায কেবল বসিয়া বলিযা সুখ ভোগই করিতে হয়। কর্মমাত্রই নাই, কেবল ভোগ—এ অবস্থা। নিজের নিজের জ্ঞান-গবাক্ষের দ্বারা সে তত্রত্য সুখ অনুভব করিতে থাকে। স্বর্গ অতুল সুখেব স্থান হইলেও মানুষের ভোগ অপরিমেয় নহে। কারণ, গবাক্ষ যদি বেশী খোলা না থাকে, তবে ভোগেব পরিমাণ খুব কমই হয়। ভোগের পরিমাণ উন্মুক্ত গবাক্ষের পবিমাণেব উপবই নির্ভব করে। আর যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তির কর্মক্ষেত্র সেখানেও প্রশস্ত, তাঁহাবা সাধারণ ভোগীদিগের সঙ্গে সমান অবস্থায় অবস্থিত নহেন ; তাঁহারা মহিমামণ্ডিত দেবযোনি হইয়া ওঠেন, তাঁহাবা ক্রমবিকাশের উন্নত সোপানে আরূঢ়। স্বর্লোকে যাঁহারা জ্ঞানচৈতন্য সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফূট, তিনি তাঁহার মনোময় দেহটাকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার কবিতে পারেন। স্থূলদেহেব

উপর যেমন সাধারণ লোকের প্রভাব, মনোময় কোষের উপরে তাঁহার প্রভাবও সেইরূপ। সেই মনোময় দেহের সাহায্যে তিনি তাঁহার সম্মুখে আরও উচ্চতর উপাদেয় জ্ঞানের বিপুল ক্ষেত্র দেখিতে পান।

কিন্তু এক্ষণে আমরা অতটা উন্নত মহাত্মার আলোচনা করিতেছি না। আমরা এমন ব্যক্তির কথা ভাবিতেছি, যাঁহার নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান গবাক্ষ উন্মুক্ত আছে। আর সেইগুলি দ্বারা তিনি স্বর্গের সুখ অনুভব করিতেছেন। এরূপ ব্যক্তির বিষয় ভাবিতে গেলে আমাদের মনে হয়, স্বর্গের সঙ্গে ইঁহার দ্বিবিদ সম্পর্ক্। স্বর্গের অবস্থাটা ইঁহার কাছে কিরূপ বোধ হয়, এইটি বিবেচনা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে, তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তাঁহার অবস্থাটা তখন কিরূপ দাঁড়ায়।

স্বর্গের অবস্থাটা তাঁহার কাছে কিরূপ বোধ হয়, এইটিই আমাদের প্রথম আলোচনায় বিষয়। এ কথাটি ভাবিতে গেলে আমাদের দুইটি কথা মনে আসে। প্রথমে মনে হয়, স্বর্লোকের জড়াংশ তাঁহার চিন্তায় প্রভাবে কতটুকু রূপান্তরিত হইয়া উঠে ; দ্বিতীযতঃ মনে হয়, সেখানকার কতটা শক্তি তাঁহার আশা-আকাঙক্ষায় সাড়া দিয়া থাকে। ভুবর্লোকের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, জীবাত্মার চারিদিকে চিন্তা-মূর্তি ফিরিয়া থাকে। ঐ সকল চিন্তা-মূর্তির প্রকৃত উৎপত্তিস্থলই স্বর্লোক। অতএব স্বর্লোকে চিন্তা-মূর্ত্তিই প্রধান আলোচ্য বিষয়। তাহা ছাড়া এখানে সজীব শক্তিনিচয় স্বর্লোকবাসীর চতুর্দিকে অবস্থান কবে। বিস্তর শক্তিশালী জীবও দেখা যায়, সেগুলি পবী প্রভৃতি দেবদুতেব মত প্রাণী। উহাদের অনেকে মানুষের উপকাব করিতে ইচ্ছুক। মানুষ একটু শরণাপন্ন হইলেই তাহাব উপকাব করে। মানুষ পৃথিবীতে যেমনভাবে জীবন কাটায়, যেমন যেমন ভাবনা ভাবে, স্বর্লোকে সাধারণতঃ সেইরূপভাবেই থাকিতে চায। স্বর্গেব শক্তি ও সজীবতা খুব বেশী—একেবাবেই স্বতন্ত্র প্রকার। আমাদের মনে হয, মানুষ সেখানে যাইবাব পর তাহার চিন্তাধারা ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্তিত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা নহে পরিবর্ত্তিত হইতে একটু বিলম্ব ঘটে , কেন না, তত্রত্য নূতন ধরনে সে অনভ্যস্ত। কারণ ভূলোকে, ভুবর্লোকে স্থূলদেহ ও বাসনা দেহই তাহাব আয়ত্ত ছিল, মনোময় দেহটিব উপর তাহার কখনই কর্তৃত্ব ছিলনা। পূর্ব পূর্ব জন্মের স্থূলদেহেব ও বাসনা দেহেব ভিতব দিয়া অশেষ প্রকার কার্য্য প্রবৃত্তি তাহাব মনোময় কোষে গিয়া সঞ্চিত হইযাছে। সুতবাং তাহাব মনোময় কোষ পার্থিব জীবনেব ভাবেই ভাবিত হইয়া আছে। এ ক্ষেত্রে স্বর্গের নূতন ভাবটা গ্রহণ করিতে পাবা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে। মানুষ পার্থিব জীবনে যদি মনোময় কোষটাকে স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করিতে পারিত, তবে পূর্ব হইতেই উহাকে স্বর্গে চলিবার উপযোগী কবিয়া তুলিত, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা না পারায় মনোময় কোষ স্বর্গেব ভাব গ্রহণে আপাততঃ অনুপযোগীই থাকিযা যায়।

সঙ্গীত-গবাক্ষ

স্বর্গবাসীর অনেকগুলি জ্ঞান-গবাক্ষের কথা বলা হইযাছে। ঐ সকল গবাক্ষ কোন্ দিকে উন্মুক্ত, আর উহাতে কিরূপ কাচ খাটান, তাহা দেখিতে হইবে। এক এক জনের গবাক্ষের কাচ এক এক প্রকার, আবার এক দিকেও উন্মুক্ত থাকে না। মানুষ পার্থিব জীবনে যদি খুব উচ্চ চিন্তা করে, তবে স্বর্লোকে তাহার গবাক্ষ বিশেষ বিশেষ দিকে খুলিয়া যায়। স্নেহ, অনুরাগ প্রভৃতি গুণগুলি মানবীয়। যাহারা এ গুণে মণ্ডিত, তাহাদেব গবাক্ষ দিয়া মানবীয় দিক্টা চোখে পড়ে।

মানবীয় দিক্ ছাড়াও দিক্ আছে। একটা উদাহরণ লইয়া বুঝা যাক। আমরা যে উদাহরণটা দিতে যাইতেছি, সেটা মানবীয় নহে—স্বর্লোকের খাঁটি সম্পদ্। মনে কর, স্বর্গবাসীর একটা গবাক্ষ সঙ্গীতের দিকে। সে ঐ গবাক্ষ দিয়া বিপুল শক্তির লহবী লীলা দেখিতে পায়। না পাইবে কেন? আমবা জানি, সঙ্গীতেব শক্তি অতীব অদ্ভুত, উহা মানুষকে আত্ম-বিস্মৃত করিয়া নবীন জগতে লইয়া ফেলে। এ জগতে সামান্য সঙ্গীতেই যদ অতটা হয়, তবে স্বর্লোকের সঙ্গীত-শক্তি যে অতীব অদ্ভুত, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্যার্থিব জীবনে যাহার হৃদয়-তন্ত্রীতে কখন সঙ্গীত ঝঙ্কার দিয়া ওঠে না, স্বর্লোকে সঙ্গীতাভিমুখী গবাক্ষটা তাহাব কখনই উন্মুক্ত হয় না। স্বর্লোকে যাঁহার সঙ্গীতের বাতায়ন খুলিয়া যায়, তিনি সেই পথ দিয়া তিন প্রকার সুর শুনিতে পান। ঐ সুবত্রয তাঁহার গবাক্ষেব পরকলার গুণানুসাবে একটু আধটু পরিবর্ধিত হইয়া আসে। ঐ পরকলা তাঁহার দৃষ্টি-শক্তির কতকটা বাধা উৎপাদন কবে। পরকলা হয় ত রঙ্গীন , এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলোক আসে না, কিয়ৎ পরিমাণে আসে মাত্র। অথবা পবকাল অতীব নিম্নশ্রেণীর; তাই বাহিরের আলোক আসিবার সময কুৎসিত ও মলিন হইয়া আইসে। এখন দেখ, আমাদের সেই স্বর্গবাসী যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন হয তো তাঁহাকে কোন একটা বিশে সুরের পক্ষপাতী দেখা যাইত। এই ব্যক্তি যখন স্বর্গে গেলেন, দেখা গেল, ইঁহার সঙ্গীত গবাক্ষটি বেশ ভাল। এই গবাক্ষের ভিতর দিয়া ইনি কি দেখিলেন?

তিন প্রকার সুর

স্বর্গবাসীব গবাক্ষ বেশ ভাল হইলে, তিনি তিন প্রকাব সুব শুনিতে পাইবেন। স্বর্লোকের শক্তিপুঞ্জেব সুশৃঙ্খল গতিবিধিতে একটা সঙ্গীত নিঃসৃত হইতেছে। এইটিই প্রথম সুব। স্বর্গবাসী এইটি শুনিতে পাইবেন। কবিবা বলিযাছেন যে, গ্রহ উপগ্রহেবা মহাশূন্যে সঙ্গীতেব ঝঙ্কার তুলিয়া ছুটিযাছে। সে এই সঙ্গীত। কবিদের এই উক্তিব মধ্যে একটা সুস্পষ্ট সত্য বিবাজ কবিতেছে। গ্রহগণ ছুটিতেছে আব সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার তান লয সঙ্গত মধুর সঙ্গীত ঝরিয়া পড়িতেছে, শুধু তাহাই নহে সে সঙ্গীত আবাব বিচিত্র বর্ণে প্রকাশ পাইতেছে। স্বর্গবাসী দেখিবেন, তাঁহাব কাছে সকল চিন্তাই শব্দকরী। তাঁহাব নিজেব চিন্তা হোক আব অপবের চিন্তাই হোক, যে চিন্তা মূর্তিই তাঁহার চোখে পডিবে, সকলের মুখ হইতেই অতি চমৎকাব অনির্বচনীয় সুর লহবী বাহিব হইতেছে। সে সুব আবার নিরন্তবই মধুব বৈচিত্র্যে মধুময়ী ও বীণাপাণির বীণাব ঝঙ্কাবের ন্যায অমৃত নিঃস্যন্দিনী হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাব কাছে অনুক্ষণই এই চির-আনন্দময় সজীব সঙ্গীত সুধা ক্ষরিতে থাকিবে। অন্যান্য সুখানুভূতি ঘটিলেও এই মধুর তানেব বিরতি ঘটিবে না।

স্বর্গবাসীব দ্বিতীয় সুবটা অন্য প্রকার। স্বর্গে এক শ্রেণীর দেবযোনি আছেন ; তাঁহাবা না কি সঙ্গীত বিদ্যাবিশারদ। হিন্দুদিগেব প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, ইঁহাদিগকে "গন্ধর্ব" বলে। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি স্বর্গে গেলে তিনি কোন কোন গন্ধর্বেব প্রিযপাত্র হইয়া উঠেন। ঐ গন্ধর্বেব কাছে অতীব বিস্ময়কর সঙ্গীত-কৌশল শিক্ষা করিতে পারেন। অতএব গন্ধর্ব কণ্ঠ নিঃসৃত মধুব সুবও স্বর্গবাসীর প্রাণটাকে সুশীতল করিয়া তোলে।

আর একটা সুরও আমাদের পূর্ব্বোক্ত স্বর্গবাসী শুনিতে পান। এইটিই তৃতীয় সুর। তাঁহার পূর্বে পৃথিবী হইতে যে সকল জগদ্বিখ্যাত গায়ক মবণের পথ দিযা স্বর্গে গিয়া উঠিয়াছেন,

তাঁহারা সেখানেও চমৎকার সুরের আলাপ করেন। তাঁহাদের মধুর সঙ্গীতধ্বনি আমাদের স্বর্গবাসী পরিস্ফুটরূপে শুনিতে পান। পার্থিব গায়ক এ পর্যন্ত অল্প যায় নাই। বাক্, বিথোভেন, মেণ্ডেল, হ্যাণ্ডেল, মেজার্ট, রনিনী প্রভৃতি কত লোক গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই স্বর্গে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবিত আছেন। তাঁহাদের সঙ্গীত এখন আরও মধুর আরও সুশ্রাব্য, আরও বিস্ময়কর হইয়া উঠিয়াছে। এই মহাত্মাদিগের প্রত্যেকেই যেন অদ্ভুত স্বরসুধার নির্ঝর। ইহাদেরই করুণা কণার আভাসমাত্র পাইয়া পৃথিবীর কত গায়ক সুগায়ক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। আমাদের এই পৃথিবীতে স্বর্গবাসী ব্যক্তিবর্গের উন্মুক্ত শক্তির প্রভাব্ ক্রমাগত আসিতেছে। আমরা সকল সময় সেটি বুঝিতে পারি না। এ পৃথিবটা তাঁহাদের শক্তির প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নহে। এখানে অনেক ব্যক্তি অনেক রকমে স্বর্গবাসী কোন মহাত্মার অনুপম বিভূতিবিলাস প্রাণের ভিতরে অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাদেরই ভাবের প্রতিধ্বনি এখানে চলিতেছে মাত্র। ওস্তাদ গায়কদের মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, তাঁহারা নাকি অনেক সময় স্বর্গীয় সুরের ঝঙ্কার প্রাণের ভিতর অনুভব করেন। তাঁহাদের হৃদয় তন্ত্রীতে কি যেন এক অপূর্ব রাগ, কি যেন এক চমৎকার তানযুক্ত মোহন সুর মাঝে মাঝে না কি ঝঙ্কার দিয়া ওঠে। এই অনুভূতিটা কি প্রকারে ঘটে, তাহা সহস্র পৃষ্ঠা লিখিয়া বর্ণনা করিলেও বুঝান যায় না। তবেই দেখ, পার্থিব সঙ্গীত অপেক্ষা স্বর্গীয় সঙ্গীত কতই শ্রেষ্ঠ। সেখানকার একটি সুরে প্রাণেব ভিতরে যে ভাব জাগাইয়া তুলে, পৃথিবীতে বহু চেষ্টা কবিযাও সেরূপ একটি ভাবের স্ফুরণ করা কঠিন।

স্বর্গে চিত্রবিদ্যা

স্বর্গবাসীর গবাক্ষটা যদি চিত্রবিদ্যার হয, তবে তাঁহার অবস্থাও পূর্ব কথিত স্বর্গবাসীর মত হইয়া দাঁডায। তিনিও তিন প্রকার আনন্দ উপভোগ করেন। স্বর্গ নিরন্তর শব্দে মুখরিত আর রঙে রঞ্জিত হইতেছে যাঁহারা থিওসফির আলোচনা করেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, দেবতা দিগের মধ্যে বর্ণ-ভাষা আছে। এক শ্রেণীর দেবতা আছেন, তাঁহারা উহারই সাহায্যে আপনাদিগের মধ্যে কথাবার্তা বলেন। ঐ ভাষার ব্যবহারকালে অদ্ভুত অদ্ভুত বর্ণ ফুটিয়া ওঠে। মধ্যযুগের বিখ্যাত বিখ্যাত চিত্রকরেরা রঙের তুলিকা, কেম্বিস প্রভৃতি লইয়া ছবি আঁকিতেন না। তাঁহাদের আঁকিবার প্রণালী আরও সহজ, আরও তৃপ্তিপ্রদ। চিন্তাশক্তি দ্বারা তাঁহারা মনোময় জড়াংশকে ফুটাইয়া তুলিতেন। এ প্রণালী সাধাবণ চিত্রকরের পক্ষে অতীব কঠিন, তিনি ইহার ধারণাও কবিতে পারিতেন না। কিন্তু স্বর্গে বসিয়া এরূপ করাটা খুব সহজ। সেখানে এই প্রণালীতে চিত্র করিতে বসিলে অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বর্গে প্রত্যেক বিষয়েবই এইরূপ অদ্ভুত বিকাশ। প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা কবিবাব ও উপভোগ কবিবাব অনন্ত বিষয় তথায় বিদ্যমান বহিয়াছে. ক্ষুদ্র শক্তি আমরা, তাহাব ধাবণাও করিতে পারি না।

স্বর্গে গেলে আত্মীয় স্বজনের কথা মনে থাকে কি না

স্বর্গে গেলে আত্মীয়দের কথা মনে থাকে কি না, তাহাদের ভাবনা প্রাণে জাগে কি না, তাহাদিগকে দেখিতে পায় কি না, আমরা এক্ষণে সেই বিষয়ের আলোচনা কবিব। সকলেই জিজ্ঞাসা করে, স্বর্গে গিয়া আমরা আমাদের প্রাণপ্রিয় মৃত আত্মীয়দিগকে দেখিতে পাইব কি না, দেখিলে চিনিতে পাবিব কি না? স্বর্গের সুখ অনুপম হইলেও যদি আমবা সেখানে আমাদের

আত্মীয়স্বজনকে খুঁজিয়া না পাই, তবে সে সুখও আমাদের নিকটে সুখ বলিয়া মনে হইবে না। তাই লোকে ঐরূপ প্রশ্ন করে। ঐ প্রশ্নের উত্তর খুব সুস্পষ্ট ও সত্যমূলক। উত্তর এই যে,—আমরা মরণের পর স্বর্গে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে দেখিতে পাইব, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারা পার্থিব জীবনে যেমনটি ছিল, তাহাদিগকে তাহার অপেক্ষা আরও বেশী শ্রী-সম্পন্ন, শক্তি-সম্পন্ন ও মহিমা-মণ্ডিত দেখিব।

আবার লোকে জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা, আমাদের যে সকল আত্মীয় স্বর্গে গিয়াছে, তাহারা কিরূপ অবস্থায় আছে? সেখান হইতে কি তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছে? আমাদের কার্য্যকলাপ কি তাহারা দেখিতেছে? তাহারা কি আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছে?" উত্তর—না; তাহা হইলে সে অবস্থাটা তাহাদের কাছে কষ্টকর হইয়া উঠিত। আমরা যদি এখানে দুঃখ পাই, আর সেটা যদি তাহারা স্বর্গে বসিয়া দেখে, তবে কি তাহার সুখী হইতে পারে? আমরা যদি পাপে লিপ্ত হইয়া পড়ি, আর আমাদের আত্মীয় স্বর্গ হইতে যদি তাহা জানিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণে লাগে। তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পায় না, কেবল আমাদের প্রতীক্ষায় সময় কাটায়, এ অবস্থাটাও তাহাদের পক্ষে সুখের নহে। কেন না, সে ক্ষেত্রে অনেক দিন ধরিয়া আসা করিয়া থাকিতে হয়, কবে আসিবে—কবে আসিবে ভাবিয়া অস্থির হইতে হয়, তাহা ছাড়া পার্থিব আত্মীয়টি বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ হইয়া বোগে শোকে খিটখিটে হইয়া এমন মূর্তিতে হয় তো যাইয়া উঠিল যে, সে মূর্তিটা স্বর্গবাসী আত্মীয়ের আদৌ ভাল লাগিল না। এ ক্ষেত্রে বিধাতা যে ব্যবস্থাটা করিয়াছেন, সেটা খুব সুন্দর ও জ্ঞানের পবিচায়ক। সে ব্যবস্থায কোন পক্ষেরই ক্ষোভ হয় না। আমাদিগের যে মূর্তিটা তাহার কাছে তৃপ্তিকর, সেইটিই দেখে ; কোন প্রকাব বিকৃতি বা পরিবর্তন তাহাব চোখে পড়ে না। কি সুন্দর ব্যবস্থা! মানুষ সহস্র চেষ্টা করিয়াও এমন সুন্দর ব্যবস্থা কল্পনা করিতে পারিত না। কেমন করিয়া এরূপটি হয়, তাহা আমরা পবে বুঝাইয়া দিতেছি।

স্নেহের প্রভাব

যখনই আমরা কাহাকেও মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসি, তখনই আমাদের মনেব মধ্যে তাহার একটা মূর্তি গঠিত হইয়া ওঠে। সেই মূর্তিতে সে আমাদের মনের মধ্যে বিবাজ কবিতে থাকে। সে মূর্তিটা মনোময় মূর্তি, স্বর্লোকেই সেরূপ মূর্তির প্রকৃত বাসস্থান। সেইখানেই ঐরূপ মূর্তি বিস্তর দেখা যায়। মরণের পর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঐ মনোময় মূর্তি স্বর্গে উঠে। ভালবাসার শক্তি খুব বেশী। উহার বলে ঐ মনোময় মূর্তি সৃষ্ট হইয়া আমাদের সঙ্গে থাকে। আবার যাহাকে আমরা ভালবাসি, আমাদের ভালবাসার ক্রিয়া তাহার উপরেও হইতে থাকে। আমরা যে তাহাকে ভালবাসিতেছি, তাহার জীবাত্মা সেটা বুঝিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, সে আমাদের ভালবাসার বেগে সাড়া দিয়া ওঠে। আর আমাদের মনোময় মূর্তিটার মধ্যে পর্য্যন্ত আসিয় পড়ে। এই উপায়ে সত্য সত্যই আমরা আমাদের ভালবাসার পাত্রকে পাইয়া বসি। তাহার বেশ সজীব মূর্তিটিই দেখিতে পাই! আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে এই যে, আমরা আত্মাকেই ভালবাসি, দেহটাকে নহে। আর উক্ত উপায়ে আত্মাকেই পাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—"পার্থিব আত্মীয় যদি মারা যায় তবে তাহার আত্মাকে ঐরূপে আমরা স্বর্গে থাকিয়া আকর্ষণ করিয়া মনোময় মূর্তির মধ্যে পুরিয়া লইতে পারি, কিন্তু আমরা স্বর্গে অথচ আমাদের আত্মীয়

পৃথিবীতে জীবিত, এ অবস্থায় সেই আত্মীয় একই সময়ে পৃথিবীতে জীবিত, এ অবস্থায় সেই আত্মীয় একই সময়ে পৃথিবীতে আর স্বর্গে এই দুই স্থানে কেমন করিয়া থাকিবে?" প্রকৃত কথা এই যে, এইরূপ স্থলে ঐ আত্মীয় একই সময়ে দুইটি স্থানে থাকিতে পারে, সত্য সত্যই পারে। শুধু দুইটি স্থানে কেন, আরও অধিক স্থানেও থাকিতে পারে। আমাদের হিসাবে সে জীবিতই থাকুক আর মৃতই হোক, তাহাতে তাহার একাধিক স্থানে অবস্থান করার বাধা হয় না। আত্মা জিনিসটা কিরূপ, বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। তাহা হইলে একাধিক স্থানে থাকিবার কথাটা ভাল করিয়া বুঝা যাইবে।

আত্মা একটা বড় জিনিস—খুব উচ্চস্তরের বস্তু। উহার যতটা অংশ আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে উহা তাহার অপেক্ষা খুব বেশী বিরাট। উহার কতকটা অংশ আমরা দেখি মাত্র। একটা রেখা যেমন একটা চতুষ্কেব অংশ, অথবা একটা চতুষ্ক যেমন একটা ঘনক্ষেত্রের অংশ, সেই রূপ প্রকাশিত অংশটা একটি মহান্ অপ্রকাশিত বস্তুরই অঙ্গবিশেষ। কতকগুলি চতুষ্ক একটা ঘন ক্ষেত্র নির্মাণ করিতে পারে না ; কেন না, চতুষ্কের মাপ দুইটি, আর ঘনক্ষেত্রের মাপ তিনটি। সেইরূপ নিম্নস্তরের রাশি রাশি অভিব্যক্তি দ্বারা ও আত্মার সমগ্র অংশটা প্রকাশিত হইতে পাবে না ; কেন না, উহা উচ্চতর স্তরেও বিদ্যমান আছে। স্থূল জগতের জ্ঞানলাভার্থ আত্মার খুব সামান্য একটু অংশমাত্র নিম্নে আসিয়া স্থূল দেহ ধাবণ করিযা থাকে। স্থূল-জগতে না আসিলে স্থূল-জগতের অভিজ্ঞতা জন্মে না। এক সময়ে একটি শরীরই ধাবণ করে, কারণ সেইটিই বিধি। কিন্তু যদি একই সময়ে সহস্র দেহও ধারণ করে, তবুও উহার সমস্ত মূর্তিটা তাহাতে প্রকাশ পায় না। আত্মাব কিছু অংশ স্থূলদেহ ধরিয়া তোমাব আত্মীয বলিয়া পবিচিত হইল, মনে কর। তুমি তাহাকে যদি সত্য সত্যই ভালবাস, তবে তোমাব মরণের পবও তাহার মনোময় মূর্তি তোমার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্লোকে যাইয়া উঠিবে। ঐ আত্মীয়েব একটা স্থূল-দেহ থাকিলেও উহার অপর অংশ হইতে খানিকটা সেই মনোময মূর্তির ভিতব যাইযা উহাকে জীবিত করিয়া তুলিবে। সেটা তাহাব পক্ষে আদৌ কঠিন নহে। স্বর্লোক ভুবর্লোক অপেক্ষা আরও দুই ক্রম উচ্চে, সুতবাং আরও সূক্ষ্ম। অতএব সেখানে উহার সূক্ষ্ম গুণেব আবও সুন্দব বিকাশ হইয়া থাকে।

মানুষের আত্মা একই সময়ে এই পৃথিবীতে স্থূল দেহের মধ্যে ও স্বর্লোকে মনোময় কোষের মধ্যে থাকিতে পারে, এ কথাটা প্রণিধান করিয়া ওঠা যদি এখনও কঠিন বলিয়া মনে হয়, তবে স্থূল-জগতের একটা খুব সহজ উদাহরণ লইয়া বুঝিযা দেখ। মনে কর, তুমি চেয়ারে বসিযা আছ। এ ক্ষেত্রে একই সময়ে তোমার জ্ঞান কত দিকে ফুটিতেছে। চেয়ারের স্পর্শজ্ঞান হইতেছে, পা মাটিতে রহিয়াছে, সে বোধ হইতেছে, হাত দুখানা চেয়ারের বাহুর উপর বিন্যস্ত, তাহা বুঝিতে পারিতেছ, হাতে হয় তো পুস্তক ধরিয়া আছ, তাহাবও জ্ঞান হইতেছে। একসঙ্গে এতগুলি বিষয়ের ধারণা করা মস্তিষ্কের পক্ষে কিছুই কঠিন বলিয়া লাগিতেছে না। মস্তিষ্কের চৈতন্য অপেক্ষা আত্মার সম্বিৎ খুবই শ্রেষ্ঠ। মস্তিষ্কের পক্ষেই যদি কঠিন না হয়, তবে আত্মার পক্ষে কঠিন হইবে কেন? একই ব্যক্তি চেয়ারে বসিয়া একই সময়ে বিভিন্ন অনুভূতি করে ; তদ্রূপ একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হইতে পারে। প্রত্যেক মূর্তির মধ্যেই সে আত্মা বাস্তব, সজীব ও প্রেমময়। চিন্তা-মূর্তির মধ্যে আত্মার যে অংশটা প্রকাশ পায়, সেইটিই উৎকৃষ্ট অংশ। পার্থিব দেহে যেটুকু ব্যক্ত হয়, সেটুকু উহার মত পূর্ণাঙ্গ নহে। পৃথিবীতে উহার উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি হইলেও তাহা নির্দোষ নহে।

স্বর্গবাসী আত্মীয়েরা যদি আমাদের বিষয় ভাবে আর আমাদের আত্মা যদি মনোময় মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাদের কাছে উপস্থিত হয়, তবে সেই কার্য্য দ্বারা আমাদিগের ক্রমোন্নতির কিছু সাহায্য হয় কি না, এই প্রশ্নটি অনেকেই করিয়া থাকন। উত্তর —নিশ্চয়ই হয়. ইহাতে আমার অভিব্যক্ত হইবার সুযোগ ঘটে। আমি যদি পার্থিব দেহেই জীবিত থাকি, তবে স্থূল দেহের ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মনোময় মূর্তিতে অধিষ্ঠিত হই ও স্নেহ অনুরাগ বৃত্তিরও পরিপুষ্টিসাধন করিতে থাকি। অতএব স্বর্গবাসী আত্মীয়ের স্নেহানুরাগের ফলে আমার নিজেরও কত উপকার। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আত্মা বহু চিন্তা মূর্তিতে যুগপৎ অধিষ্ঠিত হইতে পারে। যে ব্যক্তিকে অনেকে ভালবাসে, তাহার অনেকগুলি চিন্তা মূর্তি গঠিত হয়। তাহার আত্মাও একই কালে অতগুলি মূর্তির মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়। এরূপ হওয়াটা সৌভাগ্যের বিষয়। সকলের কাছেই ভালবাসা পাওয়া, আর সকলের মনেই চিন্তা মূর্তির উদ্ভব ঘটান কম সৌভাগ্যের কথা নহে। এরূপ ভাগ্যবান্ ব্যক্তির ক্রমোন্নতি খুব দ্রুতবেগে হইতে থাকে। যাহার অসাধারণ গুণ সে-ই বহু ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে। সদ্‌গুণের পুরস্কারস্বরূপ সে বহু লোকের ভালবাসা পায়। শুধু যে পায়, তাহা নহে ; তার নিজের প্রাণটাও ভালবাসায় পূর্ণ হইতে থাকে। জীবিতকালে যেমন ভালবাসা যায়, মরণের পরও তেমনই ভালবাসিতে পারা যায়। যাহারা আমাদিগকে ভালবাসে, তাহারা জীবিতই থাকুক আর মরিয়াই যাক, তাহাদের ভালবাসায় আমাদের উপকার নিশ্চয়ই সাধিত হয়।

মনে কর, তুমি স্বর্গবাসী। তোমার আত্মীয় পৃথিবীতে জীবিত। তুমি আত্মীয়ের সঙ্গে মিশিতে ইচ্ছা করিতেছ। এ ক্ষেত্রে দুইটি অন্তরায় আছে। তাই মিশামিশিটা ষোল আনা রকম হইতে পারে না। প্রথমতঃ তুমি স্বর্গে বসিয়া আত্মীয়ের যে মূর্তিটি মনে মনে গড়িয়া তুলিলে, সেটি হয় তো আংশিক বা অসম্পূর্ণ। তাহা হইলে তাহার উচ্চতর গুণের বিকাশ না-ও হইতে পারে। ঐ অসম্পূর্ণ মনোময় কোষে সে সব গুণের বিকাশ হওয়া অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ তোমার আত্মীয়ের দিক্ দিয়াও অসুবিধা আসিয়া জুটিতে পারে। তুমি যে মনোময় মূর্তিটি গড়িয়াছ, হয়তো সেটি ঠিক হয় নাই। তোমার আত্মীয় উন্নত নহে, অথচ তুমি তাহাকে উন্নত ভাবিয়া সেইরূপ মূর্তিই গড়িয়াছ। এ ক্ষেত্রে আত্মীযের অনুন্নত আত্মা ঐ মূর্তির মধ্যে আসিয়া উঠিতে পারে না। এরূপ ঘটনা খুব বেশী ঘটে না। যখন কোন অপদার্থ আত্মীয়কে স্নেহের চক্ষুতে খুব গুণবান্ মনে করিয়া তাহার একটা উচ্চ রকমের মনোময মূর্তি কোন আত্মীয় গঠন করিয়া বসে, কেবল তখনই ঐরূপ ব্যাপার ঘটে। অবিবেচনা পূর্বক তুমি যদি কোন আত্মীয়ের ঐরূপ উচ্চ রকমের মনোময় মূর্তিই গড়িয়া বইস, তাহাতেও তাহার কোনরূপ পরিবর্তন বা ক্রটি ঘটিবে না ; কেন না, ঐ মূর্তির মধ্যে তাহার আত্মা সম্পূর্ণভাবে যাইতে না পারিলেও কতক কতক যাইবে আব ঐরূপভাবে যাইতে যাইতে তাহাব উন্নতিও হইতে থাকিবে। সে উন্নতি পার্থিব উন্নতিব অপেক্ষা অনেক বেশী; সুতরাং আত্মীযের দিন দিন উন্নতি দেখিয়া তুমি সুখী হইবে। তোমার আত্মীয়েব বাস্তবিকপক্ষে যে গুণগুলি আছে, তাহা সে সহস্র সহস্র মূর্তিতে পরিব্যক্ত করিতে পারে। কিন্তু যে গুণ নাই বা এখনও যেটি অপ্রকাশিত, তুমি যদি সেটির সমাবেশ তোমার মনোময় মূর্তির মধ্যে কবিয়া বস, তবে সে তখনই তখনই ঐ গুণটির বিকাশ দেখাইতে পারিবে না। যাঁহারা আত্মীয় স্বজনের যথার্থ গুণের চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না—হতাশ হইতে হয় না। কারণ, সেরূপ ক্ষেত্রে ঐ সকল গুণ সত্য সত্যই তাঁহাদের নিকটে মনোময় কোষে ফুটিয়া ওঠে। যাহারা মিথ্যাগুণের আরোপ করিয়া আত্মীয়ের ভাবনা ভাবে, তাহাদিগকে হতাশ হইতে হয়; কেন না, মনোময় মূর্তিতে সে গুণ তখন তখনই

দেখা যায় না। থিওসফিষ্টরা জানেন যে, আমরা যদি গুরুর চিন্তা করিয়া তাঁহার সকল গুণ আমাদের মনের মধ্যে দেখিতে না পাই, তবে সেটা গুণের ত্রুটি নহে, সেটা আমাদেরই ত্রুটি। গুরুর শক্তি ও ভালবাসা অতীব গভীর, আমরা সে গভীরতা মান রজ্জু দ্বারা মাপিয়া উঠিতে পারি নই।

স্বর্গে যাইবার পর কিরূপে আত্মার উৎকর্ষ হইতে পারে?

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন—আত্মা স্বর্গে গিয়া সেখানকার সুখভোগেই যদি মত্ত থকে, তবে তাহার উৎকর্ষ কখন্ হয়? ঐ সুযোগগুলি তিন ভাগে বিভক্ত। আবার প্রত্যেক ভাগেও অনেকগুলি করিয়া প্রকার আছে। প্রথমতঃ যে ব্যক্তি স্বর্গে গিয়া ওঠে, তাহার নিজের সদ্‌গুণ দ্বারা জ্ঞানের অনেকগুলি গবাক্ষ খুলিয়া যায়। বহুকাল যাবৎ ঐ গুণের অনুশীলন হওয়ায় উহারা বেশ শক্তিমান্ হইয়া ওঠে। স্বর্গবাসী যখন আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে, তখন ঐ গুণগুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিপুলভাবে বর্দ্ধিত হইয়া আসে। যদি পুনঃ পুনঃ একটা চিন্তা করা যায়, তবে সে চিন্তাটা নিবিড়ীভূত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে! যিনি সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ নিঃস্বার্থ ভালবাসার অনুশীলন করেন, কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, তাহা তিনি ভাল করিয়া জানেন।

দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান-গবাক্ষ দিয়া স্বর্গবাসীর শুভ নিঃস্বার্থ ভাবগুলি বাহিরে যায়। তাহাতে সময় সময় দেবযোনিরা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিত্রতা করেন। তাঁহাদের সাহচর্য্যে তাঁহার নিশ্চয় উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। গন্ধর্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটিলে তাঁহাদের নিকট স্বর্গবাসী বিবিধ সুর স্বর শিখিয়া নেন। পৃথিবীতে সেরূপ স্বরবিভূতি কল্পনারও অতীত। এইরূপে কোন দেবের নিকট হয় তো চিত্রবিদ্যা শিখিতে পারেন। সে এমন সুন্দর চিত্র যে, তাহার কল্পনাও মানুষ কখন করিতে পারে না। ঐরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত বিদ্যার আলোচনা করিতে করিতে সে সকলের ছাপ তাঁহার উপর পড়িয়া যায়। সেই ছাপ লইয়া তিনি পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গে যাইবাব সময় যেমনটি হইয়া গিয়াছিলেন, সেখান হইতে পুনরায় আসিবার সময় তাঁহার অবস্থা অনেক উন্নত হইয়া থাকে। তৃতীয়তঃ স্বর্গবাসী তাঁহার আত্মীয় স্বজনের যে সকল মনোময় মূর্ত্তি চিন্তা দ্বারা গড়িয়া তুলেন, তাহাতেও তাঁহার উপকার হইয়া থাকে। উহাতেও অনেক উন্নত সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখিয়া নিজেকে উন্নত করিয়া লইতে পারেন। এই উপায়ে অনেক উন্নত সদ্‌গুণের সমাবেশ দেখিয়া নিজেকে উন্নত করিয়া লইতে পারেন। এই উপায়ে অনেক থিওসফিষ্ট চিন্তা মূর্ত্তির ভিতর দিয়া বহু সৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ উপায়ে খুব অল্প লোকই উপকৃত হয়।

যদি কেহ কোন পৌরাণিক বীরের ভক্ত হইয়া মনে মনে তাঁহার চিন্তাই করিতে থাকে, তবে তাহাতেও তাহার উপকার হয়। সেরূপ ক্ষেত্রে কোন দেবযোনি বা কোন অদৃশ্য সহায় তাহার গঠিত মনোময় মূর্ত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সুখী ও উন্নত করিতে থাকে।

আত্মার প্রকৃত মূর্ত্তি

এখন আমরা আত্মার আসল মূর্ত্তিটির কথা বলিব। আত্মার একটা খুব সূক্ষ্মদেহ আছে, সেটা পরিবর্ত্তিত হয় না ; উহাকে কারণদেহ বলে। আত্মা বহু বহু স্থূল দেহে জন্মগ্রহণ করিলেও ঐ

কারণ দেহটা একরূপই থাকে। স্বর্গবাসও চিরদিনের জন্য নহে। কিছুদিন পরে জীবাত্মাকে স্বর্গ হইতে চলিয়া আসিতে হয়। তখন তাহার মনোময় দেহটা পরিত্যক্ত হয়। ভূর্লোকে যেমন স্থূল-দেহ ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, ভুবর্লোকে যেমন বাসনা দেহ ত্যাগ করিতে হয়, সেইরূপ স্বর্গত্যাগের সময় মনোময় দেহটাও ত্যাগ করিতে হয়। কেবল কারণ-দেহটা থাকিয়া যায়। কারণ-দেহধারী হইলে আর জ্ঞান গবাক্ষের প্রয়োজন হয় না। ঐটিই তাহার প্রকৃত মূর্তি মুক্ত আবাস । ঐ সময় তাহার নিকটে কোন প্রকার প্রাচীর, কোন প্রকার অবরোধ থাকে না। তখন সমস্ত অবরোধের বিলয় ঘটে। স্বর্গের পরে মানুষ যখন এই অবস্থায় যাইয়া ওঠে, তখন অধিকাংশ লোকেরই অতটা বোধশক্তি থাকে না। তাহারা যেন একটু তন্দ্রাচ্ছন্নভাবে বিশ্রাম করিতে থাকে। এই ভাবের পরই আসিয়া আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। প্রতি জন্মেই সে উন্নত হইতে হইতে যায়, অজ্ঞানাবরণ প্রতি জন্মেই হ্রাস পাইতে থাকে, কারণ-দেহে বিশ্রাম করিবার সময়টাও প্রতি জন্মের পর বর্দ্ধিত হয়। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কারণ-দেহে বাসের কাল বাড়ে। উন্নতির লক্ষণ কি? মানুষ যতই উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহার লইবার পরিবর্তে দিবার প্রবৃত্তি বাড়িতে দেখা যায়। পরিশেষে যীশুর মত মহান্ ভাব আসিয়া পড়ে। তখন সে মানবের জন্য নিজের যথাসর্বস্ব, এমন কি, নিজের জীবনটা পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক হয়। এইটিই শ্রেষ্ঠতম গৌরব—সাধনার চরম সিদ্ধি—আনন্দের ঘন মূর্তি। আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ মুক্তির জন্য নিরন্তর ছটফট করিতেছে। তাহাদিগকে সাহায্য করা অপেক্ষা আর কি মহান্ ব্রত থাকিতে পারে? মনে প্রাণে মানবের উপকার করা ও মানবের সেবা করাই প্রকৃত সাধনা। এই শিক্ষা তখন সে অনুভব করে। এই সেবা ধর্মের কথা সকলে জানে না। যাঁহারা উচ্চ জগতের বিষয় অবগত হইয়াছেন, সেখানকার অলৌকিক বিভূতিবিলাসের মূর্তি দেখিয়াছেন, জগদ্বাসীকে সেই সকল সম্পদ্‌রাশির সংবাদ দেওয়া তাঁহাদের কর্তব্য পাশ্চাত্য জগতের থিওসফিষ্টগণ এই মহান্ ব্রত পালন করিতেছেন; থিওসফি জীমূতমন্দ্রে ঘোষণা করিতেছে—মানবমাত্রেই স্বর্লোকে যাইয়া সেই বিপুল সমৃদ্ধি ভোগের অধিকারী হইবে, সকলেরই ভবিষ্য আশাপ্রদ। থিওসফির এই ঘোষণা বাণী সত্য ; স্বর্গ তো আমাদের কাছেই রহিয়াছে। কেবল সাধনা দ্বারা আমাদিগকে ভোগের অধিকারী হইয়া উঠিতে হইবে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

পরলোকের প্রমাণ

মরণেব পর মানুষের কিরূপ অবস্থা দাঁড়ায়, আমরা থিওসফিস্ট সম্প্রদায়ের লোক, তাহা একটু বেশী জানি। যখন আমরা আমাদের মতের যুক্তি দিয়া লোককে বুঝাইতে যাই, তখন অনেকে জিজ্ঞাসা করেন,—"তোমাদের কথা যে সত্য, তাহার প্রমাণ কি? আর আমরাই বা কি উপায়ে তোমাদের মত অতটা জানিতে শুনিতে দেখিতে পারিব?" আমরা পরলোকের কথা এমন করিয়া বুঝাইয়া দিই যে, শুনিলেই লোকের শুনিতে ইচ্ছা হয় ; কিন্তু অতটা কি সত্য ? এই সন্দেহ কাহারও কাহারও মনে আসে, তাই ঐরূপ প্রশ্ন করিয়া বসেন। যিনি বাস্তবিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া আমাদের কাছে আসেন, তাঁহাকে আমরা সমাদরে বুঝাইতে চেষ্টা করি। কিন্তু বজ্জাতি বুদ্ধি লইয়া যে নাস্তিক বিবোধ কবিতে আসে, আমবা তাহাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের কথা মানিয়া লইয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিলেন বলিয়া যদি কাহারও ধাবণা হয়, আর তিনি যদি আমাদিগকে বলেন—"এইরূপ ভাবে আমার বিশ্বাস জন্মাও" তাহা হইলে আমরা বলি—"প্রিয় মহাশয! আপনাদের বিশ্বাস জন্মাইতে যাওয়ার আমাদের গরজ কি? আপনার বিশ্বাসে অবিশ্বাসে আমাদের যায় আসে কি? আমবা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিযাছি, তাহাই ঘোষণা করিযা থাকি ; আমবা যে সকল তথ্য সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, পূর্ব পূর্ব কালে সহস্র সহস্র ব্যক্তি সেগুলিকে আমাদের মত সত্য বলিয়া বুঝিযা গিয়াছেন। ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করুন, না হয় না করুন। আপনাব বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে আমার ঘোষিত তথ্যের কিছুমাত্র লাভলোকসান নাই। তবে আপনার লাভালাভ যথেষ্টই আছে। সে লাভালাভ দেখা আপনারই কার্য্য, আমার কার্য নহে।"

যে ব্যক্তি বিশ্বাসের কারণ বুঝিয়া বিশ্বাস করিতে চায়, আর বাস্তবিক আগ্রহের সহিত ঐ কাবণ অনুসন্ধান কবে, তাহাকে আমরা খুবই আদরের সঙ্গে আমন্ত্রণ করিয়া আমাদেব যুক্তি-প্রমাণ জানাইয়া থাকি। আমরা ঐরূপ সৎশ্রেণীর উদ্দেশেই এই অধ্যায়ের বক্তব্য বিষয়গুলির অবতারণা করিব। পরলোকের বিশ্বাসটা লেড্‌বিটার সাহেবের কিরূপভাবে হইয়াছিল, সেইটি বলিতে আরম্ভ করিলেই ভাল হইত। তাহাতে ঐ পথানুসারী অনেক ব্যক্তির কিছু-না-কিছু উপকার হইতে পাবে. অবান্তর কথা বলিয়া আমরা এ অধ্যায়েব প্রথমে খানিকটা সময় একরূপ নষ্ট কবিলাম।

পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে ব্যক্তিগত জ্ঞান

লেড্‌বিটাব বলিয়াছেন—"আমি, যখন প্রথমে 'থিওসফি' জিনিসটা বুঝি, তখন আমি ইংলণ্ডের এক জন ধর্মযাজক। আমি যদি অন্য গোঁড়াদের মত লোক হইতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, ঐরূপ একটা ধর্মযাজকই থাকিয়া যাইতাম। কিন্তু আমার প্রকৃতি একটু অন্যরূপ ছিল। আমার প্রাণে একটু স্বাধীন চিন্তা আসিত, অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিটা আমার একটু বলবতী ছিল।

সাধারণ লোককে ধর্মবিশ্বাসী করিয়া তোলা আমার কতকটা কাজ ছিল। অনেকে আমার নিকটে অনেক সংশয় মিটাইতে আসিত। তাহাদের সন্দেহ দুব করা, তাহাদের প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেওয়া আমার কাজ ছিল, টমাস্ পেন্ অথবা ব্রাডল্ প্রণীত গ্রন্থের মতানুযায়ী অনেকে অনেক প্রশ্ন গড়িয়া আমাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত। প্রষ্টরা আমার উত্তর শুনিয়া পরিতুষ্ট হইত। আমি তাহাদেব প্রশ্নের উত্তর অনাযাসেই দিতে পারিতাম। তাহাদিগকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতাম বটে, কিন্তু যে তর্কধারা অবলম্বন করিযা আমি উত্তর দিতাম, তাহা আমার কাছে কখন কখন ভ্রমপূর্ণ বলিয়া বোধ হইত। তাই আমি নিজে ঐরূপ উত্তর দিয়া সন্তুষ্ট হইতে পাবিতাম না। ধর্ম-পুস্তকেব কাহিনীর সমর্থন কবিতে বসিয়া আমি যে প্রমাণ দিতাম, যদি অন্য কেহ ইতিহাস-ঘটিত কোন বিষয়ের জন্য ঐরূপ প্রমাণ আনিযা হাজির কবে, তবে আমি তাহাকে অসম্পূর্ণ বলিযা নিশ্চযই উপেক্ষা কবিয়া থাকি। খৃস্টান ধর্মে 'চিরমুক্তিব' কথা আছে; ঐ সম্বন্ধ বেশ খানিকটা বক্তৃতা আছে। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ কিছু নাই। তাই আমার মনে হইত যে, আমি সকলকেই চিবমুক্তিব আশা দিযা থাকি অথচ সেটা যে সত্য কথা, তাহার কোন প্রমাণই নাই। তাহা হইলে আমি একটা ধর্মধ্বজী সাজিযা একটা মিথ্যা কথাই এ পর্যন্ত কহিয়া আসিতেছি। তাহা হইলে এরূপ না কবিয়া বড বড মহাত্মারা তাঁহাদের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কি বলিযা গিযাছেন, এখন আমাকে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে তাহাই পডিযা দেখিতে হইবে।

আমি পডিতে লাগিলাম। পডিযা আশা পূর্ণ হইল না— কোন প্রমাণের কথাই পাইলাম না। তাঁহাবা এমন কথাই বলেন নাই, যাহাতে অনুসন্ধিৎসুব পিপাসা মেটে। দেখিলাম, তাঁহাদের পুস্তকে অনেক কঠোর আদেশ আছে। যাহাবা কিছু মানিতে চাহে না, যাহারা প্রাণের ভিতর সংশয় পোষণ কবে, তাহাদেব খুব নিন্দাবাদ আছে, কিন্তু প্রমাণ বলিযা ধবিয়া লওযা যায, এমন কোন কথা নাই। যাহাব প্রাণে জটিল প্রশ্ন আসিবে—যে মীমাংসার জন্য ব্যাকুল হইবে, সে ঐ সকল পুস্তক পডিযা কোন উপকারই পাইবে না, উহাতে একটি সন্দেহেরও নিরসন হইবে না, প্রমাণেব লেশও উহাতে নাই। সে দেখিবে, পুস্তকগুলি গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ—ঘোব অযৌক্তিক। উহাতে যেগুলিকে প্রমাণ বলিযা ঘোষণা করিতেছে, প্রকৃত তার্কিকের কাছে তাহা অতীব নগণ্য—তুচ্ছ। সে ইচ্ছা কবিলেই উহা চুবমার করিয়া ফেলিতে পাবে। খৃস্টান ধর্মের প্রচলিত যাবতীয় পুস্তকগুলিব মধ্যে এমন একটি স্থলও নাই, যেখানে কোন একটি বিষয় নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা হইয়াছে। যে ধর্ম নাড়ী-নক্ষত্রেব সঙ্গে জডিত, তাহা এমনই অসম্পূর্ণ! কি দারুণ ক্ষোভেব কথা! কি ভয়ানক ব্যাপার! যখন মানুষ ধর্মের এরূপ অসারতা দেখিতে পায়, তখন তাহার মনে হয় যে, তাহার যাবতীয় ধর্মবিশ্বাস সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল, আর ধর্মেব 'ধ' পর্যন্ত বিশ্বাসের মূলে থাকিল না।

ধর্মের প্রতি অনেকের ঐরূপ ঘৃণা জন্মিলেও আমাব অবস্থা অতটা শোচনীয় হয় নাই। আমি ধর্মপুস্তকগুলি পড়িয়া দেখাব পূর্ব হইতে প্রেত-তত্ত্বের অনুসন্ধান কবিতেছিলাম। তাহার ফলে বুঝিয়াছিলাম,—সবই মিথ্যা নহে, কিছু কিছু সত্য আছে। কিন্তু যখনই বেশ ধীরভাবে, ঠাণ্ডা মাথায়, যুক্তির সঙ্গে সৃষ্টির গল্পটা, সৃষ্টিকর্তার দারুণ ক্রোধের কাহিনীটা, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাঁহার ক্রোধের হাত হইতে, নিষ্কৃতি পাইবার কথাটা আলোচনা করিতাম, তখনই মনে হইত এ সব ব্যাপার ঘোর যুক্তি-বিরুদ্ধ, অদ্ভুত ধর্মভাববিবর্জ্জিত ও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। ঐ অসার ধর্মমত আলোচনা করিয়া কিছুমাত্র আনন্দ পাইতাম না। ঐরূপ আলোচনায় আমার মত অনেকেই বিরক্ত হইয়াছেন।

প্রকৃত জ্ঞান কিরূপ করিয়া পাইলাম

ঠিক এই সময়ে—দৈবাৎ ("দৈব" বলিয়া আমরা কিছু মানি না, কথার মাত্রাস্বরূপ বলিতেছি) এক দিন মিঃ সিনেট্ প্রণীত "সূক্ষ্ম-জগৎ" নামক একখানি পুস্তক আমার চোখে পড়িল। পড়িয়া দেখি, উহাতে অতি চমৎকার দার্শনিক তত্ত্ব। বইখানি আমার খুবই ভাল লাগিল। এই পুস্তকে যে কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না, তাহার বিশদ ব্যাখ্যা গ্রন্থকারের অন্য একখানি গ্রন্থে দেখিলাম। সেখানির নাম—"বৌদ্ধধর্মের নিগূঢ় তথ্য।" এই পুস্তকে দেখিলাম, আমি এ পর্য্যন্ত কোন কোন বিষয়ে ভ্রান্ত মত শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি। এ পর্যন্ত আমার দুইটি ভুল মত জানা ছিল। একটি জড়বাদ—অপরটি—গোঁড়ামিপূর্ণ প্রচলিত মত। জড়বাদ বলে—সবই আপনা আপনি ঘটিতেছে, সবই অন্ধ ভাগ্যের ফল। গোঁড়ামিপূর্ণ প্রচলিত মতে বলে—মানুষের সুখ-দুঃখ, সভ্য হওয়া বা অসভ্য হইয়া থাকা, সম্মান-অসম্মান, সবই ভগবানের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে।

ঐ দুইটি মতই আমার কাছে বিশ্রী লাগিত। কারণ, উহার একটিও যুক্তিযুক্ত নহে। যুক্তির লেশও উহার ভিতরে দেখা যায় না। এমন অনেক ঘটনা ঘটে, ঐমত দ্বারা তাহার কিছুমাত্র মীমাংসা করা যায় না। ভগবানের মর্জ্জিতে সব হয়, এ মতের বিরুদ্ধে বিস্তর আপত্তি আছে। আমি উহা বলিতে চাই না। কেন না, কর্ণেল ইংগারসন্ ও অন্যান্য অনেকে ঐ মতটি সম্পূর্ণভাবে উড়াইয়া দিয়াছেন। আমার কাছে "জড়বাদ" মতটিও অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইত। কেন না, উহার সাহায্যে আমি অনেক ঘটনার মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতাম না। কিন্তু সিনেটের পুস্তকে যে মত দেখিলাম, সে অতি সুন্দর। তাহার সাহায্যে অনেক জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হয়। যাহা পূর্বোক্ত দুইটি মতে ব্যাখ্যা কবিতে অপারগ, তাহার সুন্দব ব্যাখ্যা ইঁহার সাহায্যে হইতে পারে। আমরা দেখি, জগতে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ নির্ধন। এইরূপ বৈষম্যের কারণ কি, তাহার অতি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ইহার নিকটে পাওয়া যায়। এই পুস্তক পাঠে আরও জানিলাম, মানুষের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান অতি সুন্দরভাবে ক্রমোন্নতির শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত আছে। আর সেই ক্রমোন্নতি-বিধির বিচক্ষণতা দেখিলে অতি সহজেই ভগবৎসত্তার অনুভব হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, ঐ পুস্তকখানির সকল কথাই বিজ্ঞানসম্মত। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও প্রেমময়, এ কথার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ঐ পুস্তকে আমি প্রথম পাইলাম।

এ মতটি স্বভাবতঃই আমার ভাল লাগিল। পূর্বের দুইটি মত আর এই একটি, এই তিনটির মধ্যে এইটিই সর্বোৎকৃষ্ট। আমি এই মতটির বিষয় আরও জানিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, আমি মিঃ সিনেটের কাছে গিয়া উঠিলাম। তিনি খুব ভদ্র, সকলকেই সম্মান প্রদর্শন করিতেন। আমি গেলেও যথেষ্ট আদর করিলেন। তাঁহারই্ চেষ্টায় আমি থিওসফিক্যাল সম্প্রদায়ের সদস্য হইলাম। "থিওসফি"-সংক্রান্ত পুস্তক সে সময় খুব বেশী ছিল না। এখন ঐ সম্বন্ধে বিস্তর পুস্তক ও রাশি রাশি বিশদ ব্যাখ্যা হইয়াছে, এখন উহার সাহায্যে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তখন এ সব পুস্তকাদি কিছুই ছিল না। সিনেটের ঐ দুইখানা পুস্তক ব্যতীত আর দুইখানি মাত্র ছিল। একখানির নাম—"আইসিস্ আন্ভেল্ড", অপরখানি "প্রশস্ত পথ।"

সিনেটকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—ভারতের কোন্ কোন্ সিদ্ধ পুরুষের কাছে এই তথ্য ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কি জ্ঞাত হইয়াছিলেন। তিনিই ইহা পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করেন। তখন আমরা দেখিলাম—ভারতের জ্ঞান আমাদের দেশের জ্ঞান অপেক্ষা খুব বেশী উন্নত—আমাদের

গোঁড়ামিপূর্ণ ধর্মমত অপেক্ষা খুব বেশী শ্রেষ্ঠ। তবে পুরাকালের মহাত্মারা খৃস্টধর্ম সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা ভারতীয় মত উন্নত নহে। কিন্তু সাধারণ লোকই অজ্ঞান। তাই তাহারা ঐ মহাত্মাদিগের মত গ্রহণ করে নাই, উহা উপেক্ষাই করিয়াছে। তখন হইতেই খৃস্টান ধর্মের অধোগতি ; এখন আর উহাতে বুঝিবার শিখিবার কিছুই নাই। প্রত্যেক ধর্মেরই দুইটি করিয়া দিবার জিনিস থাকা চাই। দরিদ্র ও মূর্খব্যক্তি বুঝিতে পারে, এমন ভাবের কথাও থাকিবে, আবার শিক্ষিত উচ্চ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি শুনিয়া তৃপ্তি পাইবে, এমন উপদেশও থাকিবে। এ দুইটিরই প্রয়োজন। অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় যে, প্রত্যেক ধর্মেরই এই দুইটি করিয়া সম্পৎ আছে। দুই শ্রেণীর লোকই পরিতৃপ্ত হয়। এক প্রকার সহজ নৈতিক শিক্ষা—তাহা স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিবাও বুঝিতে পারে। আবাব আত্মা, পরলোক প্রকৃতি লইয়া গভীর আধ্যাত্মিক উপদেশ আছে—তাহা মনীষীগণের তৃপ্তিসাধন করে। খৃষ্টান ধর্মের এ দুইটি দিক্ই ছিল। অন্য কোন ধর্ম অপেক্ষা ইহা হীন ছিল না। প্রথম ইহা বেশ ভালই ছিল। কোন সময়ে ইহাতেও মনীষিগণ তৃপ্তি পাইতেন। কিন্তু মানুষের অবনতির দিনে উহার সেই আধ্যাত্মিক উপদেশ লোকে প্রায়ই ভুলিয়া গিয়াছে। "খৃস্টানধর্মমত" নামক পুস্তকে আমি খৃস্টান্ ধর্মের আধ্যাত্মিক গভীর উপদেশগুলির আলোচনা করিয়াছি। অ্যানি বেশান্তও "খৃস্টান ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব" নামক একখানি উপাদেয় পুস্তক প্রণয়ন করিয়া খুই দক্ষতার সঙ্গে গভীর বিষয়ের আলোচনা করিযাছেন।

উন্নতির সম্ভাবনা

ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কির কাছে আমরা শুনিয়াছি যে, এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা প্রকৃতির মহান্ সত্যগুলি জানেন ; আর অপরকে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে তাঁহারই উপযোগী। তাঁহারা যে সত্যগুলি প্রচার করিতে বলেন, তাহা কিছুমাত্র নূতন নহে ; পরন্তু খুবই পুরাতন। এত পুরাতন যে, সৃষ্টির আদি হইতে আছে বলিলেও চলে। উঁহাদের কাছে আমাদের শিখিবার অনেক আছে। ঐ সকল জ্ঞান-গুরু সময় সময় শিষ্য করিয়া থাকেন। মানুষের মধ্যে যাঁহারা সেবা-ধর্মে নিরত, যাঁহারা প্রাণপণে নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার-ধর্মে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারাই উহাদের শিষ্য হইবার আশা করিতে পারেন। পরোপকারী ব্যক্তিদের উপরেই তাঁহাদের কৃপা-কটাক্ষ আসিয়া পড়ে। আমরা চেষ্টা করিলেই যে উহাদের করুণা লাভ করিতে পারিব, তাহার কোন নিশ্চিয়তা নাই ; কেন না, কৃপা করা না করা তাঁহাদেরই হাতে। কিন্তু তাঁহারা অপরকে শিষ্য করিয়াছেন, এমনটি দেখা গিয়াছে। তাই মনে হয়,. শিষ্য হইবার আশা করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। তবে ঐরূপ আশা করিতে হইলে কষ্ট স্বীকার করিয়া, সাধনা করিয়া, চরিত্রে উপযুক্ত গুণ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আমি এক জন্য সাধারণ শ্রেণীর লোক ; এ জন্য যে আমি জ্ঞান-গুরুর শিষ্য হইবার সৌভাগ্য পাইব, সে আশা আমার নাই, সে আশা আমার পক্ষে দুরাশা। ভাবিলাম, শিষ্য হইতে না পারিলেও পড়িয়া শুনিয়া জ্ঞানলাভ অবশ্যই করিতে পারিব, আর ব্লাভাট্স্কি-প্রচারিত মহান্ সত্যগুলির অনুশীলনের নিমিত্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেও পারিব। প্রবৃত্ত হইব ; কেন না, এরূপ মহান্ সত্য আর কোন মতে দেখি নাই। এইরূপ স্থির করিয়া, আমি ধর্মযাজকের চাকরী ছাড়িয়া দিলাম। ছাড়িয়া দিয়া, ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কির সঙ্গে ভারতে গেলাম। থিওসফি সমিতির প্রধান কার্যস্থলই ভারতে। ভাবিলাম, সেখানে কাজকর্ম করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিব।

কাজ করিব, মাত্র এই আশাই প্রাণে ছিল ; আরও কিছু সৌভাগ্য আমার হইবে, তখন তাহা আমি ভাবি নাই।

ভারতে যাইয়া আমি কয়েক জন্য সিদ্ধপুরুষের সাক্ষাৎ পাই। তাঁহাদেব নিকট হইতে আব তাঁহাদের শিষ্যবর্গের কাছ হইতে আমি বিস্তব জ্ঞান লাভ করিলাম। সে সকল জ্ঞানেব কিছুই পূর্বে অবগত ছিলাম না। আমি তখন "থিওসফি" ব্যাপারটা আরও পবিষ্কার করিয়া বুঝিতে পারিলাম। কেমন করিয়া সূক্ষ্ম-জগতের জ্ঞান লাভ করা যায়, সে বিষয়েব ইঙ্গিতও পাইলাম। এরূপ সৌভাগ্যের আশাও আমি কখন করি নাই ; কারণ, আমাব জানা ছিল যে, বিশেষ শক্তি লইয়া না জন্মিলে ঐরূপ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ কবা যায় না। কিন্তু পবে শুনিলাম যে, অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি সকলের মধ্যেই নিহিত আছে, ঐ শক্তিব উন্মেষ করিযা তুলিতে পারিলে সকলেই ঐ জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। আমি মহাত্মাদেব উপদেশমত সাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। পরে দেখিলাম, যাহা শুনিয়াছিলাম, তা সত্য। দেখিলাম, সাধনা দ্বাবা ভুবর্লোক ও স্বর্লোক দেখিবার শক্তি লাভ করা অসম্ভব নহে। ঐরূপ দিব্যদৃষ্টি ফুটিযা গেলে থিওসফিব সমস্ত উপদেশই খাঁটি সত্য বলিয়া জানিতে পাবিলাম।

আমি যেমন সাধনা দ্বাবা জ্ঞাত হইলাম যে, ভুবর্লোক স্বর্লোক প্রভৃতি ব্যাপারগুলি সত্য, সেইরূপ যাঁহারা সাধনা কবিবেন, তাঁহাবাই আমাব মত জানিতে পাবিবেন। তখন তাঁহাবাও মরণেব পব মানুষের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায, তাহা জানিতে পারিবেন। যাহাদিগকে আমবা মৃত ভাবিতেছি, তাহাদিগকে তাঁহাবা দেখিতে পাইবেন, তাহাদেব সঙ্গে গল্প-সল্প কবিতে সমর্থও হইবেন। তখন উন্নত হইযা তাঁহাদেব কাছে যাইবাবই ইচ্ছা হইবে, তাহাতেই বেশী আনন্দ হইবে , তাহাদিগকে স্থূলীভূত করিযা বৈঠকে আনিয়া দেখিয়া লইব, তখন আব এ প্রবৃত্তি আসিবে না। তখন তাঁহারা জন্মান্তর-বাদের গভীব সত্যও জানিতে পাবেন ; কেন না, তখন নিজেদেরই পূর্ব পূর্ব জন্মের দৃশ্য স্মৃতিপথে ফুটিয়া উঠে। পুস্তকেব মধ্যে যেমন পাতাব উপব পাতা সাজান থাকে, সেইরূপ মানুষের বহু জন্ম পর পর বিন্যস্ত আছে। দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যাওযায তাঁহারা অলঙ্ঘ্য ক্রমোন্নতি-বিধির সত্যতা নিঃসংশযিতরূপে জানিতে পারেন , আর কোন স্থলেই ভগবানের অবিচাব নাই, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। আমি নিজে অতগুলি ব্যাপার সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, যিনিই আমার মত একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া এই পথে আসেন, তিনিই ঐ সকল মহান্‌, সত্য অবগত হইতে পারেন। অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়া ঐ সব ব্যাপাব বুঝিতে পাবা সহজ, আমি এমন কথা বলিতেছি না। খুব শীঘ্রই ঐরূপ সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহাও বলিতেছি না। আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিতেছি যে, অনেকেই ঐরূপ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ঐ সিদ্ধিলাভের শক্তি সকলের অন্তঃকরণেই নিহিত আছে, আব ইচ্ছা করিলে সকলেই সফলমনোবথ হইতে পারেন। কিরূপ ভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহা আমি পরে বুঝাইয়া বলিব।

পরলোকের ব্যাপার ভ্রান্তি নহে

আমি পরলোকের অমুক অমুক কথা জানি বলিলে হয় তো অনেকে মনে করিবে, আমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাই ভ্রান্তি হইতেছে। অনেকেই ভাবে, যে এই সব গাঁজাখুরি কথা লেখে, সে-ও পাগল, যাহারা পড়ে, তাহারাও পাগল। অনেকে আমাদিগকে একদল বিকৃতমস্তিষ্ক

পাগল বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আমার বাঁচিয়া থাকাটা যদি মিথ্যা না হয়, আমি লিখিতেছি, আর অপরে পড়িতেছে, ইহাও যদি মিথ্যা না হয়, তবে আমি যে কথাগুলিকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছি, তাহা নিশ্চয়ই সত্য। পরলোকের ব্যাপারগুলি আমার অনুমান নহে, স্বচক্ষে দেখা। সে দেখাও একবার দেখা নহে, শত সহস্রবার দেখিয়াছি। শত সহস্রবারই বা কেন, আমি উহা প্রত্যহই দেখিয়া থাকি, আমার কাছে উহা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। একটা শহরের রাস্তাগুলি যেমন আমাদের কাছে পরিচিত, ভুবর্লোক প্রভৃতি সূক্ষ্ম জগৎগুলিও আমাদের নিকটে তেমনই খুবই চেনা। শহরে বাসা করিয়া সেই শহরের অস্তিত্বে সন্দেহ করা যেমন বাতুলের কার্য্য, ভুবর্লোক প্রভৃতির অস্তিত্বে সন্দেহ করাও সেইরূপ পাগলামি। থিওসফি যদি ভ্রান্তিই হয়, তবুও ইহা মহীয়ান্ ; কেন না, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, পিথাগোরস্ প্রভৃতির মত প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মারা এই মতের সেবক, এই পথের পথিক। থিওসফিকে ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা নিতান্ত গর্হিত। আমি যতদূর জানি, ইহা সত্য। ইহার আলোচনায় আমি খুবই পরিতৃপ্ত। অবশ্য এ কথা স্বীকার করি যে, আমি সত্য বলিতেছি বলিয়াই যে ইহা সত্য হইবে তা হইতে পারে না। আমার কথাই যে প্রমাণ, তাহারও কোন অর্থ নাই। তবে যাঁহারা প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন বা করিবেন, তাঁহারা অন্যান্য প্রমাণের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত দর্শনাদিকে প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইতে পারেন।

অনেক থিওসফি আলোচনা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক অথচ ভারতে যাওয়াও তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। আবার ভারতে গেলেই যে থিওসফির জ্ঞানে মণ্ডিত হওয়া যায়, তাহাও নহে। আমি ভারতে থাকিয়া যতটুকু জানিয়াছি, অনেকে হয় তো সারাটা জীবন সেখানে কাটাইলেও সে জ্ঞানটুকু লাভ করিবার সুযোগ পান না। তাই তাঁহারা বলেন—"যাঁহারা স্বচক্ষুতে সাধনার বলে সূক্ষ্ম-জগৎ প্রভৃতি দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহা ছাড়া আর কি প্রমাণ আছে? আমার বিশ্বাস, চোখে দেখিবার মত অমন সুন্দর সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকিলেও প্রমাণ বিস্তরই আছে। আমরা বিজ্ঞানের তথ্যগুলি যেমন যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, স্বীকার করিবার সময় কোনরূপ প্রশ্ন করি না—কোনরূপ অবিশ্বাস করি না, সেইরূপ প্রণালীতে পরলোকের তথ্যও মানিয়া লইতে পারা যায়। যাঁহারা থিওসফির প্রমাণ চান, তাঁহারা যেন মিঃ ফুলারটন্ প্রণীত "থিওসফির প্রমাণ" নামক অতীব বিখ্যাত পুস্তকখানি মনোযোগের সঙ্গে পড়েন। পড়িলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, গ্রন্থকারের তর্কগুলির উত্তর দেওয়া যায় না। তিনি বলেন, বিষয় যেমন যেমন হইবে, তাহার প্রমাণও বিষয়ের প্রকৃতির সঙ্গে সুসঙ্গত হইবে ; অতএব যাঁহারা উন্নত ও সিদ্ধ, কেবল তাঁহারাই থিওসফির নিগূঢ় প্রমাণগুলি প্রাপ্ত হইবেন, অপরে নহে। নিগূঢ় প্রমাণ সকলে না পাইলেও বিশ্বাসজনক প্রমাণের অভাব নাই। আমরা এখনই সেইরূপ প্রমাণের কথা বলিতেছি।

প্রাচীন ধর্ম্মমতের প্রমাণ

অনেক বলেন—"আমরা সুসঙ্গতি-বিধি মানি না, দার্শনিক মত বা বিষয়ের মীমাংসার জন্য আমরা গণিত প্রভৃতির প্রমাণ চাই, বা এমন প্রমাণ চাই, যাহা আমরা হাতে-কলমে বুঝিয়া লইতে পারি।" এরূপ ব্যক্তিগণকে আমারা জিজ্ঞাসা করি যে, ইঁহারা কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন মত মানিয়া আসিতেছেন? প্রচলিত ধর্ম্মের যদি প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে ইঁহারা কোন

প্রমাণ দিতে পারেন কি? প্রমাণ কোথায়? একটি প্রমাণও নাই। প্রমাণ আছে—এ কথাটি পর্য্যন্ত কেহ বলে না ; বরং বলে যে, প্রমাণ চাওয়া মহা পাপ, যাহারা শয়তান, তাহারাই প্রমাণ দেখিতে চায়।

যুক্তিকে পদ-দলিত করিয়া মানুষগুলিকে নিজের সিদ্ধান্ত বলপূর্বক স্বীকার করাই প্রাচীন ধর্মের চিরন্তন ধারা। উহা অন্য ধর্মের সত্য মতও মানিবে না, নিজের ভ্রান্ত মতকেই সত্য বলিয়া ঘোষণা করে। উহারা না কি ভুলভ্রান্তি হইতে পারে না, উহাই না কি সব-জান্তা, দুনিয়ার আর কাহারও না কি জানিবার শুনিবার অধিকার নাই? যাহারা প্রাচীন ধর্মে বিশ্বাসী, আমি সেরূপ কোন লোকের প্রাণে বেদনা দিতে ইচ্ছা করি না ; কিন্তু আমি খাঁটি সত্য কথাই বলিতেছি। খৃষ্টান ধর্মের আলোচনা করিয়া অনেকেই আমার এ কথার সত্যতা বুঝিয়াছেন। খৃস্টান ধর্ম যে কেতাবখানির উপর দণ্ডায়মান, তাহার কথাগুলির মধ্যে সুসঙ্গতি নাই। মনীষীমাত্রেই ঐ পুস্তকখানি ভ্রমপূর্ণ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। যাঁহারা জগতে ঐ পুস্তকের শিক্ষা ঘোষণা করেন, তাঁহারা না কি বলিয়াছেন—"উহা অসম্ভব বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি।" ঐ উক্তিই না কি তাঁহাদের "মূল সূত্র।" ঐ পুস্তকে বিস্তর কথা আছে, যাহার কখনও মীমাংসা হইবে না। মীমাংসা হইলেও তাহাতে মানুষের কখনও উপকার হইবে না।

যে সকল বিষয় আমাদের পক্ষে অর্থাৎ মানবের কাছে খুবই প্রয়োজন, তাহার অনুকূলে বিন্দুবিসর্গ প্রমাণও ঐ পুস্তকে পাওয়া যায় না। ধর্মযাজকদের মধ্যে এক জনকেও বলিতে শুনা যায় না যে তিনি নিজে স্বর্গে বা নরকে গিয়া অমুক অমুক স্থান বা অমুক অমুক ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছেন ; নিজে দেখিয়া আসিয়া ঘোষণা করিতেছেন ; এমন কথাটি কেহই বলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলে,—"আমাদের ধর্ম এই এই কথা বলে।" কিংবা "বাইবেলে এইরূপ লেখা আছে।" শুধু বাইবেলের কথা প্রমাণ হইতে পারে না, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। বাইবেল্ "চিরমুক্তির" কথা বলে কিন্তু প্রমাণ কোথায়? প্রমাণ ব্যতীত অত বড় একটা গুরুতর বিষয় কি করিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়? আমাদের থিওসফিস্ট দল কদাচ ওরূপ ঘোষণা করেন্ না। যাহা আমরা নিজে না দেখি যাহার বিশেষ, প্রমাণ না পাই, তাহা প্রচার করিতে যাই না।

প্রচলিত ধর্ম প্রমাণ তো দিতেই পারে না, কিন্তু দৈনন্দিন ঘটনার কারণই কি নির্ণয় করিতে পারে? জীবনের গুরুতর সমস্যার স্থলে প্রশ্ন করিলে উহা বেশ সুস্পষ্ট যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাই কি করিতে পারে? পারা দূরে থাকুক, উহারা সেরূপ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টাও করে না। ওরূপ স্থলে উহারা ঐ একই কথা বলে যে,—"ইহা ভগবানের ইচ্ছা, মানুষকে ইহা ভোগ করিতেই হইবে কারণ অনুসন্ধান করা নিষ্প্রয়োজন।" জীবনের সমস্যাস্থলে যদি আমরা ইহা ব্যতীত আর কিছু জানিতে বা শুনিতে না পাই, তবে আমাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় বলিতে হইবে। জড়বাদমতে আমরা আদৌ তৃপ্তি পাই না ; কেন না, উহাতে কোন ব্যাখ্যা নাই। কিন্তু উহাতে একটা দৈববিধির কথা আছে। সবই দৈবাৎ হইতেছে, আপনা আপনি হইতেছে, এরূপ কথা আছে। অন্ততঃ উহাতে এটুকু আছে যে, সকলকেই সদ্‌ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহাতে ভবিষ্যতে ভাল হোক না হোক, এ জন্মেও উপকার। জড়বাদের এ ভাবটা মহৎ ও নিঃস্বার্থ।

থিওসফি কাহাকেও কোন কিছু অন্ধের মত বিশ্বাস করিতে বলে না। উহা এমন কথা বলে, যাহা খুবই যুক্তি যুক্ত। তাহা ছাড়া, আমাদের চারিদিকে যে সকল রহস্য জড়িত ঘটনা ঘটে, তাহারও সুমীমাংসা করিয়া দেয়। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া যে সকল উপদেশ চলিয়া আসিতেছে,

থিওসফি তাহার ভিতর হইতে সত্য অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, যে সকল ঘটনার বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপরেও থিওসফির বেশী আস্থা। জড়বাদ, প্রচলিত ধর্ম আর থিওসফি—এই তিনটিব মধ্যে তবে কোন্‌টি গ্রহণ-যোগ্য? সুস্পষ্ট উত্তর এই যে, যেটি খুব যুক্তি-যুক্ত, সেইটিই গ্রহণ করিতে হইবে, গ্রহণ করিয়া উহা সত্য কি না, অহরহঃ পরীক্ষা কবিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ করিলে প্রতেকেই থিওসফির সত্য জ্ঞাত হইয়া বিস্মিত হইয়া পড়িবে।

অলৌকিক ঘটনা

এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যাহা সাধারণের কাছে মহা রহস্য বলিয়া মনে হয়। অন্যানা ধর্মমত ঐ ঘটনা হয় উপেক্ষা করে, নয় অস্বীকার করিয়া বসে। থিওসফি এইরূপ ঘটনা হইতে অদ্ভুত সত্য বাহির করিয়া দেয়। এইরূপ স্থলে থিওসফি অতি সুন্দর যুক্তির অবতারণা করিয়া প্রকৃত তথ্য বুঝাইয়া থাকে। ভূতের বৈঠকের ব্যাপারগুলি, স্থূল দেহের বাহিরে আসিয়া লিঙ্গদেহের কার্য্য কবা, ভূত-প্রেতের কাণ্ড-কারখানা, কাহাকেও তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া তাহার মুখে নানারূপ কথা বাহির করা, কাহাকেও স্মরণ বিদ্যাবলে কিছু জানাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি ব্যাপার খুবই অদ্ভুত। জড-বাদ এ সব স্থলে উহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইতে চাহে। উড়াইতে যাওয়া নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার কার্য্য। হয় তো কেহ ভাবিতে পাবে—'উহার কাবণ অনুসন্ধান করিতে যাওয়া নিরর্থক, কেবল সময নষ্ট।' যে অতটুকু সময নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহে, সে অন্যের পবীক্ষিত মীমাংসাকে ভূল বলিবার অধিকার লইতে আসে কেন? অন্যকে প্রতারক প্রভৃতি বলিবার তাহার অধিকাব কি? অন্য সম্বন্ধে সে সমালোচনা করিতে আসে কেন? সেরূপ ব্যক্তির ব্যবহার দেখিয়া আমাদের উট পাখীর কথা মনে আসে। উট পাখী যখন দেখে যে, তাহার নিকটে মহা বিপদ, তখন সে বালির মধ্যে চোখ-মুখ ঢুকাইয়া দিয়া পড়িয়া থাকে। নিজে কিছু দেখিতে পায় না বলিয়া মনে করে, জগতে কেহই তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। উট পাখীর উপমাটা আমরা ইহার পূর্বে আর একবার মিঃ ষ্টেড্ সাহেবের "প্রকৃতভূতের গল্প" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। যাঁহারা সৎ ও অনুসন্ধিৎসু, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, ঐরূপ অদ্ভুত ঘটনা মিথ্যা নহে, উহা সত্য সত্যই দেখা যায়; তবে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন কারণ নির্ণয় করেন মাত্র।

খৃস্টানধর্ম ঐ সকল অদ্ভুত ঘটনার স্থলে কোন কারণ নির্দেশ করিয়া উঠিতে পারে না। ঐরূপ ক্ষেত্রে উহা কখন কখন মিথ্যা বলিয়া উড়াইতে চাহে, আবার কখন কখন শয়তানের কার্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে বসে। খৃস্টধর্মের কাছে যাহাই দুর্বোধ্য, তাহাই তাহার মতে শয়তানের কার্য্য। বহুকাল হইতে যেখানে খৃষ্টধর্ম প্রচলিত আছে, সেখানকার অতি চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিও শয়তানের কাণ্ড বলিয়া কীর্তিত হইয়া আসিতেছে। "হ্যাম্প-সায়ার" নামক স্থানে একটা ঠিক গোলাকার হ্রদ আছে; হ্রদটা কত কালের, তাহা কেহ বলিতে পারে না। লোকের ধারণা, ওটা শয়তানের "সরবত-পাত্র"; ইয়র্কসায়ার নামক স্থানে একটি জায়গায় কযেকটা শৈল-শিখর ক্রমসূক্ষ্ম মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। লোকের ধারণা—উহা "শয়তানের বাণ।" একপ্রকার গুল্মের ছিন্নান্ত শিকড়গুলিকে কৃষকেরা "শয়তানের বেধন যন্ত্র" বলিয়া থাকে। এইরূপ বিস্তর প্রবাদ আছে। মধ্যযুগের লোকেরা খুবই অজ্ঞ ছিল। তাহাদের মত অজ্ঞান এখনও আমাদের মধ্যে অনেক আছে। এখন এই জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত বিংশ শতাব্দীতেও লোকে

"শয়তান" "শয়তান" করিয়া কাকাতুয়া বুলি বলিতে থাকে, এইটুকুই আশ্চর্য ব্যাপার। যাহারা প্রমাণ প্রমাণ করিয়া চীৎকার করে, তাহারা তাহাদের এই শয়তানের অস্তিত্ব বিষয়ে কি প্রমাণ দিতে পারে? কথায় কথায় শয়তানের দোহাই দেয়, কিন্তু শয়তানের প্রমাণ কোথায়? এ পর্য্যন্ত কে শয়তানকে দেখিয়াছে? কিন্তু প্রমাণ চাহিলে প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে কাহারও বনি-বনাও হইবে না।

আমরা দেখিয়াছি বলিয়া যে সকল প্রমাণ উপস্থাপিত করি, তাহার একটিও অবৈজ্ঞানিক নহে। পরলোকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যে সকল তথ্য সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহার পরীক্ষা আমরা নিজেরা করি না, বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞেরাই তাহার পরীক্ষা করিয়া সেগুলিকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। একই ব্যক্তি নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হইতে পারে না, কারণ, মানুষের জীবন তত দীর্ঘ নহে, বহুকাল সাধনা না করিলে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায় না। তাই, আমরা বহু বিশেষজ্ঞের মতের উপর নির্ভর করিয়াছি। আমরা পরীক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেও বিশেষজ্ঞগণের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে পারি ; কেন না, উহা ক্রমোন্নতি-বিধির সহিত সুন্দরভাবে সুসমঞ্জস, আর আমাদের পরীক্ষিত ব্যাপারেরও প্রতিকূল নহে। থিওসফি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা বলিলাম।

একটা দার্শনিক মত

থিওসফির মতগুলি যে সত্য, তাহার অন্য প্রমাণ কি আছে? বিস্তব প্রমাণ আছে। থিওসফির মত আমরা দুই দিক্ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি। বাস্তবিকপক্ষে কিরূপ ঘটে না ঘটে, সে দিক্ দিয়া আলোচনা না করিযা দার্শনিক তত্ত্বের দিকটা আলোচনা করা যাক। অন্যান্য দর্শনের মত ইহার আলোচনা হইবে। তাহা হইলে, ইহার কাছে আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাহিতে পারি না। পাটীগণিতের অঙ্কের মত দর্শন শাস্ত্রটাকে একখানি শ্লেটের উপর অতি সহজেই বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। দর্শন বুঝিতে হইলে, উহার ভিতরে যে সঙ্গতি আছে, সেটুকু চিন্তা করিতে হইবে; তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঘটনার যুক্তি-যুক্ত ব্যাখ্যা আসিয়া পড়িবে। এইরূপ পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিলে, নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, থিওসফি ধর্মমতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে।

থিওসফির মধ্যে আমবা ক্রমোন্নতি-বিধিব অতি সুন্দর পরিচয় নাই। এই বিধি মঙ্গল মূলাধার শ্রীভগবানের অলঙ্ঘ্য বিধি। ইহার অতিক্রম করিতে পারে, এমন সাধ্য কাহারও নাই। থিয়সফি ওকি বলে, একবার ভাবিয়া দেখ। উহা বলে—"যাহাকে আমরা মানব জীবন বলি, উহা এক দিন আরও মহীয়ান্ হইয়া উঠিবে ; সেই মহীয়ান্ জীবনটা আবার আর একটা পূর্ণায়ত জীবনের সঙ্গে সুসম্বদ্ধ হইয়া অনুক্ষণই উন্নতির দিকে ঊর্ধদিকে ধাবিত হইবে।" এই কথা—এই মত নিশ্চয়ই "অন্ধ দৈব-বিধির" মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "দৈব-বিধির" মতানুসারে আমরা কেবলই ঘূর্ণিত হইতেছি, তাহাতে সুফল কিছুই নাই, কেবল যন্ত্রণা। "মুক্তির' কল্পনাত্মক মতও ওরূপ সুন্দর নহে ; উহাতে বলে, দশ ভাগের নয় ভাগ লোক অবাক্শিরাঃ হইয়া দারুণ নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া থিওসফি বুঝিয়া লইতে যাঁহারা ভয় করেন, যাঁহারা সে দিক্ দিয়া অনুসন্ধান করিতে চান না, তাঁহারা আমাদের ব্যাপারটা দার্শনিকভাবেই চিন্তা করিয়া দেখুন। আমাদের মতের দার্শনিক ভাগটা আলোচনা করিয়া যদি ভাল লাগে, তবে সমগ্র

মত পরে যেন আলোচনা করেন। মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা কোন একটা বিশেষ ধর্ম প্রচার করিতে বসি নাই। আমরা কাহাকেও কিছু বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করি না, কেবল আলোচনার একটা প্রণালী উপস্থাপিত করিয়া সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলি। আমাদের প্রণালীর যে কোন ভাগের আলোচনা যে কোন ব্যক্তি কবিযা দেখিতে পারেন, ইচ্ছা হইলে যে কোন দিক্ ফেলিয়া বাখিতে পারেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তিই নাই।

আমাদের মনোবিজ্ঞান

আমাদেব মনোবিজ্ঞান অতীব সরল, বাস্তব ঘটনায পূর্ণ , তাই অনেকে গবেষণা না করিয়াই উহা গ্রহণ করিয়া লয়। আমাদের দার্শনিক মতও যেমন সহজ, মনোবিজ্ঞানও সেইরূপ। আমরা যে ব্যাখ্যা প্রদান করি, তাহা অতি সরল। লোকে শুনিবামাত্রই বিশ্বাস করিয়া লয়। আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা নিজেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ইচ্ছুক। তাঁহাদের পক্ষে কিরূপভাবে পরীক্ষা করা কর্তব্য? আমি যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া বিশ্বাস করিযাছিলাম, আমি যেমন যেমনভাবে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাঁহারাও সেইরূপ করিতে পারেন। তাঁহারা বৈঠকে যাইতে পারেন, যাঁহারা সূক্ষ্ম-জগতের ব্যাপার খুব ভাল করিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাদেব সঙ্গে তাঁহাবা দেখা-সাক্ষাৎ করিতে বা পত্র লেখা-লেখি কবিযা জানিযা লইতে পারেন। এতটা সময় নষ্ট করিতে যদি ইচ্ছা না হয়, তবে তাঁহারা ভূত-প্রেতের কাহিনী বিষয়ক বা প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পড়িয়া দেখিতে পারেন। তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট বই আছে। পড়িয়া শুনিযা অনেকটা জ্ঞান হইবে। অবশ্য সেটা পরোক্ষ জ্ঞান। আমবা অন্যান্য দিকে বিজ্ঞানেব অন্যান্য শাখায় পরোক্ষজ্ঞানেই সন্তুষ্ট থাকি। যখন আমরা ভূগোল পড়ি, তখন পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেশ পর্বত নদী প্রভৃতি স্বচক্ষে দেখিতে যাই না। অথচ, মাত্র পড়িযাই জ্ঞানলাভ করি, আর তাহাতে আনন্দও পাই। আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই অন্যের লেখা পডিয়া বিশ্বাস করিয়া লইতে প্রস্তুত।

আমবা অপবের কথা খুব বিশ্বাস কবিয়া লইযা থাকি। অপবেব মুখে শুনিয়াই জানি বলিয়া মনে করিযা লই। প্রকৃত প্রস্তাবে হয় তো সেটা আদৌ জানি না। একটা উদাহবণ দেখ। আমবা সকলেই বলি—পৃথিবী ঘুরিতেছে। আমরা বলিয়া থাকি, "আমরা জানি, পৃথিবী ঘুরিতেছে।" কিন্তু বস্তুতঃ পৃথিবীর ঘূর্ণন আমরা কেহই অনুভব করিতে পারি না। সত্য বলিতে গেলে বলিতে হয়, ও ব্যাপারটা আমবা জানি না। আমবা এই যে পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া আছি, বা এই যে বসিয়া আছি, কৈ, পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিযা বোধ হইতেছে কি? বোধ হইতেছে, পৃথিবীটা স্থির রহিয়াছে। পৃথিবীটাকে আমাদের এতই নিশ্চল বলিযা বোধ হয় যে, কোন কিছুকে স্থায়ী বলিযা পরিচয় দিতে গেলে আমরা "পৃথিবীর মত নিশ্চল" বলিয়া উপমা দিই। আমাদেব মনে হইতেছে, যেন সূর্য্য ও নক্ষত্রনিকর আমাদের চারিদিকে ঘুরিতেছে। কার্য্যতঃ আমরা উহাদেব ঘূর্ণনই দেখিতে পাই। পৃথিবীর ঘূর্ণনটা আমরা বুঝিতেই পারি না। তবে পৃথিবী ঘুরিতেছে, এই কথাটি আমরা বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি মাত্র। পৃথিবীর ঘূর্ণন কোন কোন যন্ত্র দ্বারা বুঝা যায়। যদি ঐ যন্ত্রের সাহায্যে বুঝিবাব সুযোগ হয়, তখন বলিতে পারি যে, পৃথিবীর ঘূর্ণন জানি। আর যত দিন যন্ত্রে সাহায্যে বুঝা না হয়, তত দিন "জানি" অর্থে বিশ্বাস করি, বুঝিতে হইবে। "ফোকল্ট পরিদোলক" ও "জাইবোস্কোপ" নামক যন্ত্রেব সাহায্যে পৃথিবীর আবর্তনের প্রকার

দেখা যায়। এই দুই যন্ত্রের সাহায্যে যে পৃথিবীর আবর্তন দেখিয়াছে, কেবল সেই বলিতে পারে যে, "আমি জানি, পৃথিবী ঘুরিতেছে।" ঐ যন্ত্র ব্যতীত কিছুতেই প্রমাণ করা যায় না যে, পৃথিবী ঘুরিতেছে। ঐরূপ প্রমাণ না পাইলেও সকলেই পৃথিবী ঘুরিতেছে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া রাখিয়াছে।

ঐরূপ অনেক ব্যাপার বস্তুতঃ আমরা জানি না, দেখি নাই অথচ জানি বলিয়া পরিচয় দিই। আমাদের সে জানাটা জানা নহে, শুধু বিশ্বাসমাত্র। স্পিটজ বার্জেন্ নামক দ্বীপ আছে, মধ্য-আফ্রিকায় স্ট্যান্‌লে সাহেব বামনবীরের রাজ্য দেখিয়াছিলেন—এই সব ব্যাপার কয় জন দেখিয়াছেন? এ সব যদি সত্য হয়, তবে সূক্ষ্ম জগৎ নিশ্চয়ই সত্য; কেন না, যত লোক ঐ রাজ্য দেখিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা বেশী লোক সূক্ষ্ম জগতের সংবাদ পাইয়াছেন। "ডিউ চেল্লু" নামক এক ব্যক্তি ২৫ বৎসর পূর্বে স্ট্যানলের কাছে যখন বামন বীরের জাতির বর্ণনা করেন, তখন সকলেই গাঁজাখুরী উপন্যাস বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন ; কিন্তু ঐ বর্ণনা মিথ্যা নহে, খাঁটি সত্য। বর্ণনা শুনিয়া সত্য কি মিথ্যা বুঝিয়া লইবার জন্য কেহই তখন আফ্রিকায় যাওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। বামন জাতিকে দেখিবার নিমিত্ত যখন কেহই গেলেন না, তখন সত্যদর্শী "ডিউ চেল্লুর" কথাগুলিকে অবিশ্বাস করিবার তাঁহাদের কি অধিকার ছিল? তাঁহাদের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করা উচিত ছিল, তাহা না করিয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ওঠা কখনই উচিত হয় নাই। নিজের নিজের মতামত নিজের নিজেব পরিবারেব মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই উচিত। অন্যের বেলায় মতামত প্রকাশ করিতে গেলে একটু সাবধান হইয়া করা আবশ্যক। থিওসফি সম্বন্ধেও আমাদের ঐ কথা। যাঁহারা থিওসফির কথাবার্তা শুনিতে ইচ্ছুক নহেন,. তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের কথা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পীড়াপীড়ি করি না। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমরা এ কথাটা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে চাই যে, না বুঝিবা সুঝিযা তাঁহারা যেন আমাদের কথা মিথ্যা বলিয়া মত প্রকাশ না করেন। আর একটি কথা বলিতে চাই এই যে, আমাদের কথায় প্রমাণ চাহিতে আসিয়া যেন অসম্ভব অস্বাভাবিক প্রমাণ চাহিয়া না বসেন।

সূক্ষ্মজগতের অপ্রত্যাশিত প্রমাণ

বহুকাল পূর্বে ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কি যে সকল কথা বলিয়া উপহাসিত হইয়াছিলেন, লোকে যে সকল কথাকে ঘোর অসম্ভব অবৈজ্ঞানিক বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিল, আমরা নিরন্তর সেই সকল ব্যাপারের প্রমাণ পাইয়া থাকি। তাহার পরে সূক্ষ্ম-জগতের গবেষণা করিতে গিয়া আমরা তাঁহারই কথা সত্যতা বুঝিতে পারিয়াছি। একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক। ছয় সাত বৎসর পূর্বে মিঃ সিনেট্ তাঁহার "আত্মার উন্মেষ" নামক গ্রন্থে দুইটি গ্রহের উল্লেখ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রহ না কি নেপচ্যুন গ্রহের কক্ষসীমারও বাহিরে অর্থাৎ অতি দূরে। ঐরূপ দূরে যে ঐ গ্রহ আছে, থিওসফি সম্প্রদায়ের লোক ব্যতীত আর কেহই তাহা বিশ্বাস করি না। তখন সকলেই ঐ কথাটি অসার বলিয়াই মনে করিল। কিন্তু ১৯০২ খৃস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের "টাইমস্" নামক সংবাদপত্রে খবর বাহির হইল যে, অধ্যাপক ফরবেশ্ নেপচ্যুনের অপেক্ষাও দূরে ধূমকেতুর মত কি যেন কিসের সমষ্টি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, সে দুইটি নাকি দুইটি গ্রহ। থিওসফির কথা যে সত্য, এটি তাহার একটা সামান্য প্রমাণমাত্র। সামান্য হইলেও ইহাতে থিওসফির পরিচয় কতকটা পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপ বিস্তর প্রমাণ আছে। আর একটা

ব্যাপার দেখ। এবার শুক্রগ্রহের কথা বলিব। শুক্রগ্রহকেই শুকতারা বলে। যখন আমি স্কুলে পড়িতাম, তখন শুনিয়াছিলাম যে, ঐ গ্রহের দিন রাত্রিটা ঠিক আমাদেরই পৃথিবীর অনুরূপ। কিন্তু পরে জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণায় জানা গেল যে, চন্দ্রের একটা দিক যেমন সর্বক্ষণই পৃথিবীর দিকে ফিরানো থাকে, অর্থাৎ পৃথিবীবাসীরা চাঁদের একটা পিঠই বরাবর দেখিতে পায়, সেইরূপ শুক্রগ্রহেরও না কি একটা পিঠ বরাবর সূর্যের দিকে ফিরান থাকে। তাই যদি হয়, তবে ঐ গ্রহে আমাদের মত জীব কখনই বাস করিতে পারে না। তাহা হইলে আমাদের যে ধারণা ছিল, "উহাতে আমাদের অপেক্ষা উন্নততর জীব আছে", তাহাও বিনষ্ট হইয়া যায়। আবার, স্যার রবার্ট বল প্রমাণ করিয়াছেন যে পূর্বের কথাটাই সত্য, সূর্যের দিকে এক পিঠ ফিরান থাকার কথা মিথ্যা। তাহা হইলে আমাদের কথাই সত্য দাঁড়াইল।

থিওসফির ভাবে অনুপ্রাণিত এক জন বৈজ্ঞানিকের কথা

থিওসফি যে উপদেশ দিয়াছে, যে মত প্রকাশ করিয়াছে, বিজ্ঞানও ধীরে ধীরে নিঃসংশয়িতরূপে সেই দিকেই আসিতেছে। বিজ্ঞানের প্রাণে থিওসফিরই ঝঙ্কার বাজিয়া উঠিয়াছে। [illegible] আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস [illegible] করিয়াছিলেন। তাহা হইতে আমরা কতকগুলি [illegible] পাইব। একটু লক্ষ্য করুন। উঁহার কথা এই — 'লোকের ধারণা [illegible] যদি না থাকে, তবে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। কে বলিল? আমাদের দেখিবার শক্তি যদি [illegible] তবে [illegible] হয় [illegible] আমরা [illegible] কত কি দেখিয়া ফেলিতে পারি। কিছুই অসম্ভব নহে। আমরা এখন যাহা দেখিতেছি [illegible], তো কিছুই নহে; যত দেখিবার [illegible] আছে যে, তাহার সহস্রাংশের একাংশও আমরা দেখিতে পাইতেছি না। আমরা সব [illegible] দেখিতে পাই। তবে যে [illegible] আমাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মে নাই, [illegible] বলিয়া পদার্থ কি থাকা সম্ভবপর [illegible] কেহ ভাবেন, মানুষের অপেক্ষা উন্নত [illegible] থাকিতে পারে, এমন কথা বিজ্ঞান [illegible] স্বীকার করে না। আমি যতটুকু [illegible] তাহাতে এই বুঝিয়াছি, যে, বিজ্ঞান [illegible] স্থানে ওরূপ অস্বীকার করে নাই। [illegible] জানে না, সে বিষয়ে তাহার [illegible] কোন কথা বলা ঠিক নহে। সেরূপ [illegible] কোন প্রকার মতামত দিতে [illegible] কেমন করিয়া পৃথিবীতে আদৌ 'জীবন' জিনিসটির উদ্ভব [illegible], তাহা [illegible] জানে না। বিজ্ঞানের কাছে সেটা ঘোর রহস্য। [illegible] হইবে। [illegible] আছে বলিয়া যে [illegible] নহে। আমার মনে [illegible] ভগবানের কার্যপ্রণালীর [illegible] বিশৃঙ্খলা বলিয়া বোধ [illegible], তাহার ভিতর শৃঙ্খলা আসল [illegible] কোন বুদ্ধিমান [illegible] কি উহার [illegible] শ্রীভগবানের একটা কার্যধারা আছে [illegible] কবি [illegible]। [illegible] এই যে, তিনি [illegible] তাঁহারা [illegible] হইতে পারে। ক্রম বিকাশের [illegible] তাহা আমার মনে হয় না। [illegible] শ্রীভগবানের [illegible] অতীত কালের দিকে লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না [illegible] করিতে হইবে।

ঐ সকল দেবযোনি প্রভৃতি কার্য্যকারকেরাই শ্রীভগবানেব বিরাট সঙ্কল্প কাজে পরিণত করিতেছেন। যাঁহারা এই মহান্ সত্য জ্ঞাত আছেন, তাঁহারাও শ্রীভগবানের সঙ্কল্প সিদ্ধিব পক্ষে সহায়স্বরূপ বলা যাইতে পারে। একযোগ পরস্পরকে সাহায্য করিলে তাঁহারাও ঐশী কাজের অনেকটা সহায় হইয়া উঠিতে পারেন পৃথিবীটা আমাদের শিক্ষাগার। এখানে নানাবিধ দুঃখ দুর্দশা। ইহার মধ্যেও যদি আমরা পরস্পবকে সাহায্য করিতে না শিখি, তবে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?"

পাঠক! লজের কথা শুনিলেন ত? খুব আধুনিক বিজ্ঞান যে থিওসফির সঙ্গে একমত, তাহা আমরা সুন্দররূপে দেখিলাম।

অন্ধবিশ্বাস নহে

অনেক ভাবেন, থিওসফির পথে আসিয়া যাঁহারা দিব্যচক্ষুতে দেখিবাব শক্তিলাভ করিযা উঠিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগকে প্রচলিত ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের মত এখন শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই সময় কাটাইতে হইতেছে। আর এরূপ লোকের সংখ্যাও খুব বেশী। এ কথাটি কতকাংশে সত্য ; কিন্তু ইঁহাদের বিশ্বাস এত স্বতন্ত্র প্রকাব যে, তাতে তুলনাই হইতে পারে না কোন কিছু না দেখিয়াও যদি তাহাকে আমাদের কোন ব্যক্তি সত্য বলিয়া বিশ্বাস কবেন, তবে তাঁহার সে বিশ্বাসটি অন্ধ-বিশ্বাস নহে। সে বিশ্বাসেব মধ্যে যুক্তি আছে। সে বিশ্বাসেব মূল মাত্র ধর্ম পুস্তক নহে। ধর্ম পুস্তকেব দ্বাবাও আমবা আমাদের বিশ্বাস সমর্থন করিতে পাবিত। আমরা যে ধর্ম পুস্তকের বলে বলীয়ান্, তাহা ইহুদী জাতির ধর্ম পুস্তকের মত অর্বাচীন নহে। তাহা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার নাম—বেদ ও উপনিষদ। উহা সেই জাতিব নিকট হইতে কালসহকারে আমরা পাইয়াছি, যে জাতি সভ্যতার অত্যুচ্চ শিখরে অধিরূঢ ছিলেন। যখন ইহুদীরা নগণ্য অসভ্য আবব জাতি বলিয়া পরিচিত, তখনও সেই সভ্য জাতিব মধ্যে ঐ অমূল্য ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত। আগেই বলিয়াছি, শুধু ধর্ম গ্রন্থই আমাদেব বিশ্বাসেব মূল নহে। শুধু বেদ-উপনিষদ্ হইতেই যে আমাদেব বিশ্বাস উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে, পববর্তী মহাত্মাদেব জ্ঞান ও শিক্ষা ও আমাদের বিশ্বাসের মূল। যাঁহারা জ্ঞান ও শক্তিতে সাধারণকে অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহাদিগকে আমাদিগের সম্প্রদায়ের অনেকেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া জানেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই মহাত্মা, তাঁহাদের মত নিশ্চয়ই আদরণীয়।এই সকল ব্যতীত আমাদেব বিশ্বাসেব অন্য কারণও আছে। ইউরোপবাসী অনেক ভ্রাতা আমাদের এই আলোচনায় যোগ দিয়া তত্ত্ব-অন্বেষণ নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহারা যে সকল ব্যাপার আবিষ্কার করিতেছেন, সে সমুদয় আমাদেরই উপদেশের পদে-পদে পৃষ্ঠপোষক।

মহাত্মাদেব গবেষণার ফল খুব মূল্যবান্ সন্দেহ নাই। কিন্তু শুধু উহাই আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের একমাত্র হেতু নহে। থিওসফি মতটাই বস্তুতঃখুব যুক্তিযুক্ত ও সন্তোষজনক। বিজ্ঞানের ধারা এই যে, যতক্ষণ না কোন একটা মতের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মত জানা যাইতেছে, ততক্ষণ সেই মতটিকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া মানিযা চলিতে হইবে। এই সূত্র ধরিয়া আমরাও বলিতে চাই যে, আমাদের মতটি দুর্ভেদ্য, অবিনশ্বর। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মত যদি কেহ দেখাইযা দিতে পারেন, তবে আমরা তাহা গ্রহণ করিতে রাজি আছে। কিন্তু কেহ তাহা পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই ; কেন না,আমরা বহু ধর্ম-মত আলোচনা করিয়া তাহাদের প্রকৃতি অবগত

হইয়াছি। আমাদের মতের কোন ত্রুটি আমাদের চক্ষুতে পড়া দূরে থাকুক, আমরা নানাবিধ মতের যতই আলোচনা করিতেছি, ততই আমাদের মতেরই পোষক মত দেখিতেছি। বিস্তর ব্যক্তির দিব্যশক্তি ন্যূনাধিক পরিমাণে বিকশিত হইয়াছে। অতএব এখন আমাদের অনুকূল প্রমাণ আরও পাইব বলিয়া আশা কবিতে পারি। আমাদেব মধ্যে অনেকেই অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভ কবিয়াছেন; তদ্ব্যতীত অনেকের আত্মীয-স্বজনও ঐরূপ উন্নত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহারা বিস্তর অলৌকিক ঘটনা দেখিয়াছেন ও দেখিতেছেন। থিওসফি সেরূপ ঘটনাব ব্যাখ্যা দিতে পারে। বেশ যুক্তির সঙ্গে উহাদিগের জন্য নিঃসর্গের মধ্যে স্থানও নির্দেশ কবিয়া দিতে পারে। কিন্তু অন্য কোন ধর্ম-মত উহা অপেক্ষা ভাল ব্যাখ্যা দিতে পারে কি?

কষ্টসহিষ্ণু, যত্নশীল, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে আমি একটি উপদেশ দিতে চাই। তিনি যেন অতীন্দ্রিয় শক্তির ও সূক্ষ্ম-জগতের প্রমাণ সংগ্রহ কবিতে থাকেন। প্রথমে তিনি যেন কিছু দিন ধরিয়া ঐরূপই করেন। তিনি যেন স্মরণ-বিদ্যা ও "মেস্‌মেরিজম্‌" কিনা মোহিনী বিদ্যাব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রমাণ লইতে থাকেন। যদি সম্ভব হয়, তবে যেন নিজেই হাতে কলমে করেন, নচেৎ যেন ঐ দুই বিষয়সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পড়িতে থাকেন।

ঐ পুস্তক পড়িয়া কিছু কিছু জ্ঞানলাভ কবিযা তাহার পর যেন ভুবর্লোক প্রভৃতি সূক্ষ্মজগতের চিন্তা কবিতে বসেন। এইরূপ প্রণালীই ভাল। ভুবর্লোক প্রভৃতির চিন্তা করিতে গেলেই কোথায় উহা আছে, তাহাব প্রমাণ খুঁজিবার ইচ্ছা হইবে। এইরূপ চেষ্টা করিতে করিতে ভুবর্লোকের জ্ঞান হইবে।

ভুবর্লোক স্বভাবতঃ আমরা দেখিতে পাই না। উহার অনুসন্ধান কবিতে গিযা তাঁহাকে অস্বাভাবিক ব্যাপাবেব পরীক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ করিতে গেলেই ভূর্লোক ও ভুবর্লোক এই দুইটি জগতেব সন্ধিস্থলে তাঁহাকে আসিযা উপস্থিত হইতে হইবে। তখন তাঁহাকে ভূত-প্রেতেব ব্যাপাব, বৈঠকেব কাণ্ড-কারখানা সমস্তই আলোচনা কবিয়া দেখিতে হইবে। এ আলোচনা নিজে পবীক্ষা দ্বাবা কবিলেও চলে, বা অপরের পরীক্ষা-ফল পাঠ কবিয়াও হইতে পারে। আমি নিজে হাতে কলমে সমস্ত করিয়া বুঝিযাছিলাম।

সূক্ষ্ম জগতের আলোচনায় দুইটি কার্য্য একইসময়ে সিদ্ধ হইতে পাবে, তাহাতে কোন বাধা জন্মে না। আলোচনাকারী নিজের উন্নতিসাধন কবিযা লইতে পারেন, তাহাতে ভুবর্লোকের স্বাভাবিক দৃশ্য তাঁহার চক্ষুতে পড়িবে। আবার ওখানকার অলৌকিক ব্যাপারগুলিও অবগত হইবার সুবিধা ঘটে। পববর্তী অধ্যাযে আমবা তাহাব আলোচনা করিব।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

দিব্যদৃষ্টিলাভের উপায়

দিব্য-দৃষ্টির আলোচনা করিয়া মানুষ যখন বুঝিতে পারে যে, উহার ক্ষমতা অদ্ভুত, তখন সে ঐ ক্ষমতা লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া ওঠে। ঐরূপ ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করে,—"মহাশয়, কি উপায়ে আমি দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিতে পারিব? আপনারা বলেন যে, ঐ শক্তি মানুষমাত্রেই নিহিত আছে; যদি তাহাই হয়, তবে কিরূপ কাজ করিলে তাহার বিকাশ ঘটান যাইতে পারে? আপনাদিগকে কিরূপভাবে উন্নত করিয়া তুলিলে আমরা সকলেই ঐ শক্তি লাভ করিতে পারি?" এইরূপ প্রশ্ন শুনিলে আমরা প্রষ্টাকে বলিয়া থাকি যে, মানুষ সত্যই ঐ শক্তির উন্মেষ সাধন করিতে পারে, আর অনেকে বাস্তবিকই করিয়াছে। ঐ শক্তি নানা উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু সকল উপায়গুলিই নিরাপদ নহে। কতকগুলি প্রণালীতে খুবই বিপদ আছে; সুতরাং সেগুলি বাঞ্ছনীয় নহে। দিব্য দৃষ্টিলাভের পক্ষে মাত্র একটা নিরাপদ প্রণালী আছে। আমরা সকলকেই সেই প্রণালীটি অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিই। দিব্য দৃষ্টিলাভের যতগুলি পথ আছে, আমরা সকলগুলিরই আলোচনা করিব। তাহা হইলে, উহার বিপদ আপদের কথাও জানা যাইবে। তখন সকলেই সে পথ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইবে।

আমরা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে এ কথা বলিয়া আসিয়াছি যে, পৃথিবীর উন্নত জাতির উন্নত ব্যক্তিদিগের অনেকেই ভুবলোক দেখিবার [illegible] শক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সে শক্তি পূর্ণ বিকাশই প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি [illegible] করিয়াও আমরা [illegible] ব্যবহার করিতে আদৌ ইচ্ছুক নই। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐ শক্তি ধীরে ধীরে আমাদের [illegible] ফুটিয়া উঠিয়াছে। [illegible] ধীরে ধীরে ফুটিয়াছে যে, আমরা নিজেরাও উহার প্রভাব [illegible] করিতে পারি নাই। অব্যবহার্য অস্ত্রের মত উহা আমাদের অপুষ্ট রহিয়াছে মাত্র। [illegible] ঘোর ব্যস্ত। এই স্থূলদেহের স্থূল বৃত্তির প্র[illegible] আমাদের [illegible] রহিয়াছে। সূর্যের কিরণে যেমন বহুদূর[illegible] [illegible] অতিরিক্ত [illegible] উন্নত মানুষমাত্রই [illegible] শক্তি [illegible] আমাদিগকে দুইটি [illegible] করিতে হইবে। সূক্ষ্মশক্তিলাভের চেষ্টা [illegible] এই সাধনা-সময়ে আমাদিগকে অতিশয় বলবতী দৈহিক বৃত্তিগুলির বেগ কমাইতে [illegible] আর সঙ্গে সঙ্গে [illegible] জানা সূক্ষ্মশক্তির ব্যবহারে অভ্যস্ত হইবার [illegible] পাইতে হইবে।

দৈহিক বৃত্তির দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলির [illegible] সেইটি [illegible] এটি [illegible] অনেক প্রণালী [illegible] মোটামুটি [illegible] করিয়া [illegible] আছে, বলপ্রয়োগ করিয়া [illegible] কিছুদিনের [illegible] কটি ভাগের কথা [illegible] এই যে, আমরা [illegible] আমাদের ইন্দ্রিয় সংযোগ করিয়া তুলিব

পাবি। এই শেষের প্রণালীতে একটু বিলম্ব ঘটে বটে, কিন্তু ফল খুবই ভাল হয়। প্রথম প্রণালীর ফল অস্থায়ী , দ্বিতীয় প্রণালীর ফল স্থায়ী। বলপূর্বক ইন্দ্রিয় দমন করিবার অনেক উপায় আছে। তাহার অনেকগুলিতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে স্থূল দেহের অপকার হইয়া থাকে। ঐরূপ চেষ্টা করিলে অনেক প্রকার কু-ফল ফলিতে আরম্ভ করে। একটি কুঃফল এই যে, মানুষ জড়ভাবাপন্ন হইয়া ওঠে। হইতে পারে তখন তাহার সূক্ষ্ম জগতের দিকে দৃষ্টি বেশ খুলিয়া গিয়াছে; কিন্তু স্থূলদেহ অসুস্থ হইয়া উঠিলে সে তাহা নিবারণ করিতে পাবে না।

আর একটি কু-ফল এই যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা ইন্দ্রিয়দমনের শুভ ফল খুবই অস্থায়ী। ঐ শুভ ফল অনেক সময় খুব অল্পদিনই থাকে, কখন বা আ-মরণ স্থায়ী হয়। ইহার বেশী থাকে না। ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভের চেষ্টা বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ঐ সকল দেশেও ঐ শক্তিলাভের পক্ষে দুইটি পথ নির্ধারিত হইয়াছে। একটি উপায়—লৌকিক; অপরটি লোকত্র। প্রথমটির ফল অস্থায়ী ; এটি মাত্র বর্তমান জীবনব্যাপী হয়। দ্বিতীয়টির ফল জীবাত্মার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে ; উহা জীবাত্মার সঙ্গে জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া চলে। উহা স্থায়ী ফল ; প্রকৃতপক্ষে উহাতে জীবাত্মা নিজেই উন্নত হইয়া ওঠে। প্রথম প্রণালীতে শিক্ষা-সাধনার বিশেষ প্রয়োজন হয় না ; যেটুকু শিক্ষার প্রয়োজন হয়, সেটুকুও দেহের ; আত্মার নহে। যে পাঁচটা দেহ লইয়া আমরা চলা-ফেলা করিতেছি, উহারা উহার প্রভাব ভোগ করে। পুনবায় জন্মগ্রহণ করিলে আমাদের আবার নূতন পাঁচটা কোষ তৈয়ারী হইবে, তাহারা ঐ ফল পাইবে না। এখনকার কষ্টভোগ তখন বিফল হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় উপায়ে আত্মার উন্নতি হয়। তখন নূতন জন্মেও আত্মা সেই স্থায়ী ফল প্রকাশ করিতে পাবে। বলপ্রয়োগ দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন করিয়া দিব্য শক্তিলাভের অনেক প্রকার প্রণালী আছে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ঐ সকল ব্যাপার দেখা যায়। আমরা নিম্নে ঐ প্রণালীর কথা বলিতেছি।

দিব্য- শক্তিলাভের অ-বাঞ্ছনীয় প্রণালী

দিব্য-শক্তি লাভ করিবার নিমিত্ত ভারতের অনার্যজাতিরা ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া থাকে। উহার ফলে সত্য-সত্যই দিব্যদৃষ্টি কিয়ৎপরিমাণে খুলিয়া যায়। কোন কোন ঔষধে শরীরটাকে অসাড় করিয়া ফেলে, সেইরূপ ভাঙ্গ প্রভৃতিতে স্থূল দেহ সংজ্ঞাহীন হইয়া ওঠে। তখন লিঙ্গ-শরীরটা স্বাধীনভাবে ভুবর্লোকে বিচরণ করিতে থাকে। আমরা যখন ঘুমাইয়া পড়ি, তখনও আমাদের লিঙ্গ-শরীর ঐরূপভাবে ভুবর্লোকে বেড়ায়। আমাদের নিদ্রিত অবস্থায় লিঙ্গ শরীরের বাহির হইয়া যাওয়া, আর নেশার অবস্থায় যাওয়া এ দুইটি যাওয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে। ঘুমের অবস্থায় গেলে জাগিয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে ; আর নেশার অবস্থায় গেলে সে সম্ভাবনা নাই। লিঙ্গ-শরীরে সূক্ষ্ম-জগতে বেড়াইব, বেড়াইয়া অতীন্দ্রিয় শক্তিবলে অনেক অনেক বিষয় জানিব, ইহা মনে করিয়াই এক জন যদি নেশা করে, তবে নেশা হওয়ায় লিঙ্গ -শরীর মুক্ত হইবামাত্র সে সূক্ষ্ম-শক্তির ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। এইরূপ করিতে করিতে সূক্ষ্ম দৃষ্টিলাভে কতকটা সমর্থও হয়। নেশা ছুটিয়া গেলে সে সূক্ষ্ম জগতের সেই অতীন্দ্রিয় শক্তি তখনও কিছু কিছু তাহার মনে থাকে। ঐ শক্তি-বলে সে অনেকের অনেক কথা বলিয়া দেয়। তখন দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন বলিয়া তাহার যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। নেশার প্রভাবে সংজ্ঞাহীন হইলে তাহার ঘাড়ে কখন কখন ভূত আসিয়া চাপিয়া বসে, আর কথাবার্তা বলিতে

থাকে। মিডিয়মের ঘাড়ে যেমন চাপে, উহাদের ঘাড়েও তেমনই চাপে। দিব্যশক্তিলাভের উদ্দেশ্যে অনেকে আবার নেশা না করিয়া এক প্রকার ধূঁয়া নিঃশ্বাস পথে গ্রহণ করে। কোন কোন গাছের ধূঁয়া নাকে গেলে মানুষ অজ্ঞান হইয়া আসে। উহারা ঐ প্রকার ধোঁয়া নাকে টানিয়া লয়। পুরাকালীন যাদুকরীদিগের যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের কথা শুনা যায়, তাহা সম্ভবতঃ এই উপায়ে লাভ করা হইত। ঐ যাদুকরীরা ধর্মমন্দিরে পুরোহিতের কার্য করিত। একটি বিবরণে এইরূপ জানা গিয়াছে যে, এক দিন একটা যাদুকরী একটি ত্রি-পদ আসনে বসিয়াছিল। ঐ আসনটা না কি একটি পর্বতের উপর বিন্যস্ত, আর আসনের নীচে পর্বত গাত্রে একটা ফাটল ছিল। সেই ফাটল দিয়া বাষ্প বাহিব হইযা আসিতেছিল। ঐ বাষ্প নাকে যাইবামাত্র রমণী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। তখন একটা পরিচিত ভূত উহার ঘাড়ে চাপিয়া উহার মুখে কথাবার্তা বলিতে লাগিল। পরিচিত, কেন না, অনেক বৈঠকে লোকে তাহার কথাবার্তা শুনিয়া তাহাকে চিনিযা ফেলিয়াছিল। ভাঙ্গ প্রভৃতির নেশাই হোক, আব সংজ্ঞা নাশক ধূঁয়া নাকে লওয়াই হোক, এ দুইটি প্রথাই নিন্দনীয়। ইহার কোনটিতেই বস্তবিক শক্তির উন্মেষ সাধন হয় না।

অনেকে হয় ত নৃত্যকারী দরবেশদিগের কথা শুনিয়াছেন। উহাবা উন্মত্তভাবে এক অদ্ভুত রকমের নাচ নাচিয়া থাকে। ঐরূপ নাচ না কি উহাদের ধর্মের অঙ্গবিশেষ। সে নাচ পাগলের মত একটা বিকট ভঙ্গীব নাচ। নাচিবাব সময কেবল পাক দিয়া দিয়া ঘুরিযা ঘুবিয়া নাচে। নাচিতে নাচিতে বিশ্রী মাথা ঘুরিযা ওঠে। তখন অজ্ঞান হইযা মাটিতে পড়িয়া যায়। ধর্মভাব প্রাণে লইযা নাচিয়াছিল বলিয়া এই অজ্ঞান অবস্থায় উহারা অলৌকিক ব্যাপার দেখিতে থাকে। এই প্রণালীতে উহারা ভুবর্লোকের নিম্নস্তবেব অনেক কাণ্ড জানিতে পাবে। তাহাব পব সজ্ঞান অবস্থায কতক কতক স্মরণ কবিযাও বলিযা থাকে। দববেশদিগেব একূপ ব্যাপাব আমি স্বচক্ষুতে কিছু কিছু দেখিয়াছি। আমি আব এক ব্যাপার দেখিযাছি। সেটা "ভূদু"দিগেব কাণ্ড। কাফ্রিদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর পুরোহিত আছে, তাহাদিগকে "ওবে" বা "ভূদু" বলে। ইহারা যাদুব্যবসায়ী, ইহারা এমন সকল ব্যাপার দেখায় যে, সেগুলি অতীব ঘৃণিত, লজ্জাকব ও ভয়াবহ। সেরূপ ব্যাপার আমরা কিছুতেই অনুমোদন কবিতে পারি না। ঘৃণিত ব্যাপার হইলেও উহাতে কিছু কিছু দিব্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইউরোপের কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব-কথিত উপায়ে দিব্য শক্তিলাভের চেষ্টা করিলেও আমরা ওরূপ উপায় অবলম্বন করিবার পরামর্শ কাহাকেও দিই না।

দিব্য-জ্ঞানলাভের নিন্দনীয় প্রণালী যে শুধু প্রাচ্য দেশেই আছে, তাহা নহে। পাশ্চাত্য দেশেও কম নহে ; যাঁহাদের প্রাণের পিপাসা পবিত্রতার উন্মেষ সাধন কবিয়া নিরাপদ হইয়া ওঠে, তাঁহারা যেন সেগুলি পরিহার কবিযা চলেন। পাশ্চাত্যেরাও অনেক উপাযে আপনাদিগকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া তুলেন। সেরূপ করা অতীব গর্হিত। একটা উজ্জ্বল পদার্থের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে, মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ অসাড় হইযা ওঠে। যাহার মস্তিষ্ক ঐরূপভাবে— ঐরূপ প্রণালীতে অসাড় হয়, সে একেবাবে জড়বৎ হইয়া পড়ে। তখন তাহার লিঙ্গ-দেহ ভূবর্লোকের নিম্নস্তরে বিচবণ কবিয়া কতকটা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার দেখিতে থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে সে অমুক জিনিস দেখিব, বা অমুক বিষয় জানিব, এরূপ কোন সঙ্কল্প করিতে পারে না। ভালই হোক আর মন্দই হোক, যেরূপ দেখে বা শুনে, তাহাতেই তাহাকে সন্তুষ্ট হইতে হয়। এরূপ ব্যাপারের ফল খুব বেশী সময় মন্দই হইয়া থাকে। কোন সাঙ্কেতিক কথা জপ করিয়াও অনেককে দিব্য-দৃষ্টি লাভ করিতে দেখা যায়। ইহারও কারণ পূর্বোক্ত প্রকার। জপ করা অর্থ

পুনঃ পুনঃ একটা কথা মনে মনে উচ্চারণ করা। এরূপ করিতে করিতে মনের বৃত্তি অসাড় হইয়া ওঠে। উজ্জ্বল বস্তুর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যেমন মস্তিষ্ক অসাড় হয়, মনের আলোড়ন করিতে করিতে মনের শক্তিও সেইরূপ বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন লিঙ্গ-দেহভূত চৈতন্য ভুবর্লোকেব অতীন্দ্রিয় ব্যাপার জ্ঞাত হইতে থাকে।

লর্ড টেনিসন্ দিব্য-দৃষ্টিব একটা ব্যাপাব বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি নিজের নামটা ঘন ঘন জপ কবিয়া দিব্য-জ্ঞান লাভ কবিযাছিলেন। তিনি "ফেয়াবিং ফোর্ড ফ্রেস্ওয়াটাব ওয়াইট্ দ্বীপ" নামক স্থান হইতে ১৮৭৪ খৃস্টাব্দের ৭ই মে তাবিখে স্বহস্তে ঐ ব্যাপার লিখিযা গিযাছেন। এক জন ভদ্রলোক সংজ্ঞা-নাশক দ্রব্য ব্যবহাব করায় অলৌকিক কাণ্ড কারখানা অনুভব করিয়াছিলেন বলিযা তাঁহাকে পত্র লেখেন। তাই টেনিসন্ প্রত্যুত্তবে তাঁহাকে ঐ পত্র লিখিযাছিলেন। টেনিসন্ প্রদত্ত বিবরণটি এইরূপ ঃ—

"সংজ্ঞা-নাশক ঔষধ-প্রভাবে মানুষ অজ্ঞান হইযা গেলে, তাহাব অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ হয় শুনিযাছি। আমাব কিন্তু ওরূপ জ্ঞান-লাভেব সুযোগ কখনও ঘটে নাই। অন্যভাবে আমি ঐ জ্ঞানের আস্বাদ পাইয়াছি। বাল্যকাল হইতেই আমি দিব্য-দৃষ্টিব ব্যাপার জানি। আমি একা হইলেই নিজের নামটি মনে খুব একাগ্রতাব সঙ্গে ঘন ঘন জপ কবিতাম, ফলে মনটা সব দিক্ হইতে গুটাইযা আমাব মূর্তিতে আসিযা দাঁড়াইত, তাহার পর আমার মূর্তি বিলীন হইয়া যাইত, তখন আমার স্থানটি অন্য জগতেব অসীম সত্তায যাইয়া মিশিয়া পডিত। সে এক অপূর্ব, মহান্ সত্য, মহাসুস্পষ্ট অবস্থা , ভাষায সে অবস্থাটা একেবারেই বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। মরণ বলিতে সেখানে কিছু নাই, মবণ কথাটাও সেখানে যেন উপহাসের কথা; ব্যক্তিগত অবস্থার নাশ বলিতে ব্যক্তিগত জীবনের অবসান বুঝিতে গিযা বুঝাইতে পারিতেছি না। পারিতেছি না বলিয়া লজ্জা আসিতেছে। কি করিব? ভাষায উহা বুঝান যায না। আসল কথা এই যে, পৃথিবী ছাডা অন্য জগৎ আছে, মানুষ চেষ্টা করিলে সে জগৎ এই দেহেই দেখিতে পাবে। শুধু তাহাই নহে, সে জগৎ অতি ধ্রুব, অতি সত্য, অতীব মহীযান্ ও শাশ্বত।"

পাঠক। টেনিসনের কথা ত শুনিলেন? উহাতে আমবা বুঝিলাম, টেনিসন্ সূক্ষ্ম-জগতেব আভাস সত্য সত্যই পাইয়াছিলেন। সূক্ষ্মজগতেব সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য যে কত বেশী, তাহা বুঝান যায় না। তিনি উহার কিছুই দেখেন নাই বলিলেও হয়। তিনি সূক্ষ্মজগতের মাত্র দ্বাবদেশে উপস্থিত হইযাছিলেন। যাঁহাবা সেখানকাব ব্যাপাব জানিয়াছেন, তাঁহারা টেনিসনের ঐ বর্ণনাব একটি বর্ণও অবিশ্বাস করেন না। টেনিসন্ সাধাবণ অনুশীলনকারীদের অপেক্ষা একটু বেশী বেশী রকম অতীন্দ্রিয় ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁহাব বিশ্বাস ও দৃঢ়তর দেখা যায। দেহাতিরিক্ত যে আত্মা আছে বা থাকিতে পাবে, সে বিযয়ে তাঁহার অটল বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি নিজেব নাম জপ কবিয়াই ঐরূপ শক্তি লাভ করেন, এরূপ করাও আমাদের মতে যুক্তিযুক্ত বা নিবাপদ বলিযা মনে হয না।

শ্বাস প্রশ্বাস সংযত করিয়া যোগসাধনের কথা

আমরা কখন কখন শুনিয়াছি যে, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া নির্দিষ্টভাবে পবিচালন কবিলেও দিব্যশক্তি লাভ করা যায়। ভারতের লোক এই প্রণালীটির খুব বেশী বেশী ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই প্রথার খুব পক্ষপাতী, ইহা দ্বাবা যে দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু কুফলও ফলে। এই শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়া অনেকে অনেক সময় শরীর ও মন দুইটিই অকর্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিস্তর ব্যক্তি এই প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন। আমি এইরূপ অনেককে স্বচক্ষুতেও দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, অনেকের দেহ অকর্মণ্য ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে ; অনেকেব অবস্থা প্রায় উন্মাদের মত ; তাঁহারা আমার কাছে আসিয়া বলিয়াছিলেন—"মহাশয়! এখন আমাদিগের আরোগ্যলাভের উপায় কি বলুন?" উঁহাদেব মধ্যে অনেকের দিব্যদৃষ্টি বেশ খুলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা নিরন্তরই সূক্ষ্মজগৎ দেখিতে পান। আবাব কাহার কাহার অতটা উপকার হয় নাই, অথচ দেহ ও মন দুর্বল হইয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ; তাই তাঁহারা একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। তবে দুই এক জনের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের উপকারই হইয়াছে।

ভারতের হঠযোগীরাই ঐরূপ করিয়া থাকেন। মনের উৎকর্ষসাধন দ্বাবা যে দিব্য-শক্তি লাভ হয়, সেইটিই স্থায়ী। হঠযোগীরা তাহা না করিয়া দৈহিক ব্যাপার দ্বারা অতীন্দ্রিয়-শক্তি লাভ করিতে যান। কিন্তু তাঁহারাও উপযুক্ত গুরুর উপদেশ ব্যতীত উহাতে প্রবৃত্ত হন না। গুরু যেরূপ যেরূপ বলেন, শিষ্যও সেইরূপ সেইরূপ করেন। শিষ্যের কোন অনিষ্ট হইতেছে কি না, গুরু সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। যদি দেখেন, শিষ্যের অনিষ্ট হইতে যাইতেছে, তবে তখনই তাহাকে নিরস্ত করেন। যাঁহারা ইহার কু-ফলের ভাবনা না ভাবিয়া, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়াই গুরু না লইয়াই, ইহার অনুশীলন করিতে যান, তাঁহারা নিতান্ত অজ্ঞান। তাঁহাবা মহা বিপদে পড়েন। কাহারও কাহারও উপকার হইতে পারে বলিয়াই যে সকলেবই উপকাব হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যাহা আমার পক্ষে উপকারী, তাহা হয় তো তোমার পক্ষে অপকারী হইয়া ওঠে। গুরু না পাইলে, কেহ যেন উহা করিতে না যান। গুরু হইলেই হইবে না, উপযুক্ত ও সিদ্ধ গুরু হওয়া চাই। এই হঠযোগের পথে দুই এক জন মাত্র সিদ্ধিলাভ কবিযাছেন, খুব বেশী লোককেই বিফল-মনোরথ হইতে দেখা গিয়াছে। এই পথে সিদ্ধি অপেক্ষা অসিদ্ধির ভাগই বেশী। এই পথে গেলে অতি সহজেই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি ঔষধ-পত্রেব গুণাগুণ বুঝে না, সে যদি কোন ঔষধের দোকানে যাইয়া আপন খেয়ালমত একটা ঔষধ লইয়া খাইয়া বসে, তবে তাহার উপকারের অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনাই খুব বেশী ; দৈবাৎ একটা ঠিক ঠিক ঔষধ লইয়া বসিতে পারে বটে, কিন্তু সেটা কখনই ধর্তব্য নহে। হঠ যোগীদের অবস্থাও সেইরূপ। দৈবাৎ কখন কাহারও হয় ত উপকার হইয়াছে, কিন্তু অপকারের দিকই খুব বেশী।

মেস্মিরিজম্ বা মোহিনী বিদ্যা

মোহিনী বিদ্যা দ্বারাও দিব্য-দৃষ্টি লাভ করা যায়। এই প্রথায় এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া তোলে। ঐ তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি ভুবর্লোকের অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করে। যিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন, তিনি ঐ মোহাভিভূত ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলিকে কিছু সময়ের জন্য আড়ষ্ট করিয়া ফেলেন। আড়ষ্ট হইয়া গেলে সূক্ষ্ম-জগতের ব্যাপার জানিবার, জানাইবার সুবিধা হইয়া ওঠে। তখন মোহকারী ব্যক্তিব লিঙ্গ-শরীরে শক্তি সঞ্চার করিতে থাকেন। এ প্রথায় বেশ সুন্দর ফল হয় ; কিন্তু মোহকারীর পক্ষে এতটা করিয়া ওঠা নিতান্ত সহজ নহে। মোহাভিভূত আর মোহকারী এই উভয়কেই পূর্ব হইতে প্রস্তুত হইতে হয়। উভয়েরই সাধনা চাই। উভয়েরই চরিত্রবান্ হওয়া আবশ্যক। সৎচিন্তা ও সৎ উদ্দেশ্য দুই জনের মনেই জাগরূক

রাখিতে হইবে, তবেই সুফল ফলে। মোহাভিভূত ব্যক্তি মোহকারীর একেবারে আয়ত্ত হইয়া পড়ে, অথচ তাহা টের পায় না। মোহকারীর হৃদয় বা মনের যে কোন গুণ, সবই তখন মোহাভিভূতের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। এ ক্ষেত্রে মোহকারী যদি নির্মলচরিত্র না হন, তবে দর্শকাদগের বিপদ ঘটিতে পারে! অজ্ঞান হইয়া পড়লে, মানুষ আর মানুষ থাকে না, নিজের উপর তখন আর কিছুমাত্র ক্ষমতা থাকে না। সে অবস্থাটা সূক্ষ্ম জগতের অনুসন্ধান পক্ষে সুবিধাজনক নহে। তদ্ব্যতীত কার্যো, মনে, বাক্যে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র না হইয়া এইরূপ করিতে গেলেও ভয়ানক বিপদ ঘটিয়া থাকে। এরূপ কাণ্ড করিতে হইলে মোহকারী ব্যক্তিকে খুবই পবিত্র হইতে হইবে। কিন্তু অতটা পবিত্র হওয়া যে কত কঠিন, তাহা আমরা সকলেই বুঝি। আমি নিজেও এরূপ ব্যাপার কখন করিতে চেষ্টা করি নাই। আর ঐরূপ করিতে কাহাকেও উপদেশ দিই নাই।

অনেকে মোহিনী বিদ্যার প্রভাবে অনেক রকম ব্যারাম আরোগ্য করিয়া দেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবার নাই। সে ব্যাপারটা একেবারেই স্বতন্ত্র প্রকারের ; কেন না, সে ক্ষেত্রে তাঁহারা কাহাকেও তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন না, ঐরূপ করিবার আবশ্যক হয় না। মোহকারী মোহাভিভূত ব্যক্তির দেহের উপর শূন্যে হস্তসঞ্চালন করিতে থাকেন। এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার শক্তি চৌম্বক শক্তির মত মোহাভিভূতের দেহে সঞ্চালিত হয়। এই প্রথায় ঐ ব্যক্তিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন না করিয়াও তাহার দেহের কোনও স্থানের যাতনা উপশমিত হইতে পারে, তাহার পীড়াও দূর করিয়া দেওয়া যায়, কিংবা তাহার দুর্বল দেহে জীবনীশক্তি পূর্ণ করিয়া দেওয়া চলে। এরূপ ব্যাপারে কাহারও কিছু আপত্তি থাকিতে পারে না। যিনি মোহকারী হইয়া ঐরূপ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হন, মোহিনী বিদ্যার পুস্তকাবলী শুনিয়া পড়িয়া যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়া লওয়া তাঁহার একান্ত কর্তব্য। খুব ভাল রকম জানিয়া শুনিয়াই সকল কাজ করিতে হয়। সূক্ষ্ম-জগতের শক্তি মানুষের কাছে বরাবরই একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। ভাল উদ্দেশ্যে উহা লইয়া কাজকর্ম করিতে গেলেও অনেক সময় বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। তাই উহার তথ্য বিশেষরূপে জানাই ভাল। দিব্য দৃষ্টিলাভের যতগুলি উপায় বিবৃত হইল, ইহার কোনটিকে প্রকৃত উৎকর্ষ বলা চলে না। আমরা কোন ব্যক্তিকেই এ সব করিয়া দেখিতে উপদেশ দিই না।

দিব্য-দৃষ্টিলাভের একটি ভাল উপায়

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"যখন অতগুলি উপায় সবই মন্দ, তখন কোন্ উপায় অবলম্বনীয়?" যে সকল উপায়ে দেহের উপর অত্যাচার নাই, অথচ আত্মার সুশিক্ষা ঘটে, তাহাই ভাল। আত্মা সু-শিক্ষিত হইলে, দৈহিক বৃত্তি দমন করিতে পারে, তাহাতে বাহ্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। উপযুক্ত গুরুর উপদেশে পরিচালিত হইয়া দিব্যশক্তিলাভের চেষ্টা করাই সর্বাপক্ষা ফলপ্রদ ও নিরাপদ। তাঁহার উপদেশ ভিন্ন কিছু করা উচিত নহে। কিন্তু তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন গুরু কোথায়? কোথায় সেরূপ গুরু মিলে? যাঁহারা আপনাদিগকে সদ্গুরু বলিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন, যাঁহারা শিক্ষা দিয়া নির্দিষ্ট হারে টাকা কড়ি লইয়া থাকেন, তাঁহাদের কেহই গুরু নামের যোগ্য নহেন। যাঁহারা বরাবর অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দিয়া আসিতেছেন, জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি এখনও তাঁহাদের কাছে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। সেই মহাত্মাদের জ্ঞানভাণ্ডার অসীম, অনন্ত। আমরা সামান্য একটু জানিয়াছি মাত্র।

ঐ সিদ্ধ গুরুদিগের একটি সঙ্ঘ আছে। উপযুক্ত পাত্র পাইলে উহারা তাহাকে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান দান করিয়া থাকেন। মানবের উপকার করাই তাঁহাদের ব্রত। যে ব্যক্তি এই ব্রতের নিঃস্বার্থ ব্রতী, সে-ই উঁহাদের কৃপালাভে সমর্থ হয়। উঁহাদের দর্শন পাইবার উপায় কি? আমরা স্থূল দেহে উঁহাদের সমীপে যাইতে পাবি না, বা উঁহাদিগকে দেখিলেও সিদ্ধ মহাত্মা বলিয়া চিনিতে পারি না। কিন্তু তাঁহারা আমাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন, আর আমাদের দ্বারা পৃথিবীর উপকার সাধিত হইতে পারে—যখন তাঁহারা আমাদিগকে ততটা উপযুক্ত বলিযা বোধ করেন। তখন আসিযাও থাকেন। আমরা উপযুক্ত হইলে, তাঁহারা নিশ্চয়ই আসেন। ক্রমোন্নতির ব্যাঘাত না ঘটে, সে দিকে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাহা ছাড়া মানবের সহায়তা কবা তাঁহাদের জীবনের ব্রত। তাঁহারা এইরূপ সেবা ধর্মী শিষ্য চান ; নিবন্তবই তাঁহারা ঐরূপ শিষ্য খুঁজিতেছেন। অতএব সেবা ধর্মে ব্রতী হইয়া গুরুব কৃপা পাইব না বলিয়া কাহারও হতাশ হইবার বা ভীত হইবার প্রয়োজন নাই। যিনি মাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করিবাব নিমিত্ত। বা স্বকার্য্যসাধনের অনুকূলে শক্তিলাভের নিমিত্ত ঐরূপ গুরু চান, তিনি সেরূপ গুরু পান না। ঐ সিদ্ধ মহাত্মারা তাদৃশ চপল প্রকৃতি স্বার্থান্ধ জীবকে দেখা দেন না। কিন্তু যিনি বহুকাল সাধনা করিয়া, আপন হৃদয় ও মন পবিত্র ও শক্তিশালী করিয়াছেন, যিনি মানবের উপকাবার্থে মন প্রাণ শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, যিনি আপনাকে ঐশী কার্য্যেব উপযোগী করিযা তুলিয়াছেন, মাত্র তিনিই ঐ সকল মহাত্মার দর্শন পাইয়া থাকেন। উঁহারা অযাচিত, অপ্রত্যাশিতভাবে ঐরূপ ব্যক্তিব কাছে আসিযা উপস্থিত হন।

ঐ সিদ্ধ মহাত্মারাই "থিওসফি সমিতির" প্রতিষ্ঠা কবিযাছেন বটে, কিন্তু তাই বলিযা যে কোন ব্যক্তি উহার সদস্য হইলেই যে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন, তাহাব কোন অর্থ নাই। ঐ সমিতির আবার গুপ্ত অধিবেশনও আছে। যাঁহারা খাঁটি ধর্মপ্রাণ, সেই অধিবেশনে তাঁহাবাই কেবল যোগদান করেন। সেই গুপ্ত অধিবেশনে গেলেও মহাত্মাদিগেব সদস্যেবাই কেহ কেহ উঁহাদিগকে দর্শন কবিবার অধিকাব পান। কিন্তু সদস্য হইলেই যে সে অধিকাব জন্মিবে, তাহার কোন হেতু নাই। দর্শন দেওয়া মহাত্মাদেরই ইচ্ছা। তাঁহারা মানুষের হৃদয দেখিতে পান। কে উপযুক্ত, কে অনুপযুক্ত, হৃদযেব অন্তস্তল দেখিয়া তাঁহাবাই তাহা স্থিব করেন। কিন্তু এ কথাটি খুব সত্য যে, যিনি উচ্চতব জীবনে উন্নীত হইতে ইচ্ছুক, তিনি তাঁহাদেব কৃপালাভে বিফলমনোরথ হন না। উন্নতিকামী ব্যক্তিমাত্রকেই তাঁহারা শিষ্য দ্বারা উপদিষ্ট করিযা তুলেন। যে যে প্রকার উপদেশ পাইবার যোগ্য, তাহাব জন্য তাঁহাবা সেইরূপ ব্যবস্থা করেন। উৎকর্ষ-সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা এমন সব কার্য্য করিতে পারি, যাহাতে দিব্যদৃষ্টিব অনুকূল অবস্থা অনেকটা আমাদের কাছে আসিয়া পড়ে। দিব্যদৃষ্টি লাভ করা উৎকর্ষলাভের পবিচায়ক হইলেও উহাই একমাত্র পরিচয নহে। পূর্ণ মানব হইতে হইলে আবও অনেক গুণ একসঙ্গে ফুটাইয়া তুলিতে হয। এক দিকের একটা উৎকর্ষ হইলেই হইবে না , উৎকর্ষ যৌগপদিকভাবে সকল দিকেই হওয়া চাই। এক জন হয় তো খুব বড় বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানে খুব উৎকর্ষ জন্মিযাছে ; কিন্তু তিনি ভক্তিমার্গের কিছুই জানেন না। তাঁহাকে আমরা পূর্ণ মানব বলিব না। এক জন সাধু ভক্তি মার্গে খুবই উন্নত, ভক্তির মহিমায় তিনি মহীয়ান্ ; হয় তো বুদ্ধি বৃত্তির হিসাবে খুবই নীচ। তিনিও পূর্ণ নহেন। যে গুণ ইঁহার আছে, সে গুণ উঁহার নাই। সকলকেই সকল গুণে মণ্ডিত হইতে হইবে। তবেই পূর্ণ মানবত্ব জন্মিবে।

এখনকার মানুষ সকলেই অপূর্ণ ; ইহাদের কেহই সকল দিকে উৎকর্ষ করিতে পারে নাই। পূর্ব পূর্বজন্মে যে যে দিকে কাজ করিয়াছে, সাধনা করিয়াছে, এ জন্মে তাহার সেই উৎকর্ষ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমবা যদি ভক্তি মার্গে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া সাধনা করিতে থাকি, তবে এই জন্মেই আমরা আনেকটা উন্নতি করিতে পারি ; আব ভাবী জন্মে বিখ্যাত ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিব। ভক্তিমত্তাই সে জন্মের পবিচায়ক হইয়া উঠিবে। বুদ্ধিমত্তা বা অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ্ ব্যাপার। দিব্যজ্ঞানেব উৎকর্ষও ঐরূপে হয়, অর্থাৎ জন্ম জন্মান্তব ধবিয়া সাধনা করিবাব প্রয়োজন। যাঁহাবা দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সাধনার পথে অগ্রসব হন, তাঁহাবা এই জন্মেই অনেকটা সুফল পান। তাঁহাদেব সুপ্ত শক্তি এই জন্মের সাধনাতেই অনেকটা জাগিয়া ওঠে। আমি অনুমান করিয়া ঐ কথাগুলি বলিতেছি না, ও কথাগুলি খাটি সত্য। আমাদেব সমিতিব কযেক জন কযেক বৎসব ধবিযা আত্মার উৎকর্ষ সাধনে নিবত হইযাছেন। তাঁহাদেব প্রায সকলকেই সফল প্রযত্ন দেখা যাইতেছে। একাগ্রতাব সঙ্গে যিনিই সাধনা কবেন, তিনিই কৃতকার্য্য হইয়া ওঠেন। উঁহাদের কেহ কেহ মানসিক বৃত্তিগুলিব সম্যক্ উন্নতি কবিয়াছেন, কাহারও কাহারও উন্নতি আংশিকভাবে ঘটিয়াছে, কিন্তু সকলেই সাধনার ফল বুঝিতে পারিযাছেন। তাঁহাবা সকলেই সংযমের সুন্দব ফল অনুভব কারিতেছেন।

সাধনার প্রথম অনুষ্ঠান

তোমাব যদি দিব্যদৃষ্টিলাভেব ইচ্ছা থাকে, তবে উঁহাদের মত কার্য আবম্ভ কব। প্রথম মনেব বল ও নৈতিক বলেব সঞ্চয় করিয়া লও। সাধনাব পথে গেলে যদি তুমি অদ্ভুত শক্তি লাভ কবিযা বস, তখন সেই শক্তিব অপব্যবহাব না ঘটে, এই জন্যই নৈতিক বলের সঞ্চয পূর্ব হইতে আবশ্যক। মনেব বল আয়ত্ত না কবিযা যদি তুমি অতীন্দ্রিয শক্তি লাভ কবিয়া ফেল, তবে হয তো কোন দিন উহাব অপব্যবহারও কবিতে পাব। ঐরূপ দশায শক্তিলাভ কবা অপেক্ষা শক্তিহীন হইয়া থাকাই অধিকতর শ্রেয়ঃ। যখন দেখিবে যে, মনেব বল আয়ত্ত হইযাছে, যেরূপ অবস্থাই দাঁড়াক, পরোপকাব করিতে পারিবে, শত্রুবও উপকাব করিতে পাবিবে , যখন দেখিবে যে, প্রাণে একটা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাব জাগিযা উঠিযাছে, তোমাব প্রাণেব ভিতব হইতে একটা প্রেমেব মন্দাকিনী স্ফুবিত হইয়া উঠিতেছে, আব সেটা জগৎকে প্লাবিত করিতে চাহিতেছে, যখন দেখিবে, পরেব মধ্যে আপানাকে ঢালিযা দিবার বাসনা হইতেছে, তখনই বুঝিবে, তুমি দিব্যদৃষ্টিলাভের অধিকারী হইয়াছ। তখন তোমাব দুইটি কার্য আছে। তাহা দ্বাবা তোমাব দিব্যদৃষ্টি লাভ ঘটিবে। ঐ অবস্থায় অতীন্দ্রিয় শক্তি হাতে না আসিলেও তাহাতে কোন অনিষ্ট হইবে না। দুইটি কার্য্যের কথা বলিলাম, তাহাব প্রথমটি সম্পূর্ণ নির্দেয ও উপকাবী হইলেও সকলে করিয়া উঠিতে পাবে না। দ্বিতীযটি সকলেবই সাধ্য। আমি নিজে দুইটিকেই সাধ্য বলিযা মনে কবি।

চতুর্থ মাপ

প্রথম কার্যটি সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধির ব্যাপার। এ ব্যাপারের কথা আমি ইহার পূর্বেও কয়েকবাব বলিয়াছি। ইহা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধের অতিরিক্ত একটা নূতন দিকেব আলোচনা। আমাদের স্থূল মস্তিষ্ক ঐ আলোচনায এখনও অনভ্যস্ত, তাই আমরা ঐরূপ নবীন মাপটাকে অসম্ভব বলিয়া

মনে করি। তা মনে হয়, ভাবিয়া ভাবিয়া আমরা উহার আবিষ্কার করিতে পারিব না। অনুশীলন দ্বারা দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেমন অসাধারণ উৎকর্ষসাধন করা যায়, মস্তিষ্কের বেলাও সেরূপ করা যাইতে পারে। অনুশীলনে মস্তিষ্কের শক্তি বাড়িয়া গেলে নূতন জগৎ, নূতন মাপ, নূতন দিক, সবই তখন চোখে পড়ে। এ সকলের অতি সুস্পষ্ট অনুভূতি তখন মস্তিষ্কে ফুটিয়া ওঠে। ওয়াশিংটন সহরনিবাসী সি, এইচ, হিন্টনই এই "নূতন মাপ" মন্ত্রের ঋষি। তাঁহার শ্রীমুখ হইতেই এই নূতন মাপের নূতন তথ্য প্রথমে বিঘোষিত হইয়াছিল। তিনি আমাদের সমিতির সদস্য নহেন। কিন্তু আমাদের অনেক সভ্য তাঁহার ঐ অদ্ভুত তথ্যের বিশদ ব্যাখ্যা পড়িয়া প্রতি পরিমাণে উপকৃত হইয়াছেন। তিনি নিজে মস্তিষ্কের উৎকর্ষসাধন দ্বারা ঐ নূতন মাপের ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার সমর্থ হইবার কথা তাঁহার পুস্তকাবলীতেই লিপিবদ্ধ আছে। আমাদের সমিতির অনেকেই তাঁহার পদানুসরণ করিয়াছেন।

আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি মস্তিষ্কের উন্নতি করিতে করিতে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া বসিয়াছেন। ধীরে ধীরে উন্নতি করিতে লাগিলেন, শেষে ভুবর্লোক চোখে ফুটিয়া উঠিল। মস্তিষ্কের উৎকর্ষসাধনে তাঁহার সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় শক্তি জাগিয়া পড়িল। মস্তিষ্কের উৎকর্ষ বলিলে কি বুঝিতে হইবে? ধারণ করিবার শক্তির নামই উৎকর্ষ। মস্তিষ্কের বুঝিবার অর্থাৎ গ্রহণ করিবার একটা সাধারণ সীমা আছে। ঐ সীমাটাকে বর্দ্ধিত করা যায়। অনুশীলন দ্বারা উহা প্রশস্ত হইতে থাকে, শেষে এমন বর্দ্ধিত হইয়া যায় যে, মস্তিষ্ক তখন ভুবর্লোকের অলৌকিক ব্যাপারও গ্রহণ করিতে পারে। ইহারই নাম উৎকর্ষ। হিন্টন্ সাহেব অনুশীলন দ্বারা মস্তিষ্কের ঐ গ্রহণ করিবার সীমা বর্দ্ধিত করিয়া পরিশেষে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধের অতিরিক্ত একটা নবীন মাপ বুঝিয়া ফেলিলেন, তাঁহার দেখাদেখি অনেকেই ঐরূপ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক কুড়ি জনের মধ্যে এক জনও তাঁহার মত কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাঁর মত অতটা সুফল না পাইলেও তাঁহারা একেবারে বিফলমনোরথ হন নাই। যাঁহাদের গণিতের দিকে ঝোঁক আছে, তাঁহাদের কাছে এই নূতন মাপটা ভাবিয়া বাহির করিবার চেষ্টা খুবই ভাল লাগে। ভাবিয়া বাহির করিতে না পারিলেও তাঁহাদের লাভ, কেন না, চেষ্টা করিবার ফলেই তাঁহাদের ধারণাশক্তি খুব বর্দ্ধিত হয়। তখন তাঁহারা সাধারণের অপেক্ষা সব ব্যাপারই ভাল করিয়া দেখিতে পান। এটাও নেহাত কম লাভ নহে। সাধনায় সিদ্ধ হইয়া যাঁহারা ভুবর্লোক দেখিতে পান, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের কথা বাদ দিলে মনে হয়, সাধারণের মধ্যে এই পথের পথিকেরাই ভুবর্লোকের যথার্থ ধারণা করিতে কতকটা সমর্থ। যাঁহারা এই নূতন মাপের চিন্তা করিতে থাকেন, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাদের চিন্তাশক্তি অনেকটা অনাবিল। সূক্ষ্মজগতের কল্পনা করা যদি সম্ভব হয়, তবে ইঁহাদের পক্ষেই সম্ভব।

আর একটি কার্য

প্রথম কার্যটি অর্থাৎ নূতন মাপের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে দিব্যশক্তি ফুটাইয়া তোলা কঠিন ব্যাপার। সকলে উহা পারেন না। দ্বিতীয় কার্যটি সকলেই করিয়া দেখিতে পারেন। দ্বিতীয় কার্য্যটি যে খুব সহজ, তাহা নহে। কিন্তু কার্যে প্রবৃত্ত হইলেও প্রভূত উপকার। এ পথের এইটুকুই একটা মহা সুবিধা। এই দ্বিতীয় কার্যটি দ্বারাও মানুষ দিব্যদৃষ্টির দিকে যাইতে থাকে। কেহ এই পথে শীঘ্রই উহা লাভ করে, কেহ বা বিলম্বে করে। এই পথের পথিকেরা কত দিনে

দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে পারে, সেটা উঁহাদের পূর্বপূর্ব জন্মের কর্মফলের উপর নির্ভর করে। অই এ পথের সাধকদিগকে কেহই নিশ্চিতভাবে বলিয়া দিতে পারেন না যে, এত দিন পরে সাধনার সিদ্ধি হইবে। তবে এ কথাটা খুবই সত্য যে, সাধনার প্রত্যেক ক্রমেই সাধক উন্নত হইতে হইতে যায়। সাধক যদি সারাটি জীবনেও দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে না পারে তথাচ তাহার লাভ। কেন না, তাহার অবস্থা শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সকল দিকেই সাধারণের পক্ষে আদর্শস্বরূপ হইয়া ওঠে। অনেক ধর্মে এই কার্য্যটিকে "ধ্যান" বলে। এই ব্যাপারটি ভাল করিয়া বুঝিবার নিমিত্ত আমরা ইহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলাম। প্রথম ভাগ অপেক্ষা দ্বিতীয় ভাগটি উচ্চতর; দ্বীতীয়টি অপেক্ষা তৃতীয়টি আরও ভাল। সাধককে পর পর তিনটি স্তরেরই অনুশীলন্ করিতে হইবে। আমরা তিনটি ভাগেরই নাম দিয়াছি। প্রথম স্তর বা ভাগের নাম—একাগ্রতা বা ধারণা ; দ্বিতীয়টির নাম—ধ্যান ; তৃতীয়টির নাম—নিদিধ্যাসন। পরে আমরা এই তিনটি ভাগের ব্যাখ্যা করিব।

পাঠককে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ ধ্যান-ধারণা-নিদি ধ্যাসনের চেষ্টায় একটা দিকের উৎকর্ষ হয় মাত্র। উহাতে পূর্ণ মানবত্ব ফুটে না। তাহা ছাড়া ঐ পথে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সাধককে আরও কিছু কাজ করিতে হইবে। সেই কাজই ঐ সিদ্ধিলাভের কৌশল। নির্মল চরিত্রে চরিত্রবান হইয়া ধ্যান-ধারণার পথে যাইতে হইবে, এইটিই সেই কার্য্য, এইটিই সেই কৌশল, ইহাতেই ফল ফলিবে। সাধনার পথে অগ্রসর হইবার বিস্তর উপদেশ আছে। পুরাকাল হইতে এই উপদেশ চলিয়া আসিতেছে, সকলেই উহা শুনিয়াছে. জীবনের কোন্ অবস্থায় কোন উপদেশ পালন করিয়া চলিতে হইবে, বুদ্ধের উপদেশমধ্যে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। "অদৃশ্য সহায়" নামক পুস্তিকার মধ্যে সে বিষয়েব একটা তালিকা করিয়া দেওয়া গিয়াছে। সাধন-মার্গে যাইয়া আমাদিগকে কি করিতে হইবে, সেটা জানা বিশেষ কঠিন নহে, উপদেশগুলিকে কার্য্যে পরিণত করাই শক্ত।

একাগ্রতা বা ধারণা

উচ্চ অঙ্গের দিব্যদৃষ্টি লাভ করিবার পক্ষে প্রথম কার্য্যই—একাগ্রতা। একাগ্রতা অর্থে অনেকে বুঝেন যে, আমাদিগকে বুঝি কোন একটা উজ্জ্বল বস্তুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া মনের বৃত্তিগুলিকে আড়ষ্ট অকর্মণ্য করিয়া বোধশক্তিকে সূক্ষ্মজগৎদর্শিনী করিয়া তুলিতে হইবে. না, আমি সেরূপ কথা বলিতেছি না। অভ্যাস দ্বারা মনের উপর এমন একটা ক্ষমতা আনিতে হইবে যে, মনকে যাহা বলিব, মন তাহাই করিবে। যতক্ষণ ইচ্ছা, সেখানে ইচ্ছা, মনকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিব। ইহাকেই আমি ধারণা বা একাগ্রতা বলিতেছি। এটি এক সহজ কার্য নহে ; যত কঠিন কাজ আছে, এটিও তাহার মধ্যে একটা। মনকে আটকাইয়া রাখা কঠিন হইলেও আট্‌কাইতে পারা যায়, কারণ, অনেকে ঐরূপভাবে আট্‌কাইয়াছেন। প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে মন আটকা পড়িয়াছে এরূপ শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মন যে আমাদের অনায়ত্ত, এ কথাটি বোধ হয়, আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না বা কোন দিন ভাবেনও নাই। যখন তুমি একটা বড় রাস্তা দিয়া যাইতেছে, বা ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়া চলিয়াছ, তখন হঠাৎ "কি চিন্তা করিতেছ, আর কেনই বা করিতেছ" এইটি অনুসন্ধান করিবে। তোমার ঐ চিন্তার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে। তখন দেখিবে, গত ৫ মিনিটের কত রাশি রাশি

বিশৃঙ্খল চিন্তা আসিয়া তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে দিয়া গমন করিয়াছে, ঐ রকম কত চিন্তা তখনও মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, আবার কতকটা সেখান হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। তাহাদের ছাপ পর্য্যন্তও মস্তিষ্কের মধ্যে পড়িতেছে না। চিন্তার প্রকৃতি অনুসন্ধান করিতে বসিলে তুমি ধীরে ধীরে বেশ বুঝিতে পারিবে যে, ঐ বিশৃঙ্খল চিন্তাগুলি আদৌ তোমাব চিন্তা নহে ঐগুলি অপরেব চিন্তার পরিত্যক্ত টুক্‌রা টাক্‌বা।

প্রকৃত কথা এই যে, চিন্তা একটি শক্তি ব্যতীত আর কিছু নহে। চিন্তা কবিলেই বোমের উপব একটা ছাপ পড়ে। আমরা যখন কোন এক ব্যক্তির সম্বন্ধে তীব্র চিন্তা কবিযা বসি, তখন সেই চিন্তা তাহাব কাছে গিয়া ওঠে। আমবা যদি আমাদিগের নিজেব চিন্তা করি, তাহা হইলে সেই চিন্তা আমাদের কাছে কাছেই ঘুরিযা বেড়ায়। কিন্তু আমাদের অনেক চিন্তাই তীব্র নহে, বা কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া করি না। সেইগুলি বিশৃঙ্খলভাবে অদৃশ্যমান অবস্থায ব্যোমেব উপর ভাসিয়া বেড়ায়। উইহারা যে স্থানে অবস্থান করিতেছে, যদি কোন ব্যক্তি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে তাহার মস্তিষ্কেব ভিতর উহারা প্রবেশ কবিতে থাকে। আমবা একটি রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে কত কি ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে যাই, আর সেই পাতলা পাতলা চিন্তাব মূর্তিগুলি বিশৃঙ্খলভাবে আমাদের পিছনে রাস্তাব উপর ব্যোমের মধ্যে বিচরণ করিতে থাকে। পবে অন্য কোন লোক যেমন ঐ পথে আসে, অমনই ঐ বিশৃঙ্খল চিন্তামূর্তিগুলি তাহার মনেব মধ্যে যাইয়া হাজির হয়। আগন্তুকেব মনে যদি অন্য কোন তীব্র চিন্তা না থাকে, তবে উহাবাই তাহাব মনটাকে অধিকার কবিয়া বসে। আবার অনেক সময় তাহাব মনের মধ্যে না থাকিয়া, খুব শীঘ্রই বাহিব হইযা যায়, যাইবাব সময় তাহাব মস্তিষ্কেব উপব খুব পাতলা একটা ছাপ রাখিয়া যায় মাত্র। কিন্তু আগন্তুক ঐ বিশৃঙ্খল চিন্তাব কোন কোনটায একটু আনন্দ বা একটু তৃপ্তি বোধ কবে। সেইগুলি মনের মধ্যে অনেকক্ষণ তোলাপাড়া কবে ; তাই সেগুলি মন হইতে যাইবার সময় আগন্তুকেব চিন্তাশক্তির প্রভাবে অনেকটা শক্তিশালী হইয়া যায। অপবের চিন্তা হইলেও আগন্তুক খানিকটা সমযের জন্য তাহাকে নিজের চিন্তাই করিয়া লয। তাই তাহার নিজের ভাবে উহাকে ভাবিত বা রঞ্জিত কবিয়া তুলে। একটা ঘবে হয় তো কত লোকেব কত ভাল মন্দ বিশৃঙ্খল চিন্তা ঘুবিযা বেড়াইতেছে। আমরা কোন ঘবে প্রবেশ কবিলেই অপরের ঐ চিন্তা বাশিব মধ্যে যাইয়া ওঠি। ঐ চিন্তাগুলির অধিকাংশই খুব পাতলা কুয়াসাব মত হইয়া থাকে।

দিব্যশক্তি লাভ কবিতে হইলেই মনকে আয়ত্ত কবিতে হইবে। মন কাজ না পাইলে চারিদিকে ছুটিযা বেড়ায়। তাই উহাকে কিছু কাজ দিতে হইবে। কাজ না পাইলে, যে সকল চিন্তা আমাদেব নহে, মন সেইগুলি টানিযা নিজেব মধ্যে আনে, আর তাহাদের সঙ্গে খেলিতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অপবেব সেই সকল চিন্তা আমাদের আদৌ আবশ্যক নহে। দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে গিযা প্রথমেই স্মবণ বাখিতে হইবে যে, মন আমাদের প্রভু নহে, মন আমাদের ভৃত্য। আমবা উহাব আযত্ত হইব না, উহাকেই আয়ত্ত করিব। মনই আমাদের প্রধান অস্ত্র। উহা দ্বাবাই কার্য করিতে হইবে।

এই যে একাগ্রতার কথা বলিলাম, এটি অতীব কঠিন ; সাধাবণ শ্রেণীব লোক সহজে এটুকু কবিয়া উঠিতে পারে না। ওরূপ কবা তাহাব অভ্যাস নাই, আব ওরূপ যে কবা যাইতে পারে, তাহাও সে জানে না। আচ্ছা, একটা কথা ভাবিয়া দেখ। মনে কব, তোমার মনটি যেমন তোমার অনায়ত্ত, হাত একখানিও যদি ঐরূপ হইত; তুমি মনে কব, একটি দ্রব্যেব উপব তোমাব

হাতখানি রাখিতে যাইতেছ, হাতখানি অন্য দিকে চলিয়া গেল, যদি এইরূপ ব্যাপার হইত, তাহা হইলে তুমি কিরূপ ভাবিতে? তোমার মনে হইত, হাতখানিতে পক্ষাঘাত হইয়াছে, তাই ওরূপ অকর্মণ্য হইল। মন যদি অনায়ত্ত হয়, তবে সেটাও একটা ভযানক মানসিক পক্ষাঘাত সন্দেহ নাই। এ ক্ষেত্রে মনের ঐ পক্ষাঘাত দূর করিতে হইলে, যত দিন না মন বশে আসে, তত দিন তোমাকে অভ্যাস করিতে হইবে। তত দিন মনকে বশ করিবাব, আয়ত্ত করিবাব চেষ্টা কবিবে। যখন আপন ইচ্ছামত মনকে ব্যবহার করিতে পারিবে, তখনই বুঝিবে যে মন বশে আসিয়াছে। সুখের বিষয়, আমবা সারাটা জীবনই সংসারের সাধারণ কাজকর্মের মধ্যেও এই একাগ্রতাব অভ্যাস করিতে পারি। তুমি যাহা কিছু করিবে, বেশ ভাল করিয়া করিবে। কাজ কবিবার সময সমস্ত মনটুকু কাজে নিয়োগ করিবে। যখন তুমি একখানা পত্র লিখিবে, তখন প্রতি অক্ষরটির কথা ভাবিবে, যতক্ষণ ঐ অক্ষরটি লেখা শেষ না হয়, ততক্ষণ অন্য ভাবনা ভাবিবে না; এইরূপভাবে লিখিলে লেখা খুব ভাল হইয়া উঠিবে। একখানা পুস্তক পাঠ করিবার সময় মনটিকে উার উপর নিবিষ্ট কবিয়া গ্রন্থকারের মনেব ভাব সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবে। যখনই কোন চিন্তা করিবে, তখনই বেশ হুঁস কবিয়া দেখিবে যে, কোন্ বিষয় চিন্তা কবিতেছ, আর কেনই বা করিতেছ। বেশ ভাল বিষয়ে মনটাকে নিযুক্ত বাখিবে। উহাকে অলস হইতে দিবে না। যে সময মনের হাতে কাজ থাকে না, তখনই অসৎ চিন্তা আসিযা জুটে।

তোমাব সম্পূর্ণ একাগ্রতা কখন কখন দেখা যায়। বল দেখি,সে কখন্? যখন কোন একটা বিষয় তোমাব খুব ভাল লাগিয়া যায়, তখন তুমি উহাতে তদ্‌গত-চিত্ত হইয়া পড। তখন তোমার কাছে কে কি বলিল বা কেকি করিল, সে দিকে তোমার লক্ষ্যই থাকে না। ইহাবই নাম যথার্থ একাগ্রতা।

পারিষদ্‌বৃন্দ ও জলের কলসীর গল্প

প্রাচ্যদেশে বেশ একটা গল্প আছে। গল্পটা এই ,—এক রাজার কতকগুলি পাবিষদ নাস্তিক শ্রেণীব লোক ছিল। তাহাবা কিছু বিশ্বাস কবিত না। তাহারা শুনিয়াছিল, সাধু-সন্ন্যাসীবা যখন ধ্যাননিরত থাকেন, তখন তাঁহাদেব সম্মুখ দিযা সেনা বাহিনী চলিযা গেলেও তাঁহারা টেব পান না। এই কথাটি পাবিষদরা বিশ্বাস কবিল না। রাজা বলিলেন—এ কথা খাঁটি সত্য। আমি তোমাদিগকে এক দিন ইহার প্রমাণ দিব। কিছু দিন পরে বাজা এক দিন পাবিষদগুলিকে বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকে এক একটি জলের কলসী মাথায কবিযা নগরভ্রমণ করিয়া এস, কলসীতে জল কানায কানায় পূবা থাকিবে, তোমাদের সঙ্গে উলঙ্গ তববারি হস্তে প্রহরী থাকিবে, যাহার কলসী হইতে এক ফোঁটা জল টল্‌কাইযা মাটিতে পড়িবে, তখনই প্রহরী তাহার শিরশ্ছেদ করিবে। সাবধান। জল যেন একটুও পড়ে না।" তাহাবা আব কি করে! তখন প্রত্যেকে এক একটি জলপূর্ণ কলসী মাথায লইযা সহবের বড একটা রাস্তা ঘুবিতে চলিল। তরবারি হস্তে প্রহরীও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিছু সময পরে তাহাবা ঘুবিযা আসিল। বাজা সহাস্যবদনে তাহাদিগকে আদর অভ্যর্থনা কবিয়া কাছে বসাইযা জিজ্ঞাসা কবিলেন,—"তোমবা তো খুব বড একটা রাস্তা ঘুবিযা আসিলে, কিন্তু কে কি দেখিয়া আসিলে, বল দেখি?" সকলেই বলিল—"কিছুই দেখি নাই , কেন না, আমাদেব সমস্ত মনটা জলেব দিকে ছিল, কখন্ জল পড়িয়া যাইবে, আর আমবা কাটা পড়িব, কেবল তাহাই ভাবিতেছিলাম। জল যাহাতে না পড়ে,

কেবল সেই বিষয়ে সাবধান হইয়াছিলাম। তাই অন্য কিছু চোখে পড়ে নাই।” শুনিয়া রাজা বলিলেন—“তবেই দেখ, কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট হইলে একাগ্রতা আসে কি না! সাধুসন্ন্যাসীরা ধ্যান-নিরত হইলেও তাঁহাদের ঐরূপ দশা ঘটে।”

ধ্যান

যখন তোমাদের ঐ প্রকার একাগ্রতা আয়ত্ত হইয়া আসিবে, তখন তোমরা সাধনার দ্বিতীয় স্তরে যাইতে পার। পারিষদদের ঐ একাগ্রতা ভয়জনিত। সাধকের একাগ্রতা ইচ্ছাশক্তি-জনিত হওয়া চাই। দ্বিতীয় স্তরের নাম—ধ্যান। এটিও সহজসাধ্য নহে। এটি অতীব কঠিন। কিন্তু তাহা হইলেও করা যায়। আমাদিগের অনেককে ইহা করিতে হয়। মন আয়ত্ত হইয়া আসিলে ধ্যানের সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। ধ্যান করিবার জন্য নিজের সুবিধামত একটা সময় ঠিক করিয়া লইবে। খুব ভোরবেলাটা হইলেই ভাল হয়। সেই সময় মাথা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। ধ্যান করিবার সময় মন প্রশান্ত থাকা আবশ্যক। ভোরের সময়টাই ধ্যানের পক্ষে উপযুক্ত সময় বলিলাম বটে, কিন্তু সকলের পক্ষে ঐ সময় উঠিয়া ওঠা সহজ নহে। পূর্বের মত এখন তাহার রীতি নীতি নাই। বর্তমান সভ্যতার হেঁপায় পড়িয়া আমরা সময়ের ভাগ বিশ্রী করিয়া তুলিয়াছি। আগে দুপুর বেলাটাকেই দিনের মধ্যভাগ বলা যাইত, এখন তাহা বলা চলে না। এখন রৌদ্র উঠিলেও আমরা বিছানায় পড়িয়া থাকি, আবার বহু রাত্রি পর্যন্ত আলোর সম্মুখে জাগিয়া বসিয়া চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলি। এখনকার সভ্যতার ইহাই রীতি, তুমি যদি সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা কর, তবে ধ্যানের একটা সময় ঠিক করিয়া লইবে। সময়টা যেন প্রত্যহ একই সময়ে হয়। আর, প্রত্যহই যেন কার্যটা করা হয়, একদিনও বাদ না পড়ে। আমরা জানি, প্রত্যহ যদি ব্যায়াম করা যায় তবে বেশ সুফল ফলে। আজ অনেকটা ব্যায়াম করিলাম, দুই দিন আর কিছুই করিলাম না, আবার এক দিন গলদ্‌ঘর্ম হইয়া কুস্তী করিলাম, এরূপ প্রণালীতে ব্যায়াম করিলে কোন ফল হয় না। “ধ্যান” অভ্যাসের বেলায়ও সেই কথা। বাদ পড়িলে কোন সুফল ফলিবে না, প্রত্যহই অভ্যাস চাই।

ধ্যান করিবার সময় [illegible] বেশ [illegible] সঙ্গে একটি স্থানে বসিবে। কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে না [illegible] একটা নির্জন স্থানে হইলেই ভাল হয়। বসিয়া, কোন একটা উচ্চ [illegible] আবশ্যক [illegible] একাগ্রতার সঙ্গে তোমার মনটিকে নিবিষ্ট করিবে, আমরা থিওসফি সম্প্রদায়ের [illegible] কোন্ বিষয়ে মন স্থির করিব, তাহা ঠিক করিয়া ওঠা আমাদের পক্ষে কঠিন নহে। আমাদের [illegible] বিস্তর বিষয় জানা আছে। তুমি তোমার চিন্তার বিষয় ঠিক করিয়া লইবে। ক্যাথলিক সম্প্রদায় সকল নৈতিক গুণের উপদেশ দেন, ইচ্ছা হইলে তুমি ঐরূপ একটি গুণের [illegible] পার। যদি ঐরূপ গুণই চিন্তার বিষয়ীভূত বলিয়া পছন্দ কর, তবে ধ্যানের [illegible] পুনঃ পুনঃ গুণটির কথা ভাবিতে থাকিবে। ভাবিতে থাকিবে উহা স্বর্গীয় গুণ [illegible] তোমার চক্ষুস্পর্শে উহার অভিব্যক্তি হইতেছে, ঐ অভিব্যক্তি [illegible] হইতেছে, তাহা ভাবিতে থাকিবে। পুরাকালে মহাত্মারা এ গুণ কখন কেমন করিয়া [illegible] দেখাইয়াছিলেন, তাহা ভাবিবে, দৈনিক জীবনে নিজে কেমন করিয়া উহার [illegible] দেওয়া উচিত ছিল, অথচ দাও নাই বা দিতে পার নাই, তাহা চিন্তা করিবে। ধ্যানের [illegible] ঐরূপ এইরূপ ভাবে চিন্তা করিতে থাকিবে। কোন একটা

আসিবে—যে দিন হঠাৎ তোমার চোখ খুলিয়া যাইবে। তখন তুমি দেখিবে যে, ঐ আদর্শের সঙ্গে তুমি অভিন্ন। তখন তুমি ঐ আদর্শকে নূতন ভাবে দেখিতে থাকিবে—সে রকম ভাব তোমার চোখে আর কখনই পড়ে নাই। তোমার উপর যেন একটা নবীন ও বিস্ময়কর আলোক আসিয়া পড়িবে। তখন সমগ্র জগৎ তোমার চক্ষুতে অন্যরূপ বোদ হইতে থাকিবে। তখনই তুমি প্রকৃত জীবনের আস্বাদ পাইবে, বাঁচিয়া থাকার অর্থ কি, তখনই তাহা বুঝিবে, তখন আগেকার জীবনটা তোমার কাছে অন্ধকার ও মৃত্যুর মত বলিয়া বোধ হইবে।

ঐ ভাবটি অল্পসময়ের মধ্যেই চলিয়া যায়। আবার এই পার্থিব জ্ঞান আসিয়া পড়ে। তুলনায় মনে হয়, আবার একটা অন্ধকার রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। সাধক! হতাশ হইও না, নিদিধ্যাসন প্রত্যহই করিতে থাক। তাহা হইলে ঐ সুখের অবস্থা আবার আসিবে। প্রত্যহই আসিবে, প্রত্যহই চলিয়া যাইবে। কিন্তু দিন দিন ঐ অবস্থাটা স্থায়ী হইতে থাকিবে। পরিশেষে তোমার সম্মুখে হইতে ঐ স্বর্গীয় ভাবটা আর যাইবে না। তখন আর স্বর্গীয় সুখটা ক্ষণ-প্রভার মত ক্ষণিক বলিয়া মনে হইবে না। তখন অনুক্ষণই স্বর্গের অনুপম শান্তোজ্জ্বল মূর্তি তোমার সম্মুখে প্রকট থাকিবে। দিবারাত্র একটা অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের আস্বাদ পাইতে থাকিবে, তখন জীবনটি সেবা ধর্মে অনুরঞ্জিত হইয়া সুখময় ও সুন্দর হইয়া উঠিবে। তখনকার সে অবস্থাটি অনির্বচনীয়, অতুলনীয়। তবুও সেটা পূর্ণ সুখের চিত্র নহে। উহা অপেক্ষা সহস্র গুণ সুখের অবস্থা আরও আছে। মানুষ পরে তাহাই ভোগ করে। চেষ্টা করিলে, সাধনা করিলে, সকলেই সেই অনুপম সুখের অধিকারী হইতে পারে। নিদিধ্যাসন করিতে করিতে যখন ঐরূপ জ্ঞান ফুটিয়া ওঠে, তখন যদি তুমি চারিদিকে চাহিয়া দেখ, তাহা হইলে বিস্তর অলৌকিক ব্যাপার তোমার চক্ষুতে পাড়িবে। সে সব ব্যাপার যে আছে, তাহা তুমি পূর্বে কখনই ভাব নাই। যাঁহারা সূক্ষ্ম জগতেব গবেষণাকারীদেব গবেষণা-ফল নিজেরা বুঝিযা দেখিবার চেষ্টা কবেন, কেবল তাঁহারাই নিদিধ্যাসনের পূর্বে ও ভুবর্লোকের কিছু কিছু ঐশ্বর্যের পরিচয় পাইয়া থাকেন।

সাধক, অক্লান্ত চেষ্টা কর, তাহা হইলে তুমি দিন দিন উন্নত হইয়া উঠিবে। ক্রমে ভুবর্লোক অপেক্ষাও সুখের জগৎ তোমার সমক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সেই নবীন জগতেব ঐশ্বর্য দেখিযা তুমি বিস্ময় বিহ্বল হইয়া পড়িবে। ভুবর্লোক ভূলোক অপেক্ষা যত বেশী মধুর, সেই নূতন জগৎটা ভুবর্লোক অপেক্ষাও তত চমৎকার। সেখানে দৃষ্টি পড়িলে ভুবর্লোকের জীবনটি তোমার কাছে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। তখন আর একবার মনে হইবেযে, এইবারই যথার্থ জীবনের আস্বাদ পাইলাম। তখন মনে হইবে, জীবনটা যে এত মধুর, তাহা ইহার পূর্বে জানিতাম না। উন্নত হইতে হইতে তুমি ভগবানেব কাছে যাইয়া উঠিবে। তিনিই একমাত্র বিশ্বব্যাপী জীবন, তিনিই পূর্ণ সত্য ও অখণ্ড সৌন্দর্য।

তোমরা বলিতে পার, এতটা উৎকর্ষলাভ করিতে হইলে বহু বৎসরের সাধনা আবশ্যক। হাঁ, সে কথা অসম্ভব নহে , কেন না, বহু জন্মে যে ক্রমোন্নতি ঘটিত, তাহা এক জন্মেই তোমরা লাভ করিতে চাহিতেছ। কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়া বু পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও যদি অতটা উৎকর্ষ করিয়া লওয়া যায়, তবে সেটাও খুব বেশী লাভ মনে করিতে হইবে। এক জীবনে যদি বহু জীবনের কাজ করিয়া লওয়া যায়, তবে কি সেটা কম লাভ? সে অবস্থায় সময় ও শ্রমের হিসাব করিলে চলিবে কেন? কোন এক ব্যক্তি কত দিনে সিদ্ধিলাভ করিবে, তাহা কেহই বলিয়া দিতে পারে না। সিদ্ধিলাভের পক্ষে দুইটি ব্যাপার বিবেচ্য। একটা অবিদ্যার আবরণ, অপরটা সাধকের উৎসাহ ও সঙ্কল্প। মায়া-মমতা প্রভৃতির আবরণ ছিন্ন করিয়া প্রকৃত জ্ঞানের

উন্মেষ করিয়া যাইতে হয়। যাহার আবরণ যত পুরু, তাহাকে তত শ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহার তত সময় লাগে। আবার, যিনি যত উৎসাহী যাঁহার সঙ্কল্প যত দৃঢ়, তিনি তত শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করেন। যাঁহাব উৎসাহ, সঙ্কল্প শিথিল, সিদ্ধিলাভে তাঁহার বিলম্ব ঘটে। সাধক! তুমি এত দিনে সাধন মার্গে সফলমনোবথ হইবে, আমি এমন কোন অঙ্গীকার করিতে পারি না। আমি শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, তোমার পূর্বেও অনেকে সাধন মার্গে আসিয়াছিলেন, আর তাঁহারা সিদ্ধিলাভ কবিযা গিয়াছেন। যাঁহারা এখন মহিমা-মণ্ডিত জ্ঞানগুরু, তাঁহাব সকলেই এক দিন আমাদেব মত সাধারণ শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। তাঁহারা যখন উঠিয়াছেন, তখন আমরাও উঠিব। নিশ্চয়ই উহাদের মত হইব। আমবা ক্ষীণতর শক্তিসম্পন্ন হইলেও, আমাদের মধ্যে অনেকে সাধন মার্গে যাইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের কাহার কাহার সুফল বেশী হইয়াছে কাহার কাহাব বা কম। কিন্তু সাধন মার্গে আসিযা কেহই অনুতপ্ত নহেন ; কেন না, অল্প হোক, অধিক হউক, যিনি যতটুকু উপকাব পাইয়াছেন, ততটুকুই তাঁহার শাশ্বত সম্পদ্। সেই উৎকর্ষ, উন্মেষটুকু জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিবে। কেন না, সেটা আত্মার উন্নতি। স্থূল দেহের সঙ্গে তাহার বিলোপ ঘটে না। ঐ উৎকর্ষ তন্দ্রাচ্ছন্ন মিডিয়মের জ্ঞান দৃষ্টির মত অস্থায়ী ও শিথিল নহে। উহা আত্মার উন্নতি ; তাই স্থায়ী। তাই পূর্ণ প্রভাবে আমবা ঐ উৎকর্ষের সুবিধা ভোগ কবিতে পাবি। দ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি দ্বাবা যে উৎকর্ষ জন্মে, তাহা মহিমামণ্ডিত উন্নত জীবনেব শক্তি। মানুষমাত্রেই কোন দিন না কোন দিন ঐ শক্তি লাভ কবিতে পরিবে।

সাধন-মার্গে যাইবার পূর্ব্বে প্রস্তুত হইতে হয়

সাধন-মার্গে প্রবৃত্ত হইয়া যিনি নিজের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন করিতে চান, সর্বপ্রথমে তাঁহাকে নিজেব হৃদয়ের পবিত্রতা সাধন করিয়া লইতে হইবে। মনে প্রানে সম্পূর্ণরূপ নিষ্পাপ, নির্মল, পবিত্র না হইলে কেহ যে সাধনমার্গে না যান। পবিত্র হওযাই প্রথম ও প্রধান কার্য। পবিত্রতা সাধন করিতে হইলে সাধককে স্থূল-দেহ, লিঙ্গ-দেহ অর্থাৎ বাসনা-দেহ আর মানস-দেহ এই তিনটিকেই পবিত্র কবিয়া তুলিতে হইবে। তাঁহাকে দেহেব অশুচি ও প্রিয় পাপগুলি ত্যাগ করিতে হইবে। মাছ-মাংস আহাব করিলে ও মদ্য, তামাক প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করিলে শবীর অপবিত্র হইয়া ওঠে। তাই এগুলি ত্যাগ করিবার প্রয়োজন। সাধকের সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কাব-পবিচ্ছন্ন, শুদ্ধ ও পবিত্র হওযা আবশ্যক ভূলোক, ভুবর্লোক সর্বত্রই তাঁহাকে পবিত্র থাকিবার চেষ্টা কবিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশুচি ত্যাগ কবিবেন কি না, তাহা সাধক নিজেই যেন ভাবিযা দেখেন। সেটা তাঁহার নিজেব উপরেই নির্ভব করে। একটা প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, মানুষ একই সময়ে ভগবান ও শযতান দুজনেবই কার্য কবিতে পাবে না। পৃথিবীতে কদাচাবী ব্যক্তিবা যে একেবারেই জ্ঞানদৃষ্টি লাভ কবিতে পারে না, এমন কথা আমি বলিতেছি না। তবে সুস্পষ্টভাবে দৃঢ়তাব সঙ্গে বলিতেছি যে, অশুচির অবস্থায় সাধন মার্গে গেলে কখনই বিপন্মুক্ত হওয়া যায না। আব অপবিত্র হস্তে পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিলে ভয়ানক বিপদে পড়িতে হয়।

সাধন-মার্গীকে মনেব খুঁটি নাটি ত্যাগ কবিতে হয়। সংসারের তুচ্ছ বিষয় লইয়া মনে অশান্তি ঘটাইতে নাই। কর্তব্যজ্ঞানে পৃথিবীর কার্য প্রাণপণ-যত্নে করিয়া যাইতে হয়। কার্য্যের মধ্যেস্বার্থের চিন্তা আনিযা ফেলিতে নাই। ফলভোগ করিব, এমন চিন্তা মনে আনিবে না। কার্যের ফল

পুর্নজন্ম

প্রাচীন কালে গ্রীসদেশে দুইটি সহোদর বাস করিত। পিথাগোরস প্রবর্ত্তিত দার্শনিক আলোচনায় তাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে খুব বেশী সৌহৃদ্য ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শুধু দর্শন লইয়াই ব্যস্ত, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুইটি দিকের আলোচনা করিত। দর্শনেব আলোচনাও করিত, তাহা ছাড়া স্থপতিবিদ্যারও পক্ষপাতী ছিল। সে সময় সে এক জন বিখ্যাত শিল্পী বলিয়া পরিচিত হইয়া ওঠে। এই কলা বিদ্যার অনুশীলনে কনিষ্ঠকে প্রায় অর্দ্ধেকটা সময়েরও বেশী নিয়োজিত করিতে হইত। অবশিষ্টাংশ দর্শনে দিত। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সময় কাটিতে লাগিল। শেষে বৃদ্ধ হইয়া তাহারা মারা গেল। তাহাদের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠতা ছিল যে, পুনর্জন্মের সময় তাহাদের একসঙ্গে জন্মান আবশ্যক না হইয়াই পারে না। কিন্তু সেটা লইয়া বড় গোল বাধিল। মরণের পর ভু বর্লোক হইয়া দুই জনই স্বর্গে গেল। কিন্তু এক জন সেখানে বেশী দিন থাকিবার অধিকার পাইল। আর এক জনের অল্পদিন পবেই ফিরিবার কথা। এ ক্ষেত্রে দুই জন কি করিয়া একসঙ্গে জন্মায়? ষোড়শ শতাব্দীর প্রাবম্ভেই কনিষ্ঠকে আসিয়া জন্মিতে হইল। জ্যেষ্ঠ আরও তিন শত বৎসবের অধিককাল স্বর্গে থাকিল।

আমাদের মনে হয়, কর্ম-ফল-বিধাতৃগণের পক্ষে এ দুইটি সহোদরকে পুনরায একত্র কবিয়া তোলা বড়ই কঠিন কার্য্য। কিন্তু এটি তাঁহাদের কাছে খুবই সহজ। পৃথিবীতে আমরা শুভকার্য্য করিয়া যে শক্তি লাভ করি, যত দিন সে শক্তি ক্ষয় হইয়া না যায়, তত দিন আমরা স্বর্গে থাকি। জ্যেষ্ঠ সহোদর একাগ্রতার সঙ্গে দর্শনেব আলোচনা করিয়া যে শক্তি অর্জন কবিয়াছিল, তাহার ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত সে স্বর্গে থাকিবাব অধিকার পাইল। স্বর্গভোগ মানুষের অর্জিত শক্তির উপরই নির্ভর করে। কেহই ঐ ভোগেব কাল ইচ্ছা করিলে কমাইতে বা বৃদ্ধি করিতে পারে না। কখন কখন ঘনীভূত সুখের ভোগ দ্বারাও স্বর্গে থাকিবাব কালকে কমাইয়া আনা হয়। কিন্তু সেটা বিশেষ ঘটনা হইতে দেখা যায়। ইহাদের বেলায় সেরূপ কিছু হইবার কথা নহে। সহোদব দুইটিকে একত্র করা বাহ্যতঃ কঠিন হইলেও অতি সহজে তাহাদিগকে একত্র কবা হইযাছিল। কনিষ্ঠের স্বর্গভোগের কাল ফুবাইয়া গেলেই তাহাকে ইউরোপের মধ্য অঞ্চলে জন্মিতে হইল। জন্মের পর বাল্যজীবনেই তাহার শিল্পের দিকে ঝোঁক দেখা গেল। কিন্তু এবারকার শিল্পটা অন্য রূপ। এবার তাহাকে নক্শা-শিল্পে প্রবৃত্ত হইতে হইল; কেন না, এ জন্মের পিতা ঐ কাজ করিতেন। এ দিকেও তাহার যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখা গেল। সকলেই ভাবিল, ছেলেটি কালে নকশায় খুবই উন্নতি করিবে। এমন সময় হঠাৎ সে দেশব্যাপী মড়কে মারা গেল। তখন তাহার বয়স ২০ বৎসরও হয় নাই। এত অল্পবয়সে তাহার মৃত্যু হওয়ায় সকলেই বিলাপ কবিতে লাগিল। সকলেই বলিতে লাগিল—"এই যুবক মারা যাওয়ায় শিল্পটার খুবই ক্ষতি হইল।" এরূপ একটা রত্ন নষ্ট হওয়ায় সকলেই মর্মাহত হইয়া পড়িল।

এই ব্যাপারটি আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। কুড়ি বৎসর মাত্র বাঁচিয়া থাকায় যুবক নক্শা শিল্পে যথেষ্ট পরিণাম শক্তির প্রয়োগ করিতে পারে নাই অথচ নক্শার উন্নতি করিবে বলিয়াই প্রাণের ইচ্ছাও খুব বেশী। ইহার ফলে পৃথিবীর অপেক্ষা অনেক দিন তাহাকে ভুবলোকে থাকিতে হইল, স্বর্গে আর বেশী দিন থাকিতে হইল না, কাজে কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আবার পৃথিবীতে আসিয়া জন্মিতে হইল। এ দিকে এই জন্মটার প্রায় তিন বৎসর পূর্বে যুবকের পূর্বজন্মের সেই স্বর্গবাসী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও জন্মিয়াছিল। দুই ভাই আবার একই মায়ের পেটে আসিয়া জন্মিল।

শৈশবকালে মরা একটা সৌভাগ্য

সাধারণ লোকে মনে করে, যারা অল্পবয়সে মরে, তাহারা বড়ই হতভাগ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। উপরেব ঘটনায় দেখা য়ায়, বাল্যকালে মরিলে তাহাতে শুভ ফলই ফলে। কুড়ি বৎসর বয়সে না মরিয়া যুবক যদি অনেক দিন বাঁচিত, তবে নক্‌শা বিদ্যার খুব উন্নতি করিত সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্বজন্মের সেই দর্শন শিখিবার ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিবার বৃত্তির অনুরূপ উন্নতি ঘটিত না। সে বৃত্তিটা মলিন হইয়া যাইত। দর্শন শিখিবার ইচ্ছাটাও পূর্বজন্মে কম ছিল না। সে জন্মে যুবক দার্শনিক তথ্য জানিবার জন্য জোহান্ টলার, নিকোলাস্ অব্ ব্যাসেল্, খৃশ্চিয়ানা মার্গারেথা এল্‌নার ও হেন্‌রিচ্ শুশোব উপদেশে উপদিষ্ট ও ভাবে অনুপ্রণিত হইয়া উঠিয়াছিল। নক্‌শা লইয়া দীর্ঘ জীবন ভোগ কবিলে দর্শনের পিপাসা মিটিবার সুযোগ আসিত না। ঐই অল্পবয়সে মৃত্যু হইল। মৃত্যু হওয়ার সে পিপাসা মিটিবার সুযোগ ঘটিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া থিওসফি আলোচনায প্রবৃত্ত হইল। এই উপায়ে তাহারা দার্শনিক তথ্য ও অতীন্দ্রিত-শক্তি লাভের প্রশস্ত সবণী দেখিতে পাইল। অতএব ষোড়শ শতাব্দীর সেই তরুণ বয়সের মৃত্যুটা যুবকের পক্ষে উপকারজনকই হইয়াছিল।

পরিবর্তিত জীবন

এই ঘটনা হইতেই আমরা অকাল মৃত্যুব কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি। চেষ্টা করিলে তাহাতে মৃত ব্যক্তির শুভও দেখিতে পাই। আবার অনেক সময় শুধু এই বিবরণটিতেই সকল মরণেব মীমাংসা করিযা ওঠা যায না। আরও উদাহরণ স্থলের প্রয়োজন হয়। আমরা আর একটি বিবরণ বলিতেছি। এক জন থিওসফি সম্প্রদায়ের যুবক একই পবিবারে দুইবার আসিয়া জন্মিয়াছিল। যুবক প্রথম জন্মে মাত্র কয়েক সপ্তাহ জীবিত ছিল। তাহার পর মরিল। কয়েক বৎসর পরে ঐ মা বাপের কাছেই আবার আসিয়া জন্মিল। প্রথম জন্মে তাহাব এত শীঘ্র মরণ হইল কেন, জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইল না কেন? এ বিষয়ের গবেষণা চলিতে লগিল। অনুসন্ধানকারীবা প্রকৃত কারণ খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তত্ত্বজ্ঞেরা ভাবিতে লাগিলেন,—"প্রথম জন্ম হইতেই যদি যুবক বাঁচিয়া থাকিত, তাহাতেই বা কি দোষ হইত? মরিয়া কযেক বৎসরের ছোট হইয়া আসায বিশেষ লাভটা কি হইল?" অল্প চিন্তার ফলেই আমরা সুন্দব মীমাংসা করিতে পারিলাম। যুবকেব মাতা পিতা পূর্বে থিওসফির সংবাদ পান নাই, তখন তাঁহাবা ধর্মবিষয়ে অন্যরূপ ধাবণা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। পরে থিওসফির মত জ্ঞাত হইয়া সকলেই একযোগে এই মত গ্রহণ কবেন। প্রথম জন্ম হইতে বাঁচিয়া থাকিলে যুবক এত কম বযসে থিওসফির জ্ঞানে লাভ করিতে পাবিত না। উহাদের পরিবারে ঐ জ্ঞান আসিতে যুবকেব যৌবন উত্তীর্ণ হইযা যাইত। সুতবাং মবিয়া আবার জন্মগ্রহণ করায় যুবক থিওসফিব জ্ঞানে খুবই লাভবান্ হইয়াছিল। এইটুকুই দুইবার জন্মেব পার্থক্য। যাহারা থিওসফির পথে না আসিযা প্রচলিত ধর্মের পথে চলে, তাহারা ইন্দ্রিয় ও সংযম প্রভৃতির কথা বড় একটা ভাবে না। যুবকেব মাতাপিতার হয় তো অনেক রকম মন্দ স্বভাব ছিল। থিওসফির পথে আসায় হয় তো তাঁহারা সংযত হইয়াছিলেন। যুবক প্রথম জন্ম হইতে বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খল আদর্শ দেখিয়া অধঃপাতে যাইয়া পড়িত। মবণ হওয়ায় এই দুর্গতির হাত হইতে

নিস্তার পাইল। দ্বিতীয়বার জন্মিলে শৈশব হইতেই থিওসফির জ্ঞানে মণ্ডিত হইয়া পড়িল। তখন প্রলোভনে পড়িলেও তাহার আর ভয় নাই!

এই ঘটনাটি হইতে আমাদের চোখ আরও ফুটিয়া গেল। তখন আমরা আরও অনেক অকাল মৃত্যুর রহস্য বুঝিতে সমর্থ হইলাম। আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম যে, দ্বিতীয় জন্মটা অনেকাংশে প্রথমটির অপেক্ষা লাভ ও উপকারজনক। দ্বিতীয়টিতেই উৎকর্ষের সুযোগ সুবিধা খুব বেশী— অকাল-মরণে, যে মরে, তাহারও লাভ, তাহার মাতা- পিতারও লাভ। যে মরে, সে অতিকতর সুযোগ সুবিধার মধ্যে আসিয়া জন্মায় ; আবার তাহার মরণে দারুণ আঘাত পাইয়া শোকসন্তপ্ত মাতা-পিতার পূর্বজন্মের সঞ্চিত পাপের ক্ষয় হইযা যায়। ইহা ব্যতীত অকাল-মরণের হয় তো আরও অনেক উদ্দেশ্য, শুভ ফল আছে, সেগুলিকে আমরা আজও জানিতে পারি নাই। তবে বেশী স্থলেই বোধ হয় যে, যত দিন না উপযুক্ত ক্ষেত্র মিলে, তত দিন পার্থিব হিসাবে জীবাত্মার অকাল-মরণই হইতে থাকে। অকাল মরণ মরিয়া মরিয়া শুধু সময় কাটায় মাত্র। মনে করে, এক ব্যক্তি পার্থিব জীবনে নির্দিষ্ট পরিমাণ শুভ শক্তি সঞ্চয় করিয়া মরণের পর ভূবর্লোক হইয়া স্বর্গে গেল। সেখানে ঐ শক্তিয় ক্ষয হওয়ায় আবার আসিয়া জন্মিতে বাধ্য হইল। কিন্তু পার্থিব জীবনের সেই মাতা-পিতার কাছে ঐ ব্যক্তি এত ঋণী যে, জন্মিলে তাঁহাদেরই কাছে জন্মিতে হয়। এ দিকে ঐ মাতা-পিতাও হয তো ভূবর্লোকে বা স্বর্লোকে বহিয়াছেন। সেরূপ ক্ষেত্রে উহার জন্মান্তর টা কিরূপভাবে নিযমিত হয়? এরূপ স্থলে উহার ঐ স্বর্গবাসী মাতা-পিতা যত দিন না পৃথিবীতে আসিযা জন্মান, তত দিন উহাকে পৃথিবীতে আর একটি বার অল্পদিনেব জন্য জন্মিয়া লইতে হয়। তাহার পব উপযুক্ত সমযে সেই পূর্ব মাতা-পিতার কাছে জন্মিয়া দীর্ঘ জীবন ভোগ করে। গবেষণায় আমরা জানিযাছি ২।১ বৎসরের জন্য বাঁচিয়া মরিলেও তাহাব ভাবী জীবনের পবিবর্তন খুব বেশী বকম হইতে পারে। একটা উহা হবণ লইয়া দেখ। মনে কর, একটি শিশু কোন একটি বিশেষ সময়ে জন্মগ্রহণ কবায় কোন একটি বিশেষ গুরুতর প্রভাব পাইয়া উন্নত হইয়া উঠিল। সেই উন্নতির ফলে হয় তো শিশু পৃথিবীপ্রথিত হইল। কিন্তু ঐ শিশু ঐ পরিবাবের মধ্যে যদি আবও ২।১বৎসর আগে জন্মিত, তাহা হইলে সে হয় তো অন্য আর একজন শিক্ষক পাইত, তখন তাহার শিক্ষা অত ভাল না হইলে অত খ্যাতি-প্রতিপত্তিও হইত না। অতএব ভাগ্য সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র প্রকার মূর্তি ধরিয়া বসিত। জন্মের ২।১ বৎসর এদিক্ ওদিক্ হইলেই ভাবী জীবনের এতটা তারতম্য ঘটিতে পারে। ২।১ বৎসর অগ্র-পশ্চাৎ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে শুধু যে শিক্ষা প্রাপ্তিরই তারতম্য ঘটে, তাহা নহে। সামাজিক, নৈতিক, পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক অনেক দিকেব অনেক প্রকার সুবিধা অসুবিধার মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়।

ছোট ছোট ছেলেপুলে মরণের পর কিরূপ অবস্থায় থাকে?

আর একট কথা স্মবণ রাখিতে হইবে যে, মরণের পর ভুবর্লোকে যাইয়া ছোট ছোট ছেলে-পুলেরা মহাসুখে থাকে। যে সব শিশু কয়েক মাসের হইয়াই মরিয়া যায়, তাহারা যেমন স্থূল দেহও আয়ত্ত করিতে পারিত না, মরণের পর তাহাদের লিঙ্গ-দেহ ও বাসনা-দেহও সেইরূপ অনায়ত্ত থাকে। তাই তাহারা ভুবর্লোকে কতকটা অজ্ঞানই হইয়া পড়ে। কিন্তু যাহারা কয়েক বৎসরের হইয়া মরিয়া যায়, যাহাবা খেলাধূলা করিতে, আমোদ-আহ্লাদ করিতে শিখিয়াছে,

তাহারা সেখানে বিস্তর খেলার জিনিস পায়। ভুবর্লোকে ছেলেপুলের সংখ্যা খুব বেশী। তাহাদের খুব স্ফূর্তির প্রাণ, কেহই ম্রিয়মাণ নহে। যাঁহারা ভাল লোক, স্নেহ পরায়ণ, তাঁহারা মরিয়া ভুবর্লোকে গেলেও তাঁহাদের স্নেহ কমে না। এইরূপ অনেকে ভুবর্লোকের ছেলেপুলে-গুলিকে লইয়া খেলাধূলা করেন। শুধু তাহাই নহে, ছোট ছোট ছেলেপুলেরা যদি কোন কিছুতে ভয় পায়, তবে তাঁহারা উহাদিগকে রক্ষা করেন। ছেলেরা গল্প শুনিতে ভালবাসে। গল্পের কত বীরের কথা তাহারা মনে মনে কল্পনা করে। কেহ রবিন্‌সন ক্রুসোর কথা, কেহ আলাদীনের কথা, কেহ বা রিচার্ডের কথা ভালবাসে। পার্থিব জীবনে ছেলেপুলে ঐ সব ব্যক্তি সাজিয়া খেলাধূলা করে। ঐ সাজের মধ্যে কত শত অসঙ্গতি থাকিয়া যায়। কিন্তু মরণের পর যখন আবার ঐরূপ সাজিয়া খেলা আরম্ভ করে, তখন তাহাদের সাজা ঠিক ঠিক রকমের হয়। ভুবর্লোকের সূক্ষ্ম জড়াংশে সে মূর্তি অতি সুন্দর ফুটিয়া ওঠে। সেখানে খেলার সময় নিজেদের নিখুঁত সাজ সজ্জা দেখিয়া তাহাদের কতই আনন্দ হয়। কখন সে "আর্গো" জাহাজের বীরবর জেসন্ সাজিতেছে, কখন বা পারসিউস সাজিয়া অদ্ভুত জুতার গুনে উড়িয়া চলিয়াছে। এইরূপ অবিকল মূর্তি ধরিয়া তাহারা খেলায় মত্ত থাকে।

আমরা জানি, ছেলেপুলেরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া থাকে? এটি তাহাদের স্বভাব। সবই তাহারা ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে চায়। আমরা তাহাদিগকে অনেক সময় একটা কথা হয় তো ভালরূপ বুঝাইয়া দিতে পারি না; তাই বিরক্ত হইয়া উঠি। ভুবর্লোকে তাহাদিগকে কোন কিছু বুঝান খুবই সহজ , কেন না, সেখানে আলোচ্য বিষয়ের মূর্তি গড়িয়া তোলা যায়। আর মূর্তি দেখিলে তাহারা অতি সহজেই বুঝিয়া আনন্দিত হইয়া থাকে। এই পৃথিবীতে যাহা বর্ণনা করিতে হয়, ভুবর্লোকে তাহা দেখাইয়া দেওয়া চলে। শুনার চেয়ে দেখার আনন্দ বেশী। তা দেখিতে পাওয়ায় তাহাদের মহা আনন্দ হয়।

অনেকে ভাবেন, ছেলেদের এত আনন্দ উপভোগের সুবিধা থাকিলেও হয় তো তাহারা সুখী নহে; কেন না, তাহারা মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও সেখানে দেখিতে পায় না। তাহারা বাঁচিয়া থাকার সময় যে সকল বিড়াল, কুকুর , পাখী প্রভৃতি লইয়া খেলাধূলা করিত, সেগুলিকেও সেখানে দেখিতে পায় না। ও জন্য বোধ হয়, খুবই কষ্ট বোধ করে। যাঁরা এইরূপ ভাবেন, তাঁহারা ভুবর্লোকের অবস্থাটি ঠিক ঠিক বুঝেন না। আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা সময় সময় মনে করি, আমাদের অমুক অমুক আত্মীয় মারা গিয়াছে, তাহাদিগকে হারাইয়াছি, আর কখন দেখিতে পাইব না, ইত্যাদি ইত্যাদি; কিন্তু সেই মৃত আত্মীয়েরা সেরূপ মনে করে না। আমাদিগকে হারাইয়াছে বলিয়া তাহারা একটিবারও ভাবে না। তাহারা আমাদের অতি নিকটেই থাকে, আমাদের সূক্ষ্ম-দেহ দেখিতে পায়। তফাতের মধ্যে এই যে তাহারা আমাদিগকে রাত্রিতে পায়, দিনের বেলায় তাহাদের নিকট আমরা নিদ্রিত। তাহারা সকল সময়ই আমাদের সূক্ষ্ম-দেহ দেখিতে পাইতেছে। রাত্রিকালে আমাদের স্থূল-শরীর ঘুমাইয়া পড়িলে সূক্ষ্ম-দেহ তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বেড়ায়। দিনের বেলায় আমাদের সূক্ষ্ম-শরীর তাহারা দেখিতে পাইলেও উহা তাহাদের কথায় সাড়া দিতে পারে না ; তাই উহা তখন তাহাদের কাছে নিদ্রিত বলিয়া বোধ হয়। দিনের বেলায় আমরা তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারি না, রাত্রিকালে পারি। তাহাদের নিকট হইতে অল্পসময়ের জন্য প্রত্যহ একটু করিয়া বিরহ সহ্য করি মাত্র। পার্থিব জীবনেও তো ইহা করিয়া থাকি। যখন আমরা ঘুমাই, তখন কি কিছু সময়ের জন্য জীবিত আত্মীয়গুলিকে ভুলি না? অতএব, ছেলেপুলেরা মরণের পর মা-বাপকে

খুবই দেখিতে পায়। তাহাদের খেলার সাথী তাহাদের কুকুর, বিড়াল, সমস্তই পূর্বের মতই দেখে। কেন না, খেলার সাথী কুকুর, বিড়াল প্রভৃতিরাও ঘুমাইয়া পড়িলে, তাহারাও ভুবর্লোকে যাইয়া ওঠে। তখন ছেলেপুলেরাও তাহাদের সঙ্গে আসিয়া মিশে। ভুবর্লোকে দেখিবার শুনিবার শক্তি খুব বাড়িয়া যায়। তাই ছেলেপুলেরা পার্থিব আত্মীয় প্রভৃতির আরও মধুর ভাব দেখিয়া খুব বেশী আনন্দিত হয়। আর আমরা যখন পৃথিবীতে জাগি, অর্থাৎ তাহাদের কাছে যখন আমরা নিদ্রিতের মত থাকি, তখন তাহারা সেখানকার খেলার সাথীদের লইয়া খেলিয়া বেড়ায়। ভুবর্লোক-বিহারী অনেক মহাত্মাও তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহাদিগকে এটা ওটা দিয়া ভুলান যাহাতে তাহারা মহাস্ফূর্তিতে থাকে, উহারা তাহাই করেন।

ভুবর্লোকে যাইবার পর কি ছেলে-পুলেরা বড় হয়?

মরণের পর ছেলে-পুলেরা ভুবর্লোকে যাইয়া মহাসুখে থাকে, তাহা তো দেখা গেল। কিন্তু সেখানে যে পরিমাণ আকারে যায়, ততটুকুই থাকে, না সেখানে বাড়ে? অনেকেই ঐ প্রশ্নটি করিয়া বসেন। আমাদের প্রেততত্ত্বজ্ঞ ভাইরা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ রাখেন না। তাঁহারা বলেন—"হাঁ, ভুবর্লোকে ছেলে-পুলে খুব বাড়িতে থাকে।" তাঁহারা প্রেত-বৈঠকে এরূপ বিস্তর ছেলেপুলে ভূত আনিয়া ফেলেন যে, তাহাদের মা-বাপও তাহাদের বড় সড় চেহারা দেখিয়া চিনিয়া উঠিতে পারেন না। আমরা থিওসফিষ্ট সম্প্রদায় প্রেত তত্ত্বজ্ঞদিগের এই মীমাংসা বিশ্বাস করি না। আমরা জানি, ছেলে-পুলেরা পরিণতবয়স্কদিগের অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। আমরা উপরের ঐ কথাটি ভুল বলিয়াই মনে করি। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ছেলেপুলেরা ভুবর্লোকে চিন্তাশক্তি দ্বারা মূর্তি গড়িয়া তুলিতে পারে। এ কথাটি আমাদিগের ভুলিলে চলিবে ন। অতএব, তাহারা ইচ্ছামত যে কোন মূর্তিতে দেখা দিতে পারে। যে সমস্ত ছেলে মরণকালে একটু বড় ছিল, যাহাদের প্রাণে বড় হইবার সাধ ছিল, বড় হইতেছি বলিয়া যাহাদের ধারণা হইয়াছিল, তাহারা মরণের পরও ঐ ধারণার বশবর্তী থাকে। তখনও তাহারা ভাবে যে, আমরা খুব বড় হইতেছি। তাই তাহাদের সূক্ষ্ম-দেহটাও তাহাদের চিন্তার অনুরূপ হইয়া ওঠে। আত্মীয় স্বজনের কাছে স্থূল-মূর্তিতে দেখা দিতে হইলেও তাই বড়সড় হইয়াই দেখা দেয়। অতএব বৈঠকে যে বড় হওয়াটা দেখি, তাহা তাহাদের রূপের প্রকৃত বৃদ্ধি নহে ; সেটা একটা বাহ্য ব্যাপার, চোখের ভ্রম।

আর একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ভুবর্লোকের সূক্ষ্ম-দেহগুলির অধিকাংশই পূর্বেকার স্থূলশরীরেরই অনুরূপ। স্থূল শরীর বিনষ্ট হইয়া গেলেও ঐ সূক্ষ্মদেহটা অনেক দিন সেখানে বিচরণ করে। জীবাত্মা চিন্তা দ্বারা সে দেহটার একটা পরিবর্তন করিতে পারে বটে, কিন্তু চিন্তার প্রভাব অপসারিত হইবামাত্র দেহটা আবার পূর্বভাব প্রাপ্ত হয়। যেমন মূর্তিটি আগে ছিল, ঠিক তেমনিটিই আবার হইয়া পড়ে। পার্থিব জীবনে একটি শিশু শনৈঃ শনৈঃ বাড়ে, তাহার সূক্ষ্ম দেহটারও তখন ধীরে ধীরে পরিবর্তন হইতে থাকে। ইহাই নিয়ম। শিশু মরিয়া গেলে সূক্ষ্মদেহের পরিবর্ত্তন হওয়া থামিয়া যায় ; তখন উহা আর বাড়ে না; সুতরাং মরণকালে যতটুকু বাড়িয়াছিল, যেমনটি হইয়াছিল, সেইটিই তাহার স্বাভাবিক মূর্তি ; অতটুকু হইয়া থাকাই তাহার প্রকৃতি, কেবল বড় হইয়া ওঠার ঝোঁক আসিলে মূর্তিটি খানিক সময়ের জন্য একটু পরিবর্তিত হয় মাত্র। বৈঠকে যে অনেক ছেলেপুলেকে বড় হইয়া আসিতে দেখা যায়, এইটিই তাহার

একমাত্র হেতু। বড় হইবার সাধ উহাদের খুব বেশী, তাই সেই সাধের প্রভাবে আকারের ক্ষণিক পরিবর্তন ঘটে।

নাম ধরিয়া আসা

এমন ব্যাপার আমরা অনেক দেখিয়াছি যে, অন্য এক জন ভূতযোনি ছেলের মূর্তি ধরিয়া আসিয়া শোকাতুর মাতাপিতাকে সান্ত্বনা দেয়। এই ভূতগুলির উদ্দেশ্য ভাল। পরোপকারই উদ্দেশ্য। আমি অল্পদিন আগে ঐরূপ একটা ভূতযোনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "তুমি ঐরূপ করিতেছ কেন? তুমি ছেলে সাজিয়া আসিয়াছ কেন?" সে যে উত্তর করিল, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইলাম। বহু দিন পূর্বে ভূতটা ঐ মৃত শিশুর মায়ের উপপতি ছিল। রমণী এখন অপরের পত্নী হইলেও উহার উপর হইতে ভূতের ভালবাসাটি যায় নাই। তাই উহাকে এই শোকের সময় প্রবোধ দিতে না কি আসিয়াছিল। যে শিশুর শোকে রমণী কাতরা, ভূত বলিল, সে এখন আর ভুবর্লোকে নাই, সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে বা অন্য স্থানে গিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। রমণী শিশুটিকে দেখিবার জন্য আকুল, তাই তাহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে সে না কি ঐরূপ মূর্তি ধরিয়া আসিয়াছিল। সে বলিল—"এই জন্যেই আমি এরূপ করিয়াছি; ইহাতে আমাব অপরাধ হয় হোক।" শিশুর মূর্তিটি যেমন ছিল, সে ইচ্ছাশক্তির বলে অবিকল সেইরূপ মূর্তি ধরিত। বৈঠকে আসিয়া ঐরূপ বালিকা মূর্তিতে রমণীকে দেখা দিত। রমণী তাহাকে নিজের মেয়েটি মনে করিয়া কতই সুখ ও আনন্দ পাইত। ভূত বলিল—"এরূপ কার্য্যে আমার নিজেরই ক্ষতি, ইহাতে অপর কাহারও ক্ষতি নাই; আমার উদ্দেশ্য যখন ভাল, তখন ভগবান নিশ্চয়ই এ জন্য আমাকে শাস্তি দিবেন না।" সে সরল প্রাণে আবার বলিল—"মহাশয়! একটা সামান্য মিথ্যা বলিলেই যখন রমণী সান্ত্বনা পাইতে পারে, তখন তাহাকে আমি শোকাতুরা দেখিব কেন?" তাহার পরোপকার বৃত্তিটা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। প্রতারণাটা নিন্দনীয়। ভাবিলাম, ন্যায় অন্যায় ভগবান্ বিচার করিবেন। সে বিচার আমরা করিতে যাই কেন? ভাল উদ্দেশ্যে এইরূপ ভাবে নাম ধরিয়া আসা বিস্তরই দেখা যায়। যাহার নাম ধরিয়া আসে, ভূত অবিকল তাহার দেহ গড়িয়া লয়। প্রেত-তত্ত্বজ্ঞেরা বলেন যে, যে সকল শিশু মৃতাবস্থায় প্রসূত হয়, তাহারাও নাকি অনেকে বৈঠকে দেখা দিয়া থাকে, আবার যে ভুবর্লোকে বাঁচিয়া আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের লোক, আমরা ওরূপ ব্যাপার সহজেই বুঝিতে পাবি। মৃতাবস্থায় যে দেহ প্রসূত হয়, সে দেহে আদৌ আত্মা আসে না। তবে জীবাত্মা আসিয়া দেখা দিবে কিরূপে? ঐ রূপ ঘটনাস্থলে বুঝিতে হইবে, অন্য কোন ভূত ঐরূপ অভিনয় করিতেছে।

চমৎকার প্রবোধ

এইরূপ সকল ব্যাপারে থিওসফিই খাঁটি তথ্য বলিয়া দেয়। থিওসফির কথায় প্রাণে চমৎকার প্রবোধ পাওয়া যায়। প্রাণপুত্তলী সন্তান মারা গেলে মা বাপের হৃদয়ে শেল বিঁধিয়া যায়। সে দারুণ শোক সর্বদার জন্য প্রাণে জাগিয়া থাকে। কিন্তু থিওসফির কথা শুনিলে শোকের বেগ অনেকটা কমে। থিওসফি বলিয়া দেয়—"তোমার সন্তান মরে নাই, স্থূল শরীরটা গিয়াছে মাত্র, সে কিছু দিন পরে আরও উন্নত হইয়া, আরও বেশী সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আরও ভাল ভাল

সুখসুবিধার ভিতরে আসিয়া জন্মগ্রহণ করবে, এই জন্যই তাহার আপাত মরণ হইয়াছে।" কেমন, থিওসফির এ কথা কি তৃপ্তিকর নহে? শিশুর মরণ আপাত দৃষ্টিতে শোচনীয় বলিয়া বোধ হইলেও উহার পরিণাম ভাল। ঐরূপ অনেক ঘটনারই পরিণাম শুভ অথচ আপাত দৃষ্টিতে বড়ই সাংঘাতিক বলিয়া বোধ হয়। শিশুর মরণ হওয়ায় ভগবান্‌কে নিষ্ঠুর নির্দয় বলিয়া আমাদের মনে হয় ; কিন্তু তিনি মঙ্গলময়। তাঁহার কাছে অন্যায় হইতে পারে না। আমরা অজ্ঞান বলিয়াই তাঁহাকে নির্দয় ভাবি।

"কে বুঝিবে বল কার্য ধারা তাঁর
অতীব মহান্ অতি চমৎকার।
অজ্ঞান মানব বৃথা করে শোক,
বুঝে না তাঁহার করুণা অপার"—(ফেবার।)
ভাঙ্গা গড়া যত যা দেখিছ ভবে
সকলি তাঁহার নিয়মের ফল।
উন্নতির তরে ভাঙ্গা হয় শুধু
প্রতি কার্যে তাঁর সুন্দব কৌশল ॥
ন্যায়বান্ তিনি ন্যায়ের মুরতি
ন্যায়ের স্ফুরণ তাঁহার বিধান।
প্রেম শান্তি ঝবে জগতেব তবে
পালহ আদেশ কর অবধান ॥"

(স্যার এড্‌উইন্ আর্ণল্ড্)